ভারতে জাতীয় আন্দোলন
ইসলাম ও পাকিস্তান

ভারতে জাতীয় আন্দোলন

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থম

কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

আমার স্নেহাস্পদ পুত্রদের ও বধূমাতাদের হস্তে এই বইখানি সমর্পণ করলাম, এই ভরসায় যে, তাঁরা তাঁদের সন্তানদের স্বাধীন ভারতের যোগ্য নাগরিক হবার শিক্ষা দেবেন। তারা যেন বলতে শেখে—

'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বমায়ের, তোমাতে বিশ্বময়ীর আঁচল পাতা।'

—আর নতুন যুগের ডাক যেন তারা শুনতে পায়—বিশ্বকল্যাণভাবনা ও দেশের কল্যাণকামনা একই। ইতি

বোলপুর—শান্তিনিকেতন বাবা

১১ শ্রাবণ ১৩৬৭

[২৭ জুলাই ১৯৬০]

মুখবন্ধ

১৯৩০-৩১ অব্দে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষ্যে অবসরপ্রাপ্ত ভারতের একজন ইংরেজ উচ্চ রাজ-কর্মচারী একটি সারগর্ভ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, "ভারতে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে কোন ইংরেজ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে লণ্ডন সহরে ভারতবাসী ও ইংরেজ একত্রে মিলিত হইয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি স্থির করিবেন। আর ইহা কখনও সম্ভবপর হইত না যদি রাজা রামমোহন রায় অগ্রণী হইয়া তিনজন ঠাকুর, একজন ঘোষ ও একজন ব্যানার্জীর সহযোগে ইহার গোড়াপত্তন না করিতেন। তাঁহারা যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, গোলটেবিল বৈঠক তাহারই পরিণতি মাত্র।"

১৮২৩ অব্দে ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব করিয়া এক নূতন্ আইন জারী হয়। ইহার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায়, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ এবং গৌরীচরণ ব্যানার্জী তীব্র প্রতিবাদ করেন ও সুপ্রীম কোর্টে এই আইনের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেন। ইহা নামঞ্জুর হইলে তাঁহারা ব্রিটিশ রাজার নিকট প্রতিবাদ করিয়া এক সুদীর্ঘ আপীল করেন। এই আপীলের ভাষা ও ভাব এবং ইহার মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার পক্ষে যে সমস্ত যুক্তিতর্ক দেখান হইয়াছে তাহা ইংলণ্ডেও উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। রাজা রামমোহনের এই আপীলেও কোন ফল হয় নাই। কিন্তু রাজা ও তাঁহার সহযোগীরা রাজশক্তির অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আইনসম্মত প্রণালীতে সংগ্রাম করিয়া যে অতুল সাহস ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাই ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ নির্দেশ করিয়া দিল। এবং সেই পথে অগ্রসর হইতে হইতে অবশেষে ভারত স্বাধীনতা অবলম্বন করিল। উপরে উদ্ধৃত উক্তিটির তাৎপর্য এই।

ভারতের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে এই উক্তিটি

অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বস্তুতঃ যে আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে রামমোহনের আমলেই তাহার সূচনা হয়। এই সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস না জানিলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভবপর নহে।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়া সকলের ধন্যবাদ অর্জন করিবেন সন্দেহ নাই। কারণ এইরূপ বিস্তারিত জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস শুধু বাংলা-ভাষায় কেন ইংরেজী ভাষায়ও কোন একখানি গ্রন্থে নাই। অনেক শিক্ষিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এমন কি প্রবীণ রাজনৈতিকও মনে করেন যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হইতেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ইহা যে কত বড় ভুল আলোচ্য গ্রন্থ পাঠ করিলে সকলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর গ্রন্থের অভাবই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার অন্যতম কারণ।

আলোচ্য বিষয়টি খুবই ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই সম্বন্ধে লিখিত প্রথম গ্রন্থে ইহার পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল আলোচনা সম্ভবপর নহে। কিন্তু গ্রন্থকার জাতীয় আন্দোলনের বিবর্তন ও পরিবর্তনের মূল সূত্রগুলি সময়ানুক্রমে সাজাইয়া যে কাঠামো তৈয়ার করিয়াছেন তাহাতে এই বিষয়টি বুঝিবার ও আলোচনার সুবিধা হইবে এবং ইহার সম্বন্ধে আরও বেশী জানিবার আগ্রহ জন্মিবে।

গ্রন্থটি বহুল তথ্যে পরিপূর্ণ। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতামত উদ্ধৃত করায় এই গ্রন্থের মূল্য ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ পেশাদার রাজনৈতিক ছিলেন না; রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; রাজনীতিবিদেরা ইহার সম্বন্ধে খুব বেশী আলোচনাও করেন নাই। সুতরাং এই উক্তিগুলির সহিত সাধারণের বিশেষ পরিচয় নাই। আজিকার

দিনে এই উক্তিগুলি পাঠ করিলে রাজনীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতের পথ নির্দেশেও ইহা অনেক সহায়তা করিবে।

গ্রন্থখানির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার রচয়িতা গতানুগতিক ভাবে আলোচনা বা মামুলি বচন না আওড়াইয়া স্বাধীনভাবে অনেক সমস্যা বুঝিতে এবং নিজের মতামত প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক সম্বন্ধ, মহাত্মা গান্ধীর মতামত ও প্রবর্তিত পথ, কংগ্রেসের উৎপত্তি অগ্রগতি ও পরিণতি বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা এই স্বাধীন চিন্তার ফল। সকলেই যে তাঁহার সহিত একমত হইবেন এমন আশা করা অসঙ্গত। কিন্তু বর্তমানকালে কতকগুলি রাজনৈতিক স্লোগ্যান বেদবাক্যের ন্যায় বিনা বিচারে অভ্রান্ত স্বীকার করিয়া ভারতবাসী যে মানসিক জড়তার পরিচয় দিতেছে তাহার প্রতিকার করিতে হইলে এইরূপ আলোচনার প্রয়োজন। আজকাল রাজনৈতিক দলের মধ্যে গুরুবাদের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু কার্ল মার্কস্, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি গুরুর বাক্যই যে রাজনীতির শেষ কথা নহে—অথবা তাঁহাদের কার্য বা আচরণ যে আলোচনার উর্ধ্বে নহে সেকথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। এই গ্রন্থের নানা স্থানে প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনার যোগ্য।

গ্রন্থশেষে "ভারতে বিপ্লববাদ" এবং "ইস্‌লাম ও পাকিস্তান" নামে দুইটি সুদীর্ঘ আলোচনা আছে। জাতীয় আন্দোলনের অংশ হইলেও এই দুইটি বিষয়ের পৃথক আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার ইহাদের গুরুত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং বহুল তথ্য সমাবেশ করিয়াছেন।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃতভাবে জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

ভূমিকা

'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। বরদা এজেন্সির শিশিরকুমার নিয়োগী এ গ্রন্থের প্রকাশক; তিনি কল্লোলযুগের লেখক ও ভাবুক, 'কালিকলম' নামে প্রগতিপক্ষীয় মাসিকপত্রের পরিচালক। শিশিরকুমার আমার 'জাতীয় আন্দোলন' গ্রন্থ প্রকাশের পর 'ভারত-পরিচয়ে'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ ছেপে বের করেন। 'জাতীয় আন্দোলন' প্রকাশিত হলে শিশিরকুমারকে কলকাতা পুলিসের কাছে জবাবদিহি করতে হয়—কারণ, কালটা হচ্ছে বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারি হবার পর্ব কিন্তু গ্রন্থমধ্যে ব্রিটিশ সরকারের উপর জ্বালাময়ী অগ্নিবর্ষী বিশেষ্য-বিশেষণ বর্ষিত না-হওয়ায় এ বইকে আইনের বেড়াজালে ধরা যায় নি। আমি জানতাম, 'শক্ত কথায় হাড় ভাঙেনা'—তথ্য নিখুঁতভাবে সাজাতে পারলে, তত্ত্ব আপনা হতেই ফুটে ওঠে, সত্যরূপ মূর্ত হয়।

এ বইকে পুনর্মুদ্রণ করবার জন্য নানা বন্ধুজনের কাছ থেকে অনুরোধ আসত; কিন্তু নানা কারণে হাত দেবার অবসর করে উঠতে পারিনি। প্রথম প্রকাশনের প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে একে পুনরায় লোক্‌চক্ষুগোচর করছি।

প্রায় দু'শ বৎসর বাংলাদেশ ব্রিটিশের শাসনাধীন থাকার পর, ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলো। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বের পাঁচ দশক ভারতের উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়েছিল - এখনো আকাশ সর্বতোভাবে নির্মল হয়েছে তা বলতে পারিনে। এই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারত বিভক্ত হলো—ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিমে নূতন রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' গড়ে উঠলো বৃটিশ কূটনীতি জয়জয়কারের মাঝে। ১৯০৫ সালে ইংরেজ বঙ্গচ্ছেদ ক'রে দুটো প্রদেশ সৃষ্টি করেছিল। বাঙালীরা আন্দোলন ক'রে, আবেদন ক'রে, 'বয়কট ক'রে বঙ্গচ্ছেদ রদ করালো—সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের অনুগ্রহে খণ্ডিত বাংলা জোড়া লাগলো ১৯১২ সালে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের শুরু হতেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কালো মেঘ

দেখা দিয়েছিল—যার চরম পরিণতি হলো খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতালাভে ও পাকিস্তানের ইসলামিক স্টেটের নব রূপায়ণে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ভারতীয়রা সংগ্রাম ক'রে যে স্বাধীনতা লাভ করেছে তারই রেখাঙ্কিত ইতিহাস আমরা রচনা করেছি।

এই গ্রন্থ 'পত্রিকা সিণ্ডিকেট'-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হচ্ছে, এজন্য আমি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ মহাশয়দের নিকট কৃতজ্ঞ। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে এই গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন ও ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ডক্টর আদিত্য ওহদেদর এই গ্রন্থের Bibliography প্রস্তুত করে দিয়ে এর মূল্য বাড়িয়েছেন—তজ্জন্য আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এ গ্রন্থের কপি পরীক্ষা ও প্রুফ দেখা ছাড়া নানা সৎপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমানবেন্দ্র পাল। তাঁর দৃষ্টিতে ছোটখাটো বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে। তবে এখনো যে সমস্তটাই নির্ভুল হয়েছে, এমন দাবী করতে পারি না। আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ আমাকে তাঁদের মন্তব্য জানাবেন; যদি পুনরায় এই মুদ্রণের প্রয়োজন ও সুযোগ হয়, তবে কৃতজ্ঞচিত্তে ভুলগুলি সংশোধন করে দেবো। এই গ্রন্থের নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে আমায় সহায়তা করেছেন বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের এম, এ ক্লাসের ছাত্র শ্রীমান জয়কুমার চট্টোপাধ্যায়; তজ্জন্য তাঁকে আমার আশীর্বাদ জানাচ্ছি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের 'মুক্তির সন্ধানে ভারত', শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্তের 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ' বই থেকে অনেক সাহায্য গ্রহণ করেছি।

ইতি—

১৫ অগষ্ট ১৯৬০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

(প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত ।)

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহের জন্য কত প্রকার শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা প্রমাণসহ বর্ণনা করিয়া শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়স্‌বাল্ মহাশয় 'হিন্দু পলিটি' নামধেয় একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায়, সর্বসাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বলিতে বর্তমান সময়ে লোকে যাহা বুঝে, ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে, কোন কোন সময়ে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা বহু পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং রাষ্ট্রীয় অধিকার ও স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের আধুনিক চেষ্টা ভারতবর্ষের পক্ষে অশ্রুতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব ও অভূতপূর্ব একটা জিনিষ পাইবার চেষ্টা নহে। কিন্তু ইহা স্বীকার্য, যে, ভারতে ব্রিটিশ-রাজত্ব স্থাপনের প্রাক্‌কালে এদেশে এই জিনিষটি ছিল না।

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত যখন হয়, তখন যে দেশের লোক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং সর্ববিধ পৌর ও জনপদ অধিকার চাহিয়াছিল তাহা নহে ; যদিও ইহা সত্য, যে, আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক আদিগুরু রামমোহন রায়ের মানসপটে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের ছায়া পড়িয়াছিল। কিন্তু, যেমন অন্য অনেক বিষয়ে, তেমনই এই বিষয়েও তিনি স্বীয় সমসাময়িক ব্যক্তিগণের অনেক অগ্রে ও উর্ধ্বে ছিলেন।

তাঁহার পরে যখন এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তখন সামান্য জিনিষের জন্য সামান্যভাবেই তাহার আরম্ভ হইয়াছিল। কেমন করিয়া সেই ক্ষীণ স্রোতটির উদ্ভব হইয়াছিল, কোন্ পথ ধরিয়া সেই স্রোতটি চলিয়া আসিয়াছে, তাহার কোন্ শাখা বিপথে গিয়া ব্যর্থতার মরুভূমিতে আত্মবিলোপ করিয়াছে বা করিতে বসিয়াছে অথচ সেই ব্যর্থতার ইতিহাস দ্বারাও আমাদিগকে উপদেশ দিতেছে ও সুপথ দেখাইতেছে, কেমন করিয়া সেই গোড়াকার ক্ষীণ স্রোতটি পুষ্ট, বিপুলকায়, প্রবল ও বেগবান হইয়াছে এই সমস্ত কথা শ্রীমান্ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন। রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় যোগ দিবার লোক ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে; ভবিষ্যতে আরও দ্রুত বাড়িবে। কিন্তু যাঁহারা যোগ দিয়াছেন ও পরে দিবেন, তাঁহারা এই প্রচেষ্টার অতীত ইতিহাস জানিলে দেশের যত কল্যাণ করিতে পারিবেন, না জানিলে তত পারিবেন না। এইজন্য ইহার ইতিহাস তাঁহাদের জানা উচিত। তা ছাড়া, কৌতূহল তৃপ্তির জন্যও উহা জ্ঞাতব্য।

গ্রন্থখানি রচনার জন্য লেখককে বহু তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। বহিখানিতে এমন অনেক কথা দেখিলাম, যাহা আমি জানিতাম না; তার চেয়ে বেশী কথা দেখিলাম, যাহা জানিতাম কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে, সম্পাদকীয় কাজ করিবার সময় এইরূপ একখানি বই নিকটে থাকিলে দুর্বল স্মৃতি অনেক সাহায্য পাইবে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সকল দেশেই হুজুক, দলাদলি, গালাগালি ও অন্তর্বিরোধ থাকায় রাষ্ট্রনীতি জিনিষটার উপরই অনেকে বিরূপ। কিন্তু হুজুক প্রভৃতি আনুষঙ্গিক দোষ আছে বলিয়া আমরা উহার গুরুত্ব বিস্মৃত হইতে পারিনা; রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টা জ্ঞানবত্তা, বিচক্ষণতা ও ধীরতার সহিত পরিচালিত হইলে তাহা হইতে যে প্রভূত কল্যাণের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা অস্বীকার করিতে পারিনা। আমাদের পূর্বজগণ রাষ্ট্রনীতির গৌরব বুঝিতেন। প্রমাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়স্বাল্ মহাশয় 'হিন্দু পলিটি' গ্রন্থে মহাভারত হইতে যে শ্লোক দুটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নীচে মুদ্রিত করিতেছি।—

মজ্জেৎত্রয়ী দণ্ডনীতৌ হতায়াং সর্বেধর্মা প্রক্ষয়েয়ুর্বিবৃদ্ধা
সর্বে ধর্মাশ্চাশ্রমাণাং হতাঃ স্যুঃ ক্ষাত্রে ত্যক্তে রাজধর্মে পুরাণে ॥২৮॥
সর্বে ত্যাগা রাজধর্মেষু দৃষ্টা সর্বাঃ দীক্ষা রাজধর্মেষু যুক্তাঃ।
সর্বা বিদ্যা রাজধর্মেষু চোক্তাঃ সর্বে লোকা রাজধর্মে প্রবিষ্টাঃ ॥২৯॥

(মহাভারত, শান্তি পর্ব, ৬৩ অধ্যায়)

রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টাকে সুপথে চালিত করিতে এই পুস্তক পরোক্ষভাবে সাহায্য করিবে বলিয়া, আমার মনে হয়, গ্রন্থকার ইহা লিখিতে পরিশ্রম করিয়া ভালই করিয়াছেন।

৩ ফাল্গুন ১৩৩১ [১৯২৫]

সূচী

ইসলাম ও পাকিস্তান

ভারতে জাতীয় আন্দোলন

পটভূমি

জাতীয় আন্দোলনের 'জাতীয়' শব্দটা ইংরেজি 'ন্যাশনাল' শব্দের অনুবাদ; য়ুরোপেও নেশন ও ন্যাশনাল শব্দের প্রয়োগ খুব প্রাচীন নহে। য়ুরোপের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে এবং ভারতের বর্তমান ভূগোল ও প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানাহরণ হইতে দেশ সম্বন্ধে শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে আধুনিক অর্থে জাতীয়তার অস্পষ্ট ধারণার জন্ম হয়।

প্রাক্-য়ুরোপীয় যুগে সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, দর্শনাদির অনুশীলন হইতে ভারতের শিক্ষিত উচ্চবর্ণের মধ্যে হিন্দুত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল, তাহাকে 'ন্যাশনাল' বা জাতীয় ভাবোদ্দীপক ভাবনা বলা যায় না। তীর্থাদি ভ্রমণের ফলেও সাধারণ লোকের মনে হিন্দুভারত সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় হইত—তবে তাহাও মুষ্টিমেয়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মোট কথা, একটা অস্পষ্ট ধর্মভিত্তিক ঐক্যবোধ তাহারা অনুভব করিলেও, দেশ বা নেশন অর্থে জাতি সম্বন্ধে কোনো বোধ জাগ্রত হয় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে উনবিংশ শতকের আরম্ভ ভাগে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের মধ্যে এই ঐক্যভাবনার উদয় হয় যে, ভারত একটি অখণ্ড দেশ ও ইহার একটি বিশিষ্ট আত্মিক ও সাংস্কৃতিক মূর্তি আছে।

জননী জন্মভূমি স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ—এ কথা সংস্কৃতে চালু থাকিলেও এই শ্লোকের জননী অর্থে গর্ভধারিণী জননী, আর জন্মভূমি বলিতে বুঝায় নিজের গ্রাম, নগর বা ক্ষুদ্র রাজ্য। কি প্রাচীন জগতে, কি মধ্যযুগে ইতিহাসের অবিস্মরণীয় বীরেরা নিজ নিজ দুর্গ, নগর বা ক্ষুদ্র একখণ্ড রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়া অশেষ গৌরব অর্জন করিয়াছেন—সমগ্র দেশ বা ন্যাশনাল স্টেট সম্বন্ধে ভাবনা তাঁহাদের ছিল না, থাকিতেও পারে না। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস আমরা পড়ি, কিন্তু কোথাও গ্রীসকে খুঁজিয়া পাই না—পাওয়া যায় কতকগুলি বিবদমান ক্ষুদ্র রাষ্ট্রনগরী। ভারতের ও অন্যান্য সকল প্রাচীন দেশের ইতিহাস এই একই ধরণের। 'স্বজাতি প্রীতি' বলিয়া শব্দের ব্যবহার দেখা যায়—সেখানে 'স্বজাতি' অর্থে নিজের 'জাতভাই'দের কথাই বুঝায়—আমরা 'নেশন' বলিতে যাহা বুঝি, তাহা নহে।

'ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা'—

এ ধারণা সে যুগে আশা করা যায় না—কারণ দেশ একটা ভৌগোলিক সত্য এবং দেশপ্রীতির উদ্‌ভব হয় একটা অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সংস্কার হইতে। 'নেশন' কি—এই শব্দের সংজ্ঞা লইয়া বিচারের অন্ত নাই।

বিদেশী বা বিধর্মী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকেও আধুনিক অর্থে 'জাতীয়' আন্দোলন বলিতে পারা যায় না; কারণ সর্বদেশের ইতিহাসেই দেখা যায় যে, এক রাজবংশের শাসনের অধোগতি সময়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের অনিবার্য তাড়নায় প্রজা-বিদ্রোহ ও নূতন রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছে। যাহাকে আমরা 'জনসমাজ' বা 'পীপল্' বলি তাহারা কখনো যুদ্ধে যোগদান করিত না, তাহারা নির্লিপ্তভাবে বলিত 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়'; তাহারা উদাসীনভাবে অদূরের প্রান্তরে দাঁড়াইয়া দুইটি সৈন্যদলের যুদ্ধ দেখে— কে রাজা, কাহার রাজ্য—তাহা লইয়া তাহার শিরঃপীড়া নাই; কারণ তাহারা জানে 'রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব।' শাসকগোষ্ঠীর উপর জনতার শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে এই-সব প্রবাদ বচনে, যেমন— 'যে আসে লঙ্কায় সে হয় রাবণ।' এই-সব প্রবাদ বাক্যের নির্গলিত অর্থ হইতেছে, জনতার নিকট শাসক ও শোষক শ্রেণী একই জাতের, অর্থাৎ তাহারা একটা বিশেষ 'শ্রেণী'ভুক্ত। হিন্দু বৌদ্ধ পাঠান মুঘল ইংরেজ যে আসে আসুক, তাহাদের উত্যক্ত না করিলেই হয়—এই ছিল জনতার মনোভাব।

রাজ্য ভাঙাগড়ার চিরন্তন খেলা চলিয়া আসিতেছে— কিন্তু এ-সবের পটভূমিতে জনতার সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও ধর্মীয় জীবন প্রচেষ্টার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ব্যাহত হয় নাই। রাষ্ট্রের রাজসিংহাসনে কে বা কাহারা কখন অধিরূঢ়, সে কথা সাধারণ লোকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছে; জনতার নিকট অশোক ও আকবর সমভাবেই অপরিচিত, ইতিহাসের মুদ্রিত পৃষ্ঠায় তাঁহারা নাম মাত্র। কিন্তু অতীতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, প্রাচীরচিত্র আজও দেশ বক্ষে বহন করিতেছে। বিদ্যাপতিকে লোকে ভোলে নাই—রাজা শিবসিংহ সম্বন্ধে

লোকের কোনো কৌতূহল নাই। বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস প্রভৃতি লেখকগণ কবে কোথায় ছিলেন কেহ জানে না—কিন্তু তাঁহাদের রচনা জনতার জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত।

২

ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয় শুরু হয় য়ুরোপীয় বণিকদের আগমন হইতে; তাহাদের উন্নততর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির জন্য ভারতের মধ্যযুগীয় কারুশিল্প অন্যায় প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়। মধ্যযুগের তুর্কী-মুঘলদের শাসন ও শোষণ হইতে য়ুরোপীয়দের নীতির প্রভেদ একটি জায়গায়। তুর্কী-মুঘলরা দেশ জয় করিতে আসিয়াছিল—এবং জয় করিয়াওছিল; কিন্তু তাহারা এ দেশকে মাতৃভূমিরূপেই বরণ করিয়া লয়। এ দেশের অধিবাসীর সহিত রক্তের সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পড়ায় এই দেশ হয় তাহাদের বাসভূমি—ইহার সুখ-দুঃখ—ইহার ভালোমন্দ সমস্তের সঙ্গে তাহারা জড়াইয়া পড়ে। ঠিক বিপরীতটি ঘটে য়ুরোপীয়দের বেলায়। তাহারা এ দেশকে তাহাদের চাষের ক্ষেত্রতুল্য করিয়া রাখে—বৎসর বৎসর শস্য কাটিয়া গৃহে লইয়া যাওয়াই ছিল জমির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ। য়ুরোপীয়রা ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া রাজ্যটাকে যেন 'পড়িয়া' পায়। 'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।' তাই ভারতকে তাহারা আপনার দেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই; কোনোদিন শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। ভারত হইতে ধনরত্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শোষণ ও লুণ্ঠন ছিল এই শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বৈশিষ্ট্য। সুলতান মামুদ, তৈমুরলঙ, নাদির শাহ বিশাল ভারতের কতটুকু অংশই বা লুণ্ঠন করে এবং কয়দিনই বা তাহারা দেশের মধ্যে বাস করিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশযুগে সমগ্র ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া ইংরেজ ভারতীয়দের সকল প্রকারের সম্পদ সুনিপুণভাবে শোষণ করে। জনশ্রুতির ভ্যামপায়ার পক্ষী যেমন তাহার দীর্ঘ পক্ষ দ্বারা ক্লান্ত পথিকের দেহ ব্যজন করে ও পরে চঞ্চুসংযোগে তাহার সমস্ত রুধির শুষিয়া পান করে—সেই পদ্ধতি ছিল ব্রিটিশের।

৩

উনবিংশ শতকে পৃথিবীর সর্বত্র জাতীয়তাবাদের নূতন রাজনীতিক চেতনা 'জাতীয় রাষ্ট্র' বা ন্যাশনাল স্টেট গঠন করিবার প্রেরণায় রূপ লয়। পশ্চিম এশিয়ায় ও য়ুরোপে মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যগুলি প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; এই সময়ের মধ্যে অস্‌ট্রিয়ান সাম্রাজ্য, তুর্কী সাম্রাজ্য, রুশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে—বহু ক্ষুদ্র জাতির রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে সকলেই বাধ্য হয়। অর্থাৎ self-determination বা আত্ম-কর্তৃত্বের অধিকার সকলেই মানিয়া লয়। এই আত্ম-কর্তৃত্ব-প্রাপ্ত 'জাতীয়' রাষ্ট্রগুলির প্রধান লক্ষণ জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন, জাতির সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্বয়ম্ভরতা ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা রক্ষা। ভারতে যে জাতীয় আন্দোলন দেখা দেয়, তাহার পটভূমিতে ছিল স্বাধীনতা অর্জন, সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যলাভের তীব্র ইচ্ছা।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত হইতেই প্রশ্ন উঠিল, জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষা যদি মুক্তি আন্দোলনের উদ্দেশ্য হয়—তবে সে সংস্কৃতি কাহার—হিন্দুর না মুসলমানের। এই সঙ্ঘভেদী মনোভাবের উদয় হয় জাতীয়তাবোধের ভাবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই। হিন্দুরা মনে করে, হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষাই জাতীয়তাবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য—কারণ তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহাদের ভারত 'হিন্দুস্থান।' মুসলমান ভাবে, সংখ্যালঘু হইয়াও তাহারা সাত শত বৎসর ভারত শাসন করিয়াছিল। সাত শত বৎসর পূর্বে ভারতে মুসলমান ছিল কি না সন্দেহ, আজ সেখানে তাহারা আট-নয় কোটি—সংখ্যা লঘু হইলেও তাহারা 'নেশন'; অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কোনো সামাজিক ভেদ নাই, তাহাদের এক ধর্ম, এক নবী, 'এক ভাষা'। মোটামুটিভাবে ভারতীয় মুসলমানমাত্রই আপনাদের একত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ; নিজেদের মধ্যে বিবদমান হইলেও, অ-মুসলমানের সহিত যুদ্ধ বা জেহাদের সময় তাহারা একমত হইয়া কার্য করিতে পারে।

জাতীয় আন্দোলনের অরুণযুগ হইতেই মুসলমানের মনে হইয়াছিল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর হস্তে আধিপত্য আসিলে তাহাদের সংস্কৃতি বিপন্ন হইতে পারে; সুতরাং তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষার জন্য হিন্দু হইতে দূরে

থাকিয়া আন্দোলন ও আত্মোন্নতিপরায়ণ হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ম; অথবা যৌথদায়িত্বে রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তাহাদের জন্য রক্ষাকবচের প্রয়োজন। বিদেশী শাসকদের উপস্থিতি ও উস্কানি এই ভেদ-বুদ্ধির ইন্ধন ও উত্তেজনা জোগাইয়া হিন্দু-মুসলমানের 'জাতীয়' আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক সমস্যারূপে কঠিন করিয়া তোলে; এবং অবশেষে সেই ভেদজ্ঞানকে সুসংবদ্ধ দ্বিজাতিক তত্ত্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারত ও পাকিস্তান দুইটি রাষ্ট্র সৃষ্টির সহায়তা করিল।

৪

ভারতে জাতীয় আন্দোলনের মূলে আছে ইংরেজি শিক্ষা। ভাষার বাঁধ ভাঙিয়া গেলে ভাবের বন্যাকে আটকানো যায় না। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা হইতে ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি চর্চার সূত্রপাত। এই বিজাতীয় শিক্ষা হইতেই জাতীয়তার জন্ম ও বিদেশীর বন্ধন হইতে স্বদেশের মুক্তিলাভ-আন্দোলনের উদ্ভব। কিন্তু ইস্ট্-ইন্ডিয়া-কোম্পানি গোড়ার দিকে ইংরেজি ভাষা প্রচারে মন দেয় নাই, তার কারণ সে যুগে যাহারা ভারতে আসিত তাহাদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত, সাহসিক ও অর্থগৃধ্নু বণিক।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে ইংরেজ ইস্ট্-ইন্ডিয়া-কোম্পানি নামত রাজত্ব করিতে আরম্ভ না করিলেও কার্যত বঙ্গদেশের শাসন ও শোষণ আরম্ভ করে। মুঘল সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বের অবসান হয় আউরঙজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই। ১৭০৭ অব্দে দক্ষিণভারতে বাদশাহের জীর্ণ দেহ সমাধিস্থ হইবার মুহূর্ত হইতে মুঘল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে। তাঁহার তিরোভাবের ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পারস্যের শাহনশাহ নাদির কর্তৃক দিল্লী মহানগরী লুণ্ঠিত হয়। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি মুঘল বাদশাহ হারাইয়াছিলেন এবং জনতার মধ্যে কোনো প্রতিরোধক শক্তি জাগ্রত হয় নাই। আর বিশ বৎসরের মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্যমধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাজ্য গড়িয়া উঠিল; দিল্লীশ্বর শাহনশাহ সত্যই অবশেষে দিল্লীর ঈশ্বর রূপেই অধিষ্ঠিত থাকিলেন। সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত হইল বহুরাজকতা—যাহা অরাজকতারই নামান্তর মাত্র। বঙ্গদেশে আলিবর্দী খাঁ

স্বাধীন নবাবী পত্তন করিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসরের মধ্যে গৃহবিবাদে, বিশ্বাসঘাতকতায় জীর্ণ রাজ্যসংস্থা মুষ্টিমেয় বিদেশী বণিকের পদানত হইল। ১৭৫৭ সালে জুন মাসে ভাগীরথী তীরে পলাশী ক্ষেত্রে সামান্য এক যুদ্ধে পরাভূত হইবার পর বাংলা সুবার নবাব মীরজাফর ইস্ট্-ইন্ডিয়া-কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের ক্রীড়নক হইয়া মুর্শিদাবাদের মসনদে বসিলেন। ইহার পর একশত বৎসরের মধ্যে ইংরেজ সমস্ত ভারত গ্রাস করে এবং তাহার পর প্রায় একশত বৎসর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অধীন রাষ্ট্ররূপে শাসিত ও শোষিত হয়। ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস এই একশত বৎসরের মধ্যে সীমিত।

উত্তর ভারতে মারাঠাদের সংহত শক্তি পাণিপথ ক্ষেত্রে চূর্ণত হইল পলাশী যুদ্ধের তিন বৎসর পরে। অতঃপর মারাঠা সর্দাররা পেশাবার এক-কর্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন এবং প্রত্যেকেই আপনাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে হিন্দ্ পাতশাহ স্থাপনের স্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠিলেন। তখন প্রশ্ন উঠিল—মারাঠাদের মধ্যে কে—হোলকার, সিন্ধিয়া, না ভোঁসলে—কোথায় প্রভুত্ব স্থাপন করিবে—পেশাবা তো ক্রীড়নক। নিখিল ভারতের উপর প্রভুত্ব স্থাপন যদি করিতে হয়, তবে সে একাই করিবে; সকলকে লইয়া, সকলকে বুঝাইয়া অখণ্ড ভারত-ভাবনা কার্যকরী হয় নাই। শুরু হইল পরস্পরের মধ্যে হানাহানি, ষড়যন্ত্র, নিষ্ঠুর রাজনৈতিক চালবাজি। ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে। মারাঠা সর্দারদের সকলেই ইংরেজের রণনীতি ও কূটনীতির নিকট পরাভব মানিয়া ব্রিটিশরাজের অনুগ্রহভাজন সামন্ত নরপতি-রূপে দেশমধ্যে উচ্ছৃঙ্খল ও অকর্মণ্য জীবনের প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। দীর্ঘকাল তাঁহারা ব্রিটিশের মিত্ররাজরূপে শোভমান ছিলেন—সদ্য তাঁহাদের সামন্ততন্ত্রীয় স্বৈরাচারের অবসান হইয়াছে।

১৭৬৫ অব্দে ইংরেজ কোম্পানি দেওয়ানী লাভের পর, বহুকাল দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন, শিক্ষা, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে নাই। কতক ভয়ে, কতক লোকরঞ্জনার্থে, কতক রাজনীতিবোধে ও অভিজ্ঞতার অভাবে তাহারা সর্ববিষয়ে এ দেশের প্রাচীন গতানুগতিক রীতিনীতিকে অনুবর্তন করিয়া চলিয়াছিল। তা ছাড়া—তাহারা তো নবাবের দেওয়ান—নবাবই তো শাসক—তাহারা দেওয়ানরূপে রাজস্ব আদায় ও ব্যয় করিবার ভার-

প্রাপ্ত কর্মচারীমাত্র। কিন্তু এই ভান বেশি দিন চলিল না। অকর্মণ্য নবাবদের সমস্ত ক্ষমতাই কোম্পানির ভৃত্যদের হস্তে আসিয়া গেল। ইতিহাসে দেখা যায়, প্রিটোরিয়ান গার্ড, প্যালেস গার্ডরা রাজকর্তা (King-maker) হইয়া সর্বাধিকার হস্তগত করিয়াছে। কোম্পানির ভৃত্যগণ এখন বাংলার অর্থ ও অস্ত্র —এই দুয়েরই মালিক—তৎসত্ত্বেও তাহারা নামত দেওয়ান।

কোম্পানির পরিচালকগণ তাঁহাদের 'দেওয়ানী'-রাজ্যের এলাকামধ্যে খ্রীষ্টান পাদরীদের প্রবেশ করিবার অনুমতি দিতেন না,—পাছে ভারতীয়দের মনে হয়, বিদেশী দেওয়ান-কোম্পানি তাহাদের খ্রীষ্টান করিতে চায়। এইজন্য প্রথম পাদরীদের দল আসিয়া দিনেমারদের অধিকৃত রাজ্য শ্রীরামপুরে মিশন স্থাপন ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের দিক হইতে এ দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের কোনো আগ্রহ ছিল না। ক্রমে রাজ্যবিস্তারের সহিত রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা করা অপরিহার্য হইয়া পড়িলে একদল ইংরেজিজানা অধস্তন কর্মচারীর প্রয়োজন অনুভূত হইল। তখন হইতে এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের জল্পনা-কল্পনার সূত্রপাত, কিন্তু এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঘোর মতভেদ থাকায় তাহা দীর্ঘকাল কার্যকরী হয় নাই।

ইস্ট্-ইন্ডিয়া-কোম্পানির প্রথম গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতীয় বহু ভাষা জানিতেন এবং তাঁহারই ইচ্ছায় ভারতের কৌলিক ও সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য কলিকাতায় মাদ্রাসা[১] ও কাশীতে সংস্কৃত চতুষ্পাঠি স্থাপিত হয়। এই ব্যবস্থায় হিন্দুরা তাহাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে সংকুচিত এবং মুসলমানরা তাহাদের মধ্যযুগীয় ইস্লামিক জ্ঞানচর্চার মধ্যে নিমজ্জিত থাকিল—পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচলিত হইল না।

এই সময়ে বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি নামে বিদ্বজ্জনদের এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় (১৭৮৫)। স্যর উইলিয়ম জোন্স্, উইলফ্রেড্, উইলকিন্স, কোলব্রুক,

১ কলিকাতা মাদ্রাসা লীগ-শাসনকালে ইসলামিয়া কলেজ হয়; ভারত স্বাধীন হইবার পর উহার নাম হয় ক্যালকাটা সেণ্ট্রাল কলেজ।

হর্টন্, উইলসন প্রভৃতি একদল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত প্রাচীন ভারতে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার জন্য সর্বাধিক উৎসাহী ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত বিংশ খণ্ড পত্রিকায় (Asiatic Researches) ভারত ও প্রাচ্য সভ্যতার অনেক তথ্য সংকলিত হয়, যাহা ভারতীয়দেরই নিকট অজ্ঞাত ছিল।

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার যে আয়োজন হয়, তাহা বাঙালীর নিজের চেষ্টায় ও খ্রীষ্টান মিশনারীদের সহযোগিতায়। ১৮১৩ সালে বিলাতে কোম্পানির নূতন সনদ গ্রহণের সময় বহু পরিবর্তন সাধিত হইল। তখন নেপোলিয়ন য়ুরোপের সর্বময় কর্তারূপে বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছেন; বের্লিন হইতে তিনি যে ফতোয়া ঘোষণা করেন তাহার ফলে ইংরেজের জাহাজের ইউরোপের বন্দরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। তখন পর্যন্ত ইংলন্ডে ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানির মুষ্টিমেয় অংশীদারদের অনুকূলে ভারতে ও প্রাচ্যে বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই একচেটিয়া বাণিজ্য-সুবিধা লোপ করিবার জন্য বিলাতের ব্যাপারিকমহলে ঘোর আন্দোলন চলিতে থাকে; ও অবশেষে সেই আন্দোলনের ফলে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার লোপ পাইল; তখন হইতে দলে দলে ইংরেজ বণিক ও ব্যবসায়ী ভারতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানি এতকাল প্রাচ্য এশিয়া ও ভারতের শিল্পজাত সামগ্রী য়ুরোপে আমদানী করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আঠারো শতকের শেষার্ধে ইংলন্ডে যে শিল্পবিপ্লব আসে, তাহার ফলে ভারত শিল্পজাত সামগ্রী প্রেরণের বৈশিষ্ট্য হারাইল; বিদেশী কলে প্রস্তুত প্রথম কাপড়ের গাঁইট ১৮১৪ সালে কলিকাতায় আসিল। ভারতের শিল্প ইতিহাস সেদিন হইতে অন্যপথে চলিল।

১৮১৩ সালের নূতন চার্টারের শর্ত অনুসারে খ্রীষ্টান পাদরীদের এ দেশে আসা সম্বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাহা প্রত্যাহৃত হয়। এতকাল কোম্পানি কোনো পাদরীকে তাঁহাদের রাজ্যে বাস করিতে দেন নাই; কোনো দেশী খ্রীষ্টানকে সরকারী চাকরী তাহারা দিতেন না; সৈন্যবিভাগে কোনো লোক খ্রীষ্টান হইতে চাহিলে তাহাকে রীতিমতো বাধাদান করা হইত এবং তৎসত্ত্বেও দীক্ষিত হইলে তাহাকে কর্মচ্যুত করা হইত। ১৮১৩ সালের পর এই পরিস্থিতির অবসান হয়। ব্রিটেনে এই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও জনকল্যাণের জন্য একদল মানবপ্রেমিকের আবির্ভাব হয়। ১৭৯৯ অব্দে Christian Missionary Society (C. M. S)

ও Reilgious Tract Society এবং ১৮০৪ অব্দে The British and Foreign Bible Society স্থাপিত হয়। এই evangelic বা প্রচার-মনোভাব হইতে ব্রিটিশ মিশনারীরা ভারতে আসিয়াছিলেন।

ফরাসী-বিপ্লবের ভাবতরঙ্গ ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রচারিত হইয়া কী ভাবে তৎকালীন যুবকদের মনকে প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহা শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', রাজনারায়ণ বসুর রচনাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিওর সংস্কারমুক্ত মনের শিক্ষাদান ও আলেকজাণ্ডার ডাফ্ প্রভৃতি নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টীয় পাদরীদের অক্লান্ত প্রচারকার্যের ফলে যুববঙ্গের মনে যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়, তাহার দাহে প্রাচীন শাস্ত্র, প্রাচীন সংস্কার যেন সমস্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। তাঁহারা হিন্দুর সকল প্রকার সংস্কার—তা ভালোই হউক আর মন্দই হউক—নির্বিচারে,—কেবল ভাঙিবার নেশায় ভাঙিয়া চলিলেন। ফরাসী-বিপ্লবের এই ভাঙনের নেশা বাঙালির সহজ-নকল-নবীশী চিত্তকে যেভাবে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল, এমনটি বোধহয়, আর কোথাও হয় নাই—এমনকি যাহারা প্রত্যক্ষত বিপ্লব-দাবানলের মধ্যে অথবা নিকটে বাস করিত তাহাদেরও এমন রূপান্তর ঘটে নাই। পাশ্চাত্য ভাবধারা কিভাবে বাঙালিদের মনকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত পাদরী আলেকজাণ্ডার ডাফ-এর রচনা হইতে পাই; তিনি লিখিয়াছেন—"কেবলমাত্র একটা জাহাজেই এক হাজার সংখ্যা 'এইজ অব রিজন' Age of reason[১] কলকাতায় এসে পৌঁছল, প্রথম দিকে প্রতিটি বই একটাকা করে বিক্রী হচ্ছিল; কিন্তু এই বই-এর চাহিদা এতোই বেশী ছিল যে, দেখতে দেখতে এর দাম অনেক বেড়ে গেল।... কিছুদিনের মধ্যে পেইনের (Paine) সব লেখার একটা সস্তা সংস্করণ প্রকাশিত হল।"[২]

১ *Age of reason* (1794-95) Thomas Paine (1737-1809) English radical writer, champion of American independence and sometime Deputy of French National convention, whose trenchant polemical works include *The Rights of Man*, a reply to Burke's *Reflections*.

২ প্রমোদ সেনগুপ্ত, ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, ১৮৫৭, পৃ. ৪৭।

৬

পাশ্চাত্ত্যের বিপ্লবী ভাবধারা রামমোহন রায়ের মনকে স্পর্শ কিছু কম করে নাই; কিন্তু তাঁহার বুনিয়াদ ছিল ভারতের হিন্দু-মুসলমান ধর্মের ও সংস্কৃতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; তাই বাহিরের ঝটিকা তাঁহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। তিনি একদিকে পাশ্চাত্য ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবর্তন করিবার জন্য যেমন উদ্‌গ্রীব, আপন সংস্কৃতি ও ধর্মসাধনায় অটল থাকিবার জন্য তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হিন্দু-সমাজের অসংখ্য দোষত্রুটি দেখিয়াও তিনি 'হিন্দুই' ছিলেন; খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াও স্বধর্ম ত্যাগ করেন নাই এবং যুগপৎ হিন্দুধর্মের প্রতি খ্রীষ্টানদের নিন্দাবাদকে কঠোরভাবে প্রতিহত করিয়াছিলেন নৈষ্ঠিক জাতীয়তাবাদী মনোভাব হইতে। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুধর্ম ও সমাজের কুসংস্কার তাঁহার নিকট সমর্থন লাভ করে নাই—নির্বিচারে, জাতীয়তাবাদের নামে সকল ভালো-মন্দকে উচ্ছ্বসিত আবেগে আদর্শায়িত করিবার কোনো প্রয়াস তাঁহার মধ্যে ছিল না। আত্মস্তুতি ও আত্মনিন্দা দুই-ই মহাপাপ।

৭ ভারতের জাতীয়তাবোধ জাগরিত হইবার বাধা কোথায় এবং কিভাবে সেই বাধা দূর করিয়া ছিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে একটি অখণ্ড শক্তিশালী জাতিরূপে সুসংবদ্ধ করা যাইতে পারে—সে ভাবনা রামমোহনের মধ্যেই প্রথম উদ্‌ভাবিত হইয়াছিল। ভারতের অসংখ্য সম্প্রদায়, অসংখ্য ভাষাভাষী জাতি, উপজাতি—বিচিত্র তাহাদের সংস্কৃতি, লোকাচার, মতবাদ—কোথায় তাহাদের মিলনসূত্র? কোন্ সূত্রে এই বিচিত্রকে গ্রথিত করিয়া একটি অখণ্ড জাতিতে পরিণত করা যায়—ইহাই ছিল তাঁহার ভাবনা। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্মাদর্শকে 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম' আখ্যা দান করিলেন; চারিদিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেবতা ও দেব-প্রতীক, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন পূজা-পদ্ধতি;— অনেক সময়ে এই বিবদমান বিচ্ছিন্ন মনুষ্য সমাজকে বাঁধিবার একমাত্র সূত্র বেদান্তের বা উপনিষদের ব্রহ্মোপাসনা। হিন্দুরা নানা দেবদেবীর প্রতীক প্রস্তর পূজা করিলেও এ কথা স্বীকার করে যে, ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ, নিরবয়ব, নিরাকার। রামমোহনের মনে এই কথাই সেদিন জাগিয়াছিল যে, সকল মানুষকে এই এক ব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত করিতে পারিলে হয়তো এক

জাতীয়ত্ববোধও জাগ্রত হইতে পারে? নিরাকার উপাসনার ক্ষেত্রে অ-হিন্দু মুসলমানের যোগদানে কোনো বাধা নাই—তিনি হয়তো এ কথাও মনে করিয়াছিলেন যে, এইভাবে ভারতে একদিন হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টানদের একাত্মতা ও এক জাতীয়ত্ববোধ জাগ্রত হইবে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলনের ধর্মীয় বাধা এই প্রতীক-প্রতিমাদির পূজা; তাই তিনি আশা করিয়াছিলেন, নিরাকার ঈশ্বরের ভজনালয়ে সকলে সমবেত হইয়া ঐক্যানুভব করিবে। রামমোহন ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ উদ্রিক্ত করিবার জন্য তাহাদের ধর্মকে একটি মানবিক ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন যে, "হিন্দুদিগের ধর্মপ্রণালী তাহাদের রাজনৈতিক উন্নতির অনুকূল নহে। জাতিভেদ ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ—তাহাদিগকে স্বদেশানুরাগে বঞ্চিত করিয়াছে। ইহা ভিন্ন বহুসংখ্যক বাহ্য অনুষ্ঠান ও প্রায়শ্চিত্তের বহুপ্রকার ব্যবস্থা থাকাতে তাহাদিগকে কোন গুরুতর কার্যসাধনে সম্পূর্ণ অশক্ত করিয়াছে। আমার বিবেচনায় তাঁহাদের ধর্মের কোনো পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ তাঁহাদের রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও ধর্মের পরিবর্তন আবশ্যক।"

রামমোহনের জীবনচরিতের সহিত যাঁহারা অতি সামান্যও পরিচিত, তাঁহারা জানেন রাজার স্বদেশপ্রেম কী প্রগাঢ় এবং আত্মসম্মানবোধ কী গভীর ছিল। সেই স্বদেশপ্রেমের দ্বারাই উদ্‌বোধিত হইয়া তিনি ধর্মের সংস্কার চাহিয়াছিলেন। রামমোহনের জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে আমরা সে যুগের জাতীয়ভাবের উন্মেষের পরিচয় পাই। রামমোহন এক রবিবারে তাঁহার খ্রীস্টানবন্ধু আডাম সাহেবের গৃহ হইতে উপাসনায় যোগ দিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন; তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব তাঁহার গাড়িতে ছিলেন। পথিমধ্যে চন্দ্রশেখর বলিলেন, 'দেওয়ানজি, বিদেশীদের উপাসনায় আমরা যাতায়াত করি, আমাদের নিজের একটি উপাসনার ব্যবস্থা করিলে হয় না?' এই কথা রামমোহনের অন্তরে লাগিল। ইহারই ফলে ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা (৬ ভাদ্র। ২০ অগস্ট ১৮২৬)। এই ব্রহ্মমন্দির নিজেদের জাতীয় জিনিস; দেশাত্মবোধ ও স্বধর্মনিষ্ঠা হইতে এই সমাজের উদ্‌ভব। নবযুগে ইহাই মনোজগতের প্রথম বিপ্লব।

১৮৩০ অব্দে ২৩শে জানুয়ারি বা ১১ই মাঘ তিনি যে মন্দিরের দ্বার উন্মোচন

করিলেন, তাহা সর্বমানবের উপাসনাক্ষেত্র। তাঁহার ট্রাস্টডীডে লিখিত আছে —'যে কোন ব্যক্তি ভদ্রভাবে শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন, তাঁহারই জন্য উপাসনার দ্বার উন্মুক্ত। জাতি সম্প্রদায়, ধর্ম, যে কোন অবস্থার লোক হউন না কেন, এখানে উপাসনা করিতে সকলেরই সমান অধিকার।... যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা ও সঙ্গীত হইবে। অন্য কোনোরূপ হইতে পারিবে না।'

এই ধর্মস্থানে সকলশ্রেণীর হিন্দু, এমন কি মুসলমানদের যোগদানের কোনো বাধা হইতে পারে না। যদি ভারতীয়রা সেদিন রাজা রামমোহনের এই ভাবধারা গ্রহণ করিত, তবে হয়তো ভারতে একটি ভারতীয় জাতির জন্ম হইত। রাজনৈতিক মুক্তি ও সমাজজীবনে স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্যই ইহার প্রয়োজন ছিল।

রামমোহন যেমন জাতীয় আত্মচেতনা উদ্‌বোধিত করিবার গুরু, তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনের জনক। দিল্লীর হৃতসর্বস্ব মুঘল বাদশাহের কতকগুলি ন্যায্য দাবি স্থানীয় ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা পূর্ণ হইতেছিল না; ইহারই প্রতিবাদ জানাইবার জন্য বাদশাহ রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন। সেই সময়ে (১৮৩৩) ইস্ট-ইন্‌ডিয়া-কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের বিশবৎসরী-মেয়াদ শেষ হইতেছে এবং নূতন তদন্ত কমিটি সকল বিষয়ের পর্যালোচনা করিতেছেন। পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত এই তদন্ত কমিটির নিকট রামমোহন ভারতশাসন সম্বন্ধে যে নির্ভীক ও সদ্‌বিবেচনাপূর্ণ প্রতিবেদন পেশ করেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। রামমোহনই ব্রিটিশ শাসনের সেই আদিযুগে শাসন ও বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার সময় বর্তমান হইতে প্রায় সওয়া শতাব্দী পশ্চাতে; তথাপি তিনি ভারতের জাতীয় ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যে সাধনা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য বর্তমান যুগ ও ভারতের অনাগত যুগ ঋণী।[১]

১ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা লিখিতেছেন—"We heard a long talk on Rammohon Roy in which he [Vivekananda] pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message—his acceptance of the

৭

ইংলন্ডে রামমোহনের মৃত্যুর পর (২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩) প্রায় বিশ বৎসর বাংলা বা ভারতে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দেয় নাই। কিন্তু এই পর্বে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য বাঙালির নিজস্ব প্রচেষ্টার ফলে কলিকাতায় একটি নির্ভীক শিক্ষিত সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে।

এ দিকে ইতিপূর্বে ১৮২৯ সালে আলেকজাণ্ডার ডাফ্ সাহেব আসিয়া কলিকাতায় খ্রীষ্টানী কলেজ স্থাপন করিয়াছেন; তাঁহার শিক্ষায় বাংলার যুব-সমাজের মনে যে যুগান্তর আসে তাহার ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই।

কোম্পানি কর্তৃক ইংরেজি রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হইবার বহু পূর্বেই বাঙালিরা নিজেদের উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দেন। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার দ্বারা জীবিকার পথ মুক্ত হইবে ইহাই ছিল হয়তো আশু প্রেরণা; কিন্তু তাহার সঙ্গে আসিল মনের মুক্তি। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আসিল একটি উন্নত জাতির চিন্তাধারা। এতদিন বাঙালির মানসিক উপজীব্য ছিল মধ্যযুগীয় ফার্সি বা সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রের মামি ও কঙ্কাল। ইংরেজির মাধ্যমে অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লবী সাহিত্য বাঙালির মনকে রঙীন করিয়া তুলিল। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে (১৮২৩) রামমোহন রায় তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট্কে ভারতে পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রবর্তনের জন্য যে পত্র লেখেন, তাহা নূতন জগৎকে জানিবার জন্য নববঙ্গের প্রথম আবেদন।

প্রাচীন শিক্ষা ও নবীন শিক্ষার মধ্যে দেশ কোন্‌টিকে বরণ করিবে তাহা লইয়া শিক্ষিতদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল আলোচনা চলে। বাঙালিদের মধ্যে

Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussalman equally with the Hindu. For all these things, he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresignt of Rammohon Roy had mapped out."

Notes on some wanderings with the Swami V[illegible]ekananda, **Udbodhan office 1918. Chap II. P. 19.**

ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর; আর যাঁহারা প্রাচীনের মোহে মুগ্ধ তাঁহারা সংস্কৃত, ফার্সি, আরবীর মধ্যে ভারতের মনকে সুপ্ত রাখিবার জন্যই উৎসুক। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়া দেন লর্ড মেকলে—নূতন চার্টার অনুমোদিত সংবিধানের প্রথম আইনসদস্য; অতঃপর ইংরেজি রাষ্ট্রভাষা হইল।

রাষ্ট্রীয় ভাষা সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে হিন্দুদের পক্ষে ইহা কোনো সমস্যা সৃষ্টি করিল না; মুসলমানদের আমলে হিন্দুরা অতি সহজে ফার্সি, আরবী শিখিয়া রাজকার্যে প্রবেশ করিয়াছিল। হিন্দুর জীবন ও জীবিকা, তাহার অন্তঃপুর ও বৈঠকখানার ন্যায় পৃথক পৃথক জগতের বিষয়। ইংরেজ আসিবার পর দেশের নূতন পরিবেশে হিন্দুর পক্ষে ফার্সি আরবী ছাড়িয়া ইংরেজি ভাষা গ্রহণে কোনো সংস্কারগত বাধা ছিল না; পাগড়ী, চোগা, চাপকানের পরিবর্তে হ্যাট, কোট, প্যাণ্ট ধারণ করিতে তাহার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইল না। কারণ হিন্দু জানে পোষাক তাহার বহিরাবাস, বিদেশী বিধর্মীর সহিত দহরম-মহরম করিয়া ঘরে আসিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে তাহার পবিত্রতা ফিরিয়া আসিবে—কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক পান করিলেই তাহার সকল পাপ দূর হইবে। কিন্তু মুশকিল হইল মুসলমানদের। ফার্সি ছিল তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির বাহন। তাহারা সাত আট শত বৎসর ভারতে অপ্রতিহত-ভাবে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে, সেই ভাষা ছিল রাজভাষা। এখন ইংরেজের অভ্যুদয়ে নূতন ভাষা ও ভাবনার আবির্ভাব তাহাদের নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ লাগিল। হিন্দুদের ন্যায় সকল সংস্কার বাহ্যতঃ বিসর্জন দিয়া মুসলমানরা ইংরেজিয়ানা সহজে গ্রহণ করিতে পারিল না। হিন্দুরা নূতন যুগের শিক্ষা সানন্দে গ্রহণ করিয়া আগাইয়া চলিল—মুসলমানরা পিছাইয়া পড়িল।

নূতন চার্টার বা সনদের বলে ১৮৩৫ হইতে আদালতে, সরকারী দপ্তর-খানায়, বিদ্যালয়ে ফার্সির বদলে ইংরেজি চালু হইল। এই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিচিত্র অধিবাসিগণ একাত্ম হইয়াছিল; যথার্থ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও আন্দোলনের সূত্রপাত হইল এই ইংরেজি ভাষাচর্চার ফলে।

এই সময়ের আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য: সেটি হইতেছে ভারতের

তৎকালীন অস্থায়ী গবর্ণর-জেনারেল স্তর চার্লস মেটকাফের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান। মুদ্রাযন্ত্র ভারতের মনোজগতে যে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার সুষ্ঠু আলোচনা হয় নাই। এই মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস যথার্থভাবে উনিশ শতকের পশ্চাতে বড়ো যায় না। আঠারো শতকের শেষভাগ হইতে চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের কলিকাতা, ঢাকা ও মফস্বলের শহরে বহু মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল; এই-সব ছাপাখানা হইতে মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত; মানুষকে কাছে টানিবার, আপনার ভাব অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিবার এই নবতম পাশ্চাত্য যন্ত্র জাতীয় আন্দোলন বিকাশের অন্যতম প্রধান সহায় হইল। মেটকাফের প্রেস-আইন এইজন্য স্মরণীয়। তিনি প্রেস ও পত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া ব্রিটিশ সভ্যতার আদর্শে ভারতীয় প্রেসকে স্বাধীনতা দান করিলেন (১৮৩৫)।

এই প্রেরণায় বাঙালিরা প্রথমে ক্যালকাটা পাবলিক্ লাইব্রেরী স্থাপন এবং কয়েক বৎসর পরে মেটকাফের নামে স্ট্র্যান্ড রোডের উপর এক হল নির্মাণ করেন; সেই হলে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী উঠিয়া আসে। ইহাই পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী[১] নামে খ্যাত হয়। এই গ্রন্থাগার হইল জ্ঞান আহরণের বিশিষ্ট কেন্দ্র।

৮

ইংরেজি শিক্ষার প্রসার যে কেবল বাংলাদেশেই সীমিত ছিল তাহা নহে, বোম্বাই ও মাদ্রাজেও লোকে পাশ্চাত্য ভাষা ও ভাব গ্রহণে কম তৎপর ও উৎসাহী ছিল না; কিন্তু ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে বাংলা দেশের মনোরাজ্যে যে বিপ্লব সৃষ্ট হয় তাহার তুলনা কোথাও দেখা যায় নাই। তবে সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বে বা ইষ্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানির হস্ত হইতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের খাশ শাসনাধীনে ভারত যাইবার পূর্বেই শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিধিসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হয়। ইংলন্ডে রিফর্ম বিল, 'কর্ণ ল' প্রভৃতি বিষয় লইয়া জনতার আন্দোলনের সংবাদ এ দেশে পৌছিত;

১ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর বর্তমান নাম ন্যাশনাল লাইব্রেরী।

বলাবাহুল্য ফরাসী-বিপ্লব-প্রণোদিত স্বাধীনতার ভাবুকতা ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ডিমোক্রেসির আদর্শ শিক্ষিত ভারতকে সে যুগে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। ইহারই ফলে ১৮৫১ অব্দে কলিকাতা ও বোম্বাই-এ ব্রিটিশ ইন্‌ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঠকদের স্মরণ করাইয়া দিই যে, সে সময়ে ভারতে রেলওয়ে বা টেলিগ্রাফ লাইন নির্মিত ও চলিত হয় নাই। সেটি হয় ১৮৫৪ অব্দে।

কলিকাতার ব্রিটিশ ইন্‌ডিয়ান এসোসিয়েশন সভার নেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাজা দিগম্বর মিত্র, প্যারিচাঁদ মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। স্যার রাধাকান্ত দেব এক দিকে প্রাচীন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নেতা, অপর দিকে ব্রিটিশ ইন্‌ডিয়ান এসোসিয়েশনের পৃষ্টপোষক ও সভাপতি। এই স্যার রাধাকান্ত দেব রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় পর্যন্ত সনাতনী হিন্দুদের উগ্র পৃষ্ঠপোষক ও হিন্দুসমাজের সকল প্রকার সংস্কারের বাধাস্বরূপ ছিলেন। এই পিছু-চাওয়া, পিছু-হঠা সনাতনী ধর্মধারা এখনও প্রবাহিত আছে নানা নামে, নানারূপে।

বোম্বাইতেও বিধিসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম হয় এই একই বৎসরে, সেখানেও যুবকরা সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন যুগপৎ পরিচালনা করেন। জগন্নাথ শেঠ, দাদাভাই নৌরজী ছিলেন অগ্রণী। পার্সিদের মধ্যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের জন্য এই সময়েই এক সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে একটি বিষয় চোখে পড়ে; পার্সি বা গুজরাটিদের মধ্যে সমাজ ও রাজনীতি সংস্কার সম্বন্ধে যে-চেতনা দেখা গেল, সে-সাড়া মহারাষ্ট্রীয়দের নিকট হইতে তখন পাওয়া গেল না। ইহার কোনো নিগূঢ় কারণ নিশ্চয়ই ছিল। কয়েক দশক পূর্বে মহারাষ্ট্রীয়রা ভারতে 'হিন্দ্‌পাতশাহ' স্থাপনের দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিল এবং ব্যর্থকাম হইয়া কিছুকাল মুসলমানদের ন্যায় ব্রিটিশ সংসর্গ হইতে দূরেই ছিল। ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রীয় পেশাবাদের শাসনকালে প্রবর্তিত শিক্ষাবিধি ও বিদ্যালয়াদির স্থলে ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতি ও ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও উহার প্রভাব অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল; সে-শিক্ষা বঙ্গদেশের ন্যায় ব্যাপক ও গভীর হয় নাই। এতাবৎ কাল মহারাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের দপ্তরখানার কাজকর্ম মারাঠি ভাষায় চালু ছিল; ১৮৩৫-এর পর ইংরেজি

রাষ্ট্রভাষারূপে প্রচলিত হইলে মহারাষ্ট্রদের আত্মসম্মানে দারুণ আঘাত লাগে। বাঙালি হিন্দু পার্সি ভাষা শিখিয়াছিল জীবিকার জন্য—সুতরাং তাহার পক্ষে পার্সি ত্যাগ করিয়া ইংরেজি গ্রহণ করার মধ্যে কোনো জাত্যাভিমানের প্রশ্ন ছিল না; বাংলার মুসলমানের পক্ষে পার্সি ছিল তাহাদের 'জাতীয়' ভাষা, পশ্চিম ভারতে মহারাষ্ট্রদের মারাঠি ভাষা ছিল মাতৃভাষা ও রাষ্ট্র-ভাষা।

মারাঠা ভাষায় মহারাষ্ট্রদের মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আকাশকুসুম বিনষ্ট হইল; গুজরাটি ও পার্সি সমাজের সেইরূপ কোনো আত্মাভিমান ছিল না। ইহার ফলে পশ্চিম ভারতে পার্সি ও গুজরাটিরা ব্যবসায়, বাণিজ্যে, শিল্পে, শিক্ষায়, রাজনীতিতে তখন প্রাগ্রসর সমাজ হইয়া উঠিয়াছিল। দীর্ঘকাল ভারতের বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলনে ইহাদের নেতৃত্ব ছিল। মহারাষ্ট্রীয়রা অনেক পরে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। তাহাদের মধ্যে নিখিল ভারতীয় জাতীয়তাবোধ হইতে হিন্দু-ভারতীয় জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে উৎসাহ ও আন্তরিকতা ছিল অধিক—তাহার ফল ভালো কি মন্দ তাহা যথাযথ স্থানে আলোচিত হইবে।

৯

ভারতীয়দের শাসনব্যাপারে কোম্পানির অশিক্ষিত ও অমার্জিতরুচি শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের ব্যবহারের মধ্যে যে অসহ্য উগ্রতা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছিল, ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারাবদ্ধ মনের জটিলতা সম্বন্ধে তাহাদের যে শ্রদ্ধাহীন ঔদাসীন্য ও তাচ্ছিল্যভাব দেখা দিতেছিল তাহার প্রতি-ক্রিয়ায় ভারতীয়দের মধ্যে জাগিল ব্রিটিশ জাতির উপর বিদ্বেষ। সতীদাহ প্রথা, শিশুকন্যার গঙ্গাজলে নিমজ্জন, দেবতার নিকট নরবলি দান, চড়কপূজার সময় নৃশংস কৌতুকাদির অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিবারণার্থ নিষেধাজ্ঞা প্রচার, বিধবাবিবাহ প্রথা আইন দ্বারা সমর্থন, য়ুরোপীয় খ্রীষ্টান পাদরীদের ভারতের মধ্যে অবাধে ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা দান প্রভৃতি ঘটনা সাধারণ মূর্খ লোকের মনে গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিল।

ইহার উপর বাংলাদেশে রাজস্ব বিষয়ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে 'সূর্যাস্ত

পরগণার গ্রামের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া নিরক্ষর সরলপ্রকৃতি সাঁওতালদের সর্বস্বাপহরণ করিত; কিন্তু ইহার প্রতিকারের কোনো উপায় ছিল না। সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত তাহাদের গ্রামাঞ্চল হইতে বহু ক্রোশ দূরে। তাহারা বহুবার আবেদন-নিবেদনও করে, কিন্তু তাহাতে কেহ কর্ণপাত না করিলে তাহারা হিন্দুদের দূর করিয়া সাঁওতাল রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য হাঙ্গামা শুরু করে। হাঙ্গামা অগ্নির ন্যায় দাবানলে পরিণত হয়। দেখিতে দেখিতে স্থানীয় হাঙ্গামা দেশব্যাপী বিদ্রোহরূপে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে ইংরেজ সৈন্য সাঁওতালদের বাধা দিবার জন্য আসে। চিরদিনই সর্বহারাদের দুর্বৃত্তপনা দমন করিবার জন্য সরকার বাহাদুরের পুলিশ ফৌজ নিযুক্ত হইয়া আসিতেছে। যাহারা সরলপ্রকৃতি উপজাতিকে সর্বস্বান্ত করিতেছে, সেই শোষক শ্রেণীই সরকারী ফৌজের সহায়তা লাভ করিল। বলা বাহুল্য, আদিমযুগের তীর-ধনুক, বল্লম-বর্শা আধুনিক যুগের বন্দুক-বেয়নেটের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না; সাঁওতাল-বিদ্রোহ দমন করা হইল।[১]

এই ঘটনার পর সরকার জমি-জমা সংক্রান্ত বহু আইন প্রবর্তন করিয়া তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করেন; এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা প্রসারের জন্য খ্রীষ্টান মিশনারীদের বহু সুযোগ সুবিধা ও উৎসাহ দান করিলেন। ডুমকা, বেনাগড়িয়া, পাকুড় হিরণপুর প্রভৃতি স্থানে মিশনারীদের কাজকর্ম দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

প্রায় শতাব্দীকাল অন্তে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর, হায়দরাবাদ রাজ্যের নলগোন্ডা ও বরঙ্গল জেলাদ্বয়ে যে বিদ্রোহ দেখা দেয়, এবং যাহা 'কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহ' বলিয়া কম্যুনিষ্টরা ঘোষণা করিয়া থাকেন—তাহা এই শ্রেণীর অর্থনৈতিক শোষণনীতির বিরুদ্ধে জনজাগরণ—কম্যুনিষ্টরা তাহার নিমিত্তমাত্র। সেখানেও হিন্দু-বেনিয়ারা নিরক্ষর গ্রামবাসীদের কী ভীষণভাবে শোষণ করিত, তাহার বর্ণনা কাউণ্ট ফন্ হাইমানডোর্ফের লিখিত গ্রন্থ (Tribal Hyderabad) হইতে জানা যায়। সেখানেও ভূদানাদি ব্যাপারের পর তাহা শমিত হয়—মানুষের শাশ্বত ক্ষুধা একখণ্ড ভূমির জন্য।

১ পাকুড় শহরে সেই করুণ কাহিনী কহিবার জন্য এখনো একটি তোরণ আছে।

১১

শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বৈঠকী রাজনীতি চর্চার পাশাপাশি চলিতেছে অশিক্ষিত জনতার মধ্যে বিপ্লবের প্রচেষ্টা। ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ অব্দের মধ্যে একশত বৎসর গত হইয়াছে, অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধ ও সিপাহী-বিদ্রোহ পর্বের মধ্যে ভারতের সকল অংশই ব্রিটিশ কোম্পানির রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ভারতের অকর্মণ্য সামন্ত নরপতিগণ সকলেই এখন ইংরেজ প্রভুর অধীন—অনেকের দরবারেই ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বাস করেন। রাজ্যের সর্বময় কর্তা কার্যত তাঁহারাই। সামন্ত নৃপতিরা স্ব স্ব রাজ্যের লোকের উপর কেবল স্বৈরাচার ও অত্যাচার করিবার অধিকার লাভ করিয়া আত্মপ্রসাদ ভোগ করিলেন; কিন্তু উপদ্রবের মাত্রা অধিক হইলেই ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের রূঢ় করস্পর্শে তাহারা গদিচ্যুত ও অপসারিত হইতেন।

এই আপাতদৃষ্টিতে-সুখী সমাজের অন্তরালে নিরক্ষর জনতাকে একেবারে প্রাণহীন জড়ত্বে পরিণত করিতে ব্রিটিশদের শতাব্দীকালের মধ্যে বহুযুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। এই শতাব্দীর মধ্যে বোধ হয় এমন একটি বৎসরও গত হয় নাই যখন ভারতের কোনো-না-কোনো অংশে বিদ্রোহ না হইয়াছে। তবে এ-সকল বিদ্রোহ কখনো স্থানীয় অভিযোগ নিরাকৃত করিবার প্রয়াস, কখনো প্রাচীনবংশের স্বৈরাচারের অধিকার লোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—এ গুলিকে জাতীয় বা ন্যাশনাল আন্দোলন বলা যায় না। তবে যে বিচারের মানদণ্ডে রাজস্থানের ক্ষুদ্র শৈলাধিপতিদের পাঠান-মুঘল অথবা প্রবল প্রতিবেশীর আক্রমণ প্রতিনিবৃত্ত করিতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া প্রশংসামুখর হই—সেই মানদণ্ড হইতে এই-সকল স্থানীয় বীরদের ব্যর্থবিদ্রোহ প্রচেষ্টাকে সহৃদয়তার সহিত দেখিতে পারি। এই শ্রেণীর বিদ্রোহ ও বিপ্লব-প্রচেষ্টা চিরদিনই হইয়া আসিয়াছে; পুরাতন যুগের অবসানে নূতনের আবির্ভাব আসন্ন হইলেই প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীন পন্থীরা পুরাতনকে চিরস্থায়ী করিবার আশায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে। পাঠানশাসনের অবসানে মুঘলশাসনের আবির্ভাবে এই শ্রেণীর অসংখ্য বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল; এবং মুঘলশাসনের অবসন্ন অবস্থায় এই শ্রেণীরই বহু বিদ্রোহ সংঘটিত হয়; সেই-সকল বিদ্রোহের চরম ও শেষ প্রচেষ্টা হইতেছে 'সিপাহী-বিদ্রোহ'। সিপাহীদের এই বিদ্রোহ অনধিকারী ইংরেজ কোম্পানিকে

দূর করিয়া পুরাতন মুঘলবাদশাহদের কায়েম করিবারই আবেদন। আজও স্বাধীন ভারতে নূতন রাষ্ট্রচেতনার মুখেও তাহাকে পদে পদে এই শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রদায়ের বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে—যাহারা বর্ণাশ্রম না মানিয়াও কেবল বংশানুক্রমিক কতকগুলি সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে প্রতিহত করিতেছে এবং যাহারা অর্থনৈতিক শোষণাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার আশংকায় সকল প্রকার উদারনীতিক প্রচেষ্টার বাধা সৃষ্টি করিতেছে।

১২

পূর্ব ও পশ্চিমের বিরুদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ইংরেজ কোম্পানির প্রশাসন বিষয়ে উগ্র প্রগতিপরায়ণতা এবং মহাদেশতুল্য ভারত সাম্রাজ্যের আধিপত্য-লাভহেতু ব্রিটিশ কর্মচারী ও রাজপুরুষদের ঔদ্ধত্য ও দম্ভ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুতর —শাসনবিষয়ে হৃদয়হীন নৈর্ব্যক্তিকতা—ভারতীয় সর্বশ্রেণীর লোককেই ব্রিটিশদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ করিয়া তুলিতেছিল। ব্রিটিশশাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ হইতে সিপাহী-বিদ্রোহের জন্ম। আজ শতাব্দী পরে একশ্রেণীর লেখক কিছুটা ভাবালুতার আবেগে এই বিদ্রোহকে আদর্শায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কেহ দুকূল রক্ষার জন্য যথেষ্ট মুন্সিয়ানা করিয়া বিষয়টাকে জটিল করিয়া তুলিতেছেন। কিছুকাল পূর্বে ইহাকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা Indian war of independence আখ্যা দান করা হইয়াছিল। কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই বিদ্রোহকে সেই স্থান দেওয়া যায় কি না, সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যাইতেছে।

কিন্তু 'জাতীয়' বিদ্রোহ এই আখ্যা দান করিতে না পারিলেও ইহা যে ব্রিটিশ কোম্পানির শাসন-নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য একশ্রেণীর জনতার ব্যাকুলতা—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইংরেজ ভারত শাসনের অনধিকারী। তাহারা ভারতের মুঘলবাদশাহের বঙ্গদেশস্থ বিদ্রোহী সামন্ত বা নবাবের দেওয়ানরূপে ভারত গ্রাস করিয়াছে; সেই বিধর্মী অনধিকারী, অত্যাচারী বিদেশীদের কবল হইতে দেশ উদ্ধার করিবার জন্য যাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাহারা বীর আখ্যা পাইবার যোগ্য ব্যক্তি।

কিন্তু প্রশ্ন—দেশ কাহার। এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা বিদ্রোহীদের কাহারও ছিল না।

অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এই বিদ্রোহ-আন্দোলনকে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সর্ব শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ যতই গভীর থাকুক না কেন, অসন্তোষ প্রকাশের মধ্যে তাহার ব্যাপকতা দেখা যায় নাই। আসলে তথাকথিত প্রায় নিরক্ষর মুষ্টিমেয় 'সিপাহী' ইহার উদ্‌বোধক ও প্ররোচক। ইহাদের সঙ্গে যোগদান করে একশ্রেণীর স্বভাব-দুর্বৃত্ত জনতা। সুতরাং অতীতে তাহারা বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল বলিয়াই তাহাদিগকে মহিমান্বিত করিয়া দেখিবার কারণ ঘটে না; অতীত বলিয়াই মুগ্ধনেত্রে দেখা ঐতিহাসিকের ধর্ম হইতে পারে না।

সিপাহী-বিদ্রোহের নেতারা প্রাচীনপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল, অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রশাসনকালে যে-সব প্রাগ্রসরীবিধান, শিক্ষাদির সংস্কার প্রবর্তিত হয়, ইহারা সে-সবের বিরোধী।[১]

ভারতের সামন্ত নরপতিরা এই বিদ্রোহে যোগদান করে নাই সত্য; কিন্তু সামন্ততন্ত্রের মূল উৎস মুঘল-সম্রাট বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহীরা তাহাদের নেতা-পুত্তলিকা রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। 'দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর বা'-র রাজ্য সীমিত ছিল দিল্লীর লালকেল্লার মধ্যে। অশীতিপর বৃদ্ধ অকর্মণ্য বাদশাহকে মসনদে বসাইয়া বিদ্রোহীরা মুঘল সাম্রাজ্যের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখিল। বিদ্রোহী নেতাদের ক্রীড়নক বাহাদুর শাহ দুর্বিনীত সেনাপতিদের হস্তে কী পরিমাণ অপমানিত হইতেন তাহা ইতিহাস পাঠ করিলেই জানা যায়। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য রক্ষার জন্য বাদশাহী ফতোয়া প্রকাশিত হইলেও উত্তর ভারতের হিন্দুরা শাসনব্যবস্থায় বেহস্তের আশা করিতে পারেন নাই; তাহাদের দ্বিধা ও সন্দেহ দূর হয় নাই। বিদ্রোহের মূলে বিদ্বেষ ছিল, পরিণামের কোনো ধারণা কাহারও ছিল না।

১ ভারত স্বাধীন হইবার পর মধ্যভারতের কয়েকটি স্থানে 'সতীদাহ' পুনরায় দেখা দিয়াছিল; কেন্দ্রীয় সরকারকে কঠোরভাবে তাহা দমন করিতে হয়। সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাব নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর লোকের মধ্যে উদ্‌ভূত হয় নাই। সিপাহী-বিদ্রোহের প্রায় একশত বৎসর পরে ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা বিধানরূপে স্বীকৃত হইলেও দেশমধ্যে উহা কী পরিমাণ বাধা পাইতেছে, তাহা প্রতিদিনের ঘটনা সাক্ষ্য দিতেছে।

অপর-দিকে কানপুরে প্রাক্তন মারাঠা পেশবার দত্তকপুত্র পেন্‌সন্‌ভোগী নানাসাহেব বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া আপনাকে 'পেশবা' বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, মুঘল-সম্রাট ও মারাঠা পেশবাদের সম্বন্ধ ছিল অহি-নকুলের। আজ উভয়েই তাহাদের হৃতগৌরব উদ্ধারের জন্য বিদ্রোহী। কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন কেন—সম্পূর্ণ বিরোধী দুইটি এককের বিদ্রোহে যে দেশ স্বাধীন হইবে—তাহা কাহার ভোগে বা ভাগে পড়িবে—মুঘলদের না মারাঠাদের—সে বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত ছিল না। এই স্বাধীনতা সংগ্রামে না ছিল জেফারসন, ফ্রাংকলিন, না ছিল ওয়াশিংটন, লাফায়াৎ। একশত বৎসর গত হয় নাই—দিল্লীর অদূরে যমুনাতটে পাণিপথের শেষযুদ্ধে মারাঠাশক্তি ধ্বংস করিবার জন্য ভারতের বহিরাগত সাহসিক আহমদশাহ দুরানীকে মুঘল বাদশাহ ও তাঁহারই বিদ্রোহী সামন্ত নরপতি শিয়া-মুসলমান অযোধ্যার নবাব সহায়তা দান করেন। হিন্দুমারাঠা শক্তি ধ্বংসের জন্য বহিরাগত আফগান, ভারতস্থিত চিরবিবদমান সুন্নি বাদশাহ ও শিয়া নবাব মিলিত হইয়াছিল। বিধর্মীর সহিত যুদ্ধে মুসলমানরা কুরু পাণ্ডবে মিলিয়া একশ' পাঁচ ভাই। পাণিপথের পরাজয়ের ও হত্যাকাণ্ডের কথা মারাঠারা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হয় নাই। তার পর প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ভারতের শাসনদণ্ড অধিকারের জন্য তাহাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টার ইতিহাস সুপরিচিত। আজ নানাসাহেব ভারতে পেশবার প্রভুত্ব স্থাপনেরই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তিনি কানপুরে সুপ্রতিষ্ঠিত—এমন সময়ে সংবাদ আসিল দিল্লী ব্রিটিশ সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত ও অবরুদ্ধ হইয়াছে; এ ক্ষেত্রে সেখানে যে সৈন্য প্রেরণ করা একান্ত প্রয়োজন, নহিলে যে দিল্লীর পতন অবশ্যম্ভাবী এ কথা কানপুরবাসী পেশবার মনে হয় নাই; সে কি তাঁহার সমরনীতিজ্ঞানের অভাব, না অন্য কোনো উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ঔদাসীন্য?

সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে এক শ্রেণীর মুসলমানের মনে হইয়াছিল যে, ভারতে ইসলামিক প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে; কয়েক বৎসর পূর্বে ওহাবী আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছিল—এইবার হিন্দুমুসলমানের যৌথ প্রচেষ্টায় ভারত স্বাধীন হইলে তাহাদের প্রভুত্ব কায়েম হইতেও-বা পারে। এ আশা হয়তো তাহাদের অন্তরে সুপ্ত ছিল। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, মুসলমান শরিকী রাজ্য ভোগ করিবার শিক্ষা কখনো পায় নাই; অ-মুসলমান বা

কাফেরকে সম-অধিকার দান তাহাদের সরিয়াৎবিরোধী ধর্ম—তাহাদের ধর্মানুসারে হিন্দু বা অ-মুসলমান তাহাদের 'জিম্মী' বা আশ্রিত—ভাগীদার নহে। সর্বধর্মের লোক লইয়া সম-অধিকার দিয়া ডিমক্রেসির ভাবনা তাহাদের ছিল না এবং সরিয়াৎ অনুসারে থাকিতেও পারে না। এ ক্ষেত্রে হিন্দুদের পক্ষে আতঙ্কিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক; তারপর উত্তর ভারতের নানা শহরে যখন ইসলামের সবুজ পতাকা উড়িল, বহু বিশেষণযুক্ত মিলনের ফতোয়া হিন্দুদের মনে ভরসা সৃষ্টি করিতে পারিল না।

প্রায় শতাব্দীকাল পরে সিপাহী-বিদ্রোহের তথাকথিত স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ পরিণতি হইল খণ্ডিত ভারতের জন্মে। সিপাহী-বিদ্রোহের বিরোধিতা করিয়াও স্যর সৈয়দ আহমদ অল্পকাল পরে স্পষ্টই বলিলেন যে, ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি; সেই হইতে কিভাবে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব বৃদ্ধি পাইতে পাইতে পাকিস্তানে তাহার পরিণতি হইল, তাহার আলোচনা আমরা যথাস্থানে করিব।

১৩

হিন্দুদের মধ্যে যাহারা ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্য ধ্বংস করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাও প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতিবিরোধী জনতা। ব্রিটিশ শাসনকালে সতীদাহ আইনদ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে, হিন্দুদের বিধবা বিবাহ আইনদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে; এ-সবই হিন্দুধর্ম বিরোধী। ইহার উপর খ্রীষ্টান পাদরীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে ভারতের মধ্যে প্রবেশ ও হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ করিতেছে; তাহাতে তাহারা কখনো বাধা পায় না। এই-সব ঘটনার অভিঘাতে হিন্দুরা স্বভাবতই আতঙ্কিত হইয়া উঠে; কারণ হিন্দু ও উপজাতীয়দের মধ্য হইতে লোকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে থাকে। ইসলাম স্বয়ং প্রচারধর্মী—তাহাদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় পাদরীরা কৃতকার্য হইতে পারিল না। ধর্মে জনক্ষয় হইতে লাগিল হিন্দু ও উপজাতিদের মধ্যে। আতঙ্কিত জনতা রেলপথ নির্মাণ ও টেলিগ্রাফ প্রবর্তনকেও ব্রিটিশের অভিসন্ধিমূলক প্রয়াস বলিয়া মনে করিল।

এই বিচিত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক, সমাজনৈতিক কারণের

ঘাত প্রতিঘাতে ভারতে অসময়ে সিপাহী-বিদ্রোহের জন্ম ও অকালে সূতিকা-গৃহে তাহার মৃত্যু হইল। ইতিহাসে যাহা ঘটে তাহা কার্যকারণের ঘাত-প্রতিঘাতের অমোঘনীতি অনুসারেই সংঘটিত হয়। ভাবুকতার দ্বারা কঠোর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

ভারতের শিক্ষিত সমাজ কি হিন্দু কি মুসলমান এই বিদ্রোহে যোগদান তো করেই নাই বরং ইহার বিরোধিতাই করিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় সভ্যদাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ শিখ সমাজ স্বাধীনতালাভের জন্য চেষ্টা মাত্র তো করেই নাই—বরং পাতিয়ালা, নাভা, ঝিনদের মহারাজারা বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করিয়াছিল। জনতার এই আন্দোলন শিখ সর্দারদের বুনিয়াদি স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়াই তাহারা কোনোপ্রকার সহায়তা দান করিতে অগ্রসর হয় নাই—পরযুগেও এইটি স্পষ্ট দেখা দিয়াছিল। এ ছাড়া শিখ ও মুঘলদের মধ্যে কোনো প্রীতির বন্ধনই ছিল না কোনোদিন। মুঘল বাদশাহেরা কী নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা শিখরা ভুলিতে পারে না; তাই শিখরা এই বিদ্রোহকে দেশমুক্তির আন্দোলন বলিয়া গ্রহণ করিল না। রাজস্থানের প্রবাদগত বীরের দল নির্বিকার রহিলেন,—বোধ হয় মুঘল সম্রাটের নব অভ্যুত্থানের আশঙ্কায়। দক্ষিণ ভারতের 'নিজাম' মুসলমান হইয়াও তূষ্ণীম্ভাবে থাকিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষরা তো মুঘল বাদশাহের শাসন শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন, এখন ব্রিটিশের অনুগ্রহে ভালোই আছেন; আবার দিল্লীর মুঘল বাদশাহের পাদপীঠতলে পিষ্ট হইবার বাসনা তাঁহার ছিল না বলিয়াই মনে হয়। হায়দরাবাদ ছিল দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বী।

মোট কথা, অতি মুষ্টিমেয় লোক বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু মুষ্টিমেয় উন্মত্ত জনতা দেশমধ্যে যথেষ্ট আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে পারে; বিদ্রোহীরা ইংরেজ নরনারী শিশুদের প্রতি কী নির্মমতা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা ব্রিটিশ যুগে লিখিত ইতিহাসে ঐতিহাসিক যথেষ্ট তথ্যাদি দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্রোহ দমন করিবার পর ইংরেজ সৈন্য ও তাহাদের ঘাতকদল যে অমানুষিক নৃশংসতা করিয়াছিল তাহার ইতিহাস সাধারণের নিকট সুপরিচিত ছিল না; ভারতীয় ঐতিহাসিকদের গবেষণায় সে-সব তথ্য প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু অতীতের এই বর্বরতার কাহিনী বিস্মৃতি সাগর হইতে মন্থন করিলে জাতি-বৈরীই উদ্রিক্ত হইবে—তাহার দ্বারা মৈত্রী ভাবনা প্রসারিত হইবে না।

সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাসের সমস্ত উপাদান ইংরেজের রচিত গ্রন্থ—ডেসপ্যাচ প্রতিবেদন, পত্রাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেশীয় লোকের সমসাময়িক ইতিহাস নাই বলিলেই হয়। ইংরেজরা বিদ্রোহ দেখিয়া অতিশয় আতঙ্কিত হয় এবং উহার অতিরঞ্জিত বর্ণনা প্রকাশ করিয়া ইংলন্ডের লোকেদের সচকিত করিয়া তোলে। ঠিক এইটি হইয়াছিল ১৯১৮ সালে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার পেশ করিবার সময়ে; রৌলটের সিডিশন কমিটির রিপোর্ট যুগপৎ প্রকাশ করিয়া জগৎকে ইংরেজ জানাইয়া দিয়াছিল, ভারতে কী ভীষণকাণ্ড ঘটিতেছে; জালিনবালাবাগের পরেও তাহারা বলে, দ্বিতীয় সিপাহী-বিদ্রোহ হইতে দেশ রক্ষা পাইয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহ সম্বন্ধেও খানিকটা তাহাই ঘটে; গ্রেট ব্রিটেনে কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করিয়া ভারতকে কঠিনতম নিগড়ে বাঁধিয়া পিষ্ট করিবার জন্য এই আতঙ্ক প্রচার; ইহা পাশ্চাত্য দেশের প্রবাদগত প্রচারনীতির (propaganda) অন্যতম কৌশল—যাহার বলে ভারতকে সম্পূর্ণভাবে শাসন ও শোষণ করা যায়,—ইহা ব্রিটিশ পাবলিকের মধ্যে কোম্পানির শাসন অবসিত করিয়া পার্লামেন্টের বা ব্রিটিশ জনতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতের প্রয়াসমাত্র। সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে দৃষ্টি ভঙ্গীর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সিপাহী-বিদ্রোহ বহু ব্যাপক হইলেও উহা গভীর হয় নাই; তা না হইলে এতো অল্প সময়ের মধ্যে সেই যান-বাহনের অভাবের যুগে বিদ্রোহ শমিত হইত না। বিদ্রোহ আরম্ভ হয় ১৮৫৭ সালের জুন মাসে এবং ১৮৫৮ সালের পহেলা নভেম্বর এলাহাবাদে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা প্রকাশিত হইল; বিদ্রোহ বৎসর কালাধিকের মধ্যে শমিত হইয়াছিল; ইহার সহিত তুলনীয় আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম—কী দীর্ঘকাল তাহাদের যুদ্ধ চলে!

ব্রিটিশ কোম্পানি মুঘলদের নিকট হইতে ভারত অধিকার করে নাই। মুঘল সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া যে-সব জাতি বা দেশ স্বাধীন হইয়াছিল—ইংরেজ তাহাদিগকে যুদ্ধে বা কূটনীতির দ্বারা পরাজিত করিয়া আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। এই-সকল বিদ্রোহীরা হইতেছে মারাঠা ও শিখ। মুঘল শক্তির অবসানে বঙ্গ, মহীশূর, হায়দরাবাদ, অযোধ্যা প্রভৃতির শাসকগণের

উদ্‌ভব হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় উত্তর ভারতের মুসলমানেরা ভাবিয়াছিল, মুঘল সূর্য পুনরুদিত হইবে—মারাঠারা ভাবিয়াছিল, তাহাদের গৈরিক পতাকা আবার উড়িবে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ওহাবী-আন্দোলন হইতে ভারতে মুসলমানদের ইসলামী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় একশ্রেণীর মুসলমানের মনে এই কল্পনা সুদৃঢ় হইয়াছিল। যুগপৎ মারাঠারাও মনে করিতেছিল, ইংরেজ হিন্দুদের নিকট হইতে ভারত অধিকার করিয়াছে—সুতরাং বিধর্মী, বিজাতির নিকট হইতে হিন্দুস্থান উদ্ধার করিতে হইবে—মুসলমানের সহিত শরিকানি করিতে তাহারাও নারাজ। আধুনিক যুগেও এই মনোভাব তাহাদের মধ্যে অস্পষ্ট নহে।

সিপাহী-বিদ্রোহের পর ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, হিন্দুদের পক্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করা অসম্ভব। কারণ হিন্দু কোথায়? কোথায় তাহাদের মিলনভূমি? তাহারা বহু ধর্ম উপধর্মে বিভক্ত; অসংখ্য জাতি উপজাতি, বহু ভাষাভাষী, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ও ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদির ভেদাভেদে শতধা। রাজা রামমোহন রায় বেদান্তপ্রতিপাদ্য যে ধর্মমত প্রচার করেন, তাহা হয়তো এই বিপুল অথচ মজ্জায় মজ্জায় দুর্বল হিন্দুসমাজকে এক করিতে পারিত, কিন্তু প্রতিক্রিয়াপন্থী, বিত্তশালী হিন্দুরা রামমোহনের একজাতীয়ত্ব আন্দোলনের সমর্থন করেন নাই। হিন্দুধর্মসভা বা তজ্জাতীয় সর্ববাদীসম্মত বা অধিকাংশের দ্বারা অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল না; যাহা গড়িয়া উঠিল তাহা কন্‌গ্রেস-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান সমূহ।

অখণ্ড হিন্দুধর্মসভার প্রভাব ও ভাবনা কোনোদিন সকল শ্রেণীর মধ্যে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। এই জন্যই রামমোহন বলিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক সুবিধার খাতিরেও হিন্দুদের ধর্মসংস্কারের প্রয়োজন; সে সংস্কার হয় নাই। হিন্দুজাতীয়তার স্থলে দেখা দিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'জাতে'র মধ্যে এক নূতন ধরণের আত্মচেতনা বা 'জাতীয়তা'। এই-সকল 'জাতে'র প্রধানতম চেষ্টা হিন্দুসমাজের মধ্যে কৌলিন্যলাভ; তাহারা যে হীন নহে, তাহারা যে শাস্ত্রসম্মতভাবে উচ্চবর্ণ তাহা তাহারা উগ্রভাবেই প্রমাণ করিতে চেষ্টান্বিত হইল—নিখিল হিন্দুত্ব সম্বন্ধে চেতনা সুদূরে চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিক্রিয়ায় নব্যহিন্দুত্বের যে বিপুল জাগরণ হইয়াছিল, তাহা

হিন্দুধর্ম ও সমাজের যেমনটি-ছিল-তেমনটি (Status quo) বজায় রাখিবার জন্য মুষ্টিমেয় বর্ণহিন্দুর সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য, ধর্মীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই আন্দোলনের জন্ম। ব্রাহ্মসমাজ যে একজাত আন্দোলন প্রবর্তন করে, তাহা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু -প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের আন্দোলনের ন্যায় ব্যর্থ হইল। আজ বঙ্গদেশ ও ভারতের নানাস্থানে ধর্ম ও 'জাতে'র নামে যে উন্মত্ততা দেখা দিয়াছে, তাহার দিকে তাকাইয়া এই কথা মনে হয় যে, ভারতে যদি castism বর্ণহিন্দুদের দ্বারা সমর্থিত ও উত্তেজিত না হইত, তবে হয়তো ১৯৪৬-৪৭ সালের নিদারুণ ঘটনা ঘটিত না।

১৪

সিপাহী-বিদ্রোহ দমিত হইল। মধ্যযুগীয় মনোভাব সম্পন্ন নেতা ও জনতার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে ইংলন্ডের একদল লোকের মনে হইল যে, এভাবে একটা কোম্পানির হস্তে এতবড় সাম্রাজ্যের শাসনভার আর ফেলিয়া রাখা যায় না। অতঃপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট স্বয়ং ভারত শাসনভার গ্রহণ করিলেন। এই হস্তান্তরের জন্য কোম্পানির অংশীদারগণকে মোটা খেসারৎ দেওয়া হইল ; এই খেসারতের টাকা ভারতের ধন ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হয় ; অর্থাৎ ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতকে ইষ্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানির নিকট হইতে ক্রয় করিলেন, তাহার মূল্যটা দিল ভারত সরকার বা ভারতবাসী। সেটা হইল জাতীয় ঋণ।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত হওয়ায় ভারতের অবস্থা ভাল হইল কি মন্দ হইল বলা কঠিন। কারণ কোম্পানিকে প্রতি বিশ বৎসর (১৭৭৩, ১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৩৩, ১৮৫৩) অন্তর পার্লামেণ্টের নিকট হইতে নূতন সনদ গ্রহণ করিবার সময় ভারতের প্রজাদের অবস্থা, কোম্পানির আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পার্লামেণ্টের সদস্যদের সম্মুখে পেশ করিতে হইত। তখন পার্লমেণ্টে ভারত সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা চলিত। কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারত খাস ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আশ্রয়ে আসিলে শাসন বিষয়ে জবাবদিহি করিবার প্রশ্ন আর থাকিল না। এতদিন একটা কোম্পানি ভারত শাসন ও শোষণ করিত, উহার মুষ্টিমেয় অংশীদার ছিল উহার মালিক ; এখন একটা সমগ্র জাতি হইল ভারতের মালিক।

১৭৭২ হইতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট বহু আইন পাশ করিয়া ইষ্ট-ইন্‌ডিয়া-কোম্পানির কাজ নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল ; কিন্তু এখন শাসনদায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের উপর বর্তাইল। আর এখন হইতে ব্রিটিশ রাজনীতিক দলগত শাসন প্রথার (Party government) ক্রীড়নক হইল ভারত ; এই 'ক্ষণং রুষ্ট, ক্ষণং তুষ্ট' দলের প্রসাদ ভয়ঙ্কর ; একদল কিছু দেন, অপরদল আসিয়া তাহা প্রত্যাহরণ করেন। নব্বই বৎসর ভারতবাসীরা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের দলপতিদের ক্রীড়নক ছিল।

১৮৫৮ অব্দের ১লা নভেম্বর এলাহাবাদের দরবারে বড়লাট লর্ড ক্যানিং মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি বা ভাইসরয়রূপে রাজকীয় ঘোষণা পাঠ করিলেন ; সেদিন ভারতের সর্বত্র এই ঘোষণাপত্র পঠিত হইয়াছিল। ইহাতে বলা হয় যে, ব্রিটিশরাজ ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকলকে সমানভাবে দেখিবেন ; যোগ্য ভারতীয়রা উচ্চতম কার্য পাইবেন। সিপাহী-বিদ্রোহে যাহারা প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করিয়া নরহত্যাদি কর্মে লিপ্ত ছিল, তাহারা ব্যতীত সকলকেই ক্ষমা করা হইল। এই ঘোষণার বিশেষ প্রয়োজন ছিল—কারণ বিদ্রোহান্তে বিহার ও উত্তর ভারতে ইংরেজ কর্মচারীরা যে নরহত্যা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নৃশংসভাবে নরহত্যা করেন, তাহা বিদ্রোহোন্মত্ত সিপাহীদের নৃশংসতা হইতে কম ছিল না। যাহা হউক এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইলে উত্তর ভারতের ভীত, আতঙ্কিত জনতার মনে পুনরায় সাহস ও প্রাণে আশার সঞ্চার হইল।

ভারতের শিক্ষিত সমাজ মহারানী ভিক্টোরিয়ার কূটনীতিপূর্ণ ঘোষণাপত্রকে আক্ষরিক সত্যজ্ঞানে বহুকাল উহাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার চার্টার বা সনদ মনে করিয়া গর্বের ভান করিতেন। এই দলিলের দোহাই দিয়া সরকারী কাজেকর্মে, ব্যবহারে ইংরেজের নিকট হইতে সমদৃষ্টি দাবি করিতেন। ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইবার পর হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার হিন্দু প্যাটরিয়টে লিখিয়াছিলেন :

"বারংবার বিশ্বাসভঙ্গের ফলে ইংরেজ সরকারের ইজ্জত এত কমে গিয়েছে যে, সততার বাস্তব প্রমাণ না দিলে এই ঘোষণাপত্র যাদের উদ্দেশে প্রচার করা হয়েছে তারা সহজে এ বিশ্বাস করবে না। এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, আবার সুযোগ বুঝে সরকার তাদের এই পবিত্র প্রতিজ্ঞাগুলি ভঙ্গ করবে না।

রাজাদের সঙ্গে যে-সব সন্ধিগুলি প্রচলিত পন্থা অনুসারে পবিত্র প্রতিশ্রুতির দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেই সন্ধিগুলি যখন বিনা দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে যাদের দ্বারা ভঙ্গ হতে পেরেছিল তারাই যে এই নূতন প্রতিশ্রুতিগুলি অনুসারে কাজ করবে, তার গ্যারান্টি কোথায়, যদিও এই প্রতিশ্রুতিগুলি মহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞীর মুখ থেকে বের হয়েছে।"[১]

এই উক্তিগুলি অতি সত্য; বড় ইংরেজ যাহা দান করিবে বলিয়া সংকল্প করে, ছোটো ইংরেজ তাহা খর্ব বা অপহরণ করে, ব্রিটিশের খাস শাসনযুগের ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

অল্পকাল মধ্যেই দেখা গেল স্বাধীনতার এই কবচ ব্রিটিশ কূটনীতির একটি চালবাজি মাত্র। ব্রিটিশ স্বার্থ—তাহা রাজনৈতিকই হউক আর অর্থনৈতিকই হউক—যেখানে বিন্দুমাত্র খর্ব হইবার দূরতম আশঙ্কা দেখা গিয়াছে সেখানে মহারানীর কবচের হাজার দোহাই কোনো কাজে লাগে নাই। শিক্ষিত সমাজের এই ভুল ভাঙিতে বহুকাল লাগে; সে ভুল যখন ভাঙিল তখন নেতারা দেখিলেন, জনতা তাহাদের আয়ত্তের বাহিরে নূতন নেতাদের পতাকা-তলে সমবেত হইতেছে। কিন্তু সেখানেও নেতারা বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, বিবদমান।

১৫

সিপাহী-বিদ্রোহের সূচনা ও অবসানের পর্বমধ্যে বাঙালির মনকে গভীর-ভাবে নাড়া দিবার মতো এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহার উল্লেখমাত্র দ্বারা ইহাদের গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে। ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ অব্দ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন, নীলচাষের প্রসার ও তদ্বিষয়ে হাঙ্গামা ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু প্যাটরিয়টে' প্রতিবাদ, বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, 'সোমপ্রকাশ' নামক পত্রিকার অভ্যুদয়,

১ প্রমোদ সেনগুপ্ত, ভারতীয় মহাবিদ্রোহ পৃ. ১১

দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন ও হিন্দুসমাজের মধ্যে রক্ষণশীলদলের জাগরণ এবং ধর্ম ও সমাজ সংরক্ষণের প্রয়াস, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্যশিক্ষার দ্রুত ব্যাপ্তি, ইন্‌ডিয়ান কাউন্‌সিল এক্‌ট পাশ ও কলিকাতায় হাইকোর্ট স্থাপন প্রভৃতি ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটি বঙ্গ সমাজকে এমন প্রবলভাবে আলোড়িত করিয়াছিল যে, প্রত্যেকটি বিষয়ের পৃথক ইতিহাস গভীরভাবে আলোচনার বিষয় হইতে পারে। ইহাকে আমরা বলিব বাংলা-দেশের রেনাসাস।[১]

১৬

ভারতের জনতার মনে জাতীয়তা ভাব উদ্‌বুদ্ধ করিতে যে-সব ঘটনা প্রত্যক্ষত দায়ী, তাহার একটি হইতেছে নীলচাষের হাঙ্গামা। ১৮২৪ হইতে বাংলাদেশে নীলের চাষ আরম্ভ হয়। ইংরেজ কুঠিয়ালরা দলে দলে আসিয়া বাংলা-বিহারের গ্রাম-অঞ্চলে নীলের চাষ শুরু করিয়া দেয়। এই-সব ইংরেজদের অধিকাংশের চরিত্র ছিল আমেরিকার কার্পাস ও শর্করা শিল্পের কৃষ্ণকায় নিগ্রোদাসের শ্বেতকায় মালিকদের মতো। (লর্ড মেকলে ইহাদের এবং ঐ শ্রেণীর দুর্বৃত্ত য়ুরোপীয় কুঠিয়াল ও ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—Profligate adventurer দুশ্চরিত্র সাহসিক।) ১৮৩৩ সালে তিনি বলেন, হিন্দুদের ও ইহাদের বিচার একই আইনমতে হওয়া উচিত। ১৮৪৯-এ গ্রামের চাষীদের দুর্বহ জীবন যাত্রার উন্নতির জন্য বেথুন সাহেব এক আইনের খসড়া পেশ করেন; তাহাতে বলা হয়, মফস্বলের য়ুরোপীয়দের দেশীয় কোর্টেই বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শ্বেতাঙ্গরা প্রস্তাবিত আইনকে ব্ল্যাক এক্‌ট নাম দিয়া এমন প্রবল আন্দোলন উত্থাপন করে যে, আইন পাশ করিতে কাউন্সিল আর সাহসী হইল না।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে দেখা দিল নীল চাষীদের বিদ্রোহ। সমগ্র ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিতে ইহা

১ শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং অধুনা লিখিত কাজী আবদুল ওদুদের 'বাংলার জাগরণ' গ্রন্থদ্বয়ে এই রেনাসাসের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে।

ক্ষুদ্র ঘটনা—কিন্তু ইহার বেদনা ও আবেদন দরিদ্রস্তর হইতে উঠিয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনকে স্পর্শ করিয়াছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বে ইংরেজ কুঠিয়ালদের অপমানকর ব্যবহার হয়তো সাধারণের মনে তেমন ভাবে রেখাপাত করিত না, কিন্তু বোধ হয় বিদ্রোহের অভিঘাতে আজ সে-সব অসহ্য লাগিতেছে। ইংরেজ কুঠিয়ালরা অল্পব্যয়ে প্রচুর লাভের জন্য যে-সব অমানুষিক ব্যবহার করিতেন, তাহার চিত্র দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণে (১৮৬০) অঙ্কিত হইয়াছে ; মধ্যবিত্ত শিক্ষিতেরা এই আন্দোলনকে সমর্থন করিল, যাহা সাঁওতাল ও সিপাহী -বিদ্রোহ পায় নাই।

নীলকর সাহেবরা গ্রামের মধ্যেই আমিরী চালে বাস করিতেন ; তাহাদের অত্যাচার, উৎপীড়ন কচিৎ জেলার ইংরেজ শাসকদের দ্বারা শমিত হইত। দরিদ্র কৃষকরা কুঠিয়াল সাহেবদের নিকট হইতে একবার টাকা দাদন লইলে পুরুষানুক্রমে তাহাদের আর মুক্তির আশা থাকিত না ; কারণ নিরক্ষর লোকে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ—তাহাদের ঠকাইবার সহস্র প্রকার পন্থা জানিতেন সাহেবদের বাঙালি কর্মচারীরা। নীলকরগণ কৃষকদিগকে জোর করিয়া উৎকৃষ্ট জমিতে নীল রোপন করিতে বাধ্য করিত ; বলপূর্বক তাহাদের বলদ হাল লাঙল ব্যবহার করিত। আদেশ অনুসারে কাজ না করিতে পারিলে বা না চাহিলে প্রহার, কয়েদ, গৃহদাহ, গুম্ প্রভৃতি নৃশংসভাবে চলিত। ভদ্র গৃহস্থকে অপরাধী মনে করিয়া কুঠিয়ালরা কঠোর শাস্তি দিতে দ্বিধা বোধ করিত না, এই-সব হীন কার্যের প্ররোচক ইংরেজ—কিন্তু এই-সবের নির্বাহক ছিল অর্থদাস বাঙালিই, হিন্দু-মুসলমান উভয়েই।

কয়েক বৎসরের মধ্যে অত্যাচার এমনই অসহ্য হইয়া উঠিল যে, আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ গ্রাম্যচাষীরা বিদ্রোহী হইয়া ঘোষণা করিল নীলের চাষ তাহারা করিবে না ; ভারতের ইতিহাসে ইহাই বোধ হয় প্রথম অসহযোগ আন্দোলন। ধর্মঘটের ফলে কুঠিয়ালদের অত্যাচার বাড়িয়া চলিল—ইংরেজ কর্মচারীদের নিকট হইতে চাষীরা কোনো প্রতিকার পাইল না ; তাহারা গোপন সহায়তা করিতে লাগিল কুঠিয়ালদের। তখন বাংলাদেশের গ্রাম বলিষ্ঠ পুরুষশূন্য হয় নাই—হিন্দু মুসলমানের আর্থিক স্বার্থ পৃথক এ কথাও রাজনীতিক্ষেত্রে ঘোষিত হয় নাই। সুতরাং নীলকর ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে হিন্দু মুসলমানরা সমভাবে যোগদান করিল।

কলিকাতার হিন্দু-প্যাটরিয়টে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতেন। (অচিরে এই-সকল সংবাদ তৎকালীন বাংলার প্রদেশপাল বা লেফনেণ্ট গবর্ণর স্তর পিটার গ্রাণ্টের (১৮৫৯-৬১) দৃষ্টিভূত হয়;) তিনি একবার দেশভ্রমণে বাহির হইয়া প্রজাদের নিকট হইতে নীলের বিরুদ্ধে তাহাদের মনোভাবের আভাস পাইয়া আসিলেন। সে যুগে মন্দগতি যানবাহনে লাটসাহেবদেরও চলাফেরা করিতে হইত—তাই সাধারণ লোকদের ভালোভাবে দেখিবার জানিবার, বুঝিবার যথেষ্ট অবসর পাইতেন।

ইতিমধ্যে 'নীলদর্পণ' নামে এক নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৬০); দীনবন্ধু মিত্র ইহার রচয়িতা কিন্তু অ-নামে উহা মুদ্রিত হয় ঢাকা শহরের কোনো মুদ্রাযন্ত্রে। এই নাটক শিক্ষিত সমাজের মনে গভীর রেখাপাত করে। নীলদর্পণের ইংরেজী তর্জমা রেভারেণ্ড লঙ্ সাহেবের নামে প্রকাশিত হইলে (১৮৬১) সরকারী মহলে খুবই উত্তেজনা দেখা দেয়; বাংলা-গবর্মেণ্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী সীটন-কারের ইচ্ছায় এই তর্জমা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ মুদ্রণের অপরাধে লঙের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইল এবং সীটন-কারও তিরস্কৃত হইলেন। লঙের জরিমানার টাকা দিয়া দেন তরুণ সাহিত্যিক ও জমিদার কালীপ্রসন্ন সিংহ। (শোনা যায় নীলদর্পণের আসল অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।)

ইতিমধ্যে গ্রাণ্ট সাহেবের সুপারিশে নীল কমিশন বসে এবং কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে বঙ্গীয় সরকার নীলচাষ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিয়া অনেক সংস্কার করেন। এই ঘটনার পর ইংরেজ কুঠিয়ালদের দৌরাত্ম্য কিয়দপরিমাণে শমিত হইল বটে, কিন্তু হিন্দু প্যাটরিয়টের সম্পাদক হরিশচন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর, তাঁহার বিধবা পত্নীর উপর প্রতিশোধ তুলিতে সাহেবদের ধর্মে বা শিভালরিতে বাধিল না। বাঙালির সঙ্ঘশক্তি জাগ্রত হয় নাই বলিয়া বিধবা এই মামলায় সর্বস্বান্ত হইলেন।

নীলকরের হাঙ্গামা চলিতেছিল গ্রাম অঞ্চলে। কলিকাতার নগরবাসীরা পুস্তক ও পত্রিকা মারফৎ গ্রামের সংবাদ ও সমস্যা জানিতে পারিতেন—তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ও অবসর ছিল কম।

১৭

রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ঘটনাবলীর সমান্তরালে যে-সব ধর্মীয় ও সামাজিক মতবাদের বিপ্লব চলিতেছে, তাহার আলোচনাকে পাশ কাটাইয়া জাতীয় আন্দোলনের সমগ্র চিত্র ফুটাইয়া তোলা যাইবে না।

১৮৩৩ হইতে ১৮৮৪ অব্দ অর্থাৎ প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল শিক্ষিত বাঙালির মনকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন। বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মরূপে উদ্ভূত হইলেও—ইহা অচিরেই বেদের অভ্রান্তবাদ অস্বীকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের বৈজ্ঞানিকতা ও রাজনারায়ণ বসুর দার্শনিকতা বেদের অপৌরুষেয় মতবাদ ও যুগযুগান্তরের অন্ধ আনুগত্যকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। বিংশশতকের মধ্যভাগে আজ আমরা এই ঘটনার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারি না; কিন্তু সে যুগে ইহা যে কত বড় বিদ্রোহ তাহা বর্তমানে কল্পনা করাও কঠিন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৩ অব্দে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া এই ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম বিশেষ কোনো শাস্ত্রকেন্দ্রিত ধর্ম না হইলেও উহা হিন্দুধর্মশাস্ত্রসম্মত ধর্ম— এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের সংশয় ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে যে গ্রন্থ সম্পাদন করিলেন তাহা বিশেষ কোনো শাস্ত্র গ্রন্থের সংকলন নহে; যাহা আত্মপ্রত্যয়সম্মত, যাহা সহজ বুদ্ধিসম্মত, যাহা ভদ্র ও কল্যাণকর—সেই-সব শাস্ত্রবাক্য তিনি সংগ্রহ করেন।

১৮৫৬ সালে তরুণ কেশবচন্দ্র সেন (১৮) দেবেন্দ্রনাথের (৩৯) সহিত যুক্ত হন; সেই হইতে ১৮৬৫ পর্যন্ত নয় বৎসর উভয়ে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ প্রচার করেন। কিন্তু তরুণের দলের মনে এই প্রশ্ন জাগিল—ঈশ্বর সম্বন্ধে সকল সত্য কি হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যেই সীমিত? দ্বিতীয় প্রশ্ন, ব্রহ্মের সমক্ষে যখন সকল মানবই সমান তখন সমাজজীবনে ভেদাভেদ মানিয়া চলা, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার দ্বারা কি ধর্মের সার্বভৌমত্ব সংকুচিত হইতেছে না? আধুনিকযুগে কেশবচন্দ্র জাতিবর্ণভেদ লোপ করিয়া, হিন্দুশাস্ত্রের বিশেষ দাবি অস্বীকার করিয়া, সকল ধর্মের শাস্ত্রকে ধর্মশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন; তাঁহার 'নবসংহিতা' সকল ধর্মের প্রার্থনাদি সংকলিত গ্রন্থ।

কেশবচন্দ্র হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান ধর্মীদের 'মানুষ' বলিয়াই মান্য করিতেন—

বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতিনিধিরূপে নয়। তাই তিনি জাতিভেদহীন, বিশেষ ধর্মসংস্কারমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ গড়িবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কোনো দেশে সমাজ বা নেশন গড়িয়া উঠিতে পারে তখনই, যখন জাতিবর্ণ-ভেদহীন বিবাহ পদ্ধতির মাধ্যমে রক্তের সঙ্গে রক্তের সংযোগ বাধাহীন হয়; ইহাই 'নেশন' সৃষ্টির সহায়ক। কেশবচন্দ্রের ভারত সমাজ পরিকল্পনায় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের পৃথক পৃথক সত্তার স্থান ছিল না, সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান— ইহাই মানবের চরম পরিচয়। সর্বধর্মের সারসত্য গ্রহণ দ্বারা সর্বধর্মসমন্বয়ও যে সম্ভব ইহাও কেশবচন্দ্র ঘোষণা করেন।

১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র ও তরুণ ব্রাহ্মেরা দেবেন্দ্রনাথের স্থবির পন্থা ত্যাগ করিলে, সেখানে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল তাহাকে বিশেষভাবে 'ন্যাশন্যাল' বা 'জাতীয়'ই বলিব। কেশবচন্দ্র প্রমুখ তরুণের দল বিশ্বধর্মের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলেন না, তাঁহারা বলিলেন, ব্রাহ্মরা হিন্দু নহে। তাহার কারণ মুসলমান বা খ্রীষ্টানের পক্ষে তাহাদের সমস্ত ঐতিহ্য ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত ও হিন্দু শাস্ত্রকেই অধ্যাত্ম জীবনের উৎস বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে বাধা অনেক—উহার দ্বারা সর্ববর্ণক ধর্ম স্থাপিত হয় না। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভাষা যেমন বিশেষ স্থানের বিশেষ জাতির মধ্যে আবদ্ধ, ধর্ম বা সংস্কৃতিও তেমনি একটি জাতির সাধকদের বিশেষ ভাষার মধ্য দিয়াই উৎসারিত হইয়াছে; ভাষার ন্যায় ধর্মও বিশেষ সংস্কৃতির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সেই ভাষা ও ঐতিহ্য বাদ দিয়া বিশ্বধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না ইহাই ছিল সমস্যা।

কেশবচন্দ্রের বাস্তবতাশূন্য বিশ্বধর্মের প্রতিষেধক রূপে আদি-ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে হিন্দুত্ব তথা 'ন্যাশনালাজিম' নূতনভাবে রূপ গ্রহণ করিল। কেশবচন্দ্র সর্বজাতির বিবাহ অনুমোদক আইন পাশ করাইলে (১৮৭২), রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সভাপতি। সাধারণ হিন্দুরা ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি লিখিত এই প্রবন্ধ পড়িয়া খুশি হইল। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার প্রশংসা করিলেন বটে কিন্তু বলিলেন এই হিন্দুধর্ম তো ব্রাহ্মদের ধর্ম; কারণ রাজনারায়ণ একেশ্বর নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাকেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিম বলিলেন, হিন্দুধর্মে নিরাকার ও সাকার দুই প্রকার সাধনাই স্বীকৃত, সুতরাং হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে রাজনারায়ণের ভাষণ একদেশদর্শী। ইহাই হইল নব্য হিন্দু জাগরণের নেতা বঙ্কিমের প্রতিক্রিয়াশীল মত। অপর দিকে নব্য ব্রাহ্মরাও রাজনারায়ণের মতের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে কেশবচন্দ্রের দলস্থ ব্রাহ্মগণ অ-হিন্দু বলিয়া হিন্দুসমাজে অবজ্ঞার পাত্র হইল।

রাজনারায়ণের জীবনে স্বাদেশিকতা ও ধর্মীয়তা প্রায় প্রতিশব্দতুল্য। এই স্বাদেশিকতার প্রেরণা হইতে হিন্দু মেলার জন্ম (১৮৬৭) ; রাজনারায়ণই ইহার উদ্যোক্তা। ঠাকুর-বাড়ির যুবকরা ছিলেন অর্থাদি ব্যাপারে প্রধান সহায়। নবগোপাল মিত্র ইহার একনিষ্ঠ কর্মী। কলিকাতার বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হন। এই মেলা ভারতের প্রথম সর্বোদয় প্রচেষ্টা।[১]

স্বাধীনতা লাভের কথা তখন কল্পনার অতীত। তাই হিন্দুমেলার কর্মকর্তাগণ দেশবাসীকে স্বাবলম্বী হইবার পরামর্শ দিলেন। এই স্বাবলম্বী নীতি পরযুগে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী-সমাজ' প্রবন্ধ লিখিয়া দেশমধ্যে প্রচার করেন ; তাঁহার শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন এই স্বাবলম্বন নীতির উদাহরণ। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ এই স্বাবলম্বন নীতির নামান্তর মাত্র। সুতরাং হিন্দুমেলাকে (চৈত্র মেলা) আমরা 'জাতীয়' আন্দোলনের প্রথম স্পন্দন বলিতে পারি। এই মেলার প্রদর্শনীতে লোকে নানা প্রকার সামগ্রী পাঠাইত —নানাপ্রকার ফলমূল, পুষ্প ও শিল্পকার্য আনিত ; এই উৎসবক্ষেত্রে শারীরিক ব্যায়ামাদি চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদত্ত হইত। একবার একখানি তাঁতও মেলায় আসে ; এই মেলায় তাঁত আনার কথার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য আছে।

গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে (১৮১৪-৬৪) ভারতের তাঁতশিল্প ইংলন্ডের যন্ত্রজাত বস্ত্র আমদানীর ফলে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁতিদের দুর্দশা হয় সর্বাধিক। সমসাময়িক কবি মনোমোহন বসু লিখিয়াছিলেন—

১ ইহারও দুই বৎসর পূর্বে ৭ই আগস্ট ১৮৬৫ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে নবগোপালের 'ন্যাশনাল পেপার' প্রকাশিত হইয়াছিল। মধ্যে ১৮৬৬ অব্দে রাজনারায়ণ ইংরেজিতে 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন ; সেই পুস্তিকা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া কলিকাতার শিক্ষিত হিন্দুরা হিন্দুমেলা স্থাপন করিতে উৎসাহী হইয়াছিলেন।

"দেশে তাঁতি কর্মকার, করে হাহাকার,
সুতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার।…
আমাদের দেশলাইকাঠি তাও আসে পোতে,
খেতে শুতে বসতে প্রদীপ জ্বালাতে—
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"

এই কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতি গ্রন্থে স্বদেশী দেশলাই ও তাঁতের কাপড় সম্বন্ধে যে কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন তাহা সে যুগের মনোভাবের অন্যতম চিত্র। এই মেলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগানগীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প, ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।" বাংলা সাহিত্যে 'জাতীয় সংগীত' নামে নূতন এক শ্রেণীর রচনার সূত্রপাত হইল।

ইংরেজ ও ভারতীয়ের সম্বন্ধ

১৭৫৭ হইতে ১৮৫৮ পর্যন্ত এই একশত বৎসর ইংরেজ বণিকরা ভারত শাসন করে অর্থাৎ একটি ব্যবসায়ী সংঘ বা কোম্পানি ছিল ভারতের মালিক ; তাহাদের একদল আসিত ব্যবসায় করিতে এবং দলের বাহিরে একদল আসিত শাসন, বিচার, শিক্ষাদি পরিচালনা করিতে। এ ছাড়া আসিতেন নানা দেশের খ্রীষ্টান পাদরীরা। মোটকথা সেই রেল-ষ্টীমার-ডাক-তার অজ্ঞাত যুগে তাহারা ভারতময় ছড়াইয়া বাস করিত ; গতায়াতের পথঘাট আরামের নহে, দ্রুত যানবাহনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ফলে যে-সব ইংরেজ বা য়ুরোপীয়েরা এ দেশে আসিত, তাহাদের দেশীয় ভাষা শিখিয়া দেশীয় লোকের সঙ্গে মেশামেশি কিছুটা করিতে হইত। একশ্রেণীর লোক ভারতীয়দের বিবাহ করিয়া এ দেশের বাসিন্দাও হইয়া যায় ; তবে ইহারা খাস্ ইংরেজ সমাজে অপাংক্তেয়।

কিন্তু ১৮৫৮ সালে ভারত ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানির হাত হইতে খাস্ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আয়ত্তাধীনে আসিবার পর হইতে ইংরেজ কর্মচারী ও শিক্ষিত ভারতীয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্পষ্টত প্রভু-ভৃত্য বা শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

১৮৬১ সালে ভারত কাউনসিল এক্ট পাশ হইলে বড়লাটের আইন পরিষদ গঠিত ও সেই বৎসরে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে হাইকোর্ট স্থাপিত হইল ; ইতিপূর্বে ১৮৫৭ সালে উক্ত তিনটি নগরীতে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৬১ হইতে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত এই বিশ বৎসরের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক এমন-সব ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা ভারতীয়দের মনে গভীর রেখাপাত করে।

খাস্ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের শাসনাধীন রাজ্যরূপে ভারত পরিগণিত হইবার মুহূর্ত হইতে প্রশাসন বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সুদৃঢ় করিবার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হইল বহু কর্ম বিভাগের সৃষ্টি। সেই-সব বিভাগে চাকুরির জন্য দলে দলে

শিক্ষিত ব্রিটিশ যুবকরা ভারতে আসিতে আরম্ভ করিল। সিপাহী-বিদ্রোহের পর সমর বিভাগে উপরিস্তরে ভারতীয় কর্মচারীদের প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সংকুচিত করিয়া ব্রিটিশ অফিসার আমদানী করা শুরু হইল। ব্রিটিশ সাধারণ সৈন্য সংখ্যাও পূর্বাপেক্ষা বাড়িল। বিচার বিভাগের জন্য আসিল বহু ইংরেজ যুবক।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হাতে ভারত-শাসনভার সমর্পিত হইবার এগারো বৎসর পরে সুয়েজ খাল খোলা হয় (১৬ নভেম্বর ১৮৬৯); য়ুরোপ হইতে ভারত ও প্রাচ্যে যাওয়া-আসার পথ সুগম হইল এবং বহু সহস্র মাইল পথ হ্রাস পাইল। ইহার প্রতিক্রিয়ায় দেখা গেল বিচিত্র ফল। প্রথমে ব্রিটিশ অবাধ বাণিজ্যনীতি (Free trade) অনুসারে ভারতে বিনা শুল্কে বা সামান্য শুল্কে ব্রিটিশ পণ্য আমদানী হইতে আরম্ভ করিল।

ভারতের সাধারণ ইতিহাস-পাঠকের নিকট ইহা অবিদিত নহে যে, পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) পর হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারতের রাজন্যবর্গের পুঞ্জীভূত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মোটা অংশ ইংলন্ডে চালান হইয়া গিয়াছিল। ভারত লুণ্ঠনের দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশের দেওয়ানী প্রাপ্তির সময়ে রাজস্ব প্রাপ্তি হয় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা; খরচ খরচা বাদে নিট্ লাভ হয় ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। ছয় সাত বৎসরে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ কোটি টাকারও বেশি। এই টাকাটা ইংলন্ডে যাইত।

কোম্পানির লুণ্ঠন ছাড়াও কোম্পানির ছোটবড় কর্মচারীদের লুণ্ঠনের পরিমাণ ইহা হইতে অনেক বেশি। বিলাতে ক্লাইভের সম্পত্তির মূল্য ধরা হয় ২৫ লক্ষ টাকা। তা'ছাড়া তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতেও বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা পাইতেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশের পেনশন ধার্য হয় বৎসরে ৫০ হাজার টাকা; ওয়ারেন হেস্টিংসের ৪০ হাজার টাকা। ওয়েলেসলি হইতে ডালহৌসি পর্যন্ত প্রত্যেক গবর্ণর-জেনারেল একসঙ্গে ৬ লক্ষ টাকা পাইয়া বিদায় লন। ছোট কর্মচারীরাও এই সদাব্রত হইতে বঞ্চিত হইত না। একজন সাধারণ ইংরেজ কর্মচারী ১৫।২০ বৎসর চাকুরী করিয়া পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে অনায়াসে ৩ লক্ষ টাকার মালিক হইয়া দেশে ফিরিতেন।

এই-সমস্ত অর্থ নিয়োজিত হইত শিল্পোন্নয়নে। ১৮ শতকের শেষভাগে ইংলণ্ডে যে শিল্পবিপ্লব (Industrial revolution) আরম্ভ হয়, তাহার মূলে ছিল নূতন নূতন আবিষ্কৃত যন্ত্র হইতে উৎপন্ন শিল্পজাত সামগ্রী। বহু বৎসরের পরীক্ষার পর বিলাতের বস্ত্রশিল্পীরা ভারতের কারুশিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। কোম্পানীর যুগে ইংরেজ বণিকরা ভারতীয় শিল্পসামগ্রী ভারত হইতে য়ুরোপে আমদানী করিত। ১৮১৩ সালের পর কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ হইলে ইংলনডের শিল্পপতিরা তাহাদের কলে-প্রস্তুত বস্ত্রাদি ভারতে রপ্তানী করিতে আরম্ভ করিল। তারপর ১৮৬৯ সালে সুয়েজখাল খোলা হইলে এবং বিলাতে 'অবাধ বাণিজ্যনীতি'বাদ গৃহীত হইলে ভারতের কারুশিল্পের সর্বনাশ হইল। সিপাহী-বিদ্রোহের পর রেলপথ দ্রুত নির্মিত হইতে থাকিলে বিদেশীর কলে-প্রস্তুত মালপত্র সহজে ও সস্তায় ভারতের বন্দর হইতে শহরে ও শহর হইতে গ্রামে প্রসার লাভ করিল; গ্রামের কুটিরশিল্প এই আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হইতে চলিল। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক ভারকেন্দ্র সরিয়া গেল ইংলনডের অনুকূলে; এতকাল ভারত ছিল উত্তমর্ণ— এখন হইতে সে হইল অধমর্ণ দেশ;—ভারত ছিল শিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানীকার, এখন সে হইল বিদেশী মালের আমদানীকার। ভারতীয়দের সমাজ জীবনে এতকাল কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যে সমতা ছিল, তাহা এই বিপ্লবে বিপর্যস্ত হইল। ভারত তখন হইতে কৃষিপ্রধান দেশ; কিন্তু সে-বৃত্তিও উচ্চাঙ্গের নহে। তন্তুবায়, চর্মকার, কর্মকার, শর্করাকার, লবণকার বা লুনিয়া প্রভৃতির বিচিত্র শিল্প প্রায় লুপ্ত হইবার মতো হইলে, সকলেই জীবিকার জন্য জমির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল— অথবা শিল্প-জ্ঞান হারাইয়া শ্রমিক বা হাতিয়ারহীন মজুর হইল। মা-ধরিত্রী অসংখ্য অসহায় কর্মহীন সন্তানকে পর্যাপ্ত খাদ্য দিতে অথবা তাহাদের নিজ নিজ শিল্পবৃত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করিতে পারিলেন না; দেশ ruralised হইয়া পড়িল। এই অবস্থার কথা মনোমোহন বসুর পূর্বোদ্ধৃত কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

২

(১৮৬৯ অব্দে সুয়েজখাল খোলা হইবার পর হইতে ভারতের শিল্পের যেমন দ্রুত অবনতি হইতে থাকিল, তেমনি ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের সামাজিক সম্বন্ধের

মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিল। কোম্পানীর শাসনের প্রথম যুগে ইংরেজ কর্মচারীদের এ দেশে স্ত্রী-পুত্র লইয়া বসবাসের সুবিধা ছিল কম। এখন দ্রুত স্টীমারের সহজপথে মেমসাহেবরা এ দেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার ফলে ইংরেজের যে গার্হস্থ্য ও সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিল, তাহা হইল দেশীয়দের সহিত বিভেদ সংঘটনের অন্যতম প্রধান কারণ। স্বাভাবিক মেলামেশাতে পরস্পরকে জানিবার ও বুঝিবার যে সহজ পথ এতদিন উন্মুক্ত ছিল, এখন তাহা অবরুদ্ধ হইয়া আসিল। পূর্বে ইংরেজ ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের সহিত ভারতীয়দের কিছুটা সংযোগ রাখিতেই হইত; এখন তাহাদের নিজস্ব ঘরবাড়, সাহেবি হোটেল, বিলাতী ক্লাব, জিমখানা, ঘোড়দৌড়ের মাঠ হইতেছে—সেই বিশিষ্টস্থান ও ক্লাবে চাকর, বয়্, বাট্‌লার ব্যতীত অন্য ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার নাই। ক্রমেই কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের বিভেদ স্পষ্টতর এবং এই বিভেদ হইতে শ্বেতাঙ্গদের পক্ষ হইতে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য এবং কৃষ্ণাঙ্গদের পক্ষ হইতে শ্বেতাঙ্গদের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার ভাব উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল।

সুয়েজখাল খোলা হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভারত সফরে আসিলেন মহারানী ভিক্‌টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা; ইংলন্‌ডের রাজপরিবারের সহিত ভারতের এই প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৮৭৫ অব্দে মহারানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বা প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ (পরে ৭ম এডোয়ার্ড; বর্তমান রানী ২য় এলিজাবেথের প্রপিতামহ) ভারত পরিদর্শনে আসেন। সে সময়ে ভারতের আপামর সাধারণের পক্ষ হইতে রাজভক্তির যে নিদর্শন দেখানো হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছিল। কত কবিই যে নিজের পয়সায় উল্লাসপূর্ণ রাজবন্দনা লিখিয়া মুদ্রিত করেন!

রাজকুমার ফিরিয়া যাইবার পর বৎসর (১৮৭৬) ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলেন লর্ড লীটন্। ইংলন্‌ডের এককালে-বিখ্যাত ঔপন্যাসিক লর্ড লীটনের পুত্র ইনি। ভাইসরয় লীটনও সাহিত্যিক ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যিকের আদর্শবাদ ছিল না—তিনি ছিলেন উৎকট সাম্রাজ্যবাদী— খাঁটি জন্‌বুল। তখন বিলাতে প্রধান মন্ত্রী ডিস্‌রেলি—রক্ষণশীল দলের নেতা।

ভারতের মতো সুবৃহৎ দেশের নিয়ন্তা হইবার গুণ লীটনের ছিল না। তাঁহার মধ্যে ছিল ব্রিটিশ ধণিকদের ঔদ্ধত্য ও অভিজাতদের আড়ম্বরপ্রিয়তা।

এই চতুর রাজনীতিক বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, ভারতের হিন্দু-মুসলমানরা স্বভাবতই রাজভক্ত ও রাজকীয় জাঁকজমকে মুগ্ধ হয়; সেজন্য ভারতের শাসনভার গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যে ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী ভারতের প্রাচীন পরিত্যক্ত রাজধানী দিল্লী শহরে মুঘল বাদশাহের অনুকরণে তিনি এক দরবার আহ্বান করিলেন; এই দরবারে মহারানী ভিকটোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষিত হইলেন—'এম্‌প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া' এই শব্দের প্রথম ব্যবহার। য়ুরোপের আন্তর্জাতিক ঘাতপ্রতিঘাত ও রেশারেশিক প্রতিক্রিয়ায় ডিস্‌রেলী ভারতে এই আড়ম্বরের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; কয়েক বৎসর পূর্বে জারমেনীতে জার্‌মান-সম্রাট পদ সৃষ্ট হয়, ভারতে যেন তাহার প্রতিধ্বনি হইল। সেই হইতে ১৯৪৭ পর্যন্ত ইংলনডের রাজা বা রাণী ভারতের সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী উপাধিদ্বারা অলংকৃত হইয়াছিলেন। লীটনের পূর্বে এইরূপ আতিশয্য প্রকাশ কখনো হয় নাই; শিক্ষিত ভারতীয়রা এই আড়ম্বরে মুগ্ধ হন নাই। এই সময়ে ভারতের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ; অনুমান ৫২ লক্ষ লোক অনাহার ও অনাহার-জনিত ব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চারিদিকের হাহাকারের মধ্যে এই রাজসিক দরবার অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিল। বালক রবীন্দ্রনাথ (১৬) ১৮৭৭ সালের হিন্দুমেলায় (চৈত্র সংক্রান্তি) দিল্লী দরবার ও ব্রিটিশ আস্ফালনকে ধিক্কৃত করিয়া এক কবিতা পাঠ করেন।

৩

ভারতের সাধারণ ইতিহাস পাঠক অবগত আছেন যে, লীটনের সময় ভারত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানিস্থানের আমীরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হন। এই যুদ্ধের কারণ, ব্রিটিশের চিরকালের রুশ-আতঙ্ক। ১৮০৭ অব্দে টিল্‌সিটে নেপোলিয়ান ও রুশ সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি হইতে ভারতে রুশভীতির সূত্রপাত হয়। লর্ড এলেনবরা ভারত হইতে পারস্যে দূত পাঠান, বিলাত হইতেও পারস্যে দূত আসে রুশকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে। ইহার পর সত্তর বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ব্রিটিশরা ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহাদের রুশ আতঙ্ক আদৌ হ্রাস পায় নাই। সিন্ধু, পাঞ্জাব, সবই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত; এখন ব্রিটিশের সন্দেহ আফগানিস্থানকে।

ঐ অর্ধসভ্য, উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য দেশের উপর রুশ শ্যেনদৃষ্টি হানিতেছে। এইটি ব্রিটিশের পক্ষে খুবই অসোয়াস্তিকর। আফগানিস্থানে ব্রিটিশস্বার্থ কায়েম করিতে না পারিলে ভারতের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না; ইহাই হইল ব্রিটিশ কূটনীতিকুশল রাষ্ট্রনেতাদের মত। ইহারই ফলে দুইটা আফগন্ যুদ্ধ হইয়া যায়, সেগুলির মোটা ব্যয় ভারতকেই বহন করিতে হয়; কারণ যুদ্ধটা ভারতের নিরাপত্তার জন্যই করিতে হইয়াছিল।

য়ুরোপেও রুশ আতঙ্ক হইতে ক্রিমিয়ান যুদ্ধের উদ্ভব হইয়াছিল। রুশের দৃষ্টি ভূমধ্য সাগরের উপর,—য়ুরোপের 'পীড়িত মানুষ' তুর্কীর নিকট হইতে কনস্টান্টিনোপলের সম্মুখের সমুদ্রপথ অধিকার করিতে পারিলে তাহার যাতায়াতের পথ সুগম হয়। কিন্তু ইহা ইংরেজ ও ফরাসী-স্বার্থের বিরোধী; তাহারা চায় না যে ভূমধ্যসাগরে রুশীয়রা প্রবল হয়। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজ ও ফরাসীরা তুর্কীর পক্ষ লইয়া রুশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল— উহার আপাতকারণ যাহাই থাকুক। এই ক্রিমিয়ান যুদ্ধে রুশের তুর্কী জয় বা ভূমধ্য সাগরে প্রভুত্ব স্থাপনের আশা ব্যর্থ হয়। দার্দেনলিস প্রণালী রুশের হস্তগত না হওয়ায় ফরাসীরা সিরিয়া ও মিশরের এবং ব্রিটিশরা ভারতের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সাময়িকভাবে কিয়দ্‌পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

ইহার কয়েক বৎসর পরে বলকান উপদ্বীপে তুর্কীসাম্রাজ্য অন্তর্গত স্লাভজাতি-উপজাতিদের উপর অছিত্ব বা স্বাভাবিক অভিভাবকত্ব দাবি করিলেন রুশের সম্রাট; কিন্তু তাঁহার সে বাসনা য়ুরোপীয় রাজনীতিকদের কূটনীতির চালে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। বার্লিনের সন্ধিবৈঠকের (১৮৭৮) পর রুশ দেখিল বল্‌কান উপদ্বীপে বা মধ্য য়ুরোপে কোথাও তাহার প্রভাব বিস্তারের আশা নাই। তখন হইতে তাহার মন গেল মধ্যএশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে। মধ্য এশিয়ার অনগ্রসর অর্ধযাযাবর মুসলমান উপজাতিদের মধ্যে রুশের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তারিত হইতে দেখিয়া ইংরেজ তাহার ভারত-সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আবার আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। এই রুশভীতি হইতে কাবুলের আমীরের সহিত ইংরেজের মনোমালিন্যের উদ্ভব এবং উহারই প্রতিক্রিয়ায় লর্ড লীটনের সময়ে তৃতীয় আফগন্ যুদ্ধ হইয়াছিল। এই সময় হইতে ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞরা ভারতের সীমান্ত ক্রমান্বয়ে বাড়াইয়া বাড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করেন; ইহাকে বলে

ফরওয়ার্ড পলিসি। ইহার উদ্দেশ্য সাম্রাজ্য সীমান্তের বাহিরে কতকগুলি 'বশংবদ' স্যাটিলাইট স্টেট্ (বা উপগ্রহরাজ্য) গড়িয়া তোলা। আজিকার রাজনীতির মধ্যেও এই দ্বন্দ্ব চলিতেছে—কে কতদূর আপনার প্রভাব বিস্তারিত করিতে পারিবে।

ব্রিটিশের এই অগ্রসরনীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় পত্রিকাগুলি তীব্র নিন্দা করিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তরক্ষার অজুহাতে ভারতীয় রাজকোষ হইতে প্রথমে কয়েক লক্ষ টাকা ও পরে সীমান্ত সুদৃঢ় করিবার জন্য কয়েক কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়া গেল; ইহার উপর দুর্গাদিতে সৈন্য মোতায়ানে যে ব্যয় হইতে থাকিল তাহা তো বার্ষিক মিলিটারি বাজেটের অন্তর্গত বিষয়। ভারতীয়দের মতে ভারতের প্রজার প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে ভারতের বাহিরে অনুষ্ঠিত যুদ্ধাদির ব্যয়ভার চাপানো অন্যায়। তীব্র প্রতিবাদ চলিল সাময়িক পত্রিকাদিতে। উৎকট বাদশাহবাদী লীটনের পক্ষে ভারতীয় পত্রিকাওয়ালাদের এই মুখরতা অসহ্য। ১৮৩৫ সালে দেশীয় ভাষার মুদ্রণ ব্যাপারে স্বাধীনতালাভের পর হইতে দেশীয় পত্রিকাগুলি ভারতসরকারের কার্যকলাপ, ইংরেজ কর্মচারী ও নীলকরদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করিয়া আসিতেছে; কঠিন কথা, অতিরঞ্জিত ভাষাও যে তাহারা ব্যবহার করিতেন না তাহা বলা যায় না। এই অবস্থায় দেশীয় পত্রিকাওয়ালাদের ধৃষ্ট লেখনীকে সংযত করিবার জন্য বড়লাট লীটন ভার্নাক্যুলার প্রেস অ্যাক্ট কাউন্সিলে পাশ করাইয়া লইলেন (২৪ মার্চ, ১৮৭৮)। এই আইনের বলে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাদিতে ভারতসরকার-বিরোধী মন্তব্যাদি মুদ্রিত হইলে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট্দের উপর মুদ্রাযন্ত্রের গচ্ছিত অর্থ বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা অর্পিত হইল; এই আইনের একটি ধারানুসারে প্রেসের পক্ষ হইতে সরকারের নিকট অর্থ গচ্ছিত রাখা আবশ্যিক করা হয়।

তখনকার ব্যবস্থাপক সভায় এই ধরণের আইন পাশ করা সরকারের পক্ষে সহজই ছিল; কারণ, ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অনুসারে গঠিত ব্যবস্থাপক সভায় সকল সদস্যই সরকার কর্তৃক মনোনীত অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ—ভারতবাসী যে কয়জন সদস্য থাকিতেন তাঁহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। জনমত দ্বারা নির্বাচিত সদস্য প্রেরণ-প্রথা তখনো চালু হয় নাই; সেটি হয় আশী বৎসর পরে ১৯২১ অব্দে।

প্রেস একৃট বিলাতে সেক্রেটারী অব্ স্টেট ক্রানব্রুকের[১] নিকট প্রেরিত হইলে তিনি সহজেই তাহাতে সম্মতি দিলেন। কিন্তু ইংলন্ডে এমন লোক ছিলেন যাহারা এই নীতি সমর্থন করিতে পারেন নাই; স্যর আরস্কিন পেরী দীর্ঘ মন্তব্য করিয়া লিখিলেন, "এই আইন কেবল ভারতবাসীদের অসন্তোষজনক নহে, আমরা রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যে উদারনীতি অবলম্বন করিয়াছি তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যেরূপ অনভিজ্ঞ, তাহাতে ভারতবর্ষীয় স্বাধীন সংবাদ হইতে অনেক বিষয় জ্ঞান লাভ করিতে পারি।" স্যর উইলিয়ম ম্যুর লিখিলেন, "১৮৫৭ সালের ন্যায় ঘোরতর বিপদের সময় কিছুকালের জন্য এইরূপ আইন জারি-করা যুক্তিসংগত হইতে পারে; কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজ করিতেছে।" তিনি স্বেচ্ছাচারী ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দানের বিরোধী। তা ছাড়া তিনি বলিলেন, উপস্থিত আইন ইংরেজি সংবাদপত্র সমুদয়কে বাদ দিয়া কেবল দেশীয় কাগজগুলিকেই নিগডবদ্ধ করিয়া ব্রিটিশ সরকার পক্ষপাতদোষে দূষিত হইতেছেন। কর্নেল ইয়ুল, বাকিংহাম, হবহাউসও এক একদিক হইতে এই আইনের দোষগুলি একে একে দেখাইয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু লীটনের সকল কর্মের সমর্থক ভারতসচিব আইন অনুমোদন করিলেন। এই আইন পাশ করিয়া ইংরেজ ভাবিয়াছিল ভারতের তীব্র মনোভাব শমিত হইবে—কিন্তু ফল হইল বিপরীত। দেশীয় সংবাদপত্র সমূহ বিদ্রোহ প্রচার করিত না; তাহারা যে-সকল বিষয় লইয়া কঠোরভাবে আলোচনা করিত সেগুলি হইতেছে এই: য়ুরোপীয় বা শ্বেতাঙ্গদের সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহার, একই অপরাধে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় অপরাধীদের দণ্ডের প্রভেদ,—ভারতীয়দের প্রতি য়ুরোপীয়দের ঔদ্ধত্য ও অসদ্‌ব্যবহার,—ইংরেজ পত্রিকাওয়ালাদের ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রচার,—দেশীয় রাজদরবারে ইংরেজ রেসিডেণ্টদের অনিষ্টজনক অসৎ আচরণ। এই যুক্তিগুলি লেখেন হব্ হাউস সাহেব তাঁহার মন্তব্যে।

১ Cranbrook, Gathorne Hardy 1st. Earl (1814-1906). He was one of the leading figures in the Disraeli government of 1874, being Secretary of war (1874-78) and Secretary for India (1878-80). In the India office he was a strong supporter of N. W. F policy of Lytton···

এই আইন পাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকখানি বাংলা কাগজের সম্পাদক সরকারের ব্যবহারের প্রতিবাদে পত্রিকার কাজ বন্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিশিরকুমার ঘোষের বাংলা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' নাটকীয়ভাবে যথাসময়ে ইংরেজি কলেবরে প্রকাশিত হইল। এই পত্রিকার কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ১৮৬৮ অব্দে যশোহরের এক ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে উহা প্রকাশিত হইত; ইংরেজ কুঠিয়াল ও ইংরেজশাসকদের কু-কীর্তি সমূহ ইহাতে মুদ্রিত হইত। সরকার বহুবার শিশিরকুমার ও তাঁহার পত্রিকাকে আইনের জালে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সফল হন নাই; তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, নূতন আইন পাশ হইলেই 'অমৃতবাজার পত্রিকা'কে আইনের ফাঁসে টানিতে পারিবেন। কিন্তু ১৮৭৮ সালের ১৪ই মার্চ আইন পাশ হইলে লোকে অবাক হইয়া দেখিল অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরেজি কলেবরেও বাহির হইয়াছে। বোধ হয় ব্রিটিশ সরকার ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বাংলার জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। আইন পাশ হইলে লীটন ভাবিয়াছিলেন যে, বিদ্বেষ ও অসন্তোষ প্রচার বন্ধ হইবে—তাহা ব্যর্থ হইল; যাহা ছিল স্থানিক, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে তাহা ব্যাপ্ত হইল নিখিল ভারত মধ্যে। এই ঘটনার পর শাসক ও শাসিতের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধান বাড়িয়া চলিল। লীটনের এই হঠকারিতা ও রাজনীতিজ্ঞ-অনুচিত কার্য জাতীয় আন্দোলনকে অগ্রসর হইতেই সহায়তা করিল।

লীটনের আর-একটি কার্য তাঁহাকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার সময়ে অতি-কুখ্যাত অস্ত্র-আইন পাশ হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারতীয় সৈন্যগণকে গোলন্দাজী ও অন্যান্য বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্য হইতে অপসারিত করা হয়; কতকগুলি জাতিকে যুদ্ধ-অপটু শান্তিপ্রিয় আখ্যা দিয়া সৈন্য বিভাগ হইতে ছাঁটাই করা হয়। বাঙালি ও মহারাষ্ট্রীয়রা সৈন্য বিভাগ হইতে একেবারেই বাদ পড়িয়া যায়। সিপাহী-বিদ্রোহের পর যুদ্ধপ্রিয় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত জাতিসমূহকে নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। লীটনের অস্ত্র-আইনের ফলে ভারতবাসীর পক্ষে বন্দুক তরবারি প্রভৃতি আত্মরক্ষার সম্বল গৃহে রাখা দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু য়ুরোপীয় বা য়ুরেশিয়ান ফিরিঙ্গীরা এই আইনের আওতায় আসিল না। ইহাও ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিদ্বেষ ও বৈরীভাব প্রসারের অন্যতম কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের অভাব-অভিযোগের আলোচনা ও আন্দোলন যে কেবল এ দেশের শিক্ষিত সমাজই করিতেছে তাহা নহে ; ব্রিটিশদের সহিত ভারতের প্রথম যুগের সম্বন্ধের সময় হইতে ভারতের স্বাধীনতা-অর্জন-পর্ব পর্যন্ত—বরাবরই একাধিক সহৃদয় ইংরেজকে ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল দেখা গিয়াছে। ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের অবিচারের বিরুদ্ধে, ও ভারতীয়দের ন্যায়-সংগত অধিকার দাবির সপক্ষে তাঁহারা সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। কোম্পানির আমলের আদিপর্বে এডমন্ড বার্ক ও কোম্পানি শাসনের অন্ত্যপর্বে হেন্‌রী সেণ্ট জর্জ টাকার-এর মতো লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। জন ব্রাইট চিরদিন ভারতের পক্ষে পার্লামেণ্টে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। এ ছাড়া আর-একজনের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়—অর্থনীতিবিদ্ হেন্‌রী ফসেট (১৮৩৩-১৮৮৪)।

১৮৬৫ অব্দে ভারতবন্ধু ফসেট ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারতের শাসনকার্যে ভারতীয়দের সংখ্যান্যূনতা এবং বিশেষ-ভাবে দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত লোকের সংখ্যাল্পতার কথা—তিনি সুযোগ পাইলেই পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিয়া সমালোচনা করিতেন।

কিন্তু পার্লামেণ্টে সদস্যদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান এত কম এবং জানিবার ঔৎসুক্যও এত ক্ষীণ যে, ফসেটের সকল যুক্তিজাল অরণ্যে রোদনতুল্য ব্যর্থ হইত। তিনি বলিতেন যে সিবিল সার্বিসের পরীক্ষা বিলাতের ও ভারতের প্রধান তিন মহানগরীতে একইকালে গৃহীত হওয়া উচিত। তিনি অর্থশাস্ত্রী ছিলেন বলিয়া বিদেশে পরীক্ষা গ্রহণ ব্যপদেশে ভারতীয় মুদ্রার রপ্তানী যে দেশের ক্ষতিকর তাহা বোধ হয় তিনি মানিতেন। ভারতের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করিবার জন্য ১৮৭১ অব্দে যে রাজকীয় তদন্ত বৈঠক (রয়েল কমিশন)বসে, ফসেট ছিলেন উহার সভাপতি। ফসেটের মন্তব্য ভারতীয়দের অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখিবার অনুকূলেই গিয়াছিল। বোধ হয় সেইজন্য ১৮৭৪ অব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নব নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি পরাভূত হইলেন। এই সংবাদে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তাহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য ফসেটকে সাড়ে সাত হাজার টাকা পাঠাইয়া দিয়া আগামী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন।

আমাদের আলোচ্যপর্বে ভারতের সার্বজনীন শিক্ষা এমন ব্যাপ্ত হয় নাই—অথবা জনমত প্রকাশের প্রতিষ্ঠানসমূহ এত শক্তিশালী ও সংহত হইয়া উঠে

নাই—যাহার দ্বারা বিলাতে ভারত-সচিবের, অথবা ভারতে বড়লাটের স্বৈরাচারকে সংযত করিতে পারে। ১৮৭৫ অব্দে তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড সেলিস্‌বেরির নির্দেশে ইংলন্ডের অতিথি তুর্কী-সুলতানের রাজকীয় ভোজের ব্যয় ভারতকেই বহন করিতে হয়। ফসেট এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। লর্ড সেলিস্‌বেরির এই কার্যকে ফসেট সাহেব 'মহৎ নীচতা' বলিয়া আখ্যাত করেন। এই সেলিস্‌বেরিই বলিয়াছিলেন যে, ভারতের দেহে সূচি (lancet) এমন সুনিপুণভাবে প্রবেশ করাইতে হইবে যে লোক যেন নিঃশব্দে ফ্যাকাশে (bled white) হইয়া যায়। এতবড় হৃদয়হীন কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন ভারত-সচিব সেলিস্‌বেরি।

এই সময়ে নবনির্মিত সুয়েজখালের মধ্য দিয়া য়ুরোপীয়রা আসা-যাওয়া শুরু করিয়াছে। এই পথের পাশে আফ্রিকার উপকূলবাসী ইথিওপিয়ানদের (আবিসিনিয়া) সহিত যে যুদ্ধ বাধে—তাহার ব্যয় বহন করিবার ভার পড়ে ভারতীয় রাজকোষের উপর। ফসেট এবারও এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। অবশেষে স্থির হইল ভারত অর্ধেক ও ব্রিটেন অর্ধেক সমর-ব্যয় বহন করিবে। কয়েক বৎসর পূর্বে মহারানী ভিক্টোরিয়ার পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা ভারত সফরে আসিয়াছিলেন ; সেই সময়ে তিনি ভারতের রাজাদিগকে কিছু কিছু উপঢৌকন দিয়াছিলেন ; এই উপঢৌকনের মূল্য ব্রিটিশ রাজকোষ হইতে প্রদত্ত না হইয়া ভারতের ধনভাণ্ডার হইতে গৃহীত হইল। প্রিন্স অব্ ওয়েলস ভারত-সাম্রাজ্য পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন, তাহারও ব্যয়ভার ভারত হইতে সম্পূর্ণভাবে আদায়ের কথা উঠে। ফসেট এই অদ্ভুত নীতির প্রতিবাদ করিলেও ফল বিশেষ হইল না,—ভারতবর্ষের তহবিল হইতে তিন লক্ষ টাকা রাজকুমারের সফর বাবদ দিতে হইল।

এই-সব 'মহৎ নীচত্বে'র ফলে ভারতের ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণীর মন যে ক্রমেই ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহা সে যুগের অদূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞেরা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা দেশের জনমতকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্যশাসন করিতে চাহিতেছিলেন ; এবং শিক্ষিত সমাজ তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে রাজদ্রোহতুল্য অপরাধজ্ঞানে ভার্নাকুল্যার-প্রেস-একৃট পাশ করিয়া দিলেন। সংবাদপত্র মারফত জনমত ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতাহরণ করিয়া রাজপুরুষেরা ভাবিলেন সমস্যার সমাধান

হইয়া গেল। ইহার ফল উল্টাই হইল—ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে দূরত্ব ও বিরোধ বাড়িয়া চলিল।

৪

বিবিধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কারণের সমবায়ে এবং ইংরেজি শিক্ষার গুণে পাশ্চাত্য-জগতের সহিত ভারতের অবস্থা তুলনা করিবার বিদ্যা ও শক্তি ভারতীয়রা অর্জন করিয়াছে; শিক্ষিত যুবকদের মনে স্বাধীনতালাভের স্পষ্ট ধারণা না জন্মিলেও ভারতের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে ভারতীয়দের অধিকতর অধিকার লাভ করার যে একান্ত প্রয়োজন, এ বিষয়ে তাহারা তীব্রভাবে আত্মচেতন হইয়া উঠিতেছে। এই মনোভাব প্রকাশের প্রথম প্রয়াস কলিকাতায় ১৮৭৬ অব্দে, ইন্‌ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে স্থাপিত ব্রিটিশ ইন্‌ডিয়ান এসোসিয়েশন কালে জমিদার ও অভিজাতদের সভা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সহিত তাহার যোগ বহুকাল ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত 'মধ্যবিত্ত' নামে একটি শ্রেণীর উদ্‌ভব হইয়াছে; ইহা হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বা মুসলমানদের শিয়া সুন্নি প্রভৃতি সম্প্রদায়গত ভেদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটি সত্তা; ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরোভাগে আসিল এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, তরুণ গবেষকদের ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনার একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে।

নব্যবঙ্গের এই নবশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার পক্ষে ব্রিটিশ ইন্‌ডিয়ান এসোসিয়েশন যথেষ্ট ছিল না। যুবক সুরেন্দ্রনাথ কিছুকাল পূর্বে সিবিল সার্বিস হইতে লাঞ্ছিত হইয়া দেশের কাজে মনঃসংযোগ করিয়াছেন; তিনি, রেভারেণ্ড্ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রাহ্মসমাজের আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন তেজস্বী যুবক এই নূতন সভা স্থাপন করিলেন। শ্যামাচরণ সরকার প্রথম সভাপতি; ইহার পরে হন রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম সম্পাদক আনন্দমোহন বসু। এই সভার কথা পুনরায় আসিবে।

ভারতের শাসনকার্য ব্রিটিশ সিবিলিয়ান বা সিবিল সার্বিসের লোকের দ্বারা পরিচালিত হইবে, দেশীয়দের স্থান সেখানে থাকিবে না ইহাই ছিল আদিযুগের কর্মচারী নির্বাচন ও নিয়োগনীতি। গবর্নর-জেনারেল ওয়েলেসলির সময়ে কলিকাতায় ফোর্ট-উইলিয়ম-কলেজ স্থাপিত হয় তরুণ ব্রিটিশ সিবিলিয়ানদের ভারতীয় ভাষা ও আইন-কানুনাদি শিক্ষাদানের জন্য। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পরে ১৮৫৩ অব্দে ইষ্ট-ইন্‌ডিয়া-কোম্পানি যখন শেষবারের মতো পার্লামেণ্টের নিকট সনদ (চার্টার) পাইল তখন স্থির হয় যে, অতঃপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সিবিল সার্বিস নির্বাচিত হইবে ; এবং আরও স্থির হয় যে, ভারতীয় ছাত্রদিগকে অধ্যয়নাদি ও শিক্ষানবিশী করিবার জন্য বিলাতে দুই বৎসর কাল থাকিতে হইবে। ইহার পর দশ বৎসর পরীক্ষার বয়স ও শিক্ষাকালের অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল ; ফলে যোলো জন ভারতীয় পরীক্ষার্থীর মধ্যে একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৩ অব্দে কৃতকার্য হইয়া সিবিল সার্বিস পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আসিলেন মনোমোহন ঘোষ। ভারতীয়দের পক্ষে বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টারি পাশ করা কেন আবশ্যিক তাহার কারণ সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন, ইহার সহিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপার ছিল জড়িত।

ইষ্ট-ইন্‌ডিয়া-কোম্পানির শাসনকালে সুপ্রীমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ; এই কোর্টে ইংরেজি আইন প্রচলিত থাকায় নিয়ম ছিল, বিলাতের পাশকরা ব্যারিস্টার ছাড়া অন্য কেহ অর্থাৎ দেশীয় উকিলরা 'ওরিজিনাল সাইডে' অর্থাৎ মূল মামলায় নামিতে পারিবেন না। ইহার ফলে বয়স্ক আইনজ্ঞ বাঙালি উকিলদিগকে সর্বদাই সাহেব ব্যারিস্টারদের সম্মুখে তটস্থ হইয়া থাকিতে হইত। সেইজন্যে ভারতীয়রা বিলাতে গিয়া ব্যারিস্টার হইয়া আসিতেন।

প্রথম আই. সি. এস্. ও প্রথম বাঙালি ব্যারিস্টারের প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে আরও তিনজন বাঙালি যুবক সিবিল সার্বিসের জন্য বিলাত যাত্রা করেন (১৮৬৩) ; তাঁহাদের নাম উত্তরকালে বাংলাদেশে তথা ভারতে সুপরিচিত হয় ; ইহারা হইতেছেন বিহারীলাল গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহারা তিনজনে বিলাত হইতে সসম্মানে সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় পাশ করিয়া দেশে ফিরিলেন। তাঁহাদিগকে বাংলাদেশের মধ্যে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া বাঙালি বুঝিল যে তাহাদের সন্তানেরা

মেধায় শক্তিতে ইংরেজের অপেক্ষা হীন নহে। কিন্তু অচিরকালের মধ্যে উচ্চপদে ভারতীয়দের সংখ্যা ও শক্তি ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। সিবিল সার্বিসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ চাকুরিতে ভারতীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে শাসনকার্যে তাহাদের শক্তি বাড়িবে এই আশঙ্কায় সিবিল সার্বিসে প্রবেশের বয়স হ্রাস করাইয়া উনিশ করা হইল। ভারতে ও বিলাতে যুগপৎ পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ বহুবার গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু ভারত সরকার তাহা কখনো কার্যকরী করেন নাই। উচ্চ রাজপদে ভারতীয়দের নিয়োগ সম্বন্ধে স্থানীয় ইংরেজ রাজপুরুষদেরই দ্বিধা। লর্ড লীটন বিলাতে সেক্রেটারি অব স্টেট ক্রানব্রুককে এক গোপন পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার তর্জমা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ভারতবাসীদের সিবিল সার্বিসে নিয়োগের দাবী পূরণ করা আদবে সম্ভব নয়। কাজেই, তাদের এ দাবী অস্বীকার করা বা তাদের প্রবঞ্চনা করা এ দুটির একটি পথ বাছিয়া লইতে হইবে। আমরা দ্বিতীয়টি বাছিয়াছি। বিলাতে ভারতীয়দের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা এবং প্রতিযোগীদের বয়স হ্রাস করা আইনকে অকেজো করারই কৌশলমাত্র। এ পত্রখানি গোপনীয়, সুতরাং এ কথা বলিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই যে, কি ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট, কি ভারত গবর্মেণ্ট কেহই এ অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিবেন না যে, আমরা মুখে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছি, কাজে তা ষোল আনাই ভঙ্গ করিতেছি।"[১]

লর্ড লীটনের এই গোপনপত্র সমসাময়িক ভারতীয়দের হস্তগত হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার কূটবুদ্ধির পরিচয় তাঁহারা নানাদিক হইতেই পাইতেছিলেন।

৫

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন যুবক সিবিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ কেরানীদের সামান্য ত্রুটির জন্য কার্য হইতে বরখাস্ত হইয়াছেন; চব্বিশ বৎসর বয়সের অনভিজ্ঞ মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সামান্য টেক্‌নিক্যাল ত্রুটির অপরাধে চাকুরি যাওয়াতে দেশমধ্যে বেশ ক্ষোভ দেখা দিয়াছিল। তার পর যখন ব্রিটিশ

১ যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত ২য় সং পৃ. ১৪১

সরকার সিবিল সার্বিসে বয়স কমাইয়া একুশ হইতে উনিশ বৎসর করিলেন, তখন শিক্ষিত সমাজ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল ভারতীয়রা যে সিবিল সার্বিসে প্রবেশ করে, তাহা ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী বুঝিয়া তাঁহারা বাধা সৃষ্টি করিতেছেন। এই নীতির প্রতিবাদের জন্য পূর্ববর্ণিত ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরূপে সুরেন্দ্রনাথ উত্তরভারত ও পঞ্জাবের প্রধান প্রধান নগরীতে গিয়া সিবিল সার্বিসের বয়স বৃদ্ধি ও একইকালে ভারতে ও বিলাতে পরীক্ষা গ্রহণের দাবি জানাইয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। সমগ্র ভারতকে কোনো একটি বিষয় লইয়া আন্দোলনের আহ্বান এই প্রথম। পর বৎসরে সুরেন্দ্রনাথ পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ ভারত সফর করেন এই উদ্দেশ্যেই। তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলন কি লইয়া হইত তাহা ভাবিলে বর্তমানে অনেকের আশ্চর্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহাই স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদিপর্ব ও নিখিল ভারতকে একসূত্রে গাঁথিবার প্রথম প্রয়াস। উত্তর কালে যে সুরেন্দ্রনাথ বাংলাদেশ তথা ভারতের একছত্র নেতা ও রাজনৈতিক গুরুরূপে দেশপূজ্য হইয়াছিলেন, এই সামান্য বিষয়ের আন্দোলন দিয়াই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত।

সে যুগে বাঙালি যুবমনে বৈপ্লবিক ভাবনা উদ্‌বুদ্ধ করিতেছিল ইতালীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভাবদশা নেতা মাৎজিনী (Mazzini)—যেমন পূর্বকালে করিয়াছিল ফরাসী বিপ্লবের ভাবুকরা—যেমন বর্তমানে করিতেছে মার্কসীয় বাস্তববাদীরা।

সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধে উদীয়মান সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিক মাৎজিনীর জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৮৬৫-৭২)। মাৎজিনী ও ইতালীয়দের সদ্য স্বাধীনতালাভের ইতিহাস সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতারাজি ছাত্রসমাজকে যেভাবে উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে আধুনিক যুগের কম্যুনিস্ট বিপ্লব-ইতিহাস-আকৃষ্ট তরুণদের। তবে এখানে একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার যে, সুরেন্দ্রনাথ মাৎজিনীর কথা প্রচার করিয়াও বিপ্লব পথে যাইতে পারেন নাই, মধ্য-ভিক্টোরিয়ান যুগের সাংবিধানিক ডিমক্রেসি ছিল তাঁহার আদর্শ এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সেই পথ ত্যাগ করিতে পারেন নাই বলিয়া শেষ জীবনে রাজনীতিক্ষেত্রে মর্যাদা হারাইয়াছিলেন।

এ কথা ভারতের সাধকই প্রচার করিলেন। নিখিলমানবের বর্ণ ও ধর্মগত বৈষম্য স্বীকার করিয়া, মানবের জন্মগত সাম্যঅধিকারের দাবি অবহেলা করিয়া অধ্যাত্মজীবনের ধর্মসাধনা সার্থক হয় না—এই কথা ঘোষণা করেন কেশবচন্দ্র; এবং জাতিভেদ নির্মূল করিবার জন্য তিনিই প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। তিনি জানিতেন শ্রেণীহীন সমাজগঠন কখনই সম্ভব নহে, যতক্ষণ জাতিভেদহীন সমাজ না গঠিত হয়।

ভারতে স্বাধীনতালাভের পর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগঠনের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ নিরীশ্বরতাও নহে, পরধর্মবিদ্বেষও নহে। নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াও অপরের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবার শিক্ষা হইতেছে আধুনিক জগতের নাগরিকতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। আজ ভারতে জাতিভেদ দূরীকরণের জন্য যেমন চেষ্টা চলিতেছে, তেমনি ধর্মসমন্বয়ের আন্দোলন চলিতেছে যুগপৎ। গান্ধীজির সর্বধর্মীয় প্রার্থনা কেশবচন্দ্রের নববিধানের নূতন রূপায়ন মাত্র। আধুনিক বাংলার বহু কল্যাণকর্ম ও ভারতের সর্বধর্মসহিষ্ণুতার শিক্ষাদানের প্রবর্তক কেশবচন্দ্রকে যেন তাঁহার যোগ্য সম্মান আমরা দান করি।

কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া গেল কেন কেশবচন্দ্রের স্বপ্ন মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া সার্থক হইল না—তাহার প্রতিক্রিয়ায় মধ্যযুগীয় ধর্মীয়তা সর্বত্র প্রকট হইতেছে কেন—জাতীয় জীবনে এই পিছু-হটার কারণ কি— সে-সম্বন্ধে বিশ্লেষণ নিরর্থক হইবে না।

১৮৭৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতা মহানগরীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইল; পাঠকদের মনে স্বতই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে একটি সাম্প্রদায়িক দলগঠনের সহিত জাতীয় আন্দোলনের কী সম্পর্ক থাকিতে পারে যখন জাতীয় আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন। কিন্তু সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইল কেশবচন্দ্রের এক-কর্তৃত্বের প্রতিবাদে; এই নবীন ব্রাহ্মদের মূলগত অভিপ্রায় সাংবিধানিকভাবে ধর্মসমাজের কার্যনিয়ন্ত্রন; এইখানে আসিল ডিমক্রেসির কথা। ডিমক্রেসির সহিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সঙ্ঘ-আনুগত্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আমাদের আলোচ্যপর্বে বাংলাদেশের

শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি আকর্ষণের ভাব কমিয়া গিয়াছে, এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ডিমক্রেটিক ভাবধারা ও সাংবিধানিক আদর্শতা যুবমনকে আকৃষ্ট করিতেছে বেশি করিয়া, তাই দেখা যায়, সে যুগের অধিকাংশ কৃতবিদ বাঙালি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অথবা উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

কিন্তু এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদিত হয় যে, কী পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মসমাজের বিস্তার সম্ভব হইয়াছিল এবং কী কারণে সেই প্রভাব স্থায়ী ফলপ্রসূ হইল না। ব্যর্থতার কারণ জানিতে হইলে আলোচনাটা গোড়া হইতে হওয়া দরকার।

ব্রাহ্মসমাজের আদিযুগে বেদ অপৌরুষেয় অভ্রান্ত—এই মতবাদ ছিল প্রবল। কালে সে মতের কীভাবে পরিবর্তন ঘটে তাহার আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মানুভূতি ও প্রেরণা হইতে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ সংকলন ও সমাজ-নিয়ন্ত্রনের জন্য অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও সংহিতা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ধর্ম-জীবনের পক্ষে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ ও সমাজ-জীবনের পক্ষে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি কালে শ্রুতি ও স্মৃতির ন্যায় অভ্রান্ত শাস্ত্র স্থলাভিষিক্ত না হইলেও ইহাদের ব্যবস্থা মানিয়া চলা প্রথার মধ্যে আসিয়া যায়; আদি ব্রাহ্মসমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইহার দ্বারা এখনো নিয়ন্ত্রিত হন।

কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন; বিচ্ছেদের পর তিনি প্রায় বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন (১৮৬৫-৮৪)। কেশবচন্দ্রও শেষকালে বিশ্বধর্ম সংস্থাপন মানসে নববিধান ও নবসংহিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সর্বমানবের জন্য এক ধর্মসংস্থাপনের স্বপ্ন দেখেন এবং কালে আপনাকে অভ্রান্ত ও প্রত্যাদিষ্ট (Personality cult) বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করেন। স্তাবকদলের ভক্তি-আতিশয্যে কেশবের জীবনে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাহারই প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব (১৮৭৮)।

নবীন ব্রাহ্মযুবকদল কেশবচন্দ্রের জ্ঞানময় জীবনের যুক্তিবাদ, তাঁহার ভক্তিময় জীবনের রসালুতা, তাঁহার কর্মময় জীবনের মানবতা—সমস্ত গ্রহণ করিয়াও ধর্মরাজ্যে ব্যক্তিবিশেষের আধিপত্য মানিতে পারিলেন না। ধর্মরাজ্যে যে বিদ্রোহ দেখা দিল, তাহার অনুরূপ প্রতিচ্ছবি পড়িল সমাজজীবনে—সেখানেও নবীনদল বিপ্লবী। ধর্মরাজ্যে ও সমাজজীবনে যে স্বৈরাচার অসহ্য রাজনৈতিক জীবনেও তাহা তেমনি দুর্বিষহ—এ কথা সেদিনকার ব্রাহ্ম ও

ব্রাহ্মভাবাপন্ন যুবকদের মনকে দোলায়িত করে। সত্যের সহিত মিথ্যার, ধর্মের সহিত অধর্মের আপোষ করা অধ্যাত্মজীবনের পক্ষে ক্ষতিকর—তাঁহাদের মতে জীবন অখণ্ড—আদর্শ ও বাস্তব মিলিলেই জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ ও সার্থকতা। তাই রাজনীতির মধ্যে যে অসত্য, তাহাকেও শোধন করা তাঁহাদের জীবন দর্শনেরই অঙ্গ হইল।

ইন্‌ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোক্তাদের অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্ম—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম—যাঁহারা সকলপ্রকার 'অথোরিটি'কে অস্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহারাই আজ রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে আসিলেন। ধর্মজীবনে গুরুর বা অভ্রান্ত শাস্ত্রের স্থান নাই,—সমাজজীবনে স্মৃতির ভ্রূকুটি নাই,—ভক্তিবাদ, বিবেকবাণী, সহজবুদ্ধি, বিজ্ঞানীদৃষ্টি তাঁহাদের নিয়ন্তা। যুক্তিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইতেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উগ্রতা ও এমন-কি নাস্তিকতার জন্ম। ইহারই ফলে ব্রাহ্মসমাজজীবনে সঙ্ঘশক্তির অবনতির সূত্রপাত। ইহার উপর যুগধর্মের অনিবার্য প্রভাবে সর্বত্রই যে ধর্মহীনতা দেখা দিয়াছে, তাহার প্রভাব ব্রাহ্মসমাজের উপর প্রচণ্ডভাবে পড়িয়াছে।

যুক্তিবাদের সহিত ব্রাহ্মসমাজের একশ্রেণীর লোকের জীবনে ভক্তিবাদের প্রবলতা দেখা দিয়াছিল। এই ভক্তিবাদের অতিচর্চা হইতে কালে একদল খ্রীষ্ট উপাসক ও একদল বৈষ্ণব সাধক শ্রেণীভুক্ত হইলেন—জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যাওয়াতেই এইটি সংঘটিত হয়।

সমাজের শ্রেয় বা কল্যাণকর্মে ব্রাহ্মসমাজ আরম্ভ হইতে মনোযোগী হইয়াছিল। তাঁহারাই শ্রমিক আন্দোলনের পথিকৃৎ ; আসামের চুক্তিবদ্ধ কুলিদের কাহিনী তাঁহারাই সর্বপ্রথম সাধারণে প্রকাশ করেন ; নির্যাতিত ও পতিতা নারী -উদ্ধার প্রভৃতি কার্যে তাঁহারা ছিলেন অগ্রণী ; দুর্ভিক্ষ মহামারীতে তাঁহারাই ছিলেন সেবক ও কর্মী। কিন্তু কালে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বার্থ হইল প্রবল—সমস্ত জনকল্যাণকর কর্ম শিথিল হইয়া আসিল এবং যুগপৎ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নব-হিন্দুত্বের আবির্ভাব হইল স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে। বিবেকানন্দ ব্রাহ্মসমাজের ও খ্রীষ্টান মিশনারীদের জনসেবার আদর্শ গ্রহণ করিয়া 'রামকৃষ্ণমিশন' স্থাপন করিলেন। এখানে শাস্ত্রের অথোরিটি, গুরুর বাণী প্রভৃতি ভক্তদের পথের সম্বল হইল ; যুক্তি নহে, তর্ক নহে, সাংবিধানিক ডিমক্রেসি নহে—বেদ, কোরান, বাইবেল গ্রন্থসাহেবের ন্যায় 'কথামৃতে'-র

ও স্বামীজির রচনার অথোরিটি মানিয়া সঙ্ঘনির্দেশে কার্য করায় তাহারা সার্থক-জীবনলাভ মনে করে।

বিংশ শতকের প্রারম্ভ ভাগে বাংলাদেশে যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের জন্ম হয়, তাহার মধ্যে বহু ব্রাহ্ম যুবককে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আস্থা হ্রাস পায়, অনেকেই স্বামীজি-প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশনে' প্রবেশ করেন। বিপ্লবীদের ধর্মজীবনে এ পরিবর্তন কেন ঘটে তাহা আমাদের আলোচনার বিষয়-বহির্ভূত। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব একদিন শিক্ষিত সমাজকে কী প্রবলভাবে আলোড়িত করিয়াছিল তাহা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনাকালে বিস্মৃত হওয়া যায় না, তাহাই আমাদের প্রতিপাদ্য।

১৮৮০ অব্দে ইংলন্ডে রাজনৈতিক রক্ষণশীল বা কনজারভেটিভ দলের পরাজয় হইলে লর্ড লীটন কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন; কারণ তিনি ছিলেন ডিসরেলীর গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী রক্ষণশীল দলভুক্ত। ১৮৮০ সালের এপ্রিল মাসে গ্লাডস্টোন প্রধান মন্ত্রী হইয়া লর্ড রীপনকে ভারতের বড়লাট করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। রীপন উদারনীতিক মতবাদ বিশ্বাস করিতেন; মানুষকে দায়িত্ব দান করিতে তিনি ভয় পাইতেন না। ভারতে আসিয়া তাঁহার প্রথম কাজ হইল আফগানিস্থানের আমীরের সহিত সন্ধি স্থাপন ও সখ্যতা বন্ধন। রীপন আমীরের সহিত যে-সখ্যতা স্থাপন করিলেন, তাহা প্রায় চল্লিশ বৎসর অক্ষুন্ন ছিল—এমন-কি বিংশশতকে প্রথম মহাযুদ্ধের ঘোর দুর্দিনেও ব্রিটিশ-আফগন মৈত্রী-বন্ধন ক্ষুন্ন হয় নাই।

রীপন আর-একটি রাজনৈতিক কর্মের জন্য জনপ্রিয় হইলেন। সেটি হইতেছে মহীশূর রাজ্যে রাজবংশের পুনর্বাসন। টিপু স্থলতানের মৃত্যুর পর মহীশূর রাজ্য প্রাচীন হিন্দুরাজবংশীয়রা ফিরিয়া পাইয়াছিল; কিন্তু ১৮৩১ সালে কুশাসনের জন্য ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হইয়া রাজ্যের শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করেন এবং সেই হইতে ঐ রাজ্য ব্রিটিশ খাসশাসনেই ছিল। ১৮৮১ সালে রীপন মহীশূরের প্রাচীন রাজ্য হিন্দু রাজাকে প্রত্যর্পন করায় দেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল।

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত করিয়া লীটন্ যে আইন পাশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহৃত হইল। ইহাতে দেশের লোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া

বাঁচিল, কারণ কখন কি লিখিলে যে শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্যত খড়্গ সম্পাদক বা মুদ্রাকরের উপর পড়িবে, তাহার স্থিরতা ছিল না। মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইলে সরকারের পক্ষেও ভারতীয় স্বাধীন জনমত জানিবার সুবিধা ও শাসন-সংক্রান্ত কার্যনির্বাহন সহজ হইল। এই সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় রীপন ঘোষণা করিলেন যে, জাতীয় স্বরাজ্য পাইবার পূর্বে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন (Local self-government) প্রথম প্রয়োজন। রীপন-পরিকল্পিত স্বরাজ্যের প্রথম সোপান হইল জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। তবে সত্যকথা বলিতে কি গ্লাডস্টোন আইরিশদের হোমরুল দিবার জন্য যেরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেন, ভারতকে কোনোরূপ স্বাধীনতা দান করিবার জন্য তাঁহার তেমন উদারনৈতিকতা দেখা যায় নাই। তৎসত্ত্বেও রীপন যাহা করিয়াছিলেন বা করিবার চেষ্টান্বিত হন, তাহাতেই ভারতীয়রা তাঁহার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলেজের নাম দেন রীপন কলেজ।

শিক্ষা বিষয়েও রীপনের দৃষ্টি যায়; যাহাকে আমরা জনশিক্ষা বলি সে সম্বন্ধে ব্রিটিশযুগে তেমন দৃষ্টি যায় নাই; বাংলাদেশে ও অন্যত্র ধনীদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় শহরে ও গ্রামে স্কুল কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজি শিক্ষার অর্থকরী মূল্য সম্বন্ধে সকলেই এখন সচেতন বলিয়া সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা-নিরপেক্ষ এই-সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। কিন্তু আমরা যাহাকে জনসাধারণ বলি তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার লাভ করে নাই। পুরাতন আমলের গ্রাম্য পাঠশালা কোনো রকমে টিঁকিয়াছিল; তাহাদের আশাহীন জীবনে কিঞ্চিৎ সাহায্যাদি দানের প্রথম চেষ্টা এই সময় হইতে আরম্ভ হয়।

(কিন্তু যে ঘটনা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস ও রীপনের ভাইসরয়ী শাসনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত সেটি হইতেছে ইলবার্ট-বিল আন্দোলন। ব্রিটিশ শাসনযুগের একটা পর্বে শ্বেতাঙ্গ য়ুরোপীয় ও কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয় অপরাধীর বিচারাদি ব্যাপারে ভেদ রক্ষিত হইত। কোনো দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট এমন-কি বিলাত-ফেরত সিবিল সার্বিসের উচ্চ পদস্থ ভারতীয়ের পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর বিচার করিবার অধিকার ছিল না। বিহারীলাল গুপ্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত দ্বিতীয় দলের সিবিল সার্বিসে উত্তীর্ণ হইয়া বাংলা দেশে যথাক্রমে জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের পদপ্রাপ্ত হন। বিহারীলাল তখন হাওড়ার

জেলা জজ; রমেশচন্দ্র দত্তের উপদেশে তিনি বঙ্গের ছোটলাটের নিকট বিচারালয়ে এই বর্ণ বৈষম্য—ডিমক্রেসির পরিপন্থী বলিয়া এক মন্তব্যলিপি প্রেরণ করেন (১৮৮২)। দেশমধ্যে তখন নানাভাবে স্বাদেশিকভাব প্রচারিত হইতেছে; প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি এই বৎসরেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয়। যাহা হউক পরবৎসর বিষয়টি প্রাদেশিক সরকার হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হইলে আইন সদস্য মিঃ ইলবার্ট একটি বিল ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিলেন। বিলের মর্ম এই যে, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যে বিচারালয়ে কোনো ভেদ থাকিবে না, ভারতীয় বিচারকগণ শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর বিচার ও দণ্ডাদির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। কথাটা অবশ্য একেবারে নূতন নহে, মেকলে ১৮৩৩ অব্দে একত্র বিচারের কথা সুপারিশ করেন, বেথুনও প্রস্তাব করেন। ইলবার্ট-রচিত বিলের কথা প্রকাশিত হইলে য়ুরোপীয়রা ঘোষণা করিল—দেশীয় কৃষ্ণাঙ্গ জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে শ্বেতাঙ্গের বিচার কখনই হইতে পারে না। সমগ্র ভারতে ইংরেজ এমন-কি ফিরিঙ্গীরা পর্যন্ত এই বিলের প্রতিরোধিতার জন্য সভা-সমিতি আরম্ভ করিল। য়ুরোপীয়রা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়া তুলিল—ভাবখানি এই যে, প্রয়োজন হইলে তাহারা বলপ্রয়োগ দ্বারা ইহা বন্ধ করিবে। ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাট রীপন ব্যতীত কোনো শ্বেতাঙ্গ সদস্য এই বিলের সমর্থন করিল না। ব্যবস্থাপক সভার বাহিরের শ্বেতাঙ্গরা আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং বিল পাশ হইলে তাহারা কি করিবে সে সম্বন্ধে বহুপ্রকার গুজব ছড়াইল; এমন-কি রীপনকে জোর করিয়া জাহাজে তুলিয়া এ দেশ হইতে বিদায় করিয়া দিবে এমন কথাও শোনা গিয়াছিল।

ভারতীয়রা অসংবদ্ধ— লেখনীচালন ছাড়া তাহারা আর কোনোপ্রকার কার্যকরী কর্মের কথা ভাবিতে পারে না; বিল যেভাবে পেশ হইয়াছিল এবং যেভাবে পাশ হইল (২৮ জানুয়ারি, ১৮৮৩) তাহাতে বিলের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া গেল।

এই আন্দোলনের সময়ে ভারতে শ্বেতাঙ্গ-গঠিত ভলান্টিয়ার বাহিনী একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। ভারতীয়দের চক্ষু খুলিয়া গেল; তাহারা দেখিল মুষ্টিমেয় ইংরেজ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কী শক্তিশালী হইতে পারে—আর তাহারা সংখ্যায় বিপুল হইয়াও কী অসহায়ভাবে দুর্বল। ইহার প্রতিকার

করিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজে নামিতে হইবে। ইলবার্ট-বিলের ব্যাপারে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষের ভাব খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি ব্যঙ্গরচনায় সমসাময়িক বাঙালির মনের কথাগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন। সমকালীন রাজনীতির ইহাই একমাত্র নিদর্শন।)

ভারতীয় ও ইংরেজের মধ্যে বৈরীভাব প্রধূমিত হইবার আর-একটি কারণ হইল সুরেন্দ্রনাথের জেল। হাইকোর্টের বিচারাধীন একটি মামলা সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার দৈনিক পত্রিকা 'বেঙ্গলি'তে সমালোচনা করেন; আইনের চক্ষে ইহা আদালতের অবমাননা। এই অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের দুই মাস জেল হইল (৫ মে—৪ জুলাই, ১৮৮৩)। বিচারের দিন হাইকোর্টের সম্মুখে সর্বপ্রথম ছাত্র ও পুলিশে দাঙ্গা হয়। জেল ভাঙিয়া সুরেন্দ্রনাথকে উদ্ধার করিবার উদ্‌ভট কল্পনাও এক শ্রেণীর লোকের মনে দেখা দিয়াছিল। গত কয়েক বৎসর সুরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি বড় শহরে রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইয়াছেন—সর্বত্রই তিনি সুপরিচিত; তাহার উপর তাঁহার সম্পাদিত বেঙ্গলি দৈনিক কাগজও সর্বত্র সমাদৃত; সেইজন্যই এই ঘটনা সমগ্র ভারতে আলোচিত হইতে লাগিল। সে-যুগে বাঙালির ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা ছিল 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'বেঙ্গলি'; ইংরেজের পরিচালিত কাগজ ছিল 'ইংলিশম্যান', 'স্টেটস্‌ম্যান' ও 'ইন্‌ডিয়ান ডেইলি নিউজ'।

সুরেন্দ্রনাথ যখন জেলে, সেই সময়ে বাংলাদেশের যুবকদের মনে দুইটি ভাবনা স্পষ্ট হয়; একটি, প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালন; অপরটি, আন্দোলন চালাইবার জন্য অর্থের তহবিল গঠন। তজ্জন্য একটি ন্যাশনল ফান্‌ড্ বা জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইল।

কন্‌গ্রেস

সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক সংস্কারকার্য করিবার জন্য ভারতের প্রধান প্রধান নগরে চেষ্টা দেখা দিয়াছিল সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বেই। (ব্রিটিশ ইন্‌ডিয়ান এসোসিয়েশন ১৮৫১ সালে স্থাপিত হয়; কালে ধনীদের প্রতিষ্ঠিত এই সভা হীনবল হইয়া পড়ে। প্রায় পঁচিশ বৎসর পর ১৮৭৬ অব্দে ইন্‌ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত-সভা কলিকাতায় স্থাপিত হয়। এই সভাই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক আলোচনা হইতে আন্দোলনে অবতীর্ণ হইল। কলিকাতার শিক্ষিত যুবকের দল ইন্‌ডিয়ান এসোসিয়েশনের মারফৎ এক সম্মেলন বা কনফারেন্স আহ্বান করাইলেন। আলবার্ট হলে তিন দিন এই সভার অধিবেশন হয়; এই সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ন্যাশনাল কনফারেন্সকে বলা যাইতে পারে কন্‌গ্রেসের অগ্রদূত। সভার অধিবেশনে এই প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল পার্লামেণ্ট বলিয়া উক্ত হয়। কিছুকাল হইতে ভারতের নানা প্রদেশের মধ্যে শিক্ষিত জনমত কেন্দ্রিত করিবার প্রয়াস দেখা দিতেছে। অ্যানি বেসাণ্ট্ বলেন যে, ১৮৮৪ অব্দে মদ্রাজে থিওজফিক্যাল সোসাইটির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে যে-সব প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজন ও মদ্রাজের স্থানীয় কয়েকটি ভদ্রলোক দেওয়ান বাহাদুর রাও-এর গৃহে সমবেত হইয়া একটি কনফারেন্স আহ্বান সম্পর্কে আলোচনা করেন। 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক সুব্রহ্মণ্য আয়ার, আনন্দ চার্লু, কলিকাতার নরেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সতেরো জন সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মনের মধ্যে এই অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা জাগিল যে, নিখিল ভারতের প্রতিনিধিদের লইয়া ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাদির আলোচনার প্রশস্ততর ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাই কন্‌গ্রেস স্থাপনের প্রত্যক্ষ কারণ না হইলেও পূর্বোক্ত ন্যাশনাল কনফারেন্সের ন্যায় দেশের সুধীগণের মনে মিলিত হইবার যে একটা ইচ্ছা জাগ্রত হইতেছে—ইহা তাহারই সূচক। ইতিহাসে দেখা যায় যে, কতকগুলি বিশেষ অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ঘটনার

ঘাত-প্রতিঘাতে বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টির অভিঘাতে যুগপৎ নানাদেশে একই প্রকারের ভাবনার জন্ম হয়। ভারতেও নানা প্রদেশে সেই কারণেই ভারতীয়দের মনে স্বাধীনতালাভের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা দেখা দিল।

প্রায় এই একই সময়ে সরকারী ও আধা-সরকারী মহলেও নিখিল-ভারতীয় প্রতিনিধিদের লইয়া একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িবার কথাবার্তা চলিতেছিল। মিঃ এ. ও. হিউম্ সিবিল সার্বিস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া (১৮৮৩) ভারতীয়দের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দেশের কল্যাণকর কর্মাদি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা করিতেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে ১৮৮৩ সালে ন্যাশনাল লীগ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়; পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সে-সময়ে ধনে-মানে কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠব্যক্তি—তিনি ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিলেন। এই লীগের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ: প্রথমত—ভারতের বিচিত্র জাতিকে একটি অখণ্ড জাতিতে সম্মিলিত করা; দ্বিতীয়ত—দেশের সামাজিক ধর্মীয় বিষয়ের উন্নতি সাধন; তৃতীয়ত—ভারতীয়দের ক্ষতিকর আইনের সংশোধন ও ব্রিটিশের সহিত সখ্যতা স্থাপন।

কয়েক বৎসর পরে কন্‌গ্রেসের গঠনকালে প্রায় এইরূপ পরিকল্পনাই হিউম সাহেব পেশ করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের দুর্দিনে হিউম্ উত্তর-পশ্চিম ভারতে জেলাশাসক ছিলেন; তাঁহার চরিত্রমাধুর্যে তাঁহার শাসিত দেশাংশ শান্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার মনে এই কথারই উদয় হইতে থাকে—এ ভাবে একটা দেশকে শাসন করা যায় না। ভারতীয়দের জন্য তাঁহার কী গভীর বেদনা ছিল, তাহা তাঁহার রচিত একটি ইংরেজি কবিতা হইতে জানা যায়; এই কবিতাটি 'স্বভাবকবি' গোবিন্দচন্দ্র দাস অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই কবিতাটির প্রত্যেকটি পংক্তিতে ভারতীয়দিগকে স্বকার্যসাধনে উদ্‌বোধিত করিবার জন্য লেখকের আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার কবিতার ধুয়া হইতেছে Nations by themselves are made—'সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার।' [১]

হিউম্ বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতীয় শাসনব্যাপারে ভারতীয়দের

১ যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত

অধিকতর দায়িত্বদান না করিতে পারিলে দেশের মধ্যে ধূমায়মান অসন্তোষ আবার একদিন বহ্নিরূপে জ্বলিয়া উঠিবে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় শিক্ষিত সমাজ সংগ্রাম হইতে দূরে ছিল, কিন্তু গত ত্রিংশ বৎসরের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের ফলে এবং সুয়েজখালের পথ সুগম হওয়ায় বহু ভারতীয়ের পক্ষে য়ুরোপ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হওয়ায় দেশের মধ্যে আত্মচেতনা নূতনভাবে দেখা দিয়াছিল। দেশের মধ্যে অসন্তোষ কী পরিমাণ পুঞ্জীভূত হইতেছিল—গবর্মেণ্টের পুলিশ-বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত দেশীয় পত্রিকাদির প্রায় ত্রিশ হাজার নমুনা তাহার সাক্ষ্য। হিউম্ পুলিশের এই সংগ্রহ দেখিয়া লিখিতেছেন যে, "all going to show that the poor men were pervaded with a sense of hopelessness of the existing state of affairs, that they were convinced they would starve and die, and that they wanted to do something meant violence…" ইংরেজের ভিতরে ভিতরে এই ধারণা প্রসার লাভ করে যে, এবার শিক্ষিতসমাজ জনসমাজের বিপ্লবে নেতৃত্ব করিবে। তাহাদের এই আশঙ্কা কালে সত্যে পরিণত হয়।

হিউম দেখিলেন, ভারতের এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় শিক্ষিতসমাজ ও ইংরেজ শাসকদের মধ্যে বুঝাপড়ার জন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। তাঁহার মনে হয়, যদি বৎসর বৎসর ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সমবেত হইয়া সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফল ফলিবে; প্রাদেশিক কেন্দ্রের সমিতিতে রাজনৈতিক আলোচনা চলিবে—এই ছিল হিউমের ইচ্ছা।

১৮৮৫ সালে হিউম তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করেন; ডাফরিন্ বলেন, বিলাতে যেমন একদল লোক মন্ত্রী হইয়া দেশ শাসন করেন, আর একদল প্রতিপক্ষরূপে (opposition) সরকারের কাজের ও মতবাদের সমালোচনা করিতে থাকেন—ভারতে সেরূপ কোনো প্রথার উদ্ভব হয় নাই। এ কথা অনস্বীকার্য যে, এ দেশের সংবাদপত্রে লোকমত প্রতিফলিত হইলেও তাহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। এ অবস্থায় ভারতীয় রাজনীতিকেরা যদি বৎসর বৎসর সমবেত হইয়া দেশের মঙ্গলামঙ্গল বিষয় লইয়া আলোচনা করেন, তবে শাসকশ্রেণীর বিশেষ উপকার হইবে।

কিন্তু সকল প্রদেশের রাজনীতিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মিলিত হইলে, তাহাদের শক্তি ও মনোভাব কী রূপ লইবে তাহা প্রথমে কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই। প্রথম তিন বৎসরের কন্‌গ্রেস, ব্রিটিশ সরকার ও লর্ড ডাফরিনের সুদৃষ্টিতে ছিল। তারপর ১৮৮৮ অব্দে চতুর্থ বৎসরে যেবার এলাহাবাদে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন, সেইবার অকস্মাৎ বড়লাট বাহাদুরের মত ও ব্যবহারের পরিবর্তন লক্ষিত হইল; কারণ কন্‌গ্রেসের শিক্ষিত পৃষ্ঠ-পোষকদের মধ্যে দেশের সমস্যা ও সমাধান-সম্বন্ধে মতামত স্পষ্টত ব্রিটিশ নীতিবিরোধী হইয়া উঠিতেছে—তাঁহাদের তথ্যাদিপূর্ণ ভাষণ ও রচনা পাঠ করিয়া রাজপুরুষরা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছেন, কারণ ইংরেজের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগাদির যথাযথ উত্তর দান করার মতো যুক্তি তাহাদের নাই।

২

১৮৮৫ অব্দে বড়দিনের ছুটির সময়ে পুণা নগরীতে ভারতের জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশনের কথা হয়; তথাকার সার্বজনিক সভা (স্থাপিত ১৮৭২) ইহার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু পুণায় কলেরা রোগ দেখা দিলে সভার অধিবেশন বোম্বাই নগরীতে স্থানান্তরিত করা হইল। 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশন' অল্প সময়ের মধ্যে সম্বর্ধনার যথোপযুক্ত আয়োজন করিলেন। বোম্বাই-এর নেতাদের মধ্যে তেলাংগ ও ওয়াচার নাম এই প্রথম অধিবেশনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এই সভার নাম হইল 'ইন্‌ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌গ্রেস'। 'কন্‌গ্রেস' শব্দটি বোধ হয় আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বিধান সভার নাম হইতে গৃহীত। বোম্বাই কন্‌গ্রেস অধিবেশনের সভাপতি হইলেন কলিকাতার ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি W. C. Bonerjee নামে অধিক সুপরিচিত। প্রথম অধিবেশনের সভ্যগণ নির্বাচিত হইয়া আসেন নাই, কারণ কাহারা নির্বাচন করিবে ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। পুণা ও বোম্বাই-এর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, যাঁহারা এই কন্‌গ্রেসের উদ্যোগী ছিলেন, তাঁহাদেরই আহ্বানে সদস্যরা নানা প্রদেশ হইতে উপস্থিত হন। বাংলাদেশ হইতে সভাপতি ব্যতীত 'ইন্‌ডিয়ান মিরার' পত্রিকার সম্পাদক

নরেন্দ্রনাথ সেন, 'নববিভাকর' পত্রিকার গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র আমন্ত্রিত হন। বাংলাদেশে যাঁহারা গত দশ বৎসর হইতে রাজনীতিক আন্দোলনের নেতারূপে সুপরিচিত তাঁহাদের মধ্য হইতে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, শিশিরকুমারকে আহ্বান করা হয় নাই। তাহার কারণ ছিল, পুণা-বোম্বাই-এর নেতারা বাংলার নেতাদের প্রগতিবাদী 'বামপন্থী' মনে করিতেন, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' য়ুরোপীয় মহলে রাজদ্রোহের প্ররোচক বলিয়া কুখ্যাত—সুরেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ আমলামহলের সিবিল সার্বিস হইতে বরখাস্ত রাজনৈতিক 'অ্যাজিটেটর'।

বোম্বাই-এর এই কন্‌গ্রেসে বাঙালিদের না দেখিয়া চব্বিশ বৎসরের যুবক কবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ—
শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
কই রে বাঙালি কই।"

১৮৮৫ সালের অধিবেশনে সদস্যগণ যে কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করেন, তাহাতে রাজভক্তি ও রাজানুগত্যের কথা প্রচুর থাকিলেও, ভারতের আর্থিক রাজনৈতিক বহু সমস্যা নিরাকরণার্থে প্রস্তাব বেশ স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছিল। ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতালাভের কথা সেদিনকার কন্‌গ্রেস-নায়কদের মনে জাগিয়া ছিল কি না, তাহা কোথাও স্পষ্টভাবে উক্ত হয় নাই সত্য; কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা বহুদিন হইতে বাঙালির বক্ষে অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতেছিল,— সাহিত্যে তাহার প্রমাণ প্রচুর। বাঙালি এক কবি গাহিয়াছিলেন—

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়।"—

সেই আদিযুগের কন্‌গ্রেসের যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা আজ ঐতিহাসিক ঔৎসুক্যমাত্র হইলেও মূল হইতে ফলের পার্থক্য কতটা তাহা জানা দরকার। কন্‌গ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল ১. ভারত সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যাঁহারা দেশের কার্য করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন। ২. পরিচয়ের ফলে জাতিগত, ধর্মগত ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার দূরীকরণ ও লর্ড রীপনের সময়ে

যে জাতীয় একতার সূত্রপাত হইয়াছে তাহার পুষ্টিসাধন। ৩. ভারতের উন্নতির পথের বাধাগুলিকে ন্যায্য ও বিধিসঙ্গত আন্দোলনের দ্বারা দূর করিয়া ভারত ও ইংলন্ডের মধ্যে সখ্যতা স্থাপন।

কন্‌গ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হইল কলিকাতায় (১৮৮৬)। সভাপতি দাদাভাই নৌরজী—বোম্বাই-এর পারসিক নেতা, অর্থনৈতিক পণ্ডিত। তৃতীয় সভা হইল মদ্রাজে। সভাপতি হইলেন বোম্বাই-এর ব্যারিস্টার বদরুদ্দিন তায়াবজী। এইবার মদ্রাজের জনতার মধ্যে বেশ সাড়া পড়িয়া যায়।

এই তিনটি অধিবেশনে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং যে-সব বক্তৃতা প্রদত্ত হয়, তাহার ভাব ও ভাষা হইতে ব্রিটিশ-ভারতীয় কর্তৃপক্ষীয়রা প্রীত হইতে পারিলেন না। ইহার ফলে ১৮৮৮ অব্দে এলাহাবাদে কন্‌গ্রেস আহূত হইলে সরকারপক্ষের কোনো সহানুভূতি ও সহায়তা আর পাওয়া গেল না। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (তখনকার নর্থ ওয়েস্টার্ণ প্রভিন্স বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) তৎকালীন ছোটলাট অক্‌ল্যাণ্ড কল্‌ভিন যুগপৎ কন্‌গ্রেস ও হিউমের বিরুদ্ধতা আরম্ভ করিলেন। হিউম তদুত্তরে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের কর্মদোষে ভারতবর্ষে যে ভীষণশক্তির মাথা নাড়া দিয়া উঠিবার উপক্রম হইতেছে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। কন্‌গ্রেস অপেক্ষা কোনো নিরাপদ প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করাও অসম্ভব।"

এই সময় হইতেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যের সূত্রপাত। স্যর সৈয়দ আহমদ্ সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব; এইখানে সংক্ষেপে বলিতেছি যে, এই প্রতিভাবান পুরুষ কন্‌গ্রেসের শুরু হইতেই বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন। তিনি মুসলমানের পৃথক সত্তা বজায়ের জন্য যৌথনির্বাচন পদ্ধতি, ভারতে ও বিলাতে যুগপৎ প্রতিযোগিতা-মূলক সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণরীতি প্রভৃতির ঘোর বিরোধী। তিনি মুসলমানদের কন্‌গ্রেস হইতে দূরে থাকিবার জন্য উপদেশ দিলেন। মোট কথা দ্বিজাতিক তত্ত্বের বীজ সেইদিনই ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে রোপিত হইয়াছিল।

লর্ড ডাফ্‌রিনও বলিলেন, "ভারতে হিন্দু ও মুসলমান স্বতন্ত্র জাতি।"

সৈয়দ আহমদ্‌ও বলেন, "Is it possible that under these circumstances two nations—the Muhaumedan and Hindu could sit on the same throne and remain equal in power ? Most certainly not."

এই বক্তৃতা প্রদত্ত হয় ১৮৮৭-৮৮ সালে, যখন কন্‌গ্রেস সর্বজাতির মিলনকেন্দ্র স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছে। লর্ড ডাফ্‌রিন তো অবজ্ঞাভরে বলিলেন, কন্‌গ্রেসের সদস্যসংখ্যা তো অনুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে হয় (microscopic minority)। গবর্মেণ্টের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে নিম্নতম কর্মচারী সকলেই কন্‌গ্রেসের উপর খড়্গহস্ত। এইভাবে দশ বৎসর কাটিয়া গেল।

৩

১৮৯৫ হইতে ভারতের রাজনৈতিক অন্দোলনের মধ্যে নূতন চেতনা দেখা দিল। রাজনীতি লইয়া আলোচনা ও আন্দোলন কলিকাতা, বোম্বাই, মদ্রাজ প্রভৃতি মহানগরীর মধ্যে আর সীমিত থাকিল না; মফস্বলেও রাজনৈতিক আন্দোলন প্রসার লাভ করিল। এই প্রসারের প্রধানতম কারণ, ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার। এই জ্ঞান ও বিদ্যার রঞ্জনরশ্মিতে ভারতের কঙ্কাল মূর্তি তাহাদের চক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রসারহেতু ভারতীয়দের আত্মমর্যাদাজ্ঞানও বাড়িতেছে; সেইজন্য ইংরেজ, ইংরেজ রাজপুরুষ ও সাধারণ বেনিয়া-ইংরেজের দুর্ব্যবহার ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।

কন্‌গ্রেস বড় বড় নগরীতে তিনদিনের জন্য সমবেত হয়; সেখানে ভারতীয়দের বিবিধ সমস্যার আলোচনা ও প্রস্তাব পাশ হয়; এইসব সভায় প্রাদেশিক বা স্থানীয় সমস্যার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্ন আলোচিত হওয়া সম্ভবপর হইত না। ইহা লক্ষ্য করিয়া বঙ্গদেশের নেতারা কেবল বাঙালি বা বঙ্গবাসীর জন্য একটি রাজনৈতিক সম্মেলন স্থাপন করেন,— ইহা 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি' নামে অভিহিত হয়। ১৮৮৮ সালে কলিকাতায় ইহার প্রথম অধিবেশন হয়; তারপর (১৮৯২ সাল ব্যতীত) ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় ইন্‌ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এই সভার কার্য চলে।

এই প্রাদেশিক সভা কন্‌গ্রেসেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ; সভার বক্তৃতা, প্রস্তাব, প্রতিবেদনাদি ইংরেজি ভাষায় চলিত। তখনো গণসংযোগের প্রশ্ন কাহারও মনে আসে নাই। এই সময়ে বাংলাদেশে অজ্ঞাত, বড়োদা কলেজের অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষ কন্‌গ্রেসের সমালোচনা করিয়া স্থানীয় কাগজ 'ইন্দুপ্রকাশে' বলিয়াছিলেন—"আমি বলি (I say) কন্‌গ্রেসের আদর্শ ভুল, নেতারা বিল্‌কুল নেতৃত্বের অযোগ্য।"

"কন্‌গ্রেস জাতীয় আখ্যা পাইতে পারে না। আংলো-ইন্‌ডিয়ানরা যে বলে, ইহাতে মুসলমান নাই বলিয়া জাতীয় নয়—সে কথা ঠিক নয়। কেননা, ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ মুসলমান প্রতিনিধি আছে এবং কন্‌গ্রেস মুসলমানদের অভাব-অভিযোগ ও দাবী সম্পর্কে অতিশয় বেশী সচেতন।"

"কন্‌গ্রেস জাতীয় নয় এই বলিয়া যে ইহাতে ভারতের জনসাধারণ বা তাহাদের প্রতিনিধি নাই···।"[১] এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে সেসময়ে জনতার চিত্ত জাগে নাই এবং নেতাদের মনও জনতার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। নেতারা দূর হইতে কল্পনা করিতেন যে, ভারতের মূঢ় জনতার মঙ্গলা-মঙ্গলের কথা তাঁহারাই বুঝেন এবং সেইজন্য তাঁহাদের নির্দেশেই তাহারা চালিত হইবে। এই ভাবনা দীর্ঘকাল কন্‌গ্রেসের মধ্যে ছিল। জমিদাররা বলিতেন যে, তাঁহারাই 'ন্যাচারেল লীডার' বা আসল মোড়ল; রাজনীতিকরা আন্দোলনকারী মাত্র।

১৮৯৪ সালের মদ্রাজ কন্‌গ্রেস অধিবেশনের পর বাংলাদেশের প্রতি-নিধিরা জলপথে ফিরিতেছিলেন—তখন সরাসরি রেলপথ কলিকাতা মদ্রাজের মধ্যে নির্মিত হয় নাই, তখন বঙ্গীয় 'প্রাদেশিক সমিতির' অধিবেশন পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় আহ্বান করিবার কথা তাঁহাদের মধ্যে উঠে। অতঃপর বহরমপুরের উকিল রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেনের উদ্যোগে বহরম-পুরে প্রথম অধিবেশন হইল। তখন হইতে (১৯০২ ব্যতীত) এই সভা বঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিশিষ্ট শহরে আহূত হইয়া আসিতেছে। পরে এই সমিতি প্রাদেশিক কন্‌গ্রেস নামে অভিহিত হয়।

[১] গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ ও স্বদেশী আন্দোলন পৃ. ৬৬-৬৭

৪

বাংলাদেশের অগ্রণীরা যেমন রাজনীতিকে দেশব্যাপী করিবার জন্য চেষ্টান্বিত, ভারতের দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যেও তেমনি রাজনীতিকে সমাজ ও ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া নূতন রূপদানের জন্য প্রয়াস চলিতেছে। এই আন্দোলনের নেতা বালগঙ্গাধর টিলক; তিনি মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে প্রচলিত 'গণপতি' পূজাকে 'সার্বজনিক পূজা'রূপে প্রবর্তন করিলেন; তাঁহার উদ্দেশ্য এই লৌকিক পূজাটিকে কেন্দ্র করিয়া সর্বশ্রেণীর মহারাষ্ট্রীয়দের সঙ্ঘীভূত করা। এই 'গণপতি' শব্দ দ্ব্যর্থবোধক—লৌকিক গণেশের মূর্তি পূজা ছাড়া ইহার অন্য অর্থ হইতেছে যিনি 'গণ'-এর 'পতি' বা 'ঈশ' অর্থাৎ জনগণবিধায়ক। টিলকের ব্যবস্থায় দশ দিন ধরিয়া জনগণের দেবতার সার্বজনিক উৎসব চলিল। এই কয়দিন মহারাষ্ট্র জাতির অতীত গৌরব স্মরণ, শিবাজীর কীর্তিকলাপের জয়-গান, স্বধর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে ভাষণদানাদির দ্বারা মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে হিন্দুসর্বস্ব জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার মহাসমারোহ চলে। ইহার কিছুকাল পূর্বে (১৮৯৩) পুণা-নগরীতে গো-বধ নিবারণী সভা স্থাপিত হয়; এই ঘটনাটি জাতীয়তাবাদের পথকে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সঙ্কটময় করিয়া তোলে। গো-রক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত। হিন্দুজাতীয়তার ইহাই প্রথম আত্মচেতনার বিকৃতরূপ। ইহার পর 'সার্বজনিক গণপতি পূজা' প্রবর্তিত হইলে মুসলমানদের মনে হিন্দুদের প্রতি তাহাদের স্বভাব-সন্দিগ্ধ মনোভাব আরও সংকীর্ণ হইয়া উঠিল। গো-মাতাকে লইয়া বোম্বাই ও বিহারে হিন্দু মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে যে-সব দাঙ্গা দেখা দিল তাহার প্রতি গবর্মেণ্টের তীব্র দৃষ্টি পড়িল। ইংরেজ বুঝিলেন, এই বিষয়টিকে 'জিয়াইয়া' রাখিতে পারিলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের বাধাকে চিরন্তন করিয়া রাখা যাইবে,—হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মান্ধতা ও ধর্মমূঢ়তা হইল ব্রিটিশ শাসনের চিরস্থায়িত্বের স্তম্ভ। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ গবর্মেণ্টের পলিসিসম্মত না হইতে পারে, কিন্তু গবর্মেণ্টের বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুৎকারে যে উহা অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া থাকে—এ বিশ্বাস দেশের অনেকেরই ছিল। স্যর ওয়েডারবর্ণ লিখিয়াছেন, "এই-সমস্ত উপদ্রবে গবর্মেণ্টের কিছু হাত আছে।" বড়লাট ল্যান্সডাউন বলেন, "এমন কথা যে বলে সে অত্যন্ত দুষ্ট।" আমরা ইহার একটা সামঞ্জস্য করিয়া লই।

রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক এক প্রবন্ধে লেখেন, "অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কন্‌গ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমানগণ ক্রমশঃ ঐক্য পথে অগ্রসর হয় এই জন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্প চূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।" ইহার ফলে "উভয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষানল আরো অধিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে; এবং যেখানে কোনোকালে বিরোধ ঘটে নাই সেখানেও কর্তৃপক্ষ আগেভাগে অমূলক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া এক পক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্য পক্ষের সাহস ও স্পর্ধা বাড়িতেছে এবং চির বিরোধের বীজ বপন করা হইতেছে।"[১]

ইহার পর পঞ্চাশ বৎসর চতুর ইংরেজ ধর্মমূঢ় হিন্দু ও ধর্মান্ধ মুসলমানকে আপনার উদ্দেশ্যসাধনের ক্রীড়নক করিয়া ভারত শাসন করিয়াছিল; এবং উভয়ের সর্বনাশ সাধন করিবার উদ্দেশ্যেই দুইটি রাজ্য গড়িয়া দিয়া ভারতের উপকূল ত্যাগ করিল।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সৃষ্টি ও ব্যাপ্তির জন্য মহারাষ্ট্রীয়দের গো-বধ-নিবারণী-সভা স্থাপন ও উগ্র হিন্দুত্ব-অভিমান হয় তো কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী। তারপর ধর্মবোধের সহিত অতীত গৌরব কাহিনীর সংযোগসাধন দ্বারা হিন্দুভারতের রাজনৈতিক আত্মচেতনা জাগরূক করিবার উদ্দেশ্যে 'শিবাজী-উৎসব' প্রবর্তন একটি বিশেষ ঘটনা। টিলকের চেষ্টায় প্রতাপগড়ে[২] শিবাজীর ভগ্ন 'ভবানী মন্দিরের' সংস্কার করা হয়। শিবাজী ভারতে ধর্মরাজ্য স্থাপনের আশায় ক্ষাত্রবলের সাহায্য লইয়াছিলেন—এই কথা মহারাষ্ট্রীয় জাতির মনের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে শিবাজী-উৎসবের আয়োজন।

দেশের 'কাজ' করিতে হইলে ব্যক্তিগতভাবে বলসঞ্চয়ের ও সঙ্ঘগতভাবে ব্যায়ামাদি চর্চার প্রয়োজন—এই কথা মহারাষ্ট্রীয় যুবকরাই সর্বাগ্রে বুঝিতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্বে বাঙালি কবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "এ-সব শত্রু নহে যে তেমন—তূণীর কৃপাণে করো রে পূজা।" অন্য পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত

১ সাধনা ১৩০১

২ ১৯৫৬ ডিসেম্বরে এখানে শিবাজীর অশ্বারোহী মূর্তি নেহেরু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়

বাণী আজ মহারাষ্ট্রীয়রা বাস্তবে পরিণত করিতে উদ্যত হইল। দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকর ভ্রাতৃযুগল এই আন্দোলনের স্রষ্টা। এই সমিতির উদ্দেশ্য 'হিন্দুধর্মের কণ্টক দূরীকরণ।' এই সংকীর্ণ মনোভাব হইতে জাতীয়তাবাদের নবজন্ম; এবং ভবানীপূজাকে কেন্দ্র করিয়া বিপ্লববাদের নবরূপে আবির্ভাব। ভারতীয় জনতার মধ্যে দ্বি-জাতীয় ও দ্বি-ধর্মীয় মনোভাব সৃষ্টি ও প্রচারের দায়িত্ব কেবল মুসলমানদের নহে, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণসমাজকেও এই দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। এই ধারাই আধুনিক যুগে 'রাষ্ট্রীয় সেবক সঙ্ঘ' (R. S. S.) রূপে অবতীর্ণ। এ সম্বন্ধে আমরা অপর পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব।

৫

১৮৯৫ ডিসেম্বরে পুণায় কন্‌গ্রেসের অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ সভাপতি। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রাও বাহাদুর ভিড়ে বলিলেন, "আমরা প্রথমে ভারতবাসী, পরে হিন্দু-মুসলমান, পার্শি, খ্রীষ্টান পাঞ্জাবী, মারাঠি, বাঙালি, মদ্রাজী।" এ কথা দাদাভাই নৌরজীও বলিয়াছিলেন; কিন্তু দুই বৎসর পূর্বে এই পুণা নগরীতেই যে গো-বধ-নিবারণী সভার জন্ম হইয়াছিল তাহা তো মুসলমানের উপর পরোক্ষ আক্রমণ বা চ্যালেঞ্জ—কারণ মুসলমানরা গো-খাদক। অখণ্ড ভাবময় জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী এই মনোভাব। কোথায় সেই সার্বজনিক আন্তরিকতা? মুসলমানরা রাও বাহাদুরের আহ্বানে আশান্বিত হইতে পারিল না।

টিলক-প্রবর্তিত এই একদেশদর্শী ধর্মীয়তার সহিত কন্‌গ্রেস যে নিঃসম্পর্কীয় তাহা প্রমাণিত হইল পরবৎসরের (১৮৯৬) কলিকাতার অধিবেশনে। কারণ এবার সভাপতিত্ব করিলেন বোম্বাই-এর রহিমতুল্লা মহম্মদ সিয়ানী। সিয়ানী তাঁহার ভাষণে মুসলমানদের কন্‌গ্রেসে যোগদানের সতেরো দফা আপত্তির প্রত্যেকটি খণ্ডন করিয়া বলেন যে, কন্‌গ্রেস মুসলমানদেরও প্রতিষ্ঠান। সেদিন এই কথা মুসলমানদের মুখ হইতে নির্গত হইবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ, স্যর সৈয়দ আহমদের পার্থক্যনীতিই ধীরে ধীরে প্রবল ও মুখর হইয়া উঠিতেছিল।

রাজনীতির পরিবেশ পুণা নগরে অতর্কিতভাবে সম্পূর্ণ নূতন পথে পরিচালিত হইল (১৮৯৬) বোম্বাই-এর প্লেগ নামে নূতন ব্যাধির আবির্ভাবে। ১৮৯৭-এ এই রোগ মহামারীরূপে দেখা দিল। এই মহামারীর সময়ে টিলক ও তাঁহার 'হিন্দুধর্মের কণ্টক দূরীকরণ'কারী যুবকবৃন্দ প্লেগ ভয়ে ভীত, আর্তদের সেবার ও তদারকের ব্যবস্থা করিয়া মহারাষ্ট্র জনতার হৃদয় হরণ করিলেন।

১৮৯৭ সালে প্লেগের জন্য 'শিবাজী-উৎসব' শিবাজীর জন্মদিনে অনুষ্ঠিত না হইয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেক দিন ১৩ই জুন মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইল। ইহা এক হিসাবে অর্থবোধক। ১৮ই জুন টিলকের 'কেশরী' নামক মারাঠি সাপ্তাহিকে শিবাজী-উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ ও উৎসবে পঠিত একটি উদ্দীপক কবিতা প্রকাশিত হয়। এই ঘটনার চারিদিন পরে (২২ জুন) মিঃ র‍্যান্ড ও লেফনেণ্ট আয়ার্স্ট নামে দুইজন ইংরেজ সাহেব চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বারা পথিমধ্যে গুলির দ্বারা নিহত হইলেন।—র‍্যান্ড পুণার প্লেগ-অফিসার ছিলেন। লোকে প্লেগ ব্যাধি হইতে প্লেগ অফিসারদের উৎপাতে অধিক ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহারই প্রতিবাদে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। টিলকের ইংরেজি 'মারাঠা' কাগজে এই কথাটি লেখা হয় যে, "যাহারা শহরে রাজত্ব করিতেছে (প্লেগ অফিসার) তাহাদের অপেক্ষা প্লেগ ভালো।" অভিযোগ এই যে, যে-সব সৈনিক প্লেগ দমনের জন্য নিযুক্ত হয় তাহারা মহিলাদিগকে অপমান ও দেবস্থান কলুষিত করিয়াছিল। কর্মচারীদের ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে গিয়া নাটু ভ্রাতৃদ্বয় ইতিপূর্বে বিনাবিচারে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। এই-সকল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এই হত্যাকাণ্ড।

শিবাজী-উৎসব অনুষ্ঠান ও কেশরীতে শিবাজী সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইবার পরে কয়েকদিনের মধ্যে পুণার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ায়, সরকার বাহাদুর টিলককেই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী করিয়া পাঁচ দিন পরে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলেন। বিচারে টিলকের আঠারো মাস কারাবাসের আদেশ হইল; বিলাতে প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত আপীল করিয়াও কোনো ফল হইল না। ভারতে ইহাই বোধ হয় 'দেশের' জন্য প্রথম কারাবরণ। এই ঘটনায় বোম্বাই প্রদেশের মহারাষ্ট্ররাই যে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল তাহা নহে, সুদূর বঙ্গদেশেও ইহার প্রতিধ্বনি শোনা গেল। বাংলাদেশ হইতে টিলকের মামলা

চালাইবার জন্য অর্থ সংগৃহীত হয়। সরকার যে উদ্দেশ্যে টিলককে শাস্তি দিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল ; লোকের মন হইতে শাস্তির ভয়, কারাবরণের অপমানবোধ দূর হইয়া গেল—ইহার সঙ্গে ব্রিটিশ বিচারালয়ের প্রতিও তাহারা শ্রদ্ধা হারাইল ; কারণ টিলকের বিচারের সময় নয় জন জুরির মধ্যে ছয় জন সাহেব জুরি তাঁহাকে দোষী ও তিন জন দেশী জুরি নির্দোষ বলায় সাহেবদের প্রতি দেশবাসীর সাধারণভাবে অবজ্ঞা ও ঘৃণা বাড়িয়াই গেল। নূতন নিখিল ভারতীয় জাতীয়তাবোধের ইহাই প্রথম স্পন্দন।

৬

উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ভারতের রাজনীতি যেভাবে নূতন রূপ-পরিগ্রহ করিতেছে তাহাকে জাতীয়তাবাদ হইতে স্বজাতীয়তাবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা নাম দেওয়া সমীচীন হইবে। এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, ভারত হিন্দুপ্রধান দেশ, এবং হিন্দুরাই শিক্ষায় দীক্ষায় অগ্রসর জাতি ছিল, আবার হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি কয়েকটি উচ্চবর্ণ শিক্ষা ও অনুশীলন প্রভৃতির জন্য সমাজে ও সরকারে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই স্বধর্মীয়তা ও স্বজাতীয়তাবোধ কেন প্রবল হইয়া কন্‌গ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের পথ রুদ্ধ করিল তাহার কারণ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

৭

উনবিংশ শতকের প্রথম হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও খ্রীষ্টানধর্ম বিস্তারের ফলে ভারতের ধর্ম—বিশেষভাবে হিন্দুর আচার-ব্যবহার প্রভৃতি অতিরঞ্জিত ও বহু ক্ষেত্রে অযথাভাবে নিন্দিত হইয়াছিল। ইহার জন্য প্রধানত খ্রীষ্টান পাদরীরা ও পাদরীদের স্কুল-কলেজে-পড়া ভারতীয় ছাত্ররাই দায়ী। এই আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় রক্ষণশীল সমাজের অভ্যুদয়। এই নবীন দল ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষায় সুপণ্ডিত হইয়া কেবল জাত্যাভিমানের জন্য প্রাচীন শাস্ত্রাদির পক্ষপাতী ; অথচ তাঁহাদের অনেকেরই সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদি সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। আবার ভারতের যথার্থ সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ আধুনিক

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়ায় ইংরেজিনবীশ প্রতিক্রিয়াশীল নবীনদের চক্ষে তাঁহারা অবজ্ঞার পাত্র। সনাতনী হিন্দুদের মধ্যেও দুইটি দল ইংরেজিনবীশ ও সংস্কৃতনবীশ। এই ইংরেজি শিক্ষিত সনাতনীর দল প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি সাহস করিয়া নির্ভরশীল হইতে পারিতেন না। চিকিৎসার বেলায় যান ডাক্তারের কাছে, কবিরাজের উপর নির্ভর করিতে পারেন না। আবার দিন দেখা, কোষ্ঠী করা প্রভৃতি পুরাপুরি মানেন। কলেজে-পড়া চন্দ্রসূর্য -গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে বিদ্যা কোনো কাজে লাগে না গ্রহণের স্নানের সময়। পাশ্চাত্য শিক্ষার যুক্তিবাদকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিতেও ভরসা পান না। এইভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির দোটানায় পড়িয়া কোনোটিই তাঁহারা জীবনে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। নিজের অতীত সংস্কৃতির উপর ভরসা নাই। অপরের অত্যাধুনিক সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধা নাই। ইহাদের মনঃশিক্ষার অবস্থা 'না ঘরকা, না ঘাটকা'। ইহারাই আজ নূতন হিন্দু জাতীয়তাবোধ উদ্রিক্ত করিবার জন্য উগ্র মতাবলম্বী। বিচিত্র হিন্দুজাতি উপজাতি সম্প্রদায় সমূহকে কোনো একটি সূত্রে গাঁথিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিবেন—সে-বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ধারণাও তাঁহাদের ছিল না, থাকিলেও তাহা বর্ণহিন্দুর অনুকূলেই পরিকল্পিত হওয়ায় এই আন্দোলন সর্বজনিক ও সর্ববর্ণিকরূপ লইতে পারে নাই।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কয়েকজন সহৃদয় বিদ্বান ইংরেজ ভারতের সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানাদি আলোচনা আরম্ভ করেন। অতঃপর জারমেনি, ফ্রান্স, ইংলনড, ইতালি, রাশিয়ার অনেকে প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা করিয়া য়ুরোপে বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইঁহাদের গবেষণা গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে সবিশেষ গর্বের উদয় হয়; তাঁহারা বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, ভারতীয়দের বেদ, বেদান্ত, ধর্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কাব্য, জ্যোতিষাদি গ্রন্থ য়ুরোপে মুদ্রিত হইতেছে— সে-সব গ্রন্থের অনুবাদ নানাভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। তখন এই আত্ম-বিস্মৃত জাতির মধ্যে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নূতনভাবে জাগ্রত হইল। মোট কথা, বাহিরের নিন্দা ও স্তুতি আমাদিগকে জড়তা হইতে জাগ্রত হইবার পথে সমভাবে সহায়তা করিয়াছিল।

বাংলাদেশে এই নূতন জাতীয় আন্দোলনের বিস্তারকল্পে বঙ্গ সাহিত্যের

বিশিষ্ট স্থান আছে ; এ স্থানে তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নহে। তবে সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, কাব্য নাটক প্রভৃতি রচনা ও নাটকাদির অভিনয়ের মধ্য দিয়া স্বাদেশিকতার নবচেতনা বঙ্গদেশেই প্রথম উন্মেষিত হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত পরিচিত পাঠকগণ জানেন যে, বাংলা-সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাটক দেশকেন্দ্রিক জাতীয়তার ভাবকে বিকশিত করিয়া তুলিতে কীভাবে সহায়তা করিয়াছিল। বাংলার এই আদি লেখকগণ রাজস্থানের বীরদের লইয়া কাব্য, নাটক, উপন্যাস লেখেন। রাজপুত বীর ও বীরাঙ্গনারা স্বদেশপ্রেমের কবিতা আবৃত্তি করিয়া সাধারণ সৈন্যকে যুদ্ধে উদ্‌বুদ্ধ করিতেন, অথবা আততায়ী-ধ্বংসের জন্য সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন। এই-সব রচনা দেশমধ্যে সবিশেষ জন-প্রিয়তা অর্জন করে। সে যুগে ইংরেজের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাইত না, তাই রাজপুতবীররা মুঘলদের ও যবনদের উপর যত আক্রোশ প্রকাশ করিতেন ; কিন্তু আসলে ইংরেজই ছিল আক্রমণস্থল। হেমচন্দ্র তাঁহার বিখ্যাত 'ভারত-সংগীত' মারাঠা যুবকের মুখে বসাইয়া দিলেন ; রবীন্দ্রনাথের দিল্লীর দরবারের বিরুদ্ধে লিখিত কবিতা অদলবদল করিয়া আশ্রয় পাইল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে। রঙ্গলালের বিখ্যাত কবিতা 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়'—রাজপুতদের মুখের কথা বাঙালি নিজস্ব বুলি করিয়া লইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে হিন্দু জাতীয়তার কথাই সুস্পষ্টভাবে রূপ গ্রহণ করে। তিনি মুসলমানদের প্রতি সর্বত্র সুবিচার করেন নাই বলিয়া যে অভিযোগ আছে তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে দৈব ও অপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তিনি বিশেষ এক প্রকারের হিন্দুত্ব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিবিরোধী, বিজ্ঞানবিরোধী রাহস্যিকতা। তাঁহার 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হইবার পক্ষে বাধা যথেষ্ট ; সত্য কথা বলিতে কি, কোনো মুসলমানের পক্ষে মাতৃরূপে দেবতার কল্পনা করা অসম্ভব ; দশপ্রহরণধারিনী 'দুর্গা'র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়া তাহাকে মানিয়া লইতে হইলে মনের অনেকখানি কসরৎ করিতে হয়। মুসলমানরা সেরূপ প্রতীকাদির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় অভ্যস্ত নহে। অথচ সেই সংগীতকে জাতীয় সংগীতের অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়াতে

সমস্যার সমাধান হয় নাই। ভারতের আট নয় কোটি মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি অহিন্দুজাতির পক্ষে দেশকে দেবীরূপে আরাধনা করা কষ্টকল্পনা। আর জশলমীরের মরুভূমির মাঝে 'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং' গান করা অর্থশূন্য প্রলাপ মাত্র ; তৎসত্ত্বেও আমরা ইহাকে বিকল্প জাতীয় সংগীত রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছি।

বঙ্কিমের নব্য হিন্দুত্ব পরযুগে বিশেষভাবে পুষ্ট হইয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দ্বারা। স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব বিশেষভাবে জাতীয় জীবনকে যে প্রভাবান্বিত করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। স্বামীজির প্রাণের সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতকে সুমহান করা। যখন তিনি শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা ও য়ুরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিলেন (১৮৯৬) তখন লোকে তাঁহাকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল তাহা তুলনা-হীন ; লোকের মনে হইয়াছিল, ভারত পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতার নূতন সাম্রাজ্য গড়িয়া আসিয়াছে। অধীন জাতির আত্মপ্রসাদ লাভের পক্ষে ইহা যথেষ্ট। ইহার উপর যখন খাস ইংলন্ড হইতে মিস্ মারগারেট নোব্ল খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করিয়া স্বামীজির শিষ্যা হইয়া 'নিবেদিতা' নাম গ্রহণ করিলেন, আমেরিকা হইতে ধনী ধর্মকুতূহলী মহিলারা স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন তখন হিন্দুধর্মের ও হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে লোকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিল না। লোকের মনে হইল ভারতের সকল কিছুই মহান, হিন্দুর সকল কিছুই পবিত্র— হিন্দুদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিচারের বা সন্দেহের কোনো অবসর নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ দেশের কিশোর মনের মধ্যে দেশভক্তি ও স্বধর্মে মতি আনিলেন বটে, কিন্তু জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁহার উদাত্তবাণী দেশবাসীর কর্ণে প্রবেশ করিল, মর্মে আশ্রয় পাইল না। ইহার কারণ, তাঁহার গৃহী ভক্ত শিষ্যদের অধিকাংশই হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণ, তাঁহাদের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে এই জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার সহিত। অল্পকাল পরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিষ্যদের ধর্মভাব ব্রাহ্মদের ন্যায়ই ধর্মবিলাসে পরিণত হইল। তাঁহাদের কর্ম সীমিত হইল সমাজকল্যাণে ও শিক্ষাপ্রচারে এবং সেই শিক্ষায়তনগুলি হইল শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ ধর্মসাধনা প্রচারের কেন্দ্র—যাহাকে বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িক ধর্মই বলিতে হইবে।

৮

বাংলাদেশের বাহিরে হিন্দুত্ব নূতনভাবে শক্তিলাভ করিল থিওজফিস্টদের প্রচার ফলে। মাদাম ব্লাভাস্কি ও পরে অ্যানিবেসাণ্ট—দুইজনেই য়ুরোপ হইতে আসিয়া থিওজফি মত বা ব্রহ্মবাদ প্রচার করেন। তাঁহারা প্রাচ্যের ধর্ম, কর্ম, আচার ব্যবহার রীতি-নীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত ও মুগ্ধ মত পোষণ করিতেন, তাঁহারা প্রচার করিলেন, ভারতের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার তুলনা নাই, হিন্দুর জাতিভেদ সমাজবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার ধর্মকর্ম বিজ্ঞানসম্মত। হিন্দুরা বিদেশীর নিকট নিজধর্মের প্রশংসাপত্র পাইয়া অত্যন্ত আশ্বস্ত, ধর্মবিষয়ে কোনো সংস্কারের প্রয়োজন যে আছে তাহা তাহাদের কাছে নিরর্থক মনে হইল। সংস্কারপন্থীদের কর্মধারা তাঁহাদের নিকট বিসদৃশ লাগিল।

থিওজফির প্রায় সমকালীন হইতেছে আর্যসমাজের আন্দোলন। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের অসাড় মনকে জাগ্রত করিতে হইলে তাহার সম্মুখে বিশেষ একটি আদর্শ খাড়া করিতে হইবে। খ্রীষ্টান, মুসলমান, শিখদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ আছে—সেই-সব ধর্মগ্রন্থকে তাহারা অভ্রান্ত বলিয়া মনে করে। হিন্দুর জন্য 'বেদ'কে তিনি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর বলিয়া প্রচার করিলেন। আর প্রচার করিলেন যে, তাঁহারা 'আর্য'। বলা বাহুল্য 'আর্য' শব্দটি বিদেশী পণ্ডিতদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। বাংলাদেশেও 'আর্যামির' প্রকোপ দেখা দিল - 'আর্য-দর্শন পত্রিকা', 'আর্য-মিশন প্রেস' প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। উত্তর ভারতে ও পাঞ্জাবে আর্যসমাজের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা দিল। জাতীয় আন্দোলনে আর্যসমাজের দান নিঃসন্দেহে স্মরণীয় কিন্তু শেষকালে তাঁহারা অতি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার মোহে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীন ভারতে ভাষাভিত্তিক সমস্যা সৃষ্টি করিতেছেন—নিখিলভারতভাবনা ম্লান হইয়া আসিয়াছে তাঁহাদের কর্মময় জীবনে।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে বঙ্গদেশে স্বামী বিবেকানন্দের, উত্তর ভারতে দয়ানন্দের ও দাক্ষিণাত্য-মহারাষ্ট্রে টিলকের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকলেই অতীত ভারতের সংস্কৃতির সহিত আধুনিক ভারতের যোগসাধনের জন্য চেষ্টান্বিত; ভারতের দুর্গতি দূর করিবার জন্য ভারত হইতে বিদেশীদের

দূরীকরণ যে একান্ত প্রয়োজন তাহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতে যে বিপ্লববাদ ও সন্ত্রাসবাদ দেখা দিল—তাহার মূলে ছিল বাংলাদেশের ব্রাহ্ম ও বিবেকানন্দর ভক্ত যুবকরা, উত্তর ভারতে আর্য-সমাজীরা ও মহরাষ্ট্রদেশে টিলকের মন্ত্রে দীক্ষিত যুবকরা।

৯

এই-সকল বিচিত্র চিন্তাধারা ও কর্মধারার পাশাপাশি চলিতেছে শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা। ভারতের একদল মনীষীর মনে এই কথা উদয় হইতেছে যে, ভারতীয়দের শিক্ষা ভারতীয় আদর্শে হওয়া উচিত; সেই ভারতীয় আদর্শ প্রাচীন ভারতের আশ্রম, গুরুগৃহ ও মঠ। প্রাচীন আর্যভারতের আদর্শানুসারে শিক্ষাদানকল্পে লালা মুন্সিরাম (পরে শ্রদ্ধানন্দ স্বামী) হরিদ্বারের নিকট গুরুকুল আশ্রম স্থাপন করিলেন; ঔপনিষদিক আশ্রমের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন; এবং ভারতের মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসআশ্রম শিক্ষার জন্য বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দ এক মঠের পত্তন করিলেন। ভারতের তিনটি পর্বের প্রতীক ইঁহারা—বৈদিক, ঔপনিষদিক ও পৌরাণিক। সকলেরই উদ্দেশ্য ভারতের আত্মার অনুসন্ধান এবং সেইজন্য এই তিন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা তিন মনীষীই অতীত ভারতের দিকে মুখ ফিরাইয়া 'হিন্দুত্ব কি' তাহা আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন।[১] তাঁহাদের মনের ইচ্ছা কর্ম ও শিক্ষার মধ্যে জাতীয়তা চাই,—কিন্তু সে জাতীয়তা যে কী, তাহা কাহারও নিকট সুস্পষ্ট নহে। কেহ কেহ নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধর্মমতকে জাতীয়তাবাদের অস্ত্র মনে করিতেছেন। এই জাতীয়তাবোধ হিন্দু জাতীয়তার নামান্তরমাত্র; কিন্তু এখনো পর্যন্ত 'হিন্দু' কি ও কে তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। কোথাও নিখিল ভারতীয় হিন্দু তথা

১ উনবিংশ শতকের শেষভাগে সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ ধর্মপাল বুদ্ধের আদি ধর্ম বা থেরো বা স্থাবরবাদ পুনর্জীবিত করিবার জন্য 'মহাবোধি সোসাইটি' স্থাপন করেন। বুদ্ধের ধর্ম ভারতে পুনঃ-প্রচারের ব্যবস্থা হয়। কালে ইহাও রাজনীতির সহিত মিশিয়া স্বাধীন ভারতে সমস্যা সৃষ্টির দিকেই অগ্রসর হইতেছে; এখানেও নিখিলভারতভাবনা হইতে সাম্প্রদায়িক ভাবনা উগ্ররূপ লইতে চলিয়াছে।

সর্বধর্মীয় হিন্দুসমস্যা সমাধানের রূপ দেখা গেল না। সর্বহিন্দুর উপযোগী কোনো মত সর্ববাদীভাবে গৃহীত হইল না,—বারো জন চতুর্বেদী ব্রাহ্মণের জন্য ত্রয়োদশটি রন্ধনশালার প্রয়োজন বলিয়া চল্‌তি হিন্দিতে উত্তরপ্রদেশের যে প্রবাদবচন আছে— তাহাই থাকিয়া গেল হিন্দুত্বের মূল আশ্রয়! ভারতীয় সংবিধানে নিয়ম করিয়াও জাতিভেদকে নিরাকৃত করা সহজসাধ্য হইতেছে না; ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার প্রধান ও প্রথম বাধা হইয়াছে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও নিজ নিজ 'জাতে'র তথাকথিত স্বার্থরক্ষা ও নিজ নিজ দেবতার পূজা সমারোহ। হিন্দু জাতির মিলনসূত্র এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই; রামমোহন রায়-যে বলিয়াছিলেন, অন্তত রাজনীতির জন্য হিন্দুধর্মের পরিবর্তন প্রয়োজন— সে উপদেশ লোকে বিস্মৃত হইয়াছে।

১০

ধর্মীয় আত্মচেতনা যেমন দেশের শিক্ষিত মনকে বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদের আদর্শতায় উদ্রিক্ত করে, দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা তাহাদের মনকে তেমনই চঞ্চল করিয়া তোলে। এই সময়ে প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ ভারতীয়দের মনকে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ করিতে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। ভারতের দারিদ্র্য কীভাবে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে—ইংরেজ কোম্পানি ও তৎপরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের খাস শাসনাধীন অবস্থায় ব্রিটিশ শিল্পী ও কলওয়ালাদের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া কীভাবে আইনকানুন প্রস্তুত হইতেছিল, বিনিময়ের কারচুপিতে কীভাবে ভারতীয় শিল্পের উচ্ছেদ সাধিত ও ভারতীয়দের অর্থ শোষিত হইতেছে, কিরূপে কৃষি ও শিল্পের ভারসাম্য বিনষ্ট হইয়া সমগ্র দেশ কৃষিআশ্রয়ী গ্রামিকতায় পরিণত হইতেছে— এই-সব তথ্যপূর্ণ কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এই সময়ে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে দাদাভাই নৌরজীর 'ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও ব্রিটিশভারতে ব্রিটিশ-অনুচিত শাসন' (Proverty and UnBritish rull in British India 1902) নামক গ্রন্থ সর্বপ্রথম। ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রদেশের মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে লিখিত অর্থনীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী ভারতীয় অর্থনীতি আলোচনার বুনিয়াদ পত্তন করিয়াছিল; ব্রিটিশযুগে ভারতীয়রা শিল্প ও

কৃষির সমতা হারাইয়া কৃষিজীবী হইয়া পড়িয়াছে—এই তত্ত্ব তিনিই সর্বপ্রথম ব্যাখ্যান করেন। রাণাডের প্রবর্তিত পথে পরবর্তী যুগে জোশী, গোখ্‌লে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অর্থনীতিজ্ঞরা ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু যে গ্রন্থখানি বিংশশতকের প্রারম্ভ পর্বে শিক্ষিত ভারতীয়দের মনকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিয়াছিল—তাহার লেখক জনৈক ইংরাজ মিঃ উইলিয়াম ডিগবি। ইঁহার The Prosperous India বা 'সমৃদ্ধ ভারত' গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে লিখিত ছিল ১৮৫০ অব্দে ২ পেনী, ১৮৮০-তে ১½ পেনী, ১৯০০-তে ¾ পেনী; অর্থাৎ ভারতীয়দের মাথা-পিছু দৈনিক আয় কীভাবে হ্রাস পাইয়াছে তাহাই ব্যঙ্গভরে 'সমৃদ্ধ ভারত' নামে প্রকাশিত হইল। ডিগবি বহুশত সরকারী নথিপত্র ঘাঁটিয়া যে-সকল তথ্য প্রকাশ করেন তাহা পাঠ করিয়া য়ুরোপের উপর মন বীতশ্রদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্তের গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; তাঁহার Economic History of India নামে দুই খণ্ড গ্রন্থ বিলাতে প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্র লর্ড কার্জনকে কয়েকখানি 'খোলা' পত্রে ভারতীয় কৃষকদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার মত জ্ঞাপন করেন। সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে দত্ত মহাশয়ের যুক্তি-গুলি তন্ন তন্ন বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু সরকার পক্ষীয় জবাবে কেহই সন্তুষ্ট হইল না; কারণ দেশের দারিদ্র্য কাহাকেও পুঁথি পড়িয়া অনুভব করিতে হইতেছে না। স্যার হেনরী কটন আসামের চীফ কমিশনার ছিলেন; তাঁহার শাসনকালে তিনি যথেষ্ট জনাদর লাভ করিয়াছিলেন; ভারতবাসীর ন্যায্য দাবির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম সহানুভূতি ছিল এবং সে-মনোভাব তিনি New India নামে গ্রন্থে প্রকাশ করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদক।

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ অর্থশাস্ত্রীরা বাংলাদেশের চিরস্থায়ী ভূমি-বন্দোবস্তকে ব্রিটিশের শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া মনে করিতেন। এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনেরও তাঁহারা পক্ষপাতী ছিলেন। এই লেখকগণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী অন্তর্গত কায়িক শ্রমমুক্ত ভদ্রশ্রেণী। চাষী মজুররা কীভাবে শোষিত হইয়া এই জমিদার ও মধ্যস্বত্ববান শ্রেণীকে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে

ও অবসরসুখ ভোগের সহায়তা করিতেছিল, সে দিকে ইহাদের দৃষ্টি যায় নাই। সেইজন্য ইহাদের আলোচনা ঐতিহাসিক দিক হইতে প্রামাণ্য হইলেও ভারতের ভাবী সমস্যা বিষয়ে দিগদর্শন করিতে পারে নাই।

বঙ্গচ্ছেদ-আন্দোলনের মুখে সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে এক প্রবাসী মহারাষ্ট্রীয় শিক্ষক 'দেশের কথা' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন (১৯০৪) তাহার তথ্যাদি পূর্বোল্লিখিত ইংরেজি গ্রন্থগুলি হইতে সংগৃহীত। গ্রন্থখানি আদৌ রাজদ্রোহাত্মক নহে; তবে গ্রন্থখানিতে কেবল ব্রিটিশ শাসনের অভাবাত্মক দিকটার উপর জোর পড়িয়াছিল;— ভারতীয়দের বিজ্ঞান-বিমুখীনতা, যন্ত্রাদি আবিষ্কারে পরাঙ্মুখতা, দেশদ্রোহিতা প্রভৃতি দোষও যে দেশের শিল্পধ্বংসের অন্যতম কারণ, তাহা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় না। সরকারী রিপোর্ট বা সাধারণ ইংরেজের ভারতবিষয়ক গ্রন্থসমূহ ভারতীয়দের দুঃখ দারিদ্র্যের মূলগত কারণ বিশ্লেষণ না করিয়া, কেবল তাহার বাহ্যিক আড়ম্বর ও উপকরণের তালিকা দিয়া ব্রিটিশ শাসনের অসামান্য সাফল্য ইতিহাস লিখিত হয়। 'দেশের কথা' যেন তাহারই পাল্টা জবাব। এই গ্রন্থকে বৈজ্ঞানিক আলোচনা বলা চলে না। তৎসত্ত্বেও বইখানি খুবই জনাদর লাভ করে। সে যুগে 'দেশের কথা' ছিল তরুণদের অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ। কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর সরকার হইতে এই গ্রন্থের মুদ্রণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের আলোচ্য পর্বে এখনো বিপ্লবাত্মক পত্রিকা ও গ্রন্থের বহুল প্রচার হয় নাই—বিপ্লবের পটভূমি রচিত হইতেছে মাত্র।

১১

জাতীয়তাবাদের আর একটি লক্ষণ জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য -সম্বন্ধে সচেতনতা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে সর্বশ্রেণীর বাঙালির বিচিত্র সাহিত্যের তথ্য শিক্ষিত বাঙালির সমক্ষে পেশ করিলেন। ইহা এক নূতন আত্মচেতনা। ঐতিহাসিক গবেষণায় অক্ষয়কুমার মৈত্র পথিকৃৎ হইলেন; তাঁহার 'সিরাজদ্দৌল্লা' ও 'মীরকাসেম' গ্রন্থ তাঁহাকে অমর

করিয়াছে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মিথ্যাবাদ প্রচারের ফলে বাংলার নবাবী আমলের ইতিহাস কী পরিমাণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা বহু দলিল-দস্তাবেজের সাহায্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লিখিত হয়। তিনি প্রমাণ করিলেন যে, অন্ধকূপ-হত্যা-কাহিনী হলওয়েল সাহেবের কল্পনাপ্রসূত—বাস্তবের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। স্বাদেশিকতার আবেগে গ্রন্থখানি রচিত বলিয়া দৃষ্টির মধ্যে যথেষ্ট আচ্ছন্নভাব ছিল এবং সেইজন্য কালে সিরাজদ্দৌল্লা জাতীয় বীরের এমন-কি শহীদের আসন প্রাপ্ত হন। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করিয়া সত্যের প্রতি আরও অবহিত হইতে বলিয়াছিলেন। আর বলিয়াছিলেন যে, ইতিহাস গবেষণা যেন ভাবালুতার দ্বারা দুষ্ট না হয়। মোট কথা অক্ষয় মৈত্রের গ্রন্থ প্রকাশের পর হইতে দেশে বীরপূজার এক নূতন ভাবালুতা দেখা দিয়াছিল। বাংলাদেশে প্রতাপাদিত্যকে জাতীয় বীররূপে সন্ধান করিয়া বাহির করা হইল— এমন সময়ে মহারাষ্ট্র দেশ হইতে 'শিবাজী-পূজা'র তরঙ্গ বঙ্গদেশকে স্পর্শ করিল। সে কথা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

বঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গদেশে ও ভারতের নানাস্থানে মাতৃভূমিকে ব্রিটিশের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে দেশমধ্যে ইতস্তত ছিল, তাহা জাতীয় আন্দোলনরূপে মূর্তি পরিগ্রহ করিল লর্ড কর্জনের শাসনকালে। ১৮৯৯ জানুয়ারি মাসে (পৌষ ১৩০৫) লর্ড কর্জন ভারতের গবর্ণর জেনারেল ভাইসরয় হইয়া আসিলেন। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত, অক্লান্তকর্মী, গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী জবরদস্ত বড়লাট লর্ড লীটনের পর আর কেহ আসেন নাই। ভারতবাসীদের ন্যায্য দাবি ও অধিকারের উপর তাঁহার না ছিল সহানুভূতি, না ছিল ভারতীয়দের প্রতি কোনোপ্রকার শ্রদ্ধা। অথচ এই লোকই ভারতের প্রাচীন কীর্তি-কলাপ রক্ষার জন্য বিশেষ আইন পাশ করাইয়া দেশের যে মহৎ উপকার করিয়াছিলেন তাহা অবিস্মরণীয়। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমানদের বহু কীর্তি এই আইন পাশ না হইলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। কিন্তু এই বিদ্যোৎসাহী অদ্ভুতকর্মা বড়লাটের তাঁহার সমকালীন ভারতীয়দের প্রতি অবজ্ঞা ছিল অপরিসীম। সেই মনোভাবের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় ভারতে স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম,— যাহা হইতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা।

লর্ড কর্জন বড়লাট হইয়া আসিবার এক বৎসর পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার (১৮১৯—১৯০১) মৃত্যু হয়। মহারাণীর স্মৃতি রক্ষার্থে তাজমহলের অনুকরণে এক বিরাট মর্মর সৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কর্জন ভারতীয়দের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন। রাজধানী কলিকাতায় সেই সৌধ ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল নামে পরিচিত। অতঃপর তিনি নূতন ভারতসম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের অনুপস্থিতিতে দিল্লীতে অভিষেকের বিরাট দরবার আহ্বান করিয়া স্বয়ং রাজসম্মান গ্রহণ করিলেন, যেমন লীটন করিয়াছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতসম্রাজ্ঞী ঘোষণা উপলক্ষ্যে (১৮৭৭)। কর্জনের দিল্লী দরবার উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ 'অত্যুক্তি' নামে প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, "আমাদের বিদেশী কর্তারা ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন যে, প্রাচ্য হৃদয় আড়ম্বরেই ভোলে, এই জন্য ত্রিশ কোটি অপদার্থকে অভিভূত

করিতে দিল্লীর দরবার নামক একটি সুবিশাল অত্যুক্তি বহু চিন্তার চেষ্টায় ও হিসাবের বহুরূপ কষাকষিদ্বারা খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন··· দয়াহীন, দানহীন দরবার ঔদার্য হইতে উৎসারিত নহে, তাহা প্রাচুর্য হইতে উদ্বেলিত হয় নাই।”

এই প্রবন্ধে কবি বলিয়াছিলেন, “এ দিকে আমাদের প্রতি সিকি পয়সার বিশ্বাস ইংরেজের মনের মধ্যে নাই; এত বড়ো দেশটা·· সমস্ত নিঃশেষে নিরস্ত্র অথচ জগতের কাছে সাম্রাজ্যের বল প্রমাণ উপলক্ষ্যেও আমাদের অটল ভক্তি রটাইবার বেলা আমরা আছি।” এই কয় পংক্তি হইতে কর্জনের প্রতি তথা ব্রিটিশের প্রতি সমসাময়িক শিক্ষিত মণীষীদের মনোভাব সুস্পষ্ট হয়।

২

বাংলাদেশে জাতীয়তাবোধ নানাভাবে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছে। বিপ্লববাদের জন্মভূমি বঙ্গদেশ, রাজনারায়ণ বসু সঞ্জীবনী-সভায় সর্বপ্রথম বিপ্লববাদ ও গুপ্তসমিতি স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন; সে কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। মাঝে কয়েক বৎসর কন্‌গ্রেসের সাংবিধানিক আন্দোলনের ফলে এই বিপ্লবভাব প্রসার লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু বিংশ শতকের আরম্ভ হইতেই ইহা নব কলেবরে নানাস্থানে দেখা দিল। সমসাময়িক পত্রিকাগুলি ইংরেজের প্রতি যেভাবে বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া উঠিতেছিল, তাহা অবশ্যই বড়লাটের দৃষ্টিভূত করা হইয়াছিল।

ব্রিটিশ কূটনীতিজ্ঞরা দেখিলেন, বাঙালির জনতা আধাআধি হিন্দুমুসলমানে বিভক্ত হইলেও তাহারা এক জাতি— তাহারা বাঙালি; ইহাদের ভাষা এক, বেশভূষা এক— আচার-ব্যবহারের মধ্যে বহু মিল আছে। কর্জনের ভাবনা এই দুই সম্প্রদায়কে পৃথক করিতে পারিলে বাঙালি-হিন্দুরা দুর্বল হইয়া পড়িবে ও পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ জাগ্রত করিতে পারিলে সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়া উভয়কেই জর্জরিত করিবে। সেইজন্য ভারত সরকার ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর ঘোষণা করিলেন যে, বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত

করিয়া দুটি প্রদেশে ভাগ করা হইবে; পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ— ঢাকা তাহাদের রাজধানী হইবে— নূতন প্রদেশে তাহাদের প্রভুত্ব বাড়িবে — তাহাদের সংস্কৃতি বিকাশের সুবিধা ও সুযোগ মিলিবে। লর্ড কর্জন স্বয়ং ঢাকা শহরে গিয়া নেতৃস্থানীয় মুসলমানদিগকে স্বমতে আনিবার জন্য কথাবার্তা বলিলেন; ঢাকার নবাব প্রভৃতি অনেকেই সে-কথায় অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইলেন। অতঃপর স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে এই ভেদনীতির ফলে মুসলমানসমাজ এই আন্দোলনকে জাতীয় প্রচেষ্টা বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পারিল না। কর্জনের ১৯০৩ সালে রোপিত বিষবীজ ১৯৪৭ সালে পরিপূর্ণ বিষবৃক্ষরূপে দেখা দিল। ইংরেজের রাজনীতি সুদূরপ্রেক্ষী, ভারত ত্যাগ করিবার সময় তাহারই কূটনীতির জয় হইল।

বাঙালি-হিন্দুরা এই ভেদনীতি বা বঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবকে মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইল। মুসলমানদের মধ্যে যাঁহাদের ভাবনা সুদূরপ্রসারী ও যাঁহারা বাংলার সংস্কৃতিকে অখণ্ড বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, সেই শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মুসলমান ভাবুক এই আন্দোলনে মনপ্রাণ দিয়া যোগদান করিলেন। ১৯০৩ ডিসেম্বরে মদ্রাজ কন্‌গ্রেস অধিবেশনে সভাপতি লালমোহন ঘোষ বঙ্গচ্ছেদ পরিকল্পনার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ১৯০৩ ডিসেম্বর হইতে ১৯০৫ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় দুই সহস্র জনসভায় গবর্মেণ্টকে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। কিন্তু কর্জনী শাসন সরকার বঙ্গচ্ছেদ করিবার জন্য কৃতসংকল্প। তবে বঙ্গচ্ছেদ যদি কেবল মাত্র রাজ্যশাসনের সৌকর্যার্থে করা হইত, তবে হয়তো এই প্রস্তাব কার্যকরী না করিয়া ক্ষুব্ধ জনমতকে শান্ত করা যাইত। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। বাঙালি-হিন্দুর উদ্যত জাতীয়তাবাদকে ভেদনীতির দ্বারা ধ্বংস করিবার জন্যই বঙ্গচ্ছেদ করা সরকারের পক্ষে অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা সরকারের পক্ষে থাকিলে ব্রিটিশশাসন নিরাপদ এ কথা কূটনীতিজ্ঞরা ভালো করিয়াই জানিতেন।

১৯০৫ অব্দের ১৬ই অক্টোবর বা ১৩১২ সনের ৩০ আশ্বিন বঙ্গচ্ছেদ হইল। তখন বঙ্গদেশ বলিতে বুঝাইত বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গ, উড়িষ্যা ও বিহার; এই বিশাল প্রদেশে একজন ছোটলাট ছিলেন মহীশাসক; তাঁহার রাজধানী কলিকাতা। বড়লাটও তখন কলিকাতায়

থাকেন। কলিকাতাই ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী। বড়লাট থাকিতেন বর্তমান রাজভবনে (Govt Palace); ছোটলাট থাকিতেন বেলভেডিয়ারে এখন যেখানে ন্যাশনাল লাইব্রেরী অবস্থিত। ছোটলাটের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী দার্জিলিং ও বড়লাটের গ্রীষ্মাবাস ছিল শিমলা শৈল। বঙ্গচ্ছেদ ব্যবস্থায় আসাম প্রদেশের সহিত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগ যুক্ত করিয়া 'পূর্ববঙ্গ আসাম' নামে নূতন প্রদেশ গঠিত হইল। ঢাকা হইল রাজধানী ও আসামের শিলং হইল শৈলাবাস। প্রেসিডেন্সি বিভাগ ও বর্ধমান বিভাগ এবং বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া বঙ্গদেশ থাকিল। এখানে একটি কথা আজ মনে হয়। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আসাম প্রদেশে অসমীয়া ও বাঙালি এবং বঙ্গদেশে বাঙালি-বিহারী-ওড়িয়া এক শাসনতন্ত্রের অধীন ছিল; তখন না-ছিল প্রাদেশিকতার প্রশ্ন না-ছিল ভাষাভিত্তিক রাজ্য-গঠনের দুঃস্বপ্ন। আজ স্বাধীন ভারতে ডিমক্রেসি সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণার বশবর্তী হইয়া আমরা 'ভারতীয়' নাম গ্রহণ করিয়াও কেহই পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীকে সহ্য করিতে পারিতেছি না! ইহার পরিণাম কি তাহা কেহই কল্পনা করিতে পারিতেছেন না; তবে এই প্রাদেশিকতা ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা যে রূঢ়ভাবে অখণ্ড ভারত-ভাবনাকে আঘাত করিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১৯০৫ সালের ২০ জুলাই বিলাতের সেক্রেটারি-অব-স্টেট বা ভারতসচিব কর্জনের বঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলে বাঙালিরা দেখিল তাহাদের আবেদন-নিবেদন অগ্রাহ্য হইয়া পার্টিশন হইবেই। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আজও অচল উক্তি বলিয়া বাতিল করা যাইবে না। তিনি বলিলেন, "বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা আমরা কোনো মতে স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আমরা সচেতনভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে একই জাহ্নবী তাঁহার বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব-পশ্চিম হৃদয়ের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে। বিধাতার রুদ্রমূর্তি আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় আছে— আঘাত, অপমান ও

অভাব ; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।" কয়েক বৎসর পর (১৯০৮) অরবিন্দ এই কথাই বলেন, বঙ্গ-ভঙ্গ Greatest blessing, ইহা মরীচিকা—illusion—দূর করিয়াছে।[১]

ভারতসচিবের দ্বারা বঙ্গচ্ছেদ অনুমোদিত হইবার দশ দিন পরে 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ১লা অগস্ট প্রকাশ্যে 'বয়কট' বা বিলাতী বস্ত্রাদি বর্জন প্রস্তাব ঘোষণা করিলেন। ছয়দিন পরে ৭ই অগস্ট টাউন হলের বিরাট জনসভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে 'বয়কট' আন্দোলন দেশমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

বঙ্গচ্ছেদ রদ করিবার জন্যই আন্দোলনের প্রয়োজন—এই ছিল একশ্রেণীর লোকের মত ; বঙ্গচ্ছেদ রদ হইতেছে না বলিয়া ইংরেজকে জব্দ করিবার জন্যই 'বয়কট' বা বিলাতী দ্রব্য বর্জনই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। সেই সময়ে একপ্রকার প্রতিজ্ঞাপত্রে লিখিত হইত, 'যতদিন বঙ্গচ্ছেদ রদ না হয়, ততদিন বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিব।' অর্থাৎ সম্পূর্ণ একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে বঙ্গচ্ছেদকে তাঁহারা দেখিতেছিলেন। কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত লোকে প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিবার সময় বঙ্গচ্ছেদ রদের শর্ত কাটিয়া দিয়া সহি করিত। অর্থাৎ যাহা ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন মাত্র তাহা হইয়া উঠিল অর্থ নৈতিক ও শিল্পীয় উন্নতির প্রচেষ্টা। লোকে যেরূপ মোটা 'বোম্বাই কাপড়' পরিতে আরম্ভ করিল, তাহার নমুনা পাওয়াও এখন দুষ্কর। মনে আছে ১৯০৫ সালে আমেদাবাদের গুজরাট জিনিং মিলের যে মোটা কাপড় পরিয়া স্কুলে গিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া সহপাঠীদের কী তীব্র ব্যঙ্গ! ১৯০৬ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কাপড়ের কল 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্' স্থাপিত হইল মধ্যবিত্ত বাঙালিদের চেষ্টায়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথায় লিখিলেন, 'মোটা বসন অঙ্গে নেবো, মোটা ভূষণ আভরণ করবো।' রজনীকান্ত সেন লিখিলেন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।' রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, 'পরের ঘরে কিনবো না আর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি।' এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনকে দেশমধ্যে প্রচারে সকলেই ব্রতী হইলেন।

---

১ ১২ এপ্রিল, ১৯০৮ বারুইপুর বক্তৃতা। এই বক্তৃতাদানের উনিশ দিন পরে আলিপুর-বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ ও স্বদেশী আন্দোলন পৃ, ৩৮১

৩

বঙ্গচ্ছেদ সরকারীভাবে যেদিন কার্যকরী হইল অর্থাৎ ১৯০৫, ১৬ অক্টোবর বা ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন, সেইদিনটিকে বাঙালি একাধারে বিষাদের ও আনন্দের দিন বলিয়া গ্রহণ করিল। দেশ বিভক্ত হইয়াছে তজ্জন্য মন যেমন ভাবালুতায় ব্যথিত, জাতীয় জীবনে নবীন শক্তির আবির্ভাবে মন তেমনই পুলকিত। এই মনোভাব হইতে বাংলা সাহিত্যে কবিতা, গান, নাটকাদির যে জোয়ার আসিয়াছিল তাহা পরবর্তী যুগের কোনো আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারে নাই ; বাঙালির স্বভাব-ভাবুক মন সেদিন দেশকে যেভাবে মহিমান্বিত করিয়াছিল তাহা সত্যই এক বিস্ময়কর ঘটনা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা একটি বিশেষ পরিচ্ছেদরূপে আলোচনার যোগ্য। বঙ্গচ্ছেদের দিনকে রাখী-বন্ধনের দ্বারা উদ্‌যাপিত করা হইল ; সেদিন অরন্ধন—লোকে রবীন্দ্রনাথের সদ্য রচিত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি গাহিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া রাখীবন্ধন করিল ; ইহার সঙ্গে থাকিল 'গঙ্গাস্নান'— অর্থাৎ হিন্দুদের পক্ষে ইহা জাতীয়তা ভাবেরই একটি অঙ্গ। সেইদিন অপরাহ্নে কলিকাতার পার্সিবাগানের মাঠে ফেডারেশন হল বা মিলনমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল, সেইটি সম্পাদন করেন কন্‌গ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী আনন্দমোহন বসু। এই আন্দোলনের আবেগে ন্যাশনাল ফান্‌ড বা জাতীয় ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইল ; লোকে ভাবিয়াছিল, এই অর্থদ্বারা ফেডারেশন হল নির্মিত হইবে, কিন্তু অচিরেই রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মতভেদ তীব্রভাবে দেখা দিলে সকল গঠনমূলক কার্যই নষ্ট হইল—ফেডারেশন হলের গৃহ আর নির্মিত হইল না। প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে ভারত স্বাধীন হইলে পর এই গৃহ নির্মিত হয়, তবে তাহা ফেডারেশন হল হইল না ; সে স্থান হরণ করে 'মহাজাতিসদন'।

দেশমধ্যে স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণবেগে চলিতেছে। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে বিরাট জনসভা আহ্বান করিয়া বিলাতী বস্ত্র, লবন, চিনি ও মনোহারী সামগ্রী বর্জন করিবার জন্য সকলকেই উৎসাহিত করা হইতে লাগিল। এই সকল বক্তৃতা সর্বদা ভাবালুতা বর্জিত হইত না এবং বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক যুক্তিধারা আশ্রয়ী হইত না। সস্তায় সুন্দর মসৃণ বিলাতী বস্ত্রের স্থানে মহার্ঘ্য মোটা বোম্বাই কাপড় ক্রয় করিতে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রায়ই অনিচ্ছা

দেখা যাইত। সস্তা মিহি লাট্টু-মার্কা ধুতি, রেলির 'উনপঞ্চাশ' থান কাপড় ফেলিয়া কেন তাহারা এ-সব কিনিবে? দেশ কি, ইংরেজ কোথায় কাহাকে অত্যাচার অপমান করিতেছে ইত্যাদি কথা তাহাদের নিকট অত্যন্ত অস্পষ্ট। বরং তাহারা দেখে, জমিদার মহাজন ও বর্ণহিন্দুর অত্যাচার হইতে তাহাদের রক্ষা করে ইংরেজ শাসক বা তাহারই অধীনস্থ শিক্ষিত কর্মচারীরা। জনতার নিকট ইংরেজ শোষক, ইংরেজ লুণ্ঠনকারী ইত্যাদি বাক্য সম্পূর্ণ অর্থশূন্য—তাহারা দেখিতেছে. তাহাদের শোষণ করিতেছে হিন্দু জমিদারের নায়েব গোমস্তা তাহাদের শস্য লুণ্ঠন করিতেছে তাহাদের পাইক-পেয়াদা। তাহাদের অস্থিমজ্জা সার করিতেছে গ্রামের সুদখোর মহাজনরা, কাবুলীরা। ইংরেজ কোথায়?

রাজনৈতিক ফললাভের জন্য নেতাদের পক্ষে 'বয়কট'-আন্দোলন সফল করিতেই হইবে; এই কার্যে সহায় হইল স্কুল-কলেজের অপরিণত-বুদ্ধি উৎসাহী ভাবপ্রবণ বালক ও যুবকরা। তাহারাই দোকান-বাজারে 'পিকেটিং' শুরু করিল। অর্থাৎ বিলাতী সামগ্রী কাহাকেও কিনিতে দেখিলে স্বেচ্ছা-সেবকগণ তাহাকে অনুনয় বিনয় দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিত, তাহা সফল না হইলে ভীতিপ্রদর্শন ও জুলুম দ্বারা ক্রেতাকে বিলাতী দ্রব্য কিনিতে বাধা দিত। শহরে শহরে স্বদেশী গোলা প্রতিষ্ঠিত হইল—কলিকাতার ইন্‌ডিয়ান স্টোরস্ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও অন্যান্য দোকান খোলা হইল। স্বেচ্ছা-সেবকগণ কাপড়-চোপড়, শাঁখা-চুড়ি, যশোহরের চিরুনী-কাঁকন, (বর্ধমান)-কাঞ্চননগরের ছুরিকাঁচি, (বরিশাল)-উজিরপুরের নিব-কলম, (ত্রিপুরা)-কালীকচ্ছের দেশলাই প্রভৃতি বিচিত্র জিনিস ফেরী করিতে লাগিল। পূর্ব্ব-বঙ্গের মুসলমানপ্রধান বাজারে ও গ্রামে এই আন্দোলন প্রতিহত হইতে লাগিল, কারণ ঢাকার নবাব ও একদল মোল্লা, মুসলমানদের পক্ষে হিন্দুদের এই আন্দলনে যোগদান করা অযৌক্তিক বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন। এই আন্দোলনে শিক্ষিত বহু মুসলমান যোগাদান করা সত্ত্বেও মোল্লাদের কথাই সাধারণ মুসলমানের নিকট শরিয়াতের আদেশের ন্যায় অবশ্য পালনীয়।

পূর্ববঙ্গে ও বিশেষভাবে বাখরগঞ্জ জেলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও 'বয়কট'-আন্দোলন বিপুলভাবে সফলতা লাভ করে। তাহার কারণ,হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষিতশ্রেণী ও হিন্দু জমিদারগণ এই বয়কট-আন্দোলনে মনপ্রাণে

যোগদান করিয়াছিলেন। বরিশালের কোনো কোনো বাজারে বিলাতী বস্ত্র ও লবন দুষ্প্রাপ্য হয়; এইটি হইয়াছিল অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রভাবে ও তাঁহার অসাধারণ সংগঠননৈপুণ্যের জন্য। এই দেশব্যাপী বয়কটের ফলে ১৯০৮ সালে লক্ষ্মীপূজার সময়ে কলিকাতায় মাড়োয়ারী বণিকরা বিলাতী বস্ত্র সওদা (কনট্রাকট) কমাইতে বাধ্য হন। ম্যানচেষ্টারের কলওয়ালারা এই বর্জননীতির ফল অচিরেই বুঝিতে পারিলেন। যুগপৎ বোম্বাই ও আহমদাবাদের পার্সি ও গুজরাটি মিল মালিকরা বাংলার দৌলতে ধনী হইয়া উঠিল। কারণ তাহাদের মোটা কাপড়-চোপড়ের খরিদ্দার ছিল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও চীন,—সেখানে জাপানী বস্ত্রশিল্পীদের প্রতিযোগিতায় ভারতীয়দের ব্যবসা বন্ধ হইবার মতো হইয়া উঠে, বাংলা দেশের বয়কট-আন্দোলন বোম্বাই আহমদাবাদের মিল মালিকদের বাঁচাইয়া দিল।

ছাত্রেরা রাজনৈতিক সভায় যোগদান করে, পিকেটিং করে, রাস্তায় রাস্তায় দেশ-মাতৃকার নাম গাহিয়া বেড়ায়। করুণস্বরে গাহে—

'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্
জগৎজনের প্রাণ জুড়াক—
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্' ইত্যাদি।

আবার 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান' প্রভৃতি গান উত্তেজিত ভাবে গাহিয়া জনতাকে শোনায়; ব্রিটিশ শাসকও তাহাদের প্রতিনিধিদের যেন জানাইত চাহে যে, তাহারা মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ হইতে প্রস্তুত—ব্রিটিশের নাগপাশ তাহারা ছিন্ন করিবে।

অল্পকাল মধ্যেই ব্রিটিশশাসকশ্রেণীর স্বরূপ প্রকাশ পাইল। তৎকালীন বাংলা সরকারের প্রধান সেক্রেটারী রিজলি সাহেব এক পরোয়ানা বা সার্কুলার জারী করিয়া স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষগণকে জানাইয়া দিলেন যে, ছাত্রদের পক্ষে রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগদান অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এই সার্কুলারের প্রতিবাদে কলিকাতায় এন্‌টি-সার্কুলার-সোসাইটি স্থাপিত হইল (১৯০৫ নভেম্বর)। ইহার দরুণ সদস্যগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য করিবার শিক্ষালাভ করিয়া নেতাদের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠেন। ইহারা স্বদেশী বস্ত্র ও সামগ্রী -বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করেন।

সেই সময় বালক ও যুবকদের মধ্যে যে-সব তরুণ নেতা ও বক্তাদের প্রভাব

পড়িয়াছিল তাহাদের মধ্যে রমাকান্ত রায় ও শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর নাম বিশেষ-ভাবে আজও স্মরণীয়। রমাকান্ত জাপানে গিয়া স্বদেশী শিল্প শিক্ষা করিয়া আসেন; কিন্তু অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। অ্যান্টি-সার্কুলার-সোসাইটির প্রাণস্বরূপ ছিলেন শচীন্দ্রপ্রসাদ। ইনি বি. এ. পড়িতে পড়িতে অসহযোগ করিয়া রাজনীতিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রবীণদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বাংলাদেশের একছত্র নায়ক; বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, আবুল কাসেম, লিয়াকৎ হোসেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মোহিতচন্দ্র সেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, আবুল হোসেন, ডাক্তার গফুর, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, ললিতমোহন ঘোষাল, অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রভৃতি এ যুগের বিশিষ্ট বক্তা ও নেতৃস্থানীয় পুরুষ। তখনো রাজনীতিতে নারীরা অবতীর্ণ হন নাই।

১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে বঙ্গচ্ছেদ হইবার দুই মাস পরে কাশীতে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন; সভাপতি গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লে। গোখ্‌লে প্রার্থনা-সমাজের লোক, সাংবিধানিক আন্দোলনে বিশ্বাসী কোনোপ্রকার আতিশয্য বা উগ্রতা তাঁহার ছিল না। তিনি ছিলেন লোকমান্য টিলকের বিপরীত। কাশীর কন্‌গ্রেসে বঙ্গভঙ্গের কথা উঠে এবং সভায় বাংলাদেশের 'স্বদেশী' ও 'বয়কট'-নীতি অনুমোদন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়; কিন্তু তাঁহার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না— বাংলাদেশের বেদনা নিখিল ভারতীয় আন্দোলনের মর্যাদা লাভ করিল না। এই সময়ে প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স (পরে পঞ্চম জর্জ) ভারত সফরে আসিয়াছিলেন; কন্‌গ্রেস হইতে অভিনন্দন প্রস্তাব উত্থিত হইলে একমাত্র বাংলাদেশের প্রতিনিধিই তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; বাংলাদেশে রাজনীতি যে নূতন পথে চলিতেছে—ইহা তাহারই ইঙ্গিত মাত্র।

৪

১৯০৬ সালে গুডফ্রাইডের ছুটির সময় (১৩১৩ নববর্ষ) বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন। পাঠকের স্মরণ আছে গত ১৮৮৮ অব্দে এই সমিতি স্থাপিত হয়, কলিকাতায় ইহার অধিবেশন হইত। তারপর ১৮৯৫ হইতে

প্রায় প্রতি বৎসর সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন এক এক শহরে[১] হইয়া আসিতেছে। এইবারে সম্মেলনস্থান বরিশাল— আহ্বায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত; মনোনীত সভাপতি ব্যারিস্টার এ. রসুল।

পূর্ববঙ্গ আসাম তখন পৃথক প্রদেশ; ছয় মাস হইল স্যার ব্যামফীল্ড ফুলার নূতন প্রদেশে ছোটলাট নিযুক্ত হইয়া দোর্দণ্ড প্রতাপে 'রাজ্য' শাসন করিতেছেন। তাঁহার আদেশে প্রকাশ্যস্থলে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়। বরিশালের কনফারেন্স উপলক্ষ্যে কখন কোথায় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারিত হইতে পারিবে সে-সম্বন্ধে আহ্বায়করা অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সম্মেলন-অধিবেশনের অনুমতি দিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে আগত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও এন্‌টি-সার্কুলার-সোসাইটির সদস্যগণ বরিশাল স্টিমারঘাটে নামিয়া এই শর্তের কথা শুনিয়া দুঃখে ও ক্ষোভে অভ্যর্থনা সমিতির আতিথ্যগ্রহণ করিলেন না। বঙ্গচ্ছেদের পর এই প্রথম কন্‌ফারেন্স— বাংলাদেশের নানাস্থান হইতে প্রাও ৩০০ সদস্য প্রতিনিধি উপস্থিত।

সরকারী পক্ষ হইতে সভার অধিবেশন লইয়া এমন কাণ্ড করিতে লাগিলেন যেন দেশের মধ্যে আকস্মিক একটা বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে—তাহার আশু দমন প্রয়োজন। সভায় যাইবার পথ পুলিশের ঘোড়সওয়ারে ছাইয়া গেল। এন্‌টি-সার্কুলার-সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবকগণ 'বন্দেমাতরম্' ব্যাজ ধারণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন; এমন সময় পুলিশ তাহাদের আক্রমণ করিল। নিরস্ত্র নিরুপদ্রব মিছিলের উপর লাঠি ও বেত চালাইতে সেদিন বৃটিশ শাসকদের ইজ্জতে বাধিল না। ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী, চিত্তরঞ্জন গুহ বিশেষভাবে আহত হন; কিন্তু মার খাইয়া কোনো যুবক 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি বন্ধ করেন নাই—অহিংসক সত্যাগ্রহ সেইদিন ভারতে আরম্ভ হইল। পুলিশ সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন সাহেবের বাড়িতে লইয়া

১ ১৮৯৫ বহরমপুর (আনন্দমোহন বসু); ১৮৯৬ কৃষ্ণনগর (গুরুপ্রসাদ সেন); ১৮৯৭ নাটোর (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর); ১৮৯৮ ঢাকা (কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়); ১৮৯৯ বর্ধমান (অম্বিকাচরণ মজুমদার); ১৯০০ ভাগলপুর (রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব); ১৯০১ মেদিনীপুর (নগেন্দ্রনাথ ঘোষ) ১৯০২ কটক (সভা হয় নাই); ১৯০৩ বহরমপুর (জগদিন্দ্রনাথ রায়); ১৯০৪ বর্ধমান (আশুতোষ চৌধুরী); ১৯০৫ ময়মনসিংহ (ভুপেন্দ্রনাথ বসু); ১৯০৬ বরিশাল (আবদুল রসুল); ১৯০৭ বহরমপুর (দীপনারায়ণ সিংহ); ১৯০৮ পাবনা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

যায়, সেখানে সরাসরি তাঁহার দুই শত টাকা জরিমানা হয়। জরিমানার টাকা দিয়া তাঁহারা সভাক্ষেত্রে আসিয়া সভা করিলেন। পরদিন পুলিশকর্তা আসিয়া জানাইলেন যে, সভায় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারিত হইবে না, এই অঙ্গীকার না করিলে তাঁহারা সভার অধিবেশন হইতে দিবেন না ; এই অপমানকর শর্তে নেতারা সভা আহ্বান করিতে রাজি হইলেন না।

এই রাজনৈতিক সম্মেলনের সহিত সাহিত্য সম্মেলনের এক আয়োজন হয়, রবীন্দ্রনাথ এই সভায় মনোনীত সভাপতিরূপে বরিশালে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই পরিস্থিতিতে সে-সভাও পরিত্যক্ত হইল।

৫

বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলন ভাঙিবার চেষ্টা না করিলে ও যথাবিধি সভার অধিবেশন, বক্তৃতা প্রদান ও শ্রবণ, প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন, সংশোধন ও বর্জন প্রভৃতি গতানুগতিক কার্য নিরুপদ্রবে সম্পাদিত হইতে দিলে ইংরেজ এই আন্দোলনের যত না উপকার করিতেন—সভা ভাঙিয়া দিয়া তাহার শতগুণ উপকার সাধন করিলেন। প্রিয়নাথ গুহ তাঁহার 'যজ্ঞভঙ্গ' গ্রন্থের ভূমিকায় (১৩১৪) লিখিয়াছিলেন, "বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি সংশ্লিষ্ট ব্যাপার সমূহ রক্তাক্ষরে বাঙালির স্মৃতিপটে লিখিত থাকা কর্তব্য। সভ্যতাভিমানী ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের রাজত্বে প্রকাশ্য দিবালোকে বিনা অপরাধে রাজপুরুষগণ কর্তৃক শিক্ষিত লোকগণের প্রহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত বোধ হয় বরিশালের প্রাদেশিক সমিতি উপলক্ষ্যেই দেখা গিয়াছিল।"

বরিশালের আঘাতে সমগ্র বঙ্গদেশ যেন নূতনভাবে জাগিয়া উঠিল। লোকে গাহিল 'বরিশাল পুণ্যে বিশাল, হলো লাঠির ঘায়ে'। লোকে আরও দেখিল, ব্রিটিশরা সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য কতদূর নীচতা করিতে পারে। 'বয়কট'-আন্দোলন পূর্ণ বেগে চলিতে লাগিল এবং এখন হইতেই একদল যুবকের মনে এই ভাবনাই বলবৎ হইল যে, আবেদন-নিবেদন-ক্রন্দনের পথে দেশের মুক্তি আসিবে না, তাহারা বুঝিল 'এ-সব শক্র নহে রে তেমন'। 'ভীরু' বাঙালির ছেলেরা রুদ্র পথের পথিক হইল। সে কথা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিব।

বরিশালের ব্যাপারে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই ভাবান্বিত করিয়া তুলিল। দেখা গেল নেতাদের মধ্যে কর্মপদ্ধতি লইয়া মতভেদ ক্রমেই আদর্শগত মতানৈক্যে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে—সাংবিধানিক মতবাদ ও বিপ্লববাদ তখন নরম ও চরম বা মডারেট ও একস্‌ট্রিমিস্ট নামে চালু হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বরিশাল হইতে ফিরিবার পক্ষকাল মধ্যে কলিকাতার এক জনসভায় রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "কলহ অক্ষমের উত্তেজনা প্রকাশ তাহা অকর্মণ্যের এক প্রকার আত্মপ্রসাদ।" তিনি বলিলেন, "ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই। সুতরাং কোনো একজনকে আমাদের 'দেশনায়ক' বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুরেন্দ্রনাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমি সমস্ত বাঙালিকে আহ্বান করিতেছি।"

কিন্তু দুর্বলের সম্বল 'দল'; সুতরাং 'দল' সৃষ্টি হইতে দলাদলির জন্ম অনিবার্য। পরস্পরকে দলন প্রতিদলন করিতেই দলের অনেকখানি বল অপব্যয়িত হইয়া যায়— দেশের কাজের জন্য সামান্য শক্তিই অবশিষ্ট থাকে; কলহ একপ্রকার আত্মপ্রসাদ; এই ব্যাধি এখনো দেশব্যাপী—উহার তীক্ষ্ণতা তীব্রতা বহুগুণিত হইয়াছে— প্রতিকারের পথ এখনো অনাবিষ্কৃত!

জাতীয় শিক্ষা

১৯০৬ সালের ১৫ই অগস্ট কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ বা National council of education স্থাপিত হইল; পঞ্চাশ বৎসর পরে ১৯৫৬ সালের ১৫ই অগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন করিলেন। এখন এই জাতীয় শিক্ষার পটভূমি এখানে বিবৃত হইতেছে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতাদের প্রধান সহায় ছিল স্কুল-কলেজের ছাত্ররা। বঙ্গীয় গভর্মেণ্ট ছাত্রদের দমন করিবার জন্য প্রথম নিয়ম জারী ও পরে আইন পাশ করিলেন; বঙ্গচ্ছেদ ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে (২২ অক্টোবর ১৯০৫) কার্লাইল সাহেব এক সার্কুলার দ্বারা স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষগণকে জানাইয়া দিলেন যে, ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতিতে যোগদান করা বা সভাসমিতিতে উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

কার্লাইল সার্কুলার ঘোষিত হইবার দুইদিন পরে কলিকাতার ফীল্ড এণ্ড একাডেমির ভবনে কলিকাতায় জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের কথা প্রথম উঠিল। সেইদিন অন্যত্র আর-একটি সভায় মেজর নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের সভাপতিত্বে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, "গবর্মেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গবর্মেণ্টের চাকরী দুই-ই পরিত্যাগ করিতে হইবে।" অর্থাৎ প্রথম নন্-কো-অপারেশন বা অসহযোগনীতির কথা উঠিল বাঙালির এই আন্দোলনের মধ্যে; গান্ধীজি পনেরো বৎসর পরে (১৯২১) এই কথার পুনরাবৃত্তি করেন নূতন পরিস্থিতি উপলক্ষে।

এই সভার কয়েকদিন পরে আর একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমাদের সমাজ যদি নিজের বিদ্যাদানের ভার নিজে না গ্রহণ করেন, তবে একদিন ঠকিতেই হইবে।...(বিদেশীয়) গবর্মেণ্ট এদেশে অনুকূল শিক্ষা কখনো দিতে পারেন না।...বিদেশী অধ্যাপক অশ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষা দেন। শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা এমন একটি জিনিষ পাই, যাহা আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে অনুকূল নহে।"

প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা ও কবিদের আন্দোলন ও আলোচনার অন্তরালে গত কয়েক বৎসর হইতে এক নীরব বিদ্বান আদর্শবাদী ভাবুকের চারিপার্শ্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রতিভাবান ছাত্র শিক্ষা প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার সংকল্প লইয়া সমবেত হইয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির নাম ডন্ সোসাইটি এবং নীরব সাধকের নাম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। যে কয়জন তরুণ এই ডন্ সোসাইটির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁহারা হইতেছেন—প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, হারানচন্দ্র চাক্‌লাদার, কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত, অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ও বিনয়কুমার সরকার।

এই ডন্ সোসাইটির[১] এক সভায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "আজ যে সকল ছাত্র গবর্মেণ্টের কৃত অপমানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে যে কুসুমাস্তৃত পথ রহিয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহাদিগকে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্য পথ প্রস্তুত করিতে হইবে।"

পূর্ববঙ্গ-আসাম সরকার এখনো এক মাস স্থাপিত হয় নাই; তথাকার শিক্ষা-পরিচালক লায়ন্স সাহেব বঙ্গ সরকারের সদ্-দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ছাত্রদের পক্ষে রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া পরোয়ানা প্রচার করিলেন।

রংপুরের গবর্মেণ্ট স্কুলের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বপ্রথম সেখানে ছাত্রদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হয় এবং ইহারই প্রতিক্রিয়ায় ৯ই নভেম্বর (১৯০৫) পার্টিশনের ২৩ দিন পরে সেখানে 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হইল; তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন তরুণ অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায়।

সেইদিনই কলিকাতায় পান্তির মাঠে[২] বিরাট জনসভায় সুবোধচন্দ্র বসু

১ The Dawn নামে পত্রিকা ১৮৯৩ হইতে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন। ১৯০২-এ ডন্ সোসাইটি স্থাপিত হয় ও ১৯০৬ অগস্ট মাসে জাতীয়-শিক্ষা পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইলে এই পত্রিকা প্রায় উহারই অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। ১৯১৩ পর্যন্ত পত্রিকা চলিয়াছিল অর্থাৎ ১৮৯৩ হইতে ১৯১৩ এই বিশ বৎসর এই পত্রিকায় ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সম্মুখে এই মাঠ ছিল; এখন সেখানে বিদ্যাসাগর কলেজের হস্টেল প্রভৃতি গৃহ।

মল্লিক ঘোষণা করিলেন যে, জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা দান করিবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি সেইদিনই কলিকাতার আর এক স্থানে এন্টি-সার্কুলার-সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইল যাহার কথা আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি।

জাতীয় শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন দেখা দিল তাহা নিছক রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়শিক্ষা প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া স্বয়ং চারি বৎসর পূর্বে (ডিসেম্বর ১৯০১) বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন গবর্মেণ্টের সার্কুলারের বিরুদ্ধে ছাত্রমণ্ডলী হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন যে, তাহারা বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় 'বয়কট' করিবেন উহা 'গোলামখানা'—তাহাদের দাবি, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হউক। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার আন্দোলন' পুস্তিকায় পার্টিশনের দুই মাস পরে লিখিলেন (২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১২), "আজ যাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতেছেন, আমাদের এখনি আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাই, কালই সেখানে পরীক্ষা দিতে হইবে, তাঁহাদিগকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থায়ী সহায় বলিয়া মনে হয় না। এমন-কি তাঁহারা ইহার বিঘ্নস্বরূপ হইতে পারেন।···প্রবল প্রতাপশালী পক্ষের প্রতি রাগ করিয়া যখন মনে জেদ জন্মে, তখন অতি সত্বর যে অসাধ্য সাধন করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা ইন্দ্রজালের দ্বারাই সম্ভব।"···

"কিন্তু মায়ার ভরসা ছাড়িয়া দিয়া যদি যথার্থ কাজের প্রত্যাশা করা যায়, তবে ধৈর্য ধরিতেই হইবে। ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিতেই হইবে।···দেশীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে প্রথম হইতেই আমাদের এই যে আঘাতকর অধৈর্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহাই আমাদের আশঙ্কার কারণ।"

কিন্তু কবির কথা শুনিবার মত ধৈর্য উত্তেজিত দেশবাসীর নাই, নেতাদেরও নাই, তাঁহারা ইন্দ্রজালদ্বারা দেশ উদ্ধার করিবেন— সংহত সুচিন্তিত কর্মের দ্বারা নহে। তবে একটি অধীন জাতিকে বহু ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হয়; বারে বারে আমরা এইরূপ সঙ্কটের সম্মুখীন হইব।

২

বঙ্গচ্ছেদ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯০৫ সালে জাতীয় শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেতাদের মনে আশ্রয় পায়। কিন্তু 'জাতীয় শিক্ষা' বলিতে কি বুঝায় সে-সম্বন্ধে এ পর্যন্ত সুস্পষ্ট ধারণা কেহ দিতে পারেন নাই। এই স্বদেশী আন্দোলনের পরেও এ দেশে 'জাতীয়'-আন্দোলনের নব নব তরঙ্গ আসিয়াছে, তখনও নেতাদের মধ্যে 'জাতীয়' বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ভাবনা দেখা দিয়াছে ও নানাস্থানে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিতও হয়; কিন্তু স্থায়ী ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। বর্ষার সময়ে আগাছার ন্যায় তাহাদের আবির্ভাব হয়, তারপর অল্পকাল মধ্যে রাজনৈতিক খরতাপে শীর্ণ হইয়া যায়; অথবা আপনার মধ্যে রসের অভাবে শুকাইয়া মরে। উত্তেজনার বহ্নি উদ্‌গীরণ দ্বারা জীবিকার স্বাভাবিক পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় উৎসাহ আপনা হইতেই ম্লান হইয়া আসে।

'জাতীয় শিক্ষা' বলিতে কি বুঝায় তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট; কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বা আলিগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এমন কি পরবর্তী যুগের যাদবপুর কলেজ অব্ ইন্‌জিনিয়ারিং এন্‌ড টেকনলজিকে 'জাতীয়' শিক্ষায়তন আখ্যা দিলে 'জাতীয়-শিক্ষালয়ে'র অর্থ কিছুমাত্র পরিষ্কার হয় না।

যাহা হউক ১৯০৫ সালে রংপুরে প্রথম 'জাতীয় বিদ্যালয়' স্থাপনের নয় মাসের মধ্যে কলিকাতায় ন্যাশনাল কাউন্‌সিল অব্ এডুকেশন বা জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ স্থাপিত হইল—১৫ই অগস্ট ১৯০৬। ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের উদার দেশপ্রেমিক ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী পাঁচলক্ষ টাকা দান করিলেন; সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক ইতিপূর্বেই লক্ষ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তিনি এইবার কাউনসিলের হস্তে সেই টাকা সমর্পন করিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবহারজীবী রাসবিহারী ঘোষ বিস্তর অর্থদানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

শিক্ষা ব্যবহারিক দিকে চালিত হইবে, না আকাডেমিক বা মানসিক উৎকর্ষের দিকে নীত হইবে এই লইয়া শিক্ষা-ভাবুকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। ব্যারিস্টার স্যর তারকচন্দ্র পালিত, ডাক্তার নীলরতন সরকার প্রভৃতি কয়েকজন টেক্‌নিক্যাল বা কারুশিল্প বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। তখন শিবপুর ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ ছাড়া উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল

না। সেইজন্য ইহারা বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপন করিলেন। আজকাল আপার সার্কুলার রোডের উপর সায়েন্স কলেজ বা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ের যে বিরাট সৌধ দেখা যায় সেইখানে ১৯০৬ সালে টেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। এই বাস্তববাদী ভাবুকরা মনে করিতেন ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে টেক্‌নিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রসারের উপর।

অপর দিকে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীগণ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে সর্বাঙ্গীন শিক্ষার আয়োজন করিলেন, স্কুল হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার বিবিধ ব্যবস্থার অতি বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত হইল। স্বাভাবিক অভিব্যক্তিবাদের ধর্মে ইহার অভ্যুদয় হইল না, ইহা হইল 'তিলোত্তমা'—নানা 'উৎকৃষ্টে'র সমবায়ে পরিকল্পিত। বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে এমন খুব কম লোক ছিলেন, যাঁহার নাম্ এই নবীন প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইল না। বিদ্যালয়, কলেজ, ইন্‌জিনিয়ারিং বিভাগ, গবেষণাগার সবই একই সময়ে স্থাপিত হইল—রাতারাতি শাখা-প্রশাখাযুক্ত বটবৃক্ষ প্রান্তর মধ্যে শোভিত হইল। লোকে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া মনে মনে ভাবিল ইহাই বুঝি জাতীয় শিক্ষা!

ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র ও সোসাইটির যুবক সদস্যগণ প্রায় সকলেই এই নব প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হইলেন; ইহাদের নাম আমরা পূর্বে করিয়াছি।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ শিক্ষাদান ও বিদ্যাচর্চা ব্যাপারে যুগান্তকারী; পাঠশালা হইতে হাতের কাজ ছিল আবশ্যিক; স্কুলে বা মধ্যশিক্ষায় বিজ্ঞান অধ্যাপনার ব্যবস্থা হয়; বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে ভারতীয় সংস্কৃতি আলোচনার জন্য সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, মারাঠি, হিন্দিভাষার শিক্ষণ ব্যবস্থা হয়। কলেজে উচ্চতর বিজ্ঞান চর্চার আয়োজন হয় যথেষ্ট; অতঃপর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান আয়ত্ত করিবার জন্য বহু ছাত্রকে তাঁহারা আমেরিকায় প্রেরণ করেন।

বাঙলার এই মুষ্টিমেয় শিক্ষাশাস্ত্রী সেদিন জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে শিক্ষা ব্যাপারে যে-সব সংস্কার প্রবর্তন করেন, তাহাই কালে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণতা দান করেন। সেখানে ভারতীয় সংস্কৃতি গবেষণার নূতন ব্যবস্থা করিলেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। আসলে এই গবেষণার পথিকৃৎরূপে কাজ শুরু করিয়াছিলেন, ডন ম্যাগাজিনের লেখক গোষ্ঠী।

ইঁহারাই ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতির গবেষণা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশের উপর জোর দিয়াছিলেন। বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে প্রথম অনুসন্ধান ও গবেষণা -পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল ডন সোসাইটির এক যুবক সদস্যের দ্বারা। ইনি হইতেছেন অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। বাঙালি গান করে, 'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়'—আজ তাহারা রাধাকুমুদের গ্রন্থ হইতে এই উক্তির ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইল। বাঙালি তাহার অতীত গৌরব লইয়া আজ গর্ব করিতে পারিল।

৩

জাতীয় আন্দোলনে উদ্দীপ্ত হইয়া শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বড়োদার শিক্ষা বিভাগের কার্য ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে যোগদান করিলেন। অরবিন্দ সিভিলসার্জেন কে. ডি. ঘোষের পুত্র ও রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র; ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মনোমোহন ঘোষ অধ্যাপক ছিলেন, ইংরেজি কবিতা লিখিয়া যশস্বী হন; অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্র ঘোষ ভারতের ব্যবহারিক বিপ্লববাদের প্রথম পুরোধা। বড়োদায় অরবিন্দ চৌদ্দ বৎসর কাজ করিয়াছিলেন; বিংশশতকের আরম্ভভাগে স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর (জুলাই ১৯০২) অরবিন্দের মনে ভারতের মুক্তির কথা ধীরে ধীরে জাগিতে থাকে। তিনি কন্‌গ্রেসের মৃদুনীতি ও ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারী মনোভাবের প্রতি আদৌ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব-বাদের প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন; আমরা বিপ্লববাদের বিস্তারিত ইতিহাস অন্যত্র আলোচনা করিব। অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সহিত দীর্ঘকাল যুক্ত থাকিতে পারিলেন না; রাজনীতি চর্চার মধ্য দিয়া বিপ্লববাদ প্রচার উদ্দেশ্যেই তিনি বড়োদার কার্য ত্যাগ করিয়া বাংলাদেশে আসিয়া ছিলেন। জাতীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্বেই অরবিন্দ বঙ্গদেশের বৈপ্লবিক রাজনীতির সহিত কী ভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে-আলোচনা আমরা অন্যত্র করিয়াছি।

স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলন অচিরকালের মধ্যে স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রামের দিকে ধাবিত হইয়া চলিল। আমাদের আলোচ্য পর্বে বাংলাদেশে বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন চরমপন্থী বা একৃসট্রিমিস্টদের অন্যতম নেতা। তিনি New India নামে এক সাপ্তাহিক কাগজে রাজনীতি সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিতেন তাহা মামুলি রাজনীতিচর্চা হইতে পৃথক। অরবিন্দের আগ্রহে 'নিউ ইন্‌ডিয়া' পত্রিকার স্থলে 'বন্দেমাতরম্' নামে ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইল ১৯০৬ সালের ৬ই অগস্ট বয়কট প্রস্তাব গ্রহণের এক বৎসর পর, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ স্থাপনের নয় দিন পূর্বে। অরবিন্দের Absolute autonomy free from British control নামে প্রবন্ধ ও তাহার খসড়া প্রস্তাব বক্ষে লইয়া 'Bande Mataram' আবির্ভূত হইল। এই পত্রিকা স্বাধীনতার নূতন বাণী শুনাইল; পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি প্রসঙ্গে অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন, "আমাদের উদ্দেশ্য— আমাদের দাবী এই যে, জাতি হিসাবে আমাদের ধ্বংস অবাস্তব, আমরা বাঁচিয়া থাকিবই, কোনো শক্তি আমাদের বাধা দিলে, তাকে ন্যায়ের বিচার গ্রহণ করিতেই হইবে। কারণ প্রকৃতির নিয়ম আর ভাগবত নিয়ম অভিন্ন, এবং এইরূপে সেই শক্তি অভিন্ন হইবেই··।"

অরবিন্দের ধ্যাননেত্রে দেশ ও দেবী মাতৃমূর্তিতে প্রকাশিত। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বন্দেমাতরম্-এর মন্ত্রদ্রষ্টারূপে অন্তর হইতে শ্রদ্ধা করিতেন। শিবাজীর 'ভবানী দেবী' তাঁহার আরাধ্যা। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ হইতেই ধর্ম ও রাজনীতি তিনি মিশাইয়া লইলেন।

অল্পকাল পরে 'রাজা' সুবোধচন্দ্র মল্লিকের অর্থসাহায্য লাভ করিয়া 'বন্দেমাতরম্' দৈনিক কাগজরূপে বাহির হইল এবং একটি লিমিটেড কোম্পানি হইল পরিচালক, বিপিনচন্দ্র সম্পাদক। 'বন্দেমাতরম্' দেশের লোকের চিন্তায় যে বিপ্লব আনিয়াছিল, চরমপন্থী দলের শক্তি যে ভাবে বৃদ্ধি করিল, নবীন ও প্রাচীনের সংঘর্ষ আসন্ন এবং অনিবার্য করিয়া তুলিল সে ইতিহাস আজ বিস্মৃত। শিক্ষিত বাঙালিমাত্রই 'বন্দেমাতরম্' পড়িতেন।

'বন্দেমাতরম্' প্রকাশিত হইবার প্রায় পাঁচমাস পূর্বে কলিকাতার এক গলি হইতে 'যুগান্তর' নামে এক বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল (মার্চ ১৯০৬)। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবব্রত বসু, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি যুবকগণ ইহার উদ্যোক্তা। সক্রিয় বিপ্লববাদ, সন্ত্রাসবাদ ইহাদের দ্বারা প্রচারিত হইল; এ সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিব।

২

'বন্দেমাতরম্' ও 'যুগান্তর' আবির্ভাবের কয়েক মাস পূর্বে 'সন্ধ্যা' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা বাংলাদেশের নবজাগরণের বাণী লইয়া আবির্ভূত হয়; সেটি হয় ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে, অর্থাৎ পার্টিশন লইয়া আন্দোলনের মুখে। ইহার সম্পাদক ও সর্বেসর্বা ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ব্রহ্মবান্ধব বাংলার রাজনীতি ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি জটিল চরিত্র। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁহার স্থানও অবিস্মরণীয়।

ব্রহ্মবান্ধবের আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬১); ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল খ্রীষ্টভক্ত রেঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। কেশবচন্দ্র সেন যখন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে রত, সেই সময়ে তরুণ ভবানীচরণ ব্রাহ্মধর্ম প্রচার উদ্দেশে সিন্ধুদেশে গিয়াছিলেন। সেখানে খ্রীষ্টান পাদরীদের প্রভাবে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন; পরে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া 'ব্রহ্মবান্ধব' নাম গ্রহণ করেন। ইনি খ্রীষ্ট ও মেরী মাতার পূজা করিতেন, গৈরিক বসন পরিতেন, বেদান্ত দর্শন পড়িতেন, হিন্দুধর্মের সকল প্রকার সংস্কার-কুসংস্কারকে কেবলমাত্র সেগুলি হিন্দু বলিয়াই সমর্থন করিতেন। ১৯০১ সালে Twentieth Century নামে এক পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেন; হিন্দুত্বের নূতন অর্থ ও স্বাদেশিকতার ব্যাখ্যা ছিল এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সময়ে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে একটি মুগ্ধ আদর্শীয়তা সৃষ্টি করিয়া শিক্ষা ব্যাপারে প্রাচীন গুরুগৃহের স্বপ্ন দেখিতেছেন। শান্তি-নিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনকল্পে ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথকে যে সহায়তা দান করিতে আসেন, তাহার মূলে ছিল উভয়ের 'হিন্দুত্ব' সম্বন্ধে মুগ্ধ ধারণা। কিন্তু

ব্রহ্মবান্ধব কোনো বিষয়কেই দীর্ঘকাল ধরিয়া থাকিতে পারিতেন না বলিয়া রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। বোলপুর হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় পৌছিয়াই তিনি সংবাদ পাইলেন পূর্বদিন স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছেন (২ জুলাই ১৯০২ আষাঢ় ১৩০৯)। তদবধি তাঁহার সঙ্কল্প হইল বেদান্ত প্রচার। ইংলন্ডে গিয়া ১৯০২-০৩ সালে অকস্ফোর্ড ও কেমব্রিজে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। আশ্চর্যের বিষয় যুগপৎ 'বঙ্গবাসী'র ন্যায় অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকায় তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম সমর্থন করিয়া পত্র লিখিতেছিলেন। বৈদান্তিকতার সহিত সর্বপ্রকার কুসংস্কারের সমর্থনের মধ্যে কোনো বিরোধ জাতীয়তাবাদী হিন্দুরা দেখিতে পাইতেন না। দেশে ফিরিয়া তিনি এই হিন্দুত্বের কথাই প্রচার করেন জাতীয়তাবাদের নামে। অতঃপর বঙ্গচ্ছেদ-আন্দোলন দেশে মুখর হইয়া উঠিলে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার আবির্ভাব হইল (১৯০৫)। 'সন্ধ্যা'য় ব্রহ্ম-বান্ধবের হিন্দুয়ানী সম্পর্কে যেরূপ গোঁড়া রক্ষণশীল মনোভাব প্রকাশ পাইল তাহা আদৌ জাতীয়তাবাদের সমর্থন করে না। তিনি 'সন্ধ্যা' পত্রের সূচনায় লিখিলেন—

"আমরা হিন্দু, আমরা হিন্দু থাকিব। বেশ-ভূষায়, অশনে-বসনে সর্ব-প্রকারে হিন্দু থাকিব।...ইউরোপ হইতে আমরা স্বাধীনতা, মৈত্রী, সাম্য গ্রহণ করিব। কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্মকে নষ্ট হইতে দিব না। ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়া জাতি-মর্যাদা রক্ষা করিলে কোন দোষ স্পর্শ করিবে না।...সমুদয়ের ভিতর ঐ এক সুরের খেলা থাকিবে বেদ, ব্রাহ্মণ ও বর্ণধর্ম।"[১]

গিরিজাশঙ্কর লিখিতেছেন, "গোঁড়া হিন্দুয়ানী ও তার সঙ্গে কড়াপাকের উগ্র রাজনীতি 'সন্ধ্যা' প্রথম স্তরে বাঙালীকে পরিবেশন করিল।" এই সময়ে হিন্দু জাতীয়তা উদ্রিক্ত করিবার জন্য সকলেই উৎসুক; তবে সেই 'হিন্দুত্ব' এত বিচিত্র যে তাহার কোনো একটি সাধারণ সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রাজনারায়ণ বসুর হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনী হিন্দুধর্ম এক নহে; ব্রহ্মবান্ধবের হিন্দুধর্ম ও বিবেকানন্দের হিন্দুধর্মের মধ্যে আসমান-জমীন ভেদ; ব্রহ্মবাদী থিওজফিস্টদের মতবাদ ও ব্রাহ্মদের ব্রহ্মবাদ এক পদার্থ নহে।

১ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী; শ্রীঅরবিন্দ ও স্বদেশী আন্দোলন পৃ. ৩৭২

বর্ণাশ্রমের নামে জাতিভেদ ও জাতিভেদের দোহাই দিয়া ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার, গুরু ও ব্রাহ্মণের পদমর্যাদা অলঙ্ঘণীয় বলিয়া ঘোষণা ইত্যাদি হইল ব্রহ্মবান্ধবের ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ সেরূপ মতবাদ প্রচার করেন নাই—বরং বিপরীত মত পোষণ—ব্রাহ্মণ-বিরোধী ও ছুৎমার্গ-বিরোধী অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। স্বামীজির লেখাতে তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।

আবার রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণত্বের যে আদর্শ ব্যাখ্যা করিলেন তাহা কোনো কলির ব্রাহ্মণের দ্বারা অনুসরণ করা অসম্ভব। তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ নগরকোলাহল ও স্বার্থসংগ্রামের বাহিরে তপোবনে ধ্যানাসনে অধ্যাপকের বেদীতে আহ্বান করিতেছে—ব্রাহ্মণকে তাঁহার সমস্ত অবমাননা হইতে দূরে আকর্ষণ করিয়া ভারতবর্ষ আপনার অবমাননা দূর করিতে চাহিতেছে—ভারতবর্ষে যাঁহারা ক্ষাত্রব্রত বৈশ্যব্রত গ্রহণ করিবার অধিকারী আজ তাঁহারা ধর্মের দ্বারা কর্মকে জগতে গৌরবান্বিত করুন—তাঁহারা প্রবৃত্তির অনুরোধে নহে, উত্তেজনার অনুরোধে নহে, ধর্মের অনুরোধেই অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত ফল কামনায় একান্ত অনাসক্ত হইয়া প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হউন।" লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৩০৯ সালের আষাঢ় মাসে, যে সময়ে স্বামীজির মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্ব রাজনারায়ণ বসুর ধারায় অনুপ্রাণিত। ঠিক সেই সময়ে রাজনারায়ণের দৌহিত্র অরবিন্দও আপনাকে নৈষ্ঠিক হিন্দু বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন। ১৯০১ এপ্রিল মাসে বিবাহের পূর্বে অরবিন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু সমাজে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার এক মাস পরে Twentieth Century কাগজে ব্রহ্মবান্ধব (অগস্ট ১৯০১) প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করেন। "আমাদের কিঞ্চিৎ গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে (we must make প্রায়শ্চিত্ত, we must eat a little cow-dung)।"[১] আশ্চর্যের বিষয়, এই Twentieth Century পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সদ্য প্রকাশিত 'নৈবেদ্য' (আষাঢ় ১৩০৮) কাব্যের ব্রহ্মবান্ধব কৃত সমালোচনা পাঠ করিয়া এবং বঙ্গদর্শন (১৩০৮) পত্রিকায় 'হিন্দুত্ব' সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়া এতই মুগ্ধ হন যে অবশেষে তিনি তাঁহার পরিকল্পিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম

১ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ ও স্বদেশী আন্দোলন পৃ. ২৪৮

সংগঠনের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করেন। বিংশ শতকের গোড়ার দিকের জাতীয়তাবাদের ইহাই ছিল রূপ; এবং এই জাতীয়তাবাদীরাই উগ্র স্বাদেশিক ও পরে ইঁহারাই হন কন্‌গ্রেস-বিরোধী চরমপন্থী।

১৯০৬ সাল হইতে 'সন্ধ্যা' হইল জনতার কাগজ; পূর্বের গুরুগম্ভীর ভাষা পরিত্যক্ত হইল; সাধারণের হৃদয়গ্রাহী গ্রাম্য ভাষা, রূপকথা, ছড়া, প্রবাদ, হেঁয়ালি প্রভৃতি দ্বারা এমন এক অদ্ভুত ভাষা সৃষ্ট হইয়াছিল, যাহা অশিক্ষিত জনসাধারণেরও বোধগম্য হইল। "কখন 'সন্ধ্যা' আসিবে—আজ 'সন্ধ্যা'য় কি লিখিয়াছে—এই জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া থাকিত।"[১] আজ জনতার জন্য সে ভাষায় কেহ দৈনিক কাগজ প্রকাশ করে না।

৩

বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলন হয় ১৯০৬ সালে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্গচ্ছেদের অল্পকালের মধ্যে কর্মপদ্ধতি লইয়া নেতা ও তাঁহাদের অনুবর্তীদের ভিতর মতভেদ দেখা দিয়াছিল। প্রগতিবাদীরা, যাঁহারা সে-সময়ে চরমপন্থী বলিয়া অভিহিত হইতেন, তাঁহারা আপনাদের দল পুষ্ট করিবার জন্য যেভাবে কর্মসূচী প্রণয়ন করিলেন, তাহা হিন্দু জাতীয়তার উদ্বোধকমাত্র। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী এই নবীন দল হিন্দুসমাজকে উদ্বোধিত করিবার ভরসায় কলিকাতায় শিবাজী-উৎসবের আয়োজন করিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে, মহারাষ্ট্র দেশে ১৮৯৭ সালে টিলকের প্রেরণায় শিবাজী-উৎসব প্রবর্তিত হয়। সাত বৎসর পর বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সময়ে বাংলাদেশে শিবাজী-উৎসবের আন্দোলন সৃষ্টি করেন সখারাম গণেশ দেউস্কর; তিনি 'শিবাজীর দীক্ষা' নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন, রবীন্দ্রনাথ উহার ভূমিকারূপে 'শিবাজী-উৎসব' কবিতাটি লিখিয়া দেন (গিরিডি ২৭ আগস্ট ১৯০৪)। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড ভারতের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা কালে হিন্দু ভারতের ধ্যানের বস্তু হইয়া উঠে। বাঙালি মারাঠি-শৌর্যকে আর বর্গীর হাঙ্গামা বলিয়া দেখিতে প্রস্তুত নহে—

[১] প্রবোধচন্দ্র সিংহ—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব পৃ. ৮৪-৮৫। গিরিজাশঙ্কর হইতে উদ্ধৃত পৃ. ৩৭৫

"মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি,
এক কণ্ঠে বলো জয়তু শিবাজী।
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি,
এক সঙ্গে চলো মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পুরব
দক্ষিণ ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।"

এই 'শিবাজীর দীক্ষা' পুস্তিকা ও 'শিবাজী-উৎসব' কবিতা প্রকাশিত (বঙ্গদর্শন ১৩১১ আশ্বিন) হইবার প্রায় দুই বৎসর পর চরমপন্থী স্বাদেশিকদের ও বিশেষ করিয়া ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উদ্যোগে ফীল্ড এণ্ড একাডেমি ক্লাবের পান্তির মাঠে শিবাজী-উৎসব নিষ্পন্ন হইল। এই উৎসবের অঙ্গরূপে 'ভবানী পূজা' হইয়ছিল (জুন ১৯০৬)। এই ভবানী পূজার সহিত অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকার সম্বন্ধ আছে। ১৯০৫ সালের শেষভাগে বড়োদায় 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকা তিনি লিখিয়াছিলেন। স্বাদেশিকতার সহিত গীতা, মা-কালী প্রভৃতি মিশাইয়া 'ভবানী মন্দিরের' পরিকল্পনা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বাংলাদেশে আনেন ও ১৯০৬ সালের প্রথম ভাগে গোপনে তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। শিবাজী এই ভবানীদেবীর ভক্ত ছিলেন।

শিবাজী-উৎসব তথা ভবানী-পূজা উপলক্ষে মহারাষ্ট্রীয় নেতা টিলক, খাপার্দে, মুঞ্জেকে কলিকাতায় আমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। লোকমান্য টিলক মেলার উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় দিন তিন মহারাষ্ট্রীয় বীর হিন্দিতে বক্তৃতা দিলেন। মোটকথা আন্দোলন ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে নেতারা হিন্দুদের ধর্মভাবালুতাকে উত্তেজিত করিয়া জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত করিতে চাহিতেছেন।

শিবাজী উৎসবের সহিত ভবানীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজার ব্যবস্থাদি হইলে কৃষ্ণকুমার মিত্র ও রবীন্দ্রনাথ এই পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নাই। তাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া যে এই অনুষ্ঠান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, তাহা নহে, তাঁহারা জানিতেন 'জাতীয়' আন্দোলনের মধ্যে এই শ্রেণীর পূজাদির

অনুষ্ঠান আন্দোলনকে প্রতিহতই করিবে। অরবিন্দ ব্রাহ্মসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ভারতে ফিরিয়া ব্রাহ্মদ্বেষী, গোঁড়া হিন্দু হইয়া উঠেন। বড়োদা বাসকালে এক-পায়ে দাঁড়াইয়া বগলা মূর্তির পূজায় প্রবৃত্ত হন। ভবানী পূজা তাঁহারই পরিকল্পনা।

কিন্তু মুসলমানরা কী করিয়া এই উৎসবকে জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে—এ প্রশ্ন জাতীয়তাবাদীদের মনে কি হয় নাই? মুসলমান ধর্ম-বিরোধী এই প্রকার মুসলমান-বর্জিত উৎসবকে টিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি চরমপন্থী নেতারা সেদিন প্রাণপণ করিয়া যেরূপভাবে জাতীয়তাবাদের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহাকে তো ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তা বলিতে পারি না। কন্‌গ্রেসী জাতীয়তার আদর্শ তো ইহা নহে। পাঁচ মাস পরে কলিকাতার কন্‌গ্রেসে নৌরজী যে-জাতীয়তার উপর ভিত্তি করিয়া 'স্বরাজ' চাহিয়াছিলেন, সে তো এই একদেশদর্শী হিন্দু জাতীয়তা নহে। এই নূতন জাতীয়তাবোধ পৌরাণিক হিন্দুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা বঙ্কিম প্রদর্শিত ও তৎ অনুপ্রাণিত জাতীয়তা। অরবিন্দ এই বঙ্কিম অনুপ্রাণিত জাতীয়তা ১৮৯৪ সাল হইতে অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। বাংলাদেশে আসিয়া তিনি বিশেষ সাম্প্রদায়িক মত লইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। অরবিন্দের ও তাঁহার দলের জাতীয়তার মূলে রহিয়াছে হিন্দু সংস্কৃতির ভাবনা—কন্‌গ্রেসী জাতীয়তার ভাবনা ইহাদের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

এই পটভূমি হইতে শিবাজী-উৎসব ও ভবানী-পূজা বিচার্য। টিলক মহারাজ উৎসবের মধ্যে একদিন গঙ্গাস্নানে গেলেন—প্রায় ত্রিশ হাজার লোক তাঁহার সঙ্গে, অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতা ছবি মিছিলের অগ্রভাগে। ভবানী-পূজার কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া শুনিয়া সংস্কারপন্থী সাংবিধানিক-অন্দোলন-বিশ্বাসী মডারেট দল নিশ্চয়ই বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন ইহাই কি বিপ্লববাদের নমুনা—ইহাকে কি প্রগতি বলা হইবে!

প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, এই ১৯০৬ সালের শেষদিকে 'মুসলিম লীগ' স্থাপিত হইল ঢাকা শহরে। এখন হইতে ভারতের রাজনীতি ত্রিধারায় প্রবাহিত হইল—কন্‌গ্রেসী সর্বভারতীয়তা, তথা-কথিত জাতীয়তাবাদীদের হিন্দুসর্বস্বতা এবং মুসলমানদের ইসলাম-সর্বস্বতা; ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তা বা

জাতীয়তামুখর ধর্মীয়তা ভারতকে ধীরে ধীরে বিভক্ত হইবার দিকে লইয়া চলিল। এই-সব আন্দোলনের অন্তরালে চলিতেছে বিপ্লবীদের ফল্‌গুধারা।

৪

মহারাষ্ট্রদের 'শিবাজী' বীরপূজা দেখিয়া বাংলাদেশেও লোকে বাঙালিবীরের সন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ 'প্রতাপাদিত্য' নাটক লিখিয়া (১৯০৩) পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়া দেশপ্রীতি আত্মত্যাগের অনেক বড় বড় কথা কহাইলেন। দেশে আরম্ভ হইল প্রতাপাদিত্য-উৎসব। কিছুকাল পরে সীতারাম-উৎসব শুরু হইল। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে তাঁহার উপন্যাসে যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা ইতিহাসসম্মত নয় বলিয়া যশোহরের অন্ধ উকিল যদুনাথ সীতারামের জীবনী লিখিলেন। আসলে মুসলমানদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে-সব হিন্দু জমিদাররা বিদ্রোহী হন, তাঁহাদের সকল অপকর্ম অনাচারকে অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে মহীয়ান মহাপুরুষ ও স্বদেশ-সেবকরূপে বাঙালির কাছে চিত্রিত করা হইল। এই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ আদৌ শুভ ফলপ্রদ হয় নাই। একদিন সিরাজদ্দৌলার ন্যায় অকর্মণ্য নবাবকেও আদর্শায়িত করিবার প্রয়াস দেখা গেল। কলিকাতার মুসলমানরা একবার সিন্ধু-বিজয়ী আরব সেনাপতি মহম্মদ বিন্ কাসেমের উৎসব করিয়াছিল—মিথ্যাশ্রয়ী আত্মগৌরব কোথায় পৌঁছাইতে পারে ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। Hero-worship অর্থাৎ বীর পূজা কালে সত্যসত্যই ধর্মের স্থান গ্রহণ করিতে চলিয়াছে—ভগবৎ-ভক্তরা দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন—গান্ধীজির ভস্মাবশেষের উপর ঘাটে ঘাটে যে মন্দির নির্মিত হইতেছে তাহাও কালে হয়তো পূজা নৈবেদ্য দানের স্থান হইবে;—বেলুড়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস তো সেস্থান ইতিমধ্যেই লাভ করিয়াছেন। ইহা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দুর্লক্ষণ; কারণ সকল লোকই যদি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের ঠাকুর দেবতা গুরু ও অবতারদের পূজা-পার্বণে আবিষ্ট থাকে, তবে ধর্ম-নিরপেক্ষ লোক অবশিষ্ট থাকিল কোথায়? এবং এই অতি-ধর্মীয়তার পরিণাম কি? হিন্দুরা তো চিরকালই বিচ্ছিন্ন—কোথায় তাহাদের মিলন-ভূমি? হিন্দুধর্ম কি অথবা হিন্দুর ধর্ম কি তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট।

৫

জাতীয় আন্দোলন নানা ভাবে নানা পথে চলিতেছে। টিলক খাপার্দে মুঞ্জে প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় বীরদের কলিকাতা শফর, শিবাজী-উৎসব ও ভবানী-পূজা, দুর্গা পূজার সময়ে বীরাষ্টমী পালন, রবীন্দ্রনাথের গান, বিপিনচন্দ্র পালের জ্বালাময়ী বাগ্মিতা ও রচনা, অরবিন্দের 'বন্দেমাতরমের' প্রবন্ধমালা 'যুগান্তরে'র বিপ্লবী মতবাদ প্রচার প্রভৃতির অভিঘাতে দেশের মধ্যে নবীন দলকে ক্রমেই প্রবীণদের হইতে দূরে সরাইয়া লইতেছে। মহারাষ্ট্র দেশে 'কেশরী' ও 'কাল' ছিল এই নবীন ভাবনার প্রচারক।

বরিশালের প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনের সময় হইতে (এপ্রিল ১৯০৬) দেশের মধ্যে মতভেদ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে থাকে। ১৯০৬ সালের শেষদিকে কলিকাতায় কন্‌গ্রেস নবীন দলের ইচ্ছা টিলককে সভাপতি করেন। কিন্তু তখনও তাহারা দলপুষ্ট হইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের মনের ইচ্ছা মনেই থাকিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ তখনো বাংলাদেশের একছত্র নায়ক—প্রবীণদের ইচ্ছা ও মতানুসারে দাদাভাই নৌরজী সভাপতি মনোনীত হইলেন। ১৯০৬ সালের বামপন্থীদের ব্যর্থ মনোরথ পূর্ণ হইল পর বৎসর ১৯০৭-এ সুরত কন্‌গ্রেসে; সেখানে সভাপতি নির্বাচন লইয়া কীভাবে দক্ষযজ্ঞ হয় যথাস্থানে সে কথা আলোচিত হইবে।

১৯০৬ সালের কলিকাতা কন্‌গ্রেস প্রাচীন তন্ত্রের শেষ অধিবেশন; গত কাশী কন্‌গ্রেসে বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, বঙ্গচ্ছেদ রদ করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধও করা হইয়াছিল। এইবার সভাপতি নৌরজী বলিলেন যে, 'স্বরাজ' আমাদের কাম্য। 'স্বরাজ' বলিতে কি বুঝায় তাহা তখনো অস্পষ্ট। ইতিপূর্বে বিপিনপাল 'নিউ ইন্‌ডিয়া' কাগজে ঘোষণা করিয়াছিলেন, India for Indians; 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাও সেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করিয়াছিল যে ভারতের কাম্য—ব্রিটিশশাসনমুক্ত সম্পূর্ণ অটোনমি। ইহাই স্বরাজ।

কন্‌গ্রেসে ভাঙন

রাজনৈতিক আন্দোলন নানা প্রদেশে নানা কারণে দেখা দিতেছে। পঞ্জাবের রাওলপিণ্ডি জেলায় কিছুকাল হইতে রায়তদের সহিত সরকারের প্রজাস্বত্ব ও রাজস্ব -বিষয়ক ব্যাপার লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। অবশেষে একদিন উত্তেজিত জনতা ডাকঘর লুঠ ও একটি গির্জাঘর ভাঙিয়া তাহাতে প্রবেশ করে। পঞ্জাব সরকার তথাকার আর্যসমাজের শ্রদ্ধেয় নেতা লালা লাজপত রায় ও শিখদের অন্যতম নেতা সর্দার অজিত সিং-কে এই হাঙ্গামার জন্য পরোক্ষভাবে দায়া সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে বিনা বিচারে নির্বাসিত করিলেন (৯ মে, ১৯০৭)। ১৮১৮ সালের ইস্ট্-ইন্‌ডিয়া-কোম্পানির যুগে ৩নং রেগুলেশন নামে একটা তথাকথিত 'আইনে'র বলে বিনা বিচারে লোকদের আটকানো যাইত; সেই আইন প্রযুক্ত হইল।

এই বে-আইনী আইনের সাহায্যে অতর্কিত ভাবে লাজপত রায় ও অজিত সিংকে অন্তরীন আবদ্ধ করায় সেযুগে লোকে কিঞ্চিৎ আশ্চর্যান্বিত হইয়া যায়, কারণ তখনো লোকের মনে ব্রিটিশের শাসননীতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা লোপ পায় নাই এবং এই ধরণের বিনা বিচারে যে আটক রাখা যায় তাহা লোকের জানাই ছিল না।

২

প্রায় সমসাময়িক ঘটনা হইতেছে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার মামলা। এই পত্রিকায় কোনো প্রবন্ধের মধ্যে রাজদ্রোহাত্মক কথার আভাস পাইয়া পুলিশ অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেপ্তার করেন। 'বন্দেমাতরমে'র কোনো লেখাতেই লেখকের নাম থাকিত না; বিপিন পাল পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল। আদালতে মামলা উঠিলে বিপিনচন্দ্র ইংরেজের কোর্টে সাক্ষী দিতে অস্বীকৃত হইলেন—সরকারী নিয়মানুসারে ইহা আদালতের অবমাননা; তজ্জন্য তাঁহার ছয় মাস জেল হইল। অরবিন্দের

বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ হইল না—কারণ প্রবন্ধের লেখক যে কে তাহা জানা গেল না। অরবিন্দের বিরুদ্ধে মামলার সংবাদ পাইয়া রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লেখেন। এই কবিতাটির প্রতি ছত্রে অরবিন্দের চরিত্রের ও জীবনের আদর্শ যেন প্রকাশিত। কবি যথার্থ বলিয়াছিলেন, "স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি তুমি।" যেদিন অরবিন্দ মুক্তি পাইলেন, সেইদিন ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত এক প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহিতার অভিযোগে মামলার শুনানী হইল। উপাধ্যায় আদালতে বলিলেন, যে-রাজশক্তি বিদেশী এবং যাহা স্বভাবতই আমাদের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী, তাহার নিকট তিনি কোনো কৈফিয়ৎ দিবেন না। তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইল না—অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল—বিদেশীর আদালত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। বিপিনচন্দ্র ও ব্রহ্মবান্ধব এইভাবে ব্রিটিশদের আইন-আদালতের অস্তিত্ব ও তাহাদের বিচার করিবার অধিকার অস্বীকার করিয়া সাক্ষ্যদানে বিরত হইয়াছিলেন, ইহা যথার্থ অসহযোগ ও আইনঅমান্য কর্ম।

৩

ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই পরিস্থিতি, অপর দিকে পশ্চিম ভারতে মহারাষ্ট্রদের মধ্যে কন্‌গ্রেসের পন্থা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে লোকের আস্থা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে মেদিনীপুরে সুরেন্দ্রনাথ অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটা মীমাংসায় আসিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু নবীন দলের মুখপাত্ররূপে অরবিন্দ সংস্কারপন্থীদের ধীরমন্থর প্রাগ্রসরের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন; অন্তরে অন্তরে তিনি বিপ্লববাদী। এ দিকে ডিসেম্বরের শেষে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন আসন্ন। চরমপন্থীরা গত বৎসর টিলককে সভাপতি করিতে চাহিয়াছিল, সফল হয় নাই।

এবার নবীনদল মনস্থ করিলেন সুরত কন্‌গ্রেসে নির্যাতিত সদ্যমুক্ত দেশকর্মী লালা লাজপত রায়কে সভাপতিপদে বরণ করিয়া ব্রিটিশসরকারের কার্যের উপযুক্ত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবেন।

সুরত কন্‌গ্রেস (ডিসেম্বর ১৯০৭) অধিবেশনের দিন প্রবীন ও নবীনদলের মধ্যে বিরোধ চরম মূর্তি ধারণ করিল। এক দিকে টিলক খাপার্দে অরবিন্দ

ও তাঁহাদের অনুবর্তী প্রায় সাতশত সদস্য; অপরদিকে সুরেন্দ্রনাথ মেহ্‌ঠা রাসবিহারী গোখ্‌লে ও তাঁহাদের প্রায় নয় শত অনুবর্তক সদস্য। রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতির পদে বরণ করিবার প্রস্তাব উঠিলে মহারাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে টিলক আপত্তি উত্থাপন করিলেন; সভপতি উহা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিলে টিলক তাঁহার বক্তব্য বলিবার জন্য সভার সদস্যদের অনুমতি চাহিলেন; কিন্তু মডারেটদের পক্ষ হইতে ঘোর প্রতিবাদ উত্থাপিত হইল। তর্ক, বিতর্ক, বচসা চলিল; অবশেষে অকস্মাৎ একপাটি মারাঠি চপ্পল সুরেন্দ্র-নাথের গাত্র স্পর্শ করিয়া ফিরোজ শাহ মেহ্‌ঠার গণ্ডদেশে গিয়া পড়িল। শেষকালে পুলিশ আসিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করে! কন্‌গ্রেস ভাঙিয়া গেল।

সুরত কন্‌গ্রেসের পর মডারেট নেতারা একটি কন্‌ভেনশান বা সম্মেলন আহ্বান করিলেন; এই সভায় কন্‌গ্রেসের আদর্শ ও সংবিধান রচনা করিবার জন্য এক উপসমিতি গঠন করা হইল; ১৯০৮ সালের ১৯ এপ্রিল এলাহাবাদে কনভেনশন মিলিত হইয়া কন্‌গ্রেসের সংবিধান গ্রহণ করিলেন। এই সংবিধানের শর্ত মানিতে না পারায় চরম পন্থীরা ১৯০৭ হইতে ১৯১৬ পর্যন্ত আর কন্‌গ্রেসে যোগদান করেন নাই। ১৯১৬ সালে জাতীয়তাবাদীরা লক্ষ্ণৌ কন্‌গ্রেসে যোগদান করিলেন এবং সেই হইতে প্রকৃত পক্ষে উহা তাঁহাদের হস্তগত হয়। মডারেটরা পরে পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন। ১৯০৮ অব্দে গৃহীত সংবিধান প্রায় আমূল পরিবর্তিত হয় ১৯১৮ সালে।

সুরত কন্‌গ্রেসের কথা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে বিলাত-প্রবাসী বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিলেন (২৩ পৌষ ১৩১৪)—

"এবারকার কন্‌গ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের কথা তো শুনিয়াছই—তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা ঘায়ের উপর দুই দলে মিলিয়াই নুনের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ ভুলিবে না—কেহ ক্ষমা করিবে না—আত্মীয়কে পর করিবার যতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিবে। কিছুদিন হইতে গবর্মেণ্টের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে। এখন আর সিডিশনের সময় নাই, যেটুকু উত্তাপ এতদিনে আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল তাহা নিজেদের ঘরে আগুন দিতেই নিযুক্ত হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া 'বন্দেমাতরম্‌' কাগজে স্বাধীনতার অভয়মন্ত্রপূর্ণ কোনো উদার কথা আর পড়িতে পাইনা, এখন কেবলি অন্যপক্ষের

সঙ্গে তাহার কলহ চলিতেছে। এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে তিন পক্ষ দাঁড়াইয়াছে —চরমপন্থী, মধ্যমপন্থী এবং মুসলমান—চতুর্থ পক্ষটি গবর্মেণ্টের প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচকি হাসিতেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানেই বয়। আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না—মর্লিরও নয় কিচেনারেরও নয়—আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।”[১]

এইটি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পত্রের মতামত। ‘যজ্ঞভঙ্গ’ নামক এক প্রবন্ধে কবি বলিলেন, “মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কন্‌গ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্তভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে ইঁহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকিতেন—দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কন্‌গ্রেস-সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না।”

রবীন্দ্রনাথ জানিতেন, দেশের যথার্থ শক্তি সুপ্ত আছে জনতার মধ্যে।

৪

সুরত কন্‌গ্রেসের দেড় মাস পরে বাংলাদেশের প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইল পাবনা শহরে (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮)। রবীন্দ্রনাথ সভাপতিরূপে যে ভাষণ দান করিলেন তাহা চারি বৎসর পূর্বে প্রদত্ত ‘স্বদেশী-সমাজ’ ভাষণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। তবে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজনৈতিক পরিবেশের সবিশেষ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে; রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে লেখেন, ‘সভাপতি হইয়া শান্তিরক্ষা করিতে পারিব কি না সন্দেহ। দেশে যখন শান্তি নাই তখন তাহাকে রক্ষা করিবে কে? কলহ করিবে স্থির করিয়াই লোকে এখন হইতে অস্ত্রে শান দিতেছে।’ একথা লিখিবার কারণ কবিকে শাসাইয়া বেনামী পত্র আসিয়াছিল।

‘স্বদেশী-সমাজ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে গঠন মূলক পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন তাহাই বিস্তারিত করিয়া বলিলেন দেশবাসীকে; তিনি বলিলেন যে,

১ চিঠিপত্র ষষ্ঠ খণ্ড

রাজনীতির অত্যুক্তি ও অতিবাদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। দেশসেবার অর্থ রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় গ্রামোন্নতি, গ্রামের মধ্যে সমবায় নীতি প্রবর্তন, সংঘবদ্ধভাবে বিবিধ কার্য করা, বৈজ্ঞানিক মিত-শ্রমিক যন্ত্র (labour-saving machine) প্রচলনের দ্বারা গ্রামবাসীদের অকারণ পরিশ্রম লাঘব করা, বিচিত্র কুটীর শিল্প প্রবর্তন প্রভৃতি। বহু পন্থা নির্দেশ করিয়া কবি বলিলেন যে, এই সকল কর্মের উদ্দেশ্য শক্তিলাভ এবং শক্তি বিনা কোনো জাতি কখনো কিছু করিতে পারে না। ভারতের প্রাণশক্তি গ্রামের মধ্যে সুপ্ত, সেই নিদ্রিত শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করাই দেশের কাজ।[১]

রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আত্মসম্মানের আর একটি প্রমাণ দিলেন এই পাবনা সম্মেলনের ভাষণে; তিনি বাংলাভাষায় তাঁহার ভাষণ পাঠ করিলেন। ইতিপূর্বে এই সমিতির যাবতীয় কাজকর্ম কন্‌গ্রেসের ন্যায়ই ইংরেজির মাধ্যমে নিষ্পন্ন হইত। বাংলাভাষার প্রবর্তন এক হিসাবে বিপ্লব।

১৯০৪, ১৯০৮ ও ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ পল্লীসমিতি স্থাপনের যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন তাহাই ১৯২২ সালে বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতনে রূপায়িত করিলেন। কালে তাহাই গান্ধীজি কর্তৃক বিস্তারিত ক্ষেত্রে 'গ্রামোদ্যোগ' নামে প্রবর্তিত হয়; ইহাই বর্তমান 'সর্বোদয়' ও 'সমাজ উন্নয়ন' পরিকল্পনা।

৫

১৯০৮ সালে ১লা মে সন্ধ্যার সময়ে কলিকাতার সান্ধ্যপত্রিকা 'Empire'-এ সংবাদ বাহির হইল, "৩০ এপ্রিল রাত্রি আটটার সময়ে ব্যারিস্টার কেনেডির পত্নী মিসেস এবং কন্যা মিস কেনেডি মজঃফরপুরের জজ্ মিঃ কিংসফোর্ডের বাড়ীর ফটকে প্রবেশ পথে বোমার দ্বারা নিহত হইয়াছেন।"

বাংলাদেশে যে সন্ত্রাসবাদ ভিতরে ভিতরে কাজ করিতেছিল ইহা তাহারই

১ রবীন্দ্রনাথ পল্লীসমাজ গঠন সম্পর্কে অতিবিস্তারিত পরিকল্পনার খসড়া করেন। দ্রঃ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস, পৃ. ১৬৩...। রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড পরিশিষ্ট।

প্রথম বিস্ফোরণ। হত্যার ব্যাপারটি এই—মিঃ কিংসফোর্ড কলিকাতার জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট; সেই পদগৌরবে তাঁহাকে কয়েকটি রাজনৈতিক মোকদ্দমার বিচার করিতে হইয়াছিল। তিনিই 'বন্দেমাতরম্' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রিণ্টারদের শাস্তি বিধান করেন; তাঁহারই আদেশে সুশীলকুমার সেন নামে চৌদ্দবৎসরের বালককে বেত্রাঘাত করা হয়। এই ঘটনায় বিপ্লবী দল কিংসফোর্ডের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামে দুই তরুণকে কলিকাতা হইতে বোমা রিভলবার দিয়া প্রেরণ করেন। তাহাদের বোমায় কিংসফোর্ড মরিলেন না, মরিল দু'জন নিরপরাধ রমণী। প্রফুল্ল পুলিশের হাতে ধরা পড়িবার পূর্বে রিভলবার দিয়া আত্মঘাতী হয়, ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে।

অরবিন্দ তাঁহার 'কারা কাহিনী'তে লিখিয়াছেন যে, "সেদিনের এম্পায়ার কাগজে পড়িলাম, পুলিশ-কমিশনার বলিয়াছেন—আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং তাহারা শীঘ্র গ্রেপ্তার হইবে। জানিতাম না তখন যে, আমি এই সন্দেহের মুখ্য লক্ষ্যস্থল—আমিই পুলিশের বিবেচনায় হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্ত নেতা।"

এ কথা সত্য যে, অরবিন্দ গুপ্তহত্যাদি ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন না, কিন্তু 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধাবলী যে এই সন্ত্রাস কর্মের পরোক্ষ প্ররোচক সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।[১] "মজঃফরপুরে বোমা ফাটিবার অব্যবহিত পূর্বে অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় New conditions নাম দিয়া প্রবন্ধে লেখেন যে, গভর্ণমেণ্ট যদি এদেশে প্রজার ন্যায্য অধিকার ক্রমাগতই অস্বীকার করেন, তবে প্রতিক্রিয়ার ফলে গুপ্ত হত্যা ও গুপ্ত অনুষ্ঠান অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।"[২]

মজঃফরপুরের ঘটনায় লোকে বুঝিল যে, বঙ্গচ্ছেদ রদ, শিল্পোন্নতি, কাউনসিলে অধিকতর সদস্যের স্থান লাভ, 'মুসলিম লীগ' স্থাপন প্রভৃতি প্রশ্নের বাহিরে সম্পূর্ণ অন্যস্তরে স্বদেশী আন্দোলন চলিয়া গিয়াছে। মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ড ও কয়েকদিনের মধ্যে কলিকাতার নিকটবর্তী বোমার কারখানা

---

১ শ্রীঅরবিন্দ পৃ. ৭৩১

২ শ্রীঅরবিন্দ, পৃ. ৭৩০

আবিষ্কার ও তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমার কথা দেশময় প্রচারিত হওয়ায় সকলেই বুঝিল, রাজনীতিক আন্দোলন প্রাচীন বাঁধা পথ ছাড়িয়া নূতন বাঁকাপথ ধরিয়াছে, নূতন বাংলার নবীনের দল রুশিয়ার সন্ত্রাসবাদের পথাশ্রয়ী হইতে চলিয়াছে। মহারাষ্ট্রদেশে টিলক তাঁহার 'কেশরী' কাগজে বোমা নিক্ষেপ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিলেন। তিনি দেশের তদানীন্তন অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন যে, বোমা নিক্ষেপ নিশ্চয়ই গর্হিত কর্ম ; কিন্তু সরকারের দমননীতি ও অন্যান্য কঠোর ব্যবস্থার ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। দেশের পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য যদি সরকার কঠোরতর দণ্ডনীতির ব্যবস্থা করেন, তবে তাহার ফলে দেশে বিদ্রোহ বিস্তারের সম্ভাবনাই অধিক হইবে। বিদ্রোহ নিবারণের উপায়--নানাবিধ সুবিধা প্রবর্তন করিয়া দেশবাসীর অসন্তোষ শমিত করা।

বোম্বাই সরকার এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া স্থির করিলেন যে, টিলক এই রচনা মাধ্যমে কৌশলে বোমা ব্যবহারেরই সমর্থন করিয়াছেন, অতএব তিনি দণ্ডার্হ। সরকার টিলকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা খাড়া করিলেন ; বিচারের সময় টিলক স্বয়ং আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য যেসব যুক্তি দেন, তাহা আইনের দিক হইতে খুবই সমীচীন ; কিন্তু বিচারে তাঁহার কঠিন শাস্তি হইল—ছয় বৎসরের জন্য তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। এই মোকদ্দমায় জুরির মধ্যে সাতজন ইংরেজ, দুই জন পার্সী—কেহই মারাঠি ভাষা জানিতেন না অথচ 'কেশরী'র রচনাগুলি মারাঠি ভাষায় লিখিত। পার্সী জুরিদ্বয় যাহা কিছু বুঝিলেন তাহা হইতে তাঁহারা টিলককে নির্দোষ বলিলেন, সাতজন ইংরেজ তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। অশান্তি দমন করিবার ভরসায় টিলকের প্রতি এই কঠোর শাস্তি বিধান হইল, কিন্তু সরকারের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না ; টিলককে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া সমগ্র ভারত অশান্ত হইয়া উঠিল, রাজনৈতিক আন্দোলন তিলমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হইল না।

জাতীয় আন্দোলন বা ন্যাশনাল স্ট্রাগল দমন করিবার জন্য সরকার বাহাদুর একের পর এক আইন পাশ করিতে লাগিলেন ; জনসভা সম্বন্ধে পাবলিক্ মিটিং একট্ অনুসারে—সভার সময়, স্থান ও বক্তাদের ভাষা সম্বন্ধে কড়াকড়ি করিয়া আইনের ধারা-উপধারা রচিত হইল ; প্রেস একৃট বা মুদ্রাযন্ত্র আইন অনুসারে মালিককে টাকা জমা রাখিতে বাধ্য করা হইল। সিডিশন আইন

পাশ হইল এবং দেশময় সরকারী বিভাগের বিবিধ হুকুম ও নানাভাবের হুমকি চলিল। ইহার ফল হইল মারাত্মক। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকাশ্য পথ যতই অবরুদ্ধ হইতে লাগিল লোকেও তত হুঁশিয়ার হইয়া গোপন পথচারী হইয়া উঠিল।

সরকার বাহাদুরের চণ্ডনীতি সবেগে চলিয়াছে; নিরন্ন, অন্নাভাবে জীর্ণ ম্যালেরিয়ায় ও নানা ব্যাধিতে শীর্ণ গ্রামবাসীদের মনে শাসন-আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার জন্য পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে পুলিশ মোতায়েন করা হইল। এই পুলিশ-বাহিনীর ব্যয়ভার বহন করিতে হইল হিন্দু প্রজাদের; কারণ সাধারণ মুসলমানের 'স্বদেশী' হইবার জন্য কোনো ইচ্ছা নাই—মোল্লারা 'স্বদেশী' ওয়ালাদের বিরোধী। খানাতল্লাসী, গোয়েন্দাবিভাগের গুপ্তচরদের দৌরাত্ম্য, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদনীতির উস্‌কানি প্রভৃতিতে লোকের মন যে ক্রমশই বিপ্লবমুখী হইয়া উঠিতেছিল, তাহা ইংরেজ সরকারের কূটনীতিজ্ঞদের মর্মগত হইতেছিল না কেন ভাবিয়া পাই না। অথবা ইহার দ্বারা তাহাদের কোনো দূরতম অভিসন্ধি পূর্ণ হইতেছিল।

বাংলাদেশের সাতজন কর্মীকে এই সময়ে সরকার সেই ১৮১৮ সালের পুরাতন ৩নং রেগুলেশন অনুসারে অকস্মাৎ গ্রেপ্তার করিয়া নির্বাসিত করিলেন (১১ ডিসেম্বর, ১৯০৮)। বাংলাদেশ নেতাশূন্য হইয়া গেল; ইতিপূর্বে আলিপুর বোমার মামলার আসামীরূপে অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁহার সঙ্গে প্রায় ত্রিশজন যুবক[১] প্রেসিডেন্সি জেলখানায় আটক। বিপিনচন্দ্র পাল ছয়মাস জেল

১ কৃষ্ণকুমার মিত্র, 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক; এন্‌টি সার্কুলার সোসাইটির অন্যতম নেতা; বরিশালে পুলিশ সভা ভাঙিয়া দিলে ইনিই শেষ পর্যন্ত সভাগৃহ ত্যাগ করেন নাই।

অশ্বিনীকুমার দত্ত, বরিশালের উকিল; তথাকার ব্রজমোহন কলেজের স্থাপয়িতা; বাখরগঞ্জ জেলার বয়কট আন্দোলনকে সফলতা দানের জন্য খ্যাত।

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্রজমোহন কলেজের তরুণ অধ্যাপক। ছাত্রমহলের উপর অত্যন্ত প্রভাব ছিল।

ভূপেশচন্দ্র নাগ, ঢাকার কর্মী।

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, গিরিডির অভ্রখনির মালিক, 'নবশক্তি' কাগজের সম্পাদক; স্বদেশী বক্তা ও কর্মী।

খাটিয়া ফিরিয়াছেন। চরমপন্থীদের মধ্যে তিনি ছাড়া কেহ জেলের বাহিরে নাই বলিলেই হয়। সন্ত্রাসবাদীরা নেতৃহীন হইয়া আরও গোপন পথে চলিল —সরকার বাহাদুর যাহা চাহিতেছিলেন ফল তাহার বিপরীতই হইল।

কন্‌গ্রেসের সাংবিধানিক গণতন্ত্র প্রচেষ্টা ও বিপ্লববাদীদের গোপন ভয়াল কর্মধারার সমান্তরালে চলিতেছে—মুসলিম লীগের সদস্যদের আপন সমাজের সংগঠন ও ইংরেজের নিকট হইতে সুযোগ সুবিধা গ্রহণের বিবিধ কসরত।

বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের প্রথম হইতেই বঙ্গের মুসলিম সমাজ এই আন্দোলনকে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম বলিয়া অভিনন্দিত করে নাই। কেন করিতে পারে নাই তাহা অন্যত্র বিশ্লেষণ করিয়াছি। তবে কয়েক জন মুসলমানের নাম বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, যেমন এ. রসুল, লীয়াকৎ হোসেন, আবদুল কাসেম, গফুর সাহেব প্রভৃতি।

কিন্তু প্রশ্ন উঠে—হিন্দুরা মুসলমানদের আপনার করিতে পারিল না কেন, তাহারা দূরে থাকিয়া গেল কেন? মুসলমানরা যে আত্মীয়বোধে হিন্দুদের সহিত এক মন প্রাণ হইয়া আন্দোলনে যোগ দিতে পারে নাই সে প্রশ্নের বিশ্লেষণ হিন্দু নেতারা করিতে পারেন নাই। দেশের স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিরা কীভাবে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-ব্রহ্মবান্ধব-অরবিন্দের হিন্দু জাতীয়ভাবাদ দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া লোকের মুক্তি-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহার আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় রহিয়া গিয়াছে 'ধর্মে' ও 'জাতে'। রাজনৈতিক আন্দোলনের পথের পথিক সকলেই; কিন্তু ধর্মের সংস্কার অঙ্গারের ন্যায় শতধৌতি দ্বারা মনের মলিনত্ব ঘুচাইতে অক্ষম। বিশিষ্ট হিন্দু নেতারা ছুঁৎমার্গের সীমানা অতিক্রম করিতে পারিতেন না, মুসলমানরাও তাঁহাদের কঠোর ধর্মীয়তা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতে

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক গোষ্ঠীর অন্যতম; তেজস্বী লেখক।

সুবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয় বিদ্যালয়ে একলক্ষ টাকা দান করেন এবং বহু বৈপ্লবিক কর্মে লিপ্ত ছিলেন।

শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, ছাত্রনেতা, এন্‌টি সার্কুলার সোসাইটির বিশিষ্ট কর্মী।

পুলিনবিহারী দাস, ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা; পূর্ববঙ্গের বৈপ্লবিক শিক্ষার অন্যতম গুরু।

অপারক। উভয়েই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া পরস্পরের দূরে থাকে। মফস্বলে হিন্দু ও মুসলমান নেতারা একত্র এক সভায় উপস্থিত—হিন্দু নেতা জল পান করিবেন বলিয়া মুসলমান 'ভ্রাতা'কে দাওয়া (বারান্দা) হইতে কিছুক্ষণের জন্য নামিয়া যাইতে বলিলেন। ইহার মধ্যে যে কোনো প্রকার অপমান ও অশ্রদ্ধা আছে সে বোধটুকু পর্যন্ত সংস্কারাবদ্ধ আচারসর্বস্বধর্মী ব্যক্তিদের মনকে স্পর্শ করিত না। কৃত্রিম রাজনৈতিক প্রেমে জাতীয় জীবন পুষ্ট হয় না—সে কথা চরমপন্থী বা তথাকথিত প্রগতিবাদীরা বুঝিতে পারিতেন না। বরং আচারভ্রষ্ট ইঙ্গবঙ্গ সমাজ, বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার ডাক্তাররা কন্‌গ্রেসের মধ্যে থাকিয়া 'জাত' লইয়া স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য লইয়া কাহাকেও উত্যক্ত করিত না।

সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা শতছিন্ন বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ; ধর্মমতে সুদৃঢ় ও সমাজ-জীবনে সংহত মুসলমানদের দলে টানিবার জন্য যে আহ্বান তাঁহারা প্রেরণ করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে আন্তরিকতা হইতে উদ্দেশ্য সাধনের ভাবনাই ছিল প্রবল। হিন্দুদের এই দুর্বলতা যে কেবলমাত্র মুসলমানদের সহিত ব্যবহারেই প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহা নহে—আপনাদের 'সম্প্রদায়' ও 'জাতে'র পারস্পরিক ব্যবহারের মধ্যেও কুৎসিত কঙ্কালের মূর্তি বাহির হইয়া পড়ে।

শতাধিক বৎসর এদেশে বাস করিয়া চতুর ব্রিটিশ শাসকরা ধর্মপ্রাণ ভারতীয়দের দুর্বলতা কোথায় তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল; তাই ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া তাহার ভেদনীতিরূপ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহার বিষক্রিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল। অপর দিকে মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম লীগ (ডিসেম্বর ১৯০৬) স্থাপিত হইয়াছে এবং বিশ্বজাগতিক ইসলাম আন্দোলন ও তাহাদিগকে ধীরে ধীরে আত্মসচেতন করিয়া তুলিতেছে; সে আত্মচেতনায় অমুসলমানদের স্থান নাই। উহা নিবিড়ভাবে সাম্প্রদায়িক।

ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা দেখা দিল; ময়মনসিংহের জামালপুরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গেল (এপ্রিল ১৯০৭)। কুমিল্লার দাঙ্গায় লোক মরিল। 'পাবনাস্থ মুসলমানরা' অকথ্য ভাষায় হিন্দুদের গালি দিয়া, তাহাদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য স্বধর্মীদের উত্তেজিত করিয়া পুস্তিকা বিলি করিল। আশ্চর্যের বিষয় সরকার অপরাধীকে কোনো প্রকার শাস্তি না দিয়া কেবলমাত্র এক বৎসরের জন্য

'ভাল হইয়া থাকা'র মুচলেকা লইয়া ছাড়িয়া দিলেন।[১] এইরূপ বিচার দেখিয়া সাধারণের সন্দেহই হইল যে, হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব শাসক-শ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া তাহারা সুবিচার করিতে অসমর্থ। ভারতের নূতন জাতীয় জাগরণকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ শাসকের কর্মচারীরা এই ভেদ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন—এ কথা সমসাময়িক পত্রিকা সমূহ ইঙ্গিত করিতেন। ১৯০৭ সালে জামালপুর ও পাবনায় যাহা ঘটিল তাহার চরম রূপ প্রকাশ পাইল ১৯৪৬-৪৭ সালে।

৬

গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে বঙ্গচ্ছেদ-রদ আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনে ও স্বদেশী আন্দোলন রাজনৈতিক মুক্তি-আন্দোলনে পরিণত হইতে দেখিয়া ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞরা বুঝিলেন যে, শাসনতন্ত্রের মধ্যে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। কন্‌গ্রেস বহুকাল হইতেই শাসন-সংস্কারের দাবি জানাইয়া আসিতেছে। পনেরো বৎসর পূর্বে ১৮৯২ সালে ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি ভারতীয় সদস্যের সংখ্যা বাড়াইয়া তখনকার ক্ষীণ আন্দোলনকে শান্ত করা হইয়াছিল। এই আইনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় নাই ; কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি আসনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বণ্টননীতি অতি সুনিপুণভাবে অনুপ্রবিষ্ট করা হয়। এতকাল পরে (১৯০৭) নূতন বড়লাট লর্ড মিণ্টো ও ভারত সচিব জন্ মলি উভয়ে মিলিয়া শাসন ব্যাপারে কতকগুলি পরিবর্তনের প্রস্তাব করিলেন। ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয়দের সংখ্যাবৃদ্ধি ও প্রশ্নোত্তর করিবার অধিকার প্রশস্ততর করা হইল। কিন্তু এইসঙ্গে সম্প্রদায়গত নির্বাচনের ব্যবস্থা স্পষ্টতর হওয়াতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধও স্পষ্টাকার ধারণ করিতে চলিল। নির্বাচক মণ্ডলী চারিভাগে বিভক্ত হইল—সাধারণ, জমিদার, মুসলমান ও বিশেষ। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে 'হিন্দু' নামে কাহারও অস্তিত্ব নাই। এই নামকরণ ও শ্রেণীকরণ ব্যবস্থা প্রায় ৪০ বৎসর চলে।

১৯০৭ হইতে ১৯১০ পর্যন্ত বহু আলোচনা-গবেষণার পর মর্লী-মিণ্টো

---

১ হেমেন্দ্রপ্রসাদ, কন্‌গ্রেস পৃ. ১৯৪

শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইল (ডিসেম্বর ১৯১০)। ইতিমধ্যে ১৯০৯ সালে বড়লাটের শাসন পরিষদ বা একজ্যুকিটিভ্ কাউন্সিলে কলিকাতার ব্যরিস্টার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে এডভোকেট জেনারেলের এবং পাটনার ব্যরিস্টার সৈয়দ আমীর আলীকে বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলের সদস্যপদ দান করিয়া ব্রিটিশ সরকার প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে, তাঁহারা যোগ্য ভারতীয়ের ন্যায্য সম্মান দান করেন। এ পর্যন্ত ভারতীয়দের এ শ্রেণীর উচ্চপদ কখনো প্রদত্ত হয় নাই ; সুতরাং এক শ্রেণীর লোক ইহাতেই খুশী। এ ছাড়া ১৯১০ হইতে বাংলাদেশের ছোটলাটের জন্য শাসন-পরিষদ দেওয়া হইল ; ১৮৫৪ হইতে ১৯১০ পর্যন্ত বাংলাদেশের লেফটনেণ্ট গভর্নর শাসন বিষয়ে একেশ্বর ছিলেন অথবা কলিকাতার অপর-প্রান্তবাসী বড়লাটের আজ্ঞাবহ ছিলেন।

মর্লী-মিণ্টো শাসন-সংস্কার ভারতে শান্তি আনিতে পারিল না। নরমপন্থীরা অল্পতেই খুশী—কিন্তু চরমপন্থীরা স্বাধীনতা চাহে—সংস্কার চাহে না। তাহারা নির্যাতন চাহে ; তাহাদের বিশ্বাস নির্যাতিত হইলে লোকে বিদ্রোহী হয় ; এই সকল কথা তাঁহাদের ইতিহাসে পড়া। তাঁহাদের মতে সরকার পক্ষ হইতে repression বা দমননীতি বিশেষ ভাবেই বাঞ্ছনীয়। এই ধরণেরই কথা বহু বৎসর পর পুনরায় শোনা গিয়াছিল আর একটি দলের লোকের মুখে। তাঁহারা জানিতেন না যে, নির্বীর্য জনতা কখনো সশস্ত্র বিপ্লব সৃষ্টি করিতে পারে না। এবং বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক শাসনব্যবস্থায় গুপ্তহত্যা বা গুণ্ডামির দ্বারাও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না।

৭

১৯০৭ সাল হইতে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক হত্যা ও লুণ্ঠনাদি আরম্ভ হয়, তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। শহরের পল্লীতে পল্লীতে গ্রামের মধ্যে নানাপ্রকারের সমিতি ব্যায়ামের নামে, লাইব্রেরির নামে, ধর্মশিক্ষার নামে গড়িয়া উঠিল ; সকলের উদ্দেশ্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দলগঠন ও শক্তি-সঞ্চয়ন। এই-সকল ক্লাব বা সমিতিগুলি রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নানা-ভাবে দখল করিয়া, আপনাদের দলগত মতবাদের কাজে ব্যবহার করিতে থাকেন। বলা বাহুল্য পুলিশ এই-সব সমিতি সম্বন্ধে সকল তথ্যই সংগ্রহ

করিয়া রাখিত। এই গবর্মেণ্ট 'অনুশীলন সমিতি' ও তজ্জাতীয় ব্যায়ামাদি সমিতি বে-আইনী করিয়া দিলেন। ইহার ফল হইল ভীষণ। প্রকাশ্যে যখন মেলামেশা বন্ধ হয়, তখন সদস্যরা গোপন হইতে গোপনতর পথে চলাফেরা করে, পুলিশে বিপ্লবীতে লুকোচুরি খেলা চলে। গুপ্ত সমিতিতে দেশ ছাইয়া গেল, গুপ্তচরের বৃত্তি বাড়িয়া চলিল। মাণিকতলার বোমার মামলার পর বহু স্থানে বহু ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হয়।

এই অবস্থায় ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসের ১২ই তারিখে দিল্লী-দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গচ্ছেদ রদ ঘোষণা করিলেন। ১৯১০ সালে সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু হইয়াছে—নূতন সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী তাঁহাদের সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভারত সফরে আসিলেন (২ ডিসেম্বর)। এতদিন বড়লাটেরা দিল্লীতে দরবার আহ্বান করিয়া রাজসম্মান আদায় করিয়াছিলেন ; এবার ভারতীয়দের হৃদয় জয় করিবার আশায় সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর অভিষেক দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইল। ঐ দিন সিংহাসন হইতে বঙ্গচ্ছেদ রদ ঘোষিত ও পশ্চিমবঙ্গ-পূর্ববঙ্গ পুনর্মিলিত হইল। অখণ্ড বঙ্গদেশের শাসনভার একজন গভর্নরের উপর অর্পিত হইল—পদমর্যাদায় ইনি লেফ. গবর্নর হইতে উচ্চ—বেতন ও ইহার বেশি—দায়িত্বও অধিক। বিহার-উড়িষ্যা পৃথক করিয়া একজন ছোটলাটের উপর ন্যস্ত করা হইল—পাটনা হইল রাজধানী। আসাম প্রদেশ পূর্বের ন্যায় চীফ কমিশনারের হাতেই ফিরিয়া গেল - রাজধানী হইল শিলং। সম্রাটের দ্বিতীয় ঘোষণায় ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হইল। প্রায় দেড়শত বৎসর কলিকাতা ছিল ভারতের রাজধানী।

দরবারের এই ঘোষণার তিন দিন পরে (১৫ই ডিসেম্বর) নয়া দিল্লীর ভিত্তিপ্রস্তর সম্রাট কর্তৃক প্রোথিত হইল। আজ যে নয়াদিল্লী আমরা দেখিতেছি তখন সেখানে ছিল বিরাট মাঠ ও অসংখ্য অজানা লোকের কবর এবং ইমারতের ভগ্নস্তূপ—মুগল গৌরবের ধ্বংসাবশেষ।

উগ্রপন্থীদের গুপ্তহত্যাদি শমিত করিবার উদ্দেশ্যে হয়তো ব্রিটিশ কূট-নীতিজ্ঞরা বঙ্গচ্ছেদ রদ করিলেন। কিন্তু কন্‌গ্রেস ও মডারেট নেতাদের চেষ্টাও যে ব্রিটিশের এই মত পরিবর্তনের জন্য কিছুটা দায়ী তাহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বিলাতে ভারত-বন্ধুদের আলোচনাও হয়তো এ

বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল ; স্যর হেনরী কটন, মিঃ হার্বার্ট পল, কেয়ার হার্ডি, নেভিনসন, ব্লাণ্ট (W. S. Blunt), হিন্ডম্যান্ প্রভৃতির নাম এই পর্বে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। ভূপেন্দ্রনাথ বসু সে যুগের প্রসিদ্ধ সলিসিটর ও রাজনীতিক, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ;—কলিকাতার ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসন তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইয়া দিলেন ভারতসচিব লর্ড ক্রু-র সহিত আলোচনার জন্য ; তিনি লর্ড ক্রু-কে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলেন এবং ক্রু-র সুপারিশে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট বঙ্গচ্ছেদ রদ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

ব্রিটিশ রাজনীতিকরা ভাবিলেন, বঙ্গচ্ছেদ রদ করিলে ভারতে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তখন বাঙালির মন ক্ষুদ্র দেশবিভাগ-সংযোগাদির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। বিপ্লববাদীরা তো বঙ্গচ্ছেদের পূর্ব হইতেই সন্ত্রাসের পথাশ্রয়ী হইয়াছে। তাঁহাদিগকে সে পথ হইতে আর ফিরানো গেল না। বঙ্গচ্ছেদ রদ ঘোষণার তিন মাস পরে ১৯১২ সালে এপ্রিল মাসে লর্ড হার্ডিংজ যখন ভারতের নূতন রাজধানী দিল্লীতে মিছিল করিয়া প্রবেশ করিতেছেন, তখন বড়লাটের হাতীর উপর বোমা পড়িল। লেডি হার্ডিংজ আঘাত পাইলেন সামান্য। কিন্তু তাহার প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায় ও মৃত্যু ঘটায়। এই সংবাদে সমস্ত দেশ আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। এতদিন এখানে-সেখানে পুলিশ কর্মচারী ও গুপ্তচরদের হত্যা চলিতেছিল, এখন তাহাদের দৃষ্টি গিয়াছে বহুদূরে—বড়লাটও রেহাই পাইলেন না। দিল্লীর বোমা নিক্ষেপ হইতে জানা গেল যে, সন্ত্রাসবাদ আর বাংলাদেশের মধ্যেই আবদ্ধ নাই, আর বুঝা গেল, কন্‌গ্রেসের প্রভাব দেশের যুবকদের উপর অতি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

কন্‌গ্রেসের এই দুর্গতির কারণও ছিল ; তাঁহারা সুরত অধিবেশনের পর (১৯০৭) হইতে অত্যন্ত আপোষমুখী হইয়া উঠিয়াছিলেন। চরম-পন্থীদের অধিকাংশ নেতা হয় কারাগারে, নয় নির্বাসনে আছেন। সেই সময়ে মডারেটগণ মদ্রাজে (১৯০৮) নিজেদের মনমতো করিয়া কন্‌গ্রেসের সংবিধান প্রস্তুত করিয়া লন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন দেশ-গুলির (Self-governing dominions) ন্যায় শাসনপ্রণালী লাভ এবং সাম্রাজ্য শাসনে তাহাদের ন্যায্য অধিকার ও দায়িত্ব সম্ভোগ করিতে পারিলেই

কন্‌গ্রেস খুশি। তাহাদের মতে ব্রিটিশ ভারতের শাসনপ্রণালীর ধীর অথচ অপ্রতিহতভাবে সংস্কার করিয়া আইনসঙ্গতভাবে এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে। জাতীয় একতা বৃদ্ধি, জাতীয়ভাবের উদ্বোধন, এবং দেশের মানসিক নৈতিক আর্থিক ও বাণিজ্য বিষয়ক উন্নতিসাধন করাও এই মহাসমিতির কর্তব্য। বিপিন পালের India for Indians বা অরবিন্দের 'অটোনমির' কোনো কথা শোনা গেল না।

১৯০৮ সালে মদ্রাজ কন্‌গ্রেসে এই মত গৃহীত হইলে জাতীয় দলের কোনো সদস্যের পক্ষে কন্‌গ্রেসে যোগদান করা সম্ভবপর হইল না। ইহার পর ১৯১৬ পর্যন্ত মডারেটদের দ্বারা পুষ্ট কন্‌গ্রেসের নিয়মিত অধিবেশন হইল বটে, তবে তাহা প্রাণহীন সম্মেলন—সদস্য সংখ্যাও কমিয়া বাঁকিপুরে দাঁড়ায় মাত্র ২০৭ জন।

অপর দিকে গবর্মেণ্টের দমননীতি নানারূপে মূর্তি লইতেছে ; ১৯১০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি বাংলার অন্তরায়িত নেতারা মুক্তি পাইলেন, তবে সেইদিনই প্রেস আইন পাশ হইল। মুদ্রাকরের পক্ষ হইতে নগদ টাকা জমা রাখা আবশ্যিক হইল ; সংবাদপত্রে আপত্তিকর কিছু প্রকাশিত হইলে এক হাজার হইতে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা হইল,—ইহার পরেও অপরাধ করিলে প্রেস বাজেয়াপ্ত হইবে। ইহার ফলে ১৯১০ হইতে ১৯১৯ এর মধ্যে ৩৫০টি মুদ্রাযন্ত্র, ৩০০ খানা সংবাদপত্র ও ৫০০ বই বাজেয়াপ্ত হয়। অনেক সুপরিচিত কাগজই ইহার দংশনে আহত হইয়াছিল। ১৯২১ সালে এই আইন রদ হয়।

১৯১৪ সালের অগস্ট মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় য়ুরোপে ; সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব বাদীদের কর্মপ্রচেষ্টা নূতনভাবে দেখা দেওয়ায় ভারত গবর্মেণ্ট ১৯১৫ সালে ১৮ই মার্চ ডিফেন্স অব ইন্‌ডিয়া এক্‌ট পাশ করিল। বঙ্গের ও পঞ্জাবের বহু লোক এই আইনের কবলে পড়িয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত বা অন্তরীণে আবদ্ধ হইল। এই বৎসরের শেষে বোম্বাই-এর কন্‌গ্রেসে স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ সভাপতির ভাষণে বলিলেন, স্বায়ত্তশাসন লাভই ভারতের উদ্দেশ্য, কিন্তু স্বরাজ পাইতে ভারতীয়রা এখনো উপযুক্ত হয় নাই। এই শ্রেণীর মতামত লইয়া কন্‌গ্রেস তখন কাজ করিতেছেন। ইহার পূর্ব বৎসরে মদ্রাজের অধিবেশনে প্রাদেশিক গবর্নর একদিন সভায় পদার্পণ করায় সকলে

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কন্‌গ্রেস কোথায় নামিয়া গিয়াছিল ইহা তাহারই প্রমাণ।

ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালের প্রথম দিকে দীর্ঘ ছয় বৎসরের নির্বাসনবাসের পর লোকমান্য টিলক মুক্তিলাভ করিয়া পুণায় ফিরিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে মানিকতলার বোমার ব্যাপারের পর 'কেশরী' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার জন্য টিলক কারারুদ্ধ হন। দীর্ঘকাল কারাগারে বাস করিয়া টিলকের অদম্য উৎসাহ, তেজস্বিতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। বন্দী অবস্থায় তিনি গীতার ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, কিন্তু মুক্তি পাইয়া কয়েকজন বাঙালি বিপ্লবীর ন্যায় গৈরিকধারী সন্ন্যাসী হইয়া মঠবাসী বা ধর্মগুরু হইয়া নির্জনবাসী হইলেন না। তিনি রাজনীতির আন্দোলনেই যুক্ত থাকিলেন। গীতার ভাষ্য মাত্র লেখেন নাই গীতার কর্মযোগে জীবন উৎসর্গ করিলেন। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি ব্রিটেনকে সাহায্য করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন।

এই বৎসর আনি বেসাণ্ট রাজনীতিতে যোগদান করিয়া কন্‌গ্রেসের বিভিন্ন দলের মধ্যে মিলনের সূত্র খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু বোম্বাই-এর মডারেটগণের গোঁড়ামির জন্য তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। শ্রীমতী বেসাণ্ট এই সময়ে কাশী হইতে তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করিয়া মদ্রাজে আসিয়াছেন। থিওজফিস্টদের সাম্প্রদায়িক মতভেদ হেতু শ্রীমতী বেসাণ্টকে কাশী ত্যাগ করিতে হয়। তিনি দক্ষিণ ভারতে মদ্রাজের নিকট আদৈয়ের কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া হিন্দু থিওজফিস্টদের মধ্যে তাঁহার লুপ্ত ধর্মীয় জনাদর,—রাজনৈতিক উত্তেজনায় লিপ্ত করিয়া, পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন। মদ্রাজে 'হোমরুল লীগ' নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করিলেন। বোম্বাইতে টিলক 'ন্যাশনাল লীগ' করিয়াছেন। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় সকলেই কন্‌গ্রেসের বাহিরে থাকিয়া কাজ করিতেছেন। টিলক পশ্চিম ভারতে ও বেসাণ্ট দক্ষিণ ভারতে ভারতীয়দের ন্যায্য দাবির কথা প্রচার করিলেন।

রাজনীতিচর্চা-বিলাসীরা যুদ্ধের পর শাসন বিষয়ে নূতন কিছু পাইবার জন্য উৎসুক। যুদ্ধের জন্য ভারত সরকারের তহবিল হইতে দেড়শত কোটি টাকা ব্রিটেনের হস্তে সমর্পিত হইল। এতদ্‌ব্যতীত রেলযাত্রীদের

অসুবিধা করিয়া, ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া, মালপত্র চলাচলের উপযুক্ত পরিমাণে গাড়ির অভাব সৃষ্টি করিয়া ভারত হইতে বহু শত মাইল রেলপথের লোহা, রেলগাড়ি ও সরঞ্জাম মেসোপটেমিয়ায় (ইরাক) পাঠানো হইল। ভারতের অধিকাংশ দেশীয় ও ব্রিটিশ সৈন্য সমরাঙ্গনে গেল; ভারতীয় যুবকগণ যুদ্ধের বিবিধ কার্যে ভর্তি হইয়া সমুদ্রপারে যাত্রা করিল। এত করিয়া ভায়তীয়রা ভাবিতেছে যে, তাহাদের ন্যায্য দাবি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে স্বীকৃত হইবে, এবং যুদ্ধশেষে শাসন বিষয়ে অধিকতর অধিকার তাহারা পাইবে।

ইংরেজ অত সহজে আপন অধিকার ছাড়ে না. টিলক তাহা জানিতেন; পুণায় এক বক্তৃতার মধ্যে রাজনীতির গন্ধ পাইয়া টিলককে সরকার চল্লিশ হাজার টাকার মুচলেকায় আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মূক করিয়া দিলেন। অল্প কাল মধ্যে মদ্রাজ সরকারের আদেশে শ্রীমতী বেসাণ্ট ও তাঁহার দুই সহকর্মী অন্তরীণে আবদ্ধ হইলেন। ইতিপূর্বে ভারত-রক্ষা-আইনের আওতায় বাংলাদেশেই ১২০০ যুবককে আটক করা হইয়াছে। পঞ্জাবেও এই আইনেব বলে সহস্রাধিক পঞ্জাবী ও শিখকে অন্তরায়িত বা স্বগ্রামে আবদ্ধ বা কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। অন্তরীণের কার্য বাংলাদেশেই খুব প্রবলভাবে চলিতে থাকে; ইহার ফলে আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশের মধ্যে সাময়িকভাবে অশান্তি ও বিপ্লবাত্মক কার্য কিছু হ্রাস পাইয়াছিল, কিন্তু আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্ত-র্জাতিক বিপ্লবকর্ম চারিদিকে প্রসারলাভ করিতেছিল সে কথা অন্যত্র আলোচিত হইবে।

এই সময়ে শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত যুবকদের প্রতি কীরূপ অত্যাচার চলিয়াছিল, তাহার বর্ণনা সমসাময়িক সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। কয়েকজন যুবকের আত্মহত্যার করুণ কাহিনীও বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সরকার বাহাদুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণ ও ভারতের শান্তির অজুহাতে সকল প্রকার স্বৈরাচার করিয়া চলিলেন।

রৌলট বিল ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইতেই ভারতের সর্বশ্রেণীর মধ্যে এই আশা হয় যে, যুদ্ধান্তে ভারতের শাসন-সংস্কার হইবে। বোধ হয় সেই ভাবনা হইতেই ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯ জন বে-সরকারী হিন্দু-মুসলমান সদস্য দেশের ভাবী শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে এক খসড়া প্রস্তুত করিয়া কাউন্সিলে পেশ করেন (১৯১৬); ইহাই ভারত শাসন বিষয়ক ভারতীয়দের দ্বারা রচিত প্রথম সাংবিধানিক খসড়া। ১৯১৬ সালে ডিসেম্বরে লখনৌ শহরে কন্‌গ্রেসের একত্রিংশৎ অধিবেশনে এই ভাবী সংবিধানের আলোচনা হইল। এবারকার সভায় সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, মালবীয় প্রভৃতি মডারেটগণ এবং টিলক, খাপার্দে, বিপিনচন্দ্র, মতিলাল ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি জাতীয়তবাদী নেতৃবৃন্দ ও মুসলমান সমাজের মামুদাবাদের রাজা, মহম্মদ আলী, মহম্মদ জিন্না, এ. রসুল প্রভৃতি বহু ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত হইলেন। সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার, ফরিদপুরের উকিল, বিশিষ্ট কন্‌গ্রেসকর্মী।

এই সভায় ভারত সংবিধান বিষয়ক এক খসড়া গৃহীত হইল; পূর্বোক্ত ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের দ্বারা রচিত খসড়ার উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই সময়ে মোসলেম-লীগের অধিবেশনও লখনৌতে বসে। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯০৬ সালে লীগের জন্ম হইয়াছিল। ১৯১৬ সালে কন্‌গ্রেস ও লীগ মিলিয়া লখনৌতে সংবিধানের খসড়া গ্রহণ করিল, হিন্দু-মুসলমানের ইহাই প্রথম ও শেষ সংবিধান রচনার যৌথ প্রয়াস।

কিন্তু এখনো পর্যন্ত কন্‌গ্রেসের কর্মধারা কার্যকরী করাইবার কোনোপ্রকার সংস্থা বা মেশিনারী গড়িয়া উঠে নাই। হাতে-কলমে রাজনীতি -শিক্ষা ও প্রচারের ব্যবস্থা করা হয় বেসান্টের 'হোমরুল লীগ' হইতে; কারণ থিওজফিস্টদের একটা সংস্থা ইতিপূর্বেই চালু ছিল এবং এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া মদ্রাজে রাজনীতিক কার্য নবীন উদ্যমে চালিত হইয়াছিল। লখনৌ-র কন্‌গ্রেসে বেসান্টের গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি কীভাবে গ্রহণ ও কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা হইল।

বেসাণ্টের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের ফলে বাংলাদেশের স্বদেশী যুগের ন্যায় মদ্রাজেও ছাত্রদের স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করা কঠিন হইয়া পড়িল; সেখানেও বিদ্যালয় বয়কট আন্দোলন চলিল—যাহার ফলে বেসাণ্ট মদ্রাজে 'ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটি' স্থাপন করিলেন। রবীন্দ্রনাথ হইলেন এই 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়'-এর চ্যানসেলর বা আচার্য। আদৈয়ারের থিওজফিক্যাল বিদ্যাশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হইল। বেসাণ্টের ইচ্ছা ছিল বোম্বাই-এ বাণিজ্যকলেজ, কলিকাতায় ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন বা জাতীয় শিক্ষাপরিষদের তত্ত্বাবধানে ইন্‌জীনিয়ারিং কলেজ ও আদৈয়েতে কৃষি-গোপালনাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই পরিকল্পনার মধ্যে ভারতের সাংস্কৃতিক চর্চার কোনো আয়োজন ছিল না; সেটি করিলেন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী স্থাপন করিয়া (১৯১৮)। তবে সেটি এই পরিবেশের বাহিরেই থাকিয়া গেল।

এ দিকে বেসাণ্টের জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও 'নিউ ইন্‌ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধাবলী পাঠে মদ্রাজের সরকারপক্ষ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; গবর্মেণ্টের বড় বড় ইংরেজ কর্মচারীরা তাঁহাকে বহুবার সতর্ক করিয়া দেন, কিন্তু তিনি সে-সব হিতকথায় কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে মদ্রাজ গবর্মেণ্ট দুই সহকর্মী সহ মিসেস বেসাণ্টকে অন্তরীণাবদ্ধ করিলেন। ইতিপূর্বে 'কমরেড' নামক ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক মহম্মদ আলী, তদীয় ভ্রাতা সৌকত আলী এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বিনা বিচারে কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও ভারতের স্বাধীনতা দাবি করেন—ইহাই তাঁহাদের অপরাধ। আলী ভ্রাতাদ্বয় ও অন্যান্য মুসলিম নেতাদের মুক্তির জন্য মুসলমান সমাজ হইতে জোর আন্দোলন শুরু হয়; এবার হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে বেসাণ্টের মুক্তির জন্য প্রবল আন্দোলন দেখা দিল। মোটকথা ১৯১৭ সালের প্রথম নয় মাস বিনা বিচারে আবদ্ধদের মুক্তির জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন চলে। সরকার ও পুলিশের উৎপীড়নের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মদ্রাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্যর সুব্রহ্মণ্য আয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মিঃ উড্‌রো উইলসনকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠান। এই পত্র লইয়া সরকারী মহলে খুব হৈ চৈ পড়িয়া যায়; পত্রে কি লেখা ছিল—তাহার গুণাগুণ বিচারের বিষয় নহে—বিদেশী

রাষ্ট্রপতির নিকট ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজার এই ধরণের পত্র লেখার বৈধতাই ছিল তর্কের বিষয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথও বেসাণ্টের অন্তরীণের বিরুদ্ধে প্রেসের জন্য দীর্ঘ পত্র লেখেন। পৃথিবীময় এই পত্র প্রচারিত হয়।

কলিকাতায় প্রতিবাদ সভা হইল, রবীন্দ্রনাথ পড়িলেন 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ (৪ অগস্ট ১৯১৭)। এই সভা করিবার স্থান পাওয়াই হয় মুস্কিল; টাউন হল পাওয়া গেল না; অবশেষে পার্সিমাদন সাহেব তাঁহার হল দেওয়াতে বড় করিয়া সভা করা সম্ভব হইল।

সেপ্টেম্বর মাসে বেসাণ্টকে মদ্রাজ গভর্মেণ্ট মুক্তি দান করিলেন; কিন্তু আলী ভ্রাতাদ্বয় কোনোপ্রকার শর্তের মধ্যে আবদ্ধ হইতে রাজি না হওয়ায়, সরকার বাহাদুরের কৃপা তাঁহাদের উপর বর্ষিত হইল না। তাঁহারা আবদ্ধ থাকিলেন।

এই বৎসরের (১৯১৭) ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কন্‌গ্রেস সভাপতি কে হইবেন—তাহার বিচার লইয়া বাংলার অভ্যর্থনা সমিতিতে মতানৈক্য দেখা দিল। অভ্যর্থনা সভায় নবীনরা সংখ্যা গরিষ্ঠ, তাঁহারা শ্রীমতী বেসাণ্টকে কন্‌গ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু প্রাচীনপন্থী মডারেট দল সরকারের কোপদৃষ্টিতে শাস্তিপ্রাপ্ত বেসাণ্টকে কন্‌গ্রেসের সম্মানার্হ পদ দান করিবার বিরোধী। জাতীয়দল নূতন অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়া রবীন্দ্রনাথকে উহার সভাপতি মনোনীত করিল এবং তাহাদের সভায় বেসাণ্টকে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করা স্থির করিল। সুখের বিষয় অচিরকালের মধ্যে মূল অভ্যর্থনা সমিতির শুভবুদ্ধির উদয় হইল—তাঁহারা জাতীয় দলের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া লইলেন। মূল সভাপতি রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেনের নেতৃত্বে যথাবিধি কর্ম নিষ্পন্ন হইল। মডারেট দল যদি তরুণ জাতীয় দলের নির্দেশ না মানিতেন তবে হয়তো কলিকাতায়—দশ বৎসর পূর্বে সুরত কন্‌গ্রেসে অনুষ্ঠিত 'দক্ষযজ্ঞে'র পুনরভিনয় হইত। অভ্যর্থনা সমিতিতে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

কন্‌গ্রেসে এবার বিরাট জনতা; বেসাণ্টকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হাওড়া স্টেশনে ও কলিকাতার রাজপথে যে জনতা হইয়াছিল, ইতিপূর্বে কেহ কখনো সেরূপ দেখে নাই। দেশের জনতা ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা লাঞ্ছিত দেশসেবিকাকে সম্মান দিয়া প্রমাণ করিল যে, তাহারা সরকারের মতের সহিত একমত নহে—বেসাণ্ট অন্তরীণাবদ্ধ হইবার মতো অপরাধী নহেন—বেসাণ্ট

ভারতভক্ত রমণী। কলিকাতার কন্‌গ্রেসে জাতীয় দলের জয় হইল। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিনের অধিবেশনে ভারতের প্রার্থনা (India's prayer) পাঠ করিলেন। প্রথম দিনের অধিবেশনে মিসেস্ বেসাণ্টের পাশে বোরখা পরিহিত আলী-জননী উপবিষ্টা ছিলেন। কন্‌গ্রেসে মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকারা বোধ হয় এই সব-প্রথম অবতীর্ণ হইলেন।

গত বৎসর লখনৌতে (১৯১৬) কন্‌গ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যে-সব বোঝাপড়া হয়, তাহা রাজনৈতিক মিলনের জন্য—যাহার উদ্দেশ্য ব্রিটিশের আধিপত্য ধ্বংস। কিন্তু সেই পুরাতন প্রশ্নই থাকিয়া গেল—ইংরেজ-আধিপত্যের অবসানে কাহার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে? হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রচেষ্টার মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন ছিল, তাহার অভাব ছিল উভয়দিক হইতেই। হিন্দুদের মধ্যে যেমন একদল প্রতিক্রিয়াশীল অতিনিষ্ঠাবান ব্যক্তি বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষাকেই ভারতের মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ মার্গ বলিয়া মনে করেন; তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও কাফের-বিদ্বেষী লোকের অভাব ছিল না—যাহারা কন্‌গ্রেস ও হিন্দুদের হইতে দূরে থাকিয়া ব্রিটিশ সরকারের প্রিয়পাত্র হইয়া সুবিধা সুযোগ আদায়ের পক্ষপাতী। কোনো কোনো মুসলমানী কাগজ বেসাণ্টের 'হোমরুল লীগ'কে তীব্রভাবে আক্রমণ করিতে লাগিল। তাহাদের অভিযোগ কন্‌গ্রেসের সহিত মুসলিম লীগ জড়িত হওয়ায় মুসলমানের স্বার্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর হাতে সমর্পিত হইয়াছে; তাঁহারা বলেন 'লীগ' মুসলমান জনমত প্রকাশ করিতেছে না। আবার হিন্দুরা বলিলেন যে, কন্‌গ্রেস মুসলিম লীগের সহিত হাত মিলাইতে গিয়া হিন্দুদের জন্মগত ও ধর্মগত অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিতেছেন। মোট কথা, লখনৌ প্যাক্‌ট বা দোস্তীয়ালি অত্যন্ত ভাসাভাসা ভাবে হিন্দু-মুসলমান নেতাদের মধ্যে দেখা দেয়। কাঠ-মোল্লা ও গোঁড়া হিন্দুরা যথাযথ অনুকূলক্ষেত্রে জাতিধর্ম বিদ্বেষের ইন্ধনই জোগাইতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয় উভয় সম্প্রদায়ের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজই এই অপকর্মের পাণ্ডা! দেখিতে দেখিতে অতিক্ষুদ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা উত্তর ভারতের নানাস্থানে সংঘটিত হইল, অনেক সময় দাঙ্গার সূত্রপাত হইত বকর-ঈদের কোরবানি লইয়া। মুসলমানদের মধ্যে নবচেতনা হইতে তাহাদের পক্ষে ঈদের দিন গো-বধ অনিবার্য; এবং হিন্দুদের মধ্যে

মুসলমানদের কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট গোরু ছিনাইয়া আনা ধর্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা হইয়া দাঁড়াইল। সংখ্যাগরিষ্ঠদের এই অতি-ধার্মিকতার অভিঘাতে সংখ্যালঘু মুসলমান স্বভাবতই আতঙ্কিত। আবার সংখ্যাগুরু মুসলমানদের অঞ্চলে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্মভাবে আঘাত দিবার জন্যও মুসলমানদের জেদ কিছু কম প্রকাশ পাইত না। এই-সব ধর্মকেন্দ্রিক উত্তেজনার সময়ে সরকার এমন একটি নির্লিপ্ততার ভান করিতেন, যাহাতে আক্রান্তের মনে এই ধারণাই হইত যে, এই-সব ব্যাপারে গবর্মেণ্টের অদৃশ্য হাত আছে—গো-হত্যা লইয়া দাঙ্গা নূতন নহে ও সরকারের মনোগত ভাবটিও পুরাতন। ইহার ফলে গবর্মেণ্টের উপর লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কমিতে লাগিল। বিপ্লবীরা আছে এই-সব কলহের বাহিরে—তাহাদের গুপ্তহত্যা ও ষড়যন্ত্র নানাদিকে নানাভাবে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

২

য়ুরোপীয় মহাসমরের (১৯১৪—১৮) জন্য পৃথিবীর সর্বত্র দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষ ঋণী দেশ, অর্থাৎ গত একশত বৎসরের ব্রিটিশ- শাসন ও শোষণ নীতির ফলে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য কাঁচামাল উৎপন্ন ও সরবরাহ করিয়া আসিতেছে ও বিদেশে-প্রস্তুত শিল্পজাত নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয় করিতেছে। যুদ্ধের জন্য বিদেশী জাহাজ পাওয়া যায় না, রেলপথও কমিয়াছে। ফলে বিদেশে মালের চাহিদার অভাবে রপ্তানীযোগ্য কাঁচামালের দর নাই। আবার আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কারণে বিদেশী শিল্পজাত সামগ্রীর মূল্য অসম্ভব চড়া। তখনো ভারত বিলাতী বস্ত্রের মুখাপেক্ষী ; কিন্তু মিল্‌গুলি যুদ্ধোপকরণের বস্ত্রাদি বয়নে ব্যস্ত—বাঙালির পরিধেয় ধুতি-শাড়ি বয়ন করিবার সময় নাই। বস্ত্রাভাবে লজ্জানিবারণ হইতেছে না। বাংলাদেশের কয়েকস্থান হইতে বস্ত্রাভাবে অন্নাভাবে আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশিত হয়। সরকার বাহাদুর কয়েকবার খাদ্যাদির বাজার দর বাঁধিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। দরিদ্রকে শোষণ করিয়া কী এদেশের কী বিদেশের মূলধনী কারবারী, কল-ওয়ালারা ক্রোড়পতি হইয়া উঠিল।

সাধারণ লোকের নিকট এ দেশের ইংরেজ—তিনি ব্যবসায়ীই হউন আর রাজকর্মচারীই হউন, এই-সব অনাসৃষ্টি ব্যাপারের জন্য দায়ী ; ইংলণ্ডের সাহেব, য়ুরোপের সাহেব এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হউন—সমস্তই প্রায়-প্রতিশব্দ বাচক। দুর্মূল্যতার মূলে যে একটা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা সাধারণ লোকে তলাইয়া বুঝিতে পারে না ; তাহারা সকল দুঃখের উৎস স্থির করিল ইংরেজের ভারতে অবস্থান। ইহার একমাত্র প্রতিকার ব্রিটিশের কবল হইতে ভারতের মুক্তি। এই ভাবনা আর মুষ্টিমেয় ইংরেজি শিক্ষিতের মনে আবদ্ধ নাই এখন ইহা জনতার সুপ্ত মনকেও স্পর্শ করিতেছে।

ভারতের শাসনব্যবস্থায় সংস্কারের যে প্রয়োজন, এ কথা সকলেই বুঝিতে-ছিলেন ; এমন-কি বিলাতেও রাজনীতি-বিজ্ঞরা এ বিষয় লইয়া ভাবিত। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, ভারত ব্যবস্থাপক সভার উনিশজন সদস্য কর্তৃক ১৯১৬ সালে একটা সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত হয় এবং বিলাতে ভারত-সচিবকে সেটি যথাসময়ে প্রেরিত হয়।

এ দিকে পশ্চিমে মহাযুদ্ধের অবস্থা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিতেছে। মেসো-পটেমিয়ায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তুর্কী সৈন্যের হস্তে নিগৃহীত হইলে, তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য কমিশন বসিল। কমিশনের রিপোর্ট হইতে ভারতীয় আমলাতন্ত্রের ইংরেজদের অকর্মণ্যতা ও অসাধুতা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে বিবৃত হওয়ায় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটু সচকিত হইয়া উঠিলেন। ১৯১৭ সালে মিত্রদলের অন্যতম সহায় রুশিয়ার মধ্যে বিপ্লব দেখা দেওয়াতে তাহারা যুদ্ধ-ক্ষেত্রের পূর্বাঞ্চল হইতে রণবিমুখ হইল।[১] জারমেনীর তখন দুর্জয় শক্তি ; ব্রিটিশের ভয়, পশ্চিম এশিয়ার পথ দিয়া জারমানরা ভারত আক্রমণ করিতেও পারে। ভারতের এক দল বিপ্লবীও এই সময়ে জারমানদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বিলাতের পার্লামেন্টে সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতশাসন

১ রুশিয়ায় ১৯১৭ সালের ১৫ই মার্চ জার ২য় নিকোলাস পদত্যাগ করেন। ১৬ এপ্রিল লেলিন, জিনোভিয়েফ, রাদেক প্রভৃতি বলশিভিক নেতা পেত্রোগাদ প্রবেশ করেন। ২০শে জুলাই প্রিন্স জর্জ লোফ (Luov)-এর অস্থায়ী শাসন অবসান প্রভৃতি ঘটনা ঘটে।

সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা চলিতেছে; ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড-জর্জ অতি বিচক্ষণ শাসক—তিনি প্রতিপক্ষীয় শাসন-সমালোচক স্যামুয়েল মন্‌টেগুকেই ভারত-সচিব পদে নিযুক্ত করিলেন। মন্‌টেগুরা ইহুদী, রৌপ্যবাজারে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক।

মন্‌টেগু ভারত-সচিব হইয়াই নয় জন ভারতীয়কে সৈন্যবিভাগে এমন পদ দান করিলেন যাহা ইতিপূর্বে ইংরেজেরই একচেটিয়া ছিল। তারপর ১৯১৭ সালের ২০শে অগস্ট পার্লামেন্টে এক ঘোষণায় বলিলেন যে, শাসনব্যবস্থার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভারতীয়দিগের সহযোগিতা করিবার সুযোগ দিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে ভারতবর্ষকে ক্রমে দায়িত্বপূর্ণ শাসন দান করা হইবে। ঘোষণাটি খুবই মুন্সিয়ানা করিয়া রচিত।

দেশ যখন এই সামান্য ঘোষণার নানা অর্থ লইয়া বিচারে রত, তখন অকস্মাৎ ভারত-সচিব ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধের সময় জলপথ অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল বলিয়া ভারত-সচিবের আগমন সম্ভাবনার বার্তা সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হয় নাই; কারণ জারমান সাবমেরিন বা ডুবো-জাহাজ ব্রিটিশ জাহাজ আক্রমণ করিতেছে। ভারত-সচিবের পদ পঞ্চাশ বৎসর সৃষ্টির (১৮৫৮) পর ভারতে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মন্ত্রীর এই প্রথম পদার্পন (১০ নভেম্বর ১৯১৭)।

মন্‌টেগু ভারতে প্রায় পাঁচ মাস থাকিয়া ১৯১৮ সালের ২৩শে এপ্রিল দেশে ফিরিয়া যান। এই সময়ের মধ্যেই তিনিও বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড (১৯১৬-২১) ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া নানা দেশের নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের বক্তব্য মনোযোগপূর্বক শুনিলেন, কিন্তু কোনো মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ করিলেন না। মন্‌টেগু ভারতের সর্বত্রই আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইবার জন্য একটা বিরাট আকাঙ্ক্ষার ভাব লক্ষ্য করিলেন। সকলেরই আবেদন তাঁহাদের সমাজ বা দলকে যেন পৃথক প্রতিনিধিত্ব দান করা হয়। সকলের কাছে দেশ হইতে দল বড়—জাতি হইতে 'জাত' বড়! মদ্রাজে হোমরুল লীগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় সেখানকার অব্রাহ্মণ সমাজ 'জাস্টিস' দল নাম লইয়া বিশেষ সুযোগ সুবিধা এমন-কি পৃথক নির্বাচনও দাবি করিল। মদ্রাজের ব্রাহ্মণ আয়ার ও আয়েঙ্গাররা ছিল শিক্ষায় দীক্ষায় অগ্রণী। তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর সমাজকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতেন, এবং বিশেষভাবে 'পঞ্চম'

নামে যে অচ্ছুৎরা হিন্দু-সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে পড়িয়াছিল, তাহারা এখন মুখর হইয়া উঠিতেছে। খ্রীষ্টান পাদরীদের শিক্ষাদানের ফলে এখন পঞ্চমদের মধ্যে আত্মসম্মান জাগ্রত; তাহাদের মধ্যে বহু শিক্ষিত লোকও বাহির হইতেছে।

পঞ্জাবের শিখ সমাজও পৃথক নির্বাচনের কথা মন্টেগুর নিকট পেশ করিল; ভারত স্বাধীনতা লাভের পরও তাহাদের সে মনোভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই।

নানা লোকের সঙ্গে কথা বলিয়া মন্টেগু জানিতে পারিলেন যে দেশে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলই প্রবল। কন্‌গ্রেসে বেসাণ্টকে সভাপতি করিবার জন্য তিনি যেপ্রকার আন্দোলন দেখিয়া গেলেন, তাহাতে তাঁহার মনে হইল, জাতীয়তাবাদী দল (যাহাদের ঠিক চরমপন্থী বা বিপ্লববাদী আখ্যা দেওয়া যায় না, অথচ যাহাদের সহানুভূতি বামপন্থী দলের দিকে) রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবল পক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সেইজন্য তিনি ভারতে আসিয়া তাঁহার প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারের প্রতি যাঁহাদের সহানুভূতি আছে, সেই নরম-পন্থীদের দ্বারা একটি বিশেষ সংঘ গঠনে মনোযোগী হন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি ১৯১৭ হইতে কন্‌গ্রেস কার্যত নতুন দলের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল; ১৯০৮ হইতে ১৯১৬ পর্যন্ত পুরাতন পন্থী কন্‌গ্রেসীরা উহাদের দখলে ছিল এবং চরমপন্থী অথবা জাতীয়তাবাদীরা সেখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ১৯১৭ হইতে প্রাচীনদেরই সরিয়া পড়িতে হয়। মন্টেগু সাহেবের ইচ্ছায় কন্‌গ্রেসের বাহিরে National Liberal Federation নামে একটি নূতন সংঘ গঠিত হইল। বহু বৎসর এই সংঘ জাতীয়তাবাদী গান্ধী-প্রভাবান্বিত কন্‌গ্রেসের প্রতিষেধকরূপে কাজ করিয়াছিল। ইহারা ব্রিটিশদের সহিত আপোষ-রফা করিয়া ভারতের শাসন-সংস্কারের পক্ষপাতী। কোনো উগ্রমত ইহারা পোষণ বা কোনো উগ্রকর্ম ইহারা সমর্থন করিতেন না। তাঁহারা অনেক সময়ে সরকার ও কন্‌গ্রেসের মধ্যে বিরোধকালে শান্তির দূতরূপে কাজ করিতেন। মদনমোহন মালবীয়, সপ্রু জয়কার, সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই সংঘের খ্যাতনামা সদস্য।

ভারত-সচিব ও ভারতের বড় লাটের যৌথ স্বাক্ষরে শাসন-সংস্কারীয় প্রতিবেদন (৮ই জুলাই ১৯১৮) প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে রাজদ্রোহ বা

সিডিশন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। শেষোক্ত কমিটির কথা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। ভারতরক্ষা বিষয়ক অর্ডিনান্স পাশ হইয়াছিল মহাযুদ্ধের মুখে; তাহার মেয়াদ যুদ্ধপর্ব ও যুদ্ধের পর ছয় মাস মাত্র। কিন্তু মহাযুদ্ধ তো আর চিরকাল চলিবে না—১৯১৭ সালে ৬ এপ্রিল তারিখে মার্কিনরা ইংরেজ ও মিত্রপক্ষে যোগদান করায় যুদ্ধের মোড় ফিরিয়া গিয়াছে—জারমানরা এখন আক্রমণকারী নহে, তাহারা আক্রান্ত। মিত্রশক্তি বুঝিতে পারিতেছে, যুদ্ধ আর দীর্ঘকাল চলিবে না। ব্রিটিশ সরকারের শিরঃপীড়া ভারতকে লইয়া: যুদ্ধান্তে, সে জানে ভারতে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। যুদ্ধপর্বে বিপ্লবীরা ব্রিটিশশাসন ধ্বংস করিবার জন্য কি কাণ্ডই না করিয়াছে। সেইজন্য যুদ্ধ শেষ হইবার কয়েকমাস পূর্বে বিপ্লববাদের ইতিহাস সংকলন করিবার নিমিত্ত এবং সেই ধ্বংসাত্মক কর্মপদ্ধতি দমন করিবার উদ্দেশ্যে বিধিবিধানের সুপারিশ করিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত হয়। বিলাতের রৌলট নামে একজন বিচারক তদন্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হওয়ায়, সিডিশন কমিটির রিপোর্ট, রৌলট কমিটির রিপোর্ট নামে এমন-কি যে আইন পাশ হয় তাহাও 'রৌলট এক্ট' নামে খ্যাত বা কুখ্যাত হয়। এই রৌলট কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসের যে দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়, তাহা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব।

৩

আমাদের আলোচ্য পর্বে গান্ধীজির আবির্ভাব হইল। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই ক্ষীণকায় ব্যক্তি দীর্ঘকাল দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসজীবন যাপন করিয়া ভারতে ফিরিলেন ১৯১৫ সালে। গান্ধী গুজরাটের কাঠিয়াবাড়ের লোক; জন্ম হয় ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর। উনিশ বৎসর বয়সে বিলাতে যান ব্যারিষ্টারি পড়িতে। ১৮৯১-এ দেশে ফিরিয়া ব্যারিষ্টারি করিতে শুরু করেন বোম্বাই-এ ও রাজকোটের দেশীয় রাজার আদালতে। ১৮৯৩-এ দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী-ভারতীয়দের এক মামলা লইয়া তিনি তথায় যান; কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশে ও বুয়রদের দেশে ভারতীয়দের হীনদশা দেখিয়া তাহার

প্রতিকারের জন্য সেখানেই থাকিয়া গেলেন। তাঁহার তথাকার জীবনকাহিনী ও সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের ইতিহাস 'বহির্ভারতে ভারতীয়'দের ইতিহাসের অঙ্গ।

১৯১৪-এ য়ুরোপের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্মেণ্ট গান্ধীজির নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সাময়িকভাবে মুলতুবী করে। অতঃপর গান্ধীজি ভারতে ফিরিয়া আসাই স্থির করিয়া নাটালের ডারবান শহরে তাঁহার যে বিদ্যালয় ছিল, সেটিকেও ভারতে পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা প্রায় পাঁচ মাস রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনস্থ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আশ্রয় পায়। ১৯১৫-এ গান্ধীজি ভারতে আসিলেন। এক বৎসরের উপর তিনি দেশের অবস্থা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন ও সমস্যা বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। অতঃপর বিহার চম্পারণের চাষীদের লইয়া নীলকর সাহেবদের অত্যাচার প্রতিহত করিবার জন্য সত্যাগ্রহ পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বেই গভর্মেণ্ট এক তদন্ত কমিটি বসাইয়া গান্ধীজিকে উহার অন্যতম সদস্য মনোনীত করিয়া দেওয়াতে সত্যাগ্রহ আর প্রযুক্ত হইল না। এই তদন্ত কমিটির সুপারিশ মতে আইনের কিছু সংস্কার হওয়াতে নীলচাষীদের উপর অত্যাচার নিবারিত হইল।

গান্ধীজির জনতা লইয়া দ্বিতীয় পরীক্ষা হইল বোম্বাই প্রদেশের গুজরাট-অন্তর্গত খেড়া (Kaira) জেলায়; সেখানে অজন্মাবশত দারুণ খাদ্যকষ্ট দেখা দেয়, লোকে খাজনা মকুব চায়; গবর্মেণ্ট তাহাতে অস্বীকৃত হইলে গান্ধীজি এখানে সত্যাগ্রহনীতি প্রয়োগ করিলেন; দীর্ঘকাল সরকারী কর্মচারী খাজনা আদায়ের জন্য নানাবিধ নির্যাতন করিয়া দেখিল জনতা অটল—তখন সরকার আপোষ-রফা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইহার অল্পকাল পরে আমেদাবাদের গুজরাটি মালিকদের বয়ন শিল্পের মিলে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় গান্ধীজি অনশন অস্ত্র প্রয়োগ করেন; ইহার ফলে মালিকরা তাঁহার প্রস্তাব অংশত মানিয়া লইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার চেষ্টায় আমেদাবাদে শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর তিনি আসল অগ্নি-পরীক্ষায় নামিলেন।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসের ১১ তারিখে চারি বৎসর তিন মাস নিরন্তর যুদ্ধের পর অকস্মাৎ য়ুরোপে যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হইল; জারমেনী অন্তর্বিপ্লবে

ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—যুদ্ধের শক্তি তাহার আর নাই। যুদ্ধের সন্ধি-শর্ত আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল দেশ হইতে প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হইল। ভারত হইতে প্রেরিত হইলেন যুক্তপ্রদেশের (উত্তরপ্রদেশ) ছোটলাট স্যর জন মেস্টন, স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও বিকানীরের মহারাজা ; কিন্তু ইহাদিগকে প্রতিনিধি না বলিয়া ব্রিটিশ সরকারের মনোনীত ব্যক্তি বলিলেই ভালো হয়। ব্রিটিশ সরকার স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে বহু সম্মান দিয়াছিলেন ; তিনি ভারতীয়দের মধ্যে বড়লাটের কর্মসমিতির প্রথম আইন সদস্য। ১৯১৭ সালে সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিদের লইয়া যে সমর-বৈঠক বসে, তাহাতে ইনি সদস্যরূপে আমন্ত্রিত হন। মহাযুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি সভায় তিনি ভারতের অন্যতম সদস্যরূপে উপস্থিত হইলেন। কন্‌গ্রেস ১৯১৮ সালের দিল্লী অধিবেশনে প্রস্তাব করেন যে, এই সাম্রাজ্য আলোচনা সভায় ভারতের পক্ষ হইতে লোকমান্য টিলক, গান্ধীজি ও হাসান ইমামকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করা হউক। বলা বাহুল্য সরকার সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

রৌলট কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হইবার পর হইতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের নেতৃত্বে নামিলেন গান্ধীজি। তিনি জানিতেন জনতাকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে না পারিলে মুক্তি নাই ; রাজনৈতিক চেতনা সমাজের কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের বৈঠকী আলোচনা সভায় বা বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ কয়েকটি যুবকের মধ্যে সীমিত থাকিলে কখনই স্বাধীনতা আসিবে না—জনতাকে লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে—এক হিসাবে ইহা আগুন লইয়া খেলা। গণ-সংযোগ দ্বারা গণআন্দোলন সৃষ্টি ছাড়া বিপ্লব সম্ভব হইতে পারে না। রাজ-নীতিক্ষেত্রে গান্ধীজির প্রবেশমুহূর্ত হইতে আরাম-কেদারাশায়ীদের রাজনীতি-চর্চার অবসান হইল।

আমরা ইতিপূর্বে সিডিশন কমিটির রিপোর্টের কথা বলিয়াছি। মন্‌টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ডের ভারত শাসন বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে ১৯১৮ সালের ১৫ই জুলাই রৌলট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট ভারতের বিপ্লব-প্রয়াসের আনুপূর্বিক ঘটনারাজি খুবই দক্ষতার সহিত সন্ধান করিয়া লিখিত। দেশময় রাজদ্রোহ প্রচার, রাজনৈতিক কর্মের জন্য লুণ্ঠনাদি করিয়া অর্থ-সংগ্রহ, রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা দ্বারা সরকারী কর্মচারী

মহলে আতঙ্কসৃষ্টি, এক প্রদেশের সহিত অন্যপ্রদেশের বিপ্লবকারীদের যোগস্থাপন ও গুপ্ত ষড়যন্ত্র, অর্থ ও অস্ত্র -সংগ্রহের জন্য জারমানদের সহিত গোপন বন্দোবস্ত, দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে বিদ্রোহ জাগাইবার চেষ্টা প্রভৃতির কথা এই রিপোর্টে প্রকাশিত হয়।

এই-সকল বিপ্লবকর্ম দমন করিবার জন্য কমিটি কতকগুলি প্রস্তাব রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত করেন। সেই প্রস্তাবমত আইন পাশ করা অনিবার্য হইয়া উঠিল।

সিডিশন কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হইলে সে-যুগে সাংবাদিকরা কঠোরভাবে ইহার নিন্দা করেন। রাজদ্রোহ, বিপ্লবাদির যে-সব কাহিনী ইহাতে বর্ণিত আছে তাহা সরকারী পুলিশ বিভাগের সৃষ্টি, এইরূপ কোনো ব্যাপক ষড়যন্ত্র দেশে নাই, প্রমাণ থাকে তো সরকার সরাসরি তাহাদের ধরিয়া প্রকাশ্যে বিচার করুন—ইত্যাদি কথা উঠিয়াছিল। বিপ্লববাদ ও সন্ত্রাস-কাহিনী অস্বীকার না করিলেও ইহার ব্যাপক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। ত্রিশ বৎসর পর ভারত স্বাধীন হইলে, সেই-সকল কাহিনী অতি সত্য বলিয়া জানা গেল এবং বিপ্লব মধ্যে কে কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার আত্ম-কেন্দ্রিক বর্ণনা বিঘোষিত হইতে থাকিল। অনেক সময় এই-সব কাহিনী পরস্পর বিরোধী এবং বিভিন্ন দল উপদলের কর্মীদের মধ্যে মতান্তর হেতু অনেকগুলি গ্রন্থ পরস্পরের প্রতি দোষারোপে দুষ্ট। ১৯১৮ সালে যাহা সজোরে অস্বীকৃত হইয়াছিল, ১৯৪৮-এ তাহা সগর্বে আস্ফালনের সহিত স্বীকৃত ও বর্ণিত হইতেও দেখা গেল!

৪

আমরা পূর্বে বলিয়াছি ১৯১৮ সালে নভেম্বর মাসে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে অর্ডিনান্সের নিয়মানুসারে ভারত রক্ষা আইন আর ছয় মাস মাত্র বলবৎ থাকিতে পারিবে; সুতরাং এপ্রিল মাসে নূতন আইন পাশ না করিলে সন্ত্রাসবাদীদের শমিত করা যাইবে না। ১৯১৮ সালের শেষে দিল্লীর কন্‌গ্রেস অধিবেশনে রৌলট কমিটির ফৌজদারী দণ্ডবিধি পরিবর্তন সম্বন্ধীয় মন্তব্যের প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ হয়—তখনো কমিটির নির্দেশ অনুসারে আইন পাশ হইবে বলিয়া কোনো কথা শোনা যায় নাই।

কিন্তু ১৯১৯ সালে মার্চ মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় দণ্ডবিধির নূতন খসড়া উপস্থাপিত হইল। ভারতীয় বে-সরকারী দেশীয় হিন্দুমুসলমান সদস্যগণ একযোগে ইহার প্রতিবাদ করিলেন এবং বলিলেন, এই বিল দুইটি ন্যায় ও স্বাধীনতার মূলতন্ত্র-বিরোধী এবং মানুষের সহজাত অধিকারের পরিপন্থী। মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসবাদীদের দমন করিবার জন্য যে আইন প্রস্তুত হইতেছে তাহা স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার অধিকারকে পদে পদে সংকুচিত করিবে। সন্দেহ মাত্রই গ্রেপ্তার ও নির্বাসন, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে আইন-শৃঙ্খল ভঙ্গকারী বলিয়া ঘোষণা ও অধিবাসীদের উপর অনুরূপ আচরণ প্রভৃতি এই আইনের আওতায় আসিয়া যাইতেছে। ভারতীয় সদস্যদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮ই মার্চ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী ও ইংরেজ সদস্যদের সংখ্যাধিক্যহেতু বিল দুইটি পাশ হইয়া গেল। তবে গবর্মেণ্ট এইটুকু ভরসা দিলেন যে, প্রথম বিলটি কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে না এবং তিন বৎসর পরে উহা প্রত্যাহৃত হইবে অর্থাৎ নূতন দ্বৈরাজ্য-মূলক যে নূতন সংবিধান প্রস্তুত হইতেছে তাহা চালু হইলেই এই আইন আর বলবৎ থাকিবে না।

রৌলট বিল লইয়া যখন দেশময় কাগজেপত্রে আলোচনা চলিতেছে, তখন গান্ধীজি ঘোষণা করিলেন; "রৌলট আইন ভারতীয়দের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও মানুষের জন্মলব্ধ স্বাভাবিক স্বাধীনতার পরিপন্থী; অতএব যতদিন এই অসঙ্গত ও অপমানজনক আইন ভারত-সরকার প্রত্যাহার না করিবেন ততদিন আমরা সম্মিলিতভাবে এই আইন মানিতে অস্বীকার করিব। তবে শাসক ও শাসিতের এই বিরোধে আমরা নিরুপদ্রব প্রতিরোধপন্থা (Passive resistance) গ্রহণ করিব।" ইহাই সত্যাগ্রহের প্রথম আবেদন।

গান্ধীজি আহমদাবাদের নিকট সবরমতীতে থাকেন; তিনি বোম্বাই গিয়া রাজপথে প্রকাশ্যে সরকারের নিষিদ্ধ পুস্তক বিক্রয় করিয়া আইন ভঙ্গ করিলেন; এবং ৩০শে মার্চ, পরে তারিখ পরিবর্তন করিয়া ৬ই এপ্রিল ভারতের সর্বত্র 'হরতাল' প্রতিপালনের আহ্বান প্রেরণ করিলেন। 'হরতাল' কি, কীভাবে তাহা উদ্‌যাপন করিতে হইবে ইত্যাদি সম্বন্ধে জনতার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না; নানা লোকে নানাভাবে ইহার অর্থ করিয়া লইল। গান্ধীজির নির্দেশ ছিল লোকে সেদিন উপবাস করিবে এবং দোকানপাট বন্ধ করিবে।

মহলে আতঙ্কসৃষ্টি, এক প্রদেশের সহিত অন্যপ্রদেশের বিপ্লবকারীদের যোগ-স্থাপন ও গুপ্ত ষড়যন্ত্র, অর্থ ও অস্ত্র -সংগ্রহের জন্য জারমানদের সহিত গোপন বন্দোবস্ত, দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে বিদ্রোহ জাগাইবার চেষ্টা প্রভৃতির কথা এই রিপোর্টে প্রকাশিত হয়।

এই-সকল বিপ্লবকর্ম দমন করিবার জন্য কমিটি কতকগুলি প্রস্তাব রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত করেন। সেই প্রস্তাবমত আইন পাশ করা অনিবার্য হইয়া উঠিল।

সিডিশন কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হইলে সে-যুগে সাংবাদিকরা কঠোরভাবে ইহার নিন্দা করেন। রাজদ্রোহ, বিপ্লবাদির যে-সব কাহিনী ইহাতে বর্ণিত আছে তাহা সরকারী পুলিশ বিভাগের সৃষ্টি, এইরূপ কোনো ব্যাপক ষড়যন্ত্র দেশে নাই, প্রমাণ থাকে তো সরকার সরাসরি তাহাদের ধরিয়া প্রকাশ্যে বিচার করুন—ইত্যাদি কথা উঠিয়াছিল। বিপ্লববাদ ও সন্ত্রাস-কাহিনী অস্বীকার না করিলেও ইহার ব্যাপক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। ত্রিশ বৎসর পর ভারত স্বাধীন হইলে, সেই-সকল কাহিনী অতি সত্য বলিয়া জানা গেল এবং বিপ্লব মধ্যে কে কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার আত্ম-কেন্দ্রিক বর্ণনা বিঘোষিত হইতে থাকিল। অনেক সময় এই-সব কাহিনী পরস্পর বিরোধী এবং বিভিন্ন দল উপদলের কর্মীদের মধ্যে মতান্তর হেতু অনেকগুলি গ্রন্থ পরস্পরের প্রতি দোষারোপে দুষ্ট। ১৯১৮ সালে যাহা সজোরে অস্বীকৃত হইয়াছিল, ১৯৪৮-এ তাহা সগর্বে আস্ফালনের সহিত স্বীকৃত ও বর্ণিত হইতেও দেখা গেল!

৪

আমরা পূর্বে বলিয়াছি ১৯১৮ সালে নভেম্বর মাসে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে অর্ডিনান্সের নিয়মানুসারে ভারত রক্ষা আইন আর ছয় মাস মাত্র বলবৎ থাকিতে পারিবে; সুতরাং এপ্রিল মাসে নূতন আইন পাশ না করিলে সন্ত্রাসবাদীদের শমিত করা যাইবে না। ১৯১৮ সালের শেষে দিল্লীর কন্‌গ্রেস অধিবেশনে রৌলট কমিটির ফৌজদারী দণ্ডবিধি পরিবর্তন সম্বন্ধীয় মন্তব্যের প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ হয়—তখনো কমিটির নির্দেশ অনুসারে আইন পাশ হইবে বলিয়া কোনো কথা শোনা যায় নাই।

কিন্তু ১৯১৯ সালে মার্চ মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় দণ্ডবিধির নূতন খসড়া উপস্থাপিত হইল। ভারতীয় বে-সরকারী দেশীয় হিন্দুমুসলমান সদস্যগণ একযোগে ইহার প্রতিবাদ করিলেন এবং বলিলেন, এই বিল দুইটি ন্যায় ও স্বাধীনতার মূলতন্ত্র-বিরোধী এবং মানুষের সহজাত অধিকারের পরিপন্থী। মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসবাদীদের দমন করিবার জন্য যে আইন প্রস্তুত হইতেছে তাহা স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার অধিকারকে পদে পদে সংকুচিত করিবে। সন্দেহ মাত্রই গ্রেপ্তার ও নির্বাসন, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে আইন-শৃঙ্খল ভঙ্গকারী বলিয়া ঘোষণা ও অধিবাসীদের উপর অনুরূপ আচরণ প্রভৃতি এই আইনের আওতায় আসিয়া যাইতেছে। ভারতীয় সদস্যদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮ই মার্চ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী ও ইংরেজ সদস্যদের সংখ্যাধিক্যহেতু বিল দুইটি পাশ হইয়া গেল। তবে গবর্মেণ্ট এইটুকু ভরসা দিলেন যে, প্রথম বিলটি কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে না এবং তিন বৎসর পরে উহা প্রত্যাহৃত হইবে অর্থাৎ নূতন দ্বৈরাজ্য-মূলক যে নূতন সংবিধান প্রস্তুত হইতেছে তাহা চালু হইলেই এই আইন আর বলবৎ থাকিবে না।

রৌলট বিল লইয়া যখন দেশময় কাগজেপত্রে আলোচনা চলিতেছে, তখন গান্ধীজি ঘোষণা করিলেন ; "রৌলট আইন ভারতীয়দের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও মানুষের জন্মলব্ধ স্বাভাবিক স্বাধীনতার পরিপন্থী ; অতএব যতদিন এই অসঙ্গত ও অপমানজনক আইন ভারত-সরকার প্রত্যাহার না করিবেন ততদিন আমরা সম্মিলিতভাবে এই আইন মানিতে অস্বীকার করিব। তবে শাসক ও শাসিতের এই বিরোধে আমরা নিরুপদ্রব প্রতিরোধপন্থা (Passive resistance) গ্রহণ করিব।" ইহাই সত্যাগ্রহের প্রথম আবেদন।

গান্ধীজি আহমদাবাদের নিকট সবরমতীতে থাকেন ; তিনি বোম্বাই গিয়া রাজপথে প্রকাশ্যে সরকারের নিষিদ্ধ পুস্তক বিক্রয় করিয়া আইন ভঙ্গ করিলেন ; এবং ৩০শে মার্চ, পরে তারিখ পরিবর্তন করিয়া ৬ই এপ্রিল ভারতের সর্বত্র 'হরতাল' প্রতিপালনের আহ্বান প্রেরণ করিলেন। 'হরতাল' কি, কীভাবে তাহা উদ্‌যাপন করিতে হইবে ইত্যাদি সম্বন্ধে জনতার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না ; নানা লোকে নানাভাবে ইহার অর্থ করিয়া লইল। গান্ধীজির নির্দেশ ছিল লোকে সেদিন উপবাস করিবে এবং দোকানপাট বন্ধ করিবে।

৩০ মার্চ দিল্লীতে ও পঞ্জাবের কোনো কোনো স্থানে হরতাল পালিত হইল। কিন্তু সত্যাগ্রহের জন্য যে সংযম প্রয়োজন, সে-শিক্ষা তখনও সাধারণ জনতা পায় নাই। এ ছাড়া এই-সব আন্দোলনের সময়ে দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোকে সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলা আনিবার জন্য সদাই তৎপর হয়। যাহারা হরতাল পালন করিতে অসম্মত হয়, তাহাদের উপর জুলুম-জবরদস্তি করিয়া হাঙ্গামার সৃষ্টি চলে। পুলিশের গোপন সাহায্যপুষ্ট এক শ্রেণীর লোক বরাবরই উপদ্রব সৃষ্টি করিবার জন্য প্রস্তুত, তাহারাই আসলে হাঙ্গামার উদ্‌বোধক ও প্ররোচক। তবে সাধারণ জনতার মধ্যেও উদ্ধত ও আস্ফালনকারী লোকের অভাব ছিল না। দিল্লীর হরতাল শান্ত নিরুপদ্রব থাকে নাই; পুলিশ ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষ হইলে পুলিশের গুলিতে আটজন লোক নিহত ও বহু লোক আহত হইল। গান্ধীজির সেদিনকার শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ সফল হইল না সত্য, কিন্তু এই কথাটি সেদিন স্পষ্ট হইল যে, সাধারণ জনতাকে রাজনৈতিক কর্মে নিযুক্ত করা যাইবে, জাগ্রত জনতার দ্বারাই বিপ্লব সম্ভব। এতদিন মুষ্টিমেয় ছাত্র, ড্রইংরুমে বিলাসী রাজনৈতিক নেতাদের অনুবর্তী হইয়া অ্যাজিটেশন চালাইতেছিল, এখন গান্ধীজির নূতন পদ্ধতি অনুসারে জনতা (masses) রাজনীতিতে যোগদান করিল। কিন্তু জনতার ধর্মশিক্ষা ও সংযমশিক্ষা তখনো হয় নাই, তাই প্রথম দিকে জনতার প্রচেষ্টা হাঙ্গামা আস্ফালনে পরিণত হইয়াছিল।

দিল্লীর হাঙ্গামার সময় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দিল্লীতে উপস্থিত; তাঁহার অসাধারণ প্রতিভায় আকৃষ্ট হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজই তাঁহাকে নেতারূপে বরণ করিয়া লইল। মুসলমানদের অনুরোধে শ্রদ্ধানন্দ স্বামী দিল্লীর বিখ্যাত জুমা মসজিদের চত্বর হইতে বক্তৃতা দিয়া হিন্দু-মুসলমানকে শান্ত করেন। এই সময়ে (এপ্রিল ১৯১৯) দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমানের জনতার মধ্যে প্রীতির যে নিদর্শন প্রকাশ পায় তাহা পূর্বে কখনও হয় নাই, পরেও কখনও পুনরাবৃত্ত হয় নাই। দুঃখের দিনে পরম আগ্রহে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের হাত হইতে জল পান করিল। কিন্তু ইহা ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষ-প্রসূত আকস্মিক ভাবালুতা মাত্র—কোনো পক্ষের অন্তরের আন্তরিক পরিবর্তন হইতে সংঘটিত হয় নাই।

দিল্লীর হাঙ্গামার সংবাদ পাইয়া গান্ধীজি উদ্‌বিগ্ন হইয়া বোম্বাই হইতে দিল্লী যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে তাঁহার প্রতি দিল্লী প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা

আসিল ; বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বোম্বাই ফিরিতে হইল। দিল্লীতে রটিল, পুলিশ গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে ; এই জনশ্রুতি হইতে অচিরে দিল্লীতে প্রথমে হরতাল ও পরে হাঙ্গামার সূত্রপাত এবং তাহার অপরিহার্য পরিণাম পুলিশের গুলিবর্ষণ হইল।

গান্ধীজির গ্রেপ্তারের মিথ্যা সংবাদ উত্তরভারতময় রাষ্ট্র হইয়া গেলে উচ্ছৃঙ্খল জনতা বহুস্থানে অনাসৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। কলিকাতায় পুলিশের গুলিতে পাঁচ ছয় জন লোক হত ও দশ বার জন লোক আহত হয়। বোম্বাই প্রদেশে আহমদাবাদ, বীরজম ও নদিয়াদে জনতার উপর পুলিশের লাঠি চলিল। আহমদাবাদে শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা ও উচ্ছৃঙ্খলতা এমনভাবে দেখা দিল যে সেখানে সামরিক আইন জারি করিতে হইল। গান্ধীজি চারিদিকে এই অশান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া সবরমতীতে বলিলেন, ইহাতো সত্যাগ্রহ নহে, ইহা দুগ্রহেরও অধিক ; যাহারা সত্যাগ্রহ ব্রত ধারণ করিবে তাহারা সর্বপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াও অন্যের প্রতি বলপ্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতে বাধ্য। তাহারা অন্যের ক্ষতি সাধনের জন্য লোষ্ট্রনিক্ষেপ প্রভৃতি কুকার্য হইতে সর্বদা বিরত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"[১]

উত্তরভারত ও দিল্লী ছাড়াইয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন পঞ্জাবে পরিব্যাপ্ত হইল। পঞ্জাবে অসন্তোষ বিস্তারিত হইবার বহু কারণ সঞ্চিত হইয়াছে। পঞ্জাবের ছোটলাট স্যর মাইকেল ও'ডায়ার যুদ্ধের সময় সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করিতে গিয়া যেভাবে পঞ্জাবিদের উপর জুলুম ও অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার কথা লোকে ভুলিতে পারে নাই। লাহোরে কয়েকটি ষড়যন্ত্র মামলায় কিভাবে শত শত পঞ্জাবি ও শিখকে জড়িত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, কতজন যে স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু বরণ করিয়াছে—তাহার ইতিহাস সকলেরই

---

১ প্রায় এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির উদ্দেশ্যে একখানি দীর্ঘ খোলা পত্রের একস্থানে লিখিয়াছিলেন—"In this crisis you, as a great leader of men, have stood among us to proclaim your faith in the ideal which you know to be that of India, the ideal which is both against the cowardliness of hidden revenge and the cowed submissiveness of the terror-striken. You have said, as Lord Buddha has done in his time and for all time to come,…conquer anger by the power of non-anger and evil by the power of good." (দ্রঃ রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড পৃ. ১৩)।

সুপরিজ্ঞাত। কোমাগাটামারু হইতে প্রত্যাবৃত্ত পঞ্জাবিরা কিভাবে নিহত ও জীবিতেরা অন্তরায়িত হইয়াছে তাহা লোকে ভালোভাবেই জানে। এই-সকল ঘটনায় শিখ ও পঞ্জাবিদের মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। তাহারা ভুলিতে পারিতেছে না যে, কয় বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তাহারাই জারমান-তুর্কীর কামানের খোরাক হইয়াছিল; তাহাদের কত শত আত্মীয় বিকলাঙ্গ, বিকৃত কলেবর হইয়া আর্ত জীবন যাপন করিতেছে। আজ তাহাদেরই উপর ইংরেজ কী ব্যবহার করিতেছে! মনে মনে তাহাদের এই শব্দের উদয় হইয়াছিল 'বেইমান'। পঞ্জাবের মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ তখন একদিন (৯ এপ্রিল ১৯১৯) ডাঃ কিচ্‌লু ও সত্য পালকে ডেপুটি কমিশনার তাঁহার গৃহে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া সরাসরি অন্তরীণাবদ্ধ করিলেন; ঠিক সেইদিন গান্ধীজির গ্রেপ্তারের গুজব লোকের মুখে মুখে দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এই দুইটি সংবাদ যুগপৎ প্রচারিত হইলে অমৃতসরে তীব্র উত্তেজনা দেখা গেল। উত্তেজিত জনতা তাহাদের নেতাদের মুক্তির দাবি জানাইবার জন্য ডেপুটি কমিশনারের বাড়ির দিকে রওনা হয়; তাহারা নিরস্ত্র ছিল। সরকার বলেন, জনতা ইংরেজ পল্লী লুণ্ঠন করিতে যাইতেছিল। কিন্তু নিরস্ত্র জনতা চীৎকার করিতে পারে আক্রমণ করিবে কি লইয়া? পুলিশ জনতার উপর গুলি চালাইল। ইহার পরেই জনতা উন্মত্ত হইয়া শহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ শুরু করে। টেলিগ্রাফ অফিস, রেলওয়ে মালগুদাম তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং একটি ব্যাংকে অগ্নিসংযোগ করিয়া পুড়াইয়া দেয়। কয়েকটি আপিসও ধ্বংস হয়। মিস্ শেরউড্ নামে এক শ্বেতাঙ্গিনী দুর্বৃত্তশ্রেণীর কয়েকজনের হাতে আহত হন, কিন্তু দেশীয় ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দেন।

এই অরাজকতায় ছোটলাট মাইকেল ও'ডায়ার বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের অনুমতি লইয়া পঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করিলেন। অমৃতসর সর্বাপেক্ষা উপদ্রুত স্থান, ইহার ভার পড়িল জেনারেল ডায়ারের উপর। দুইদিন কোথাও কোনো উপদ্রব দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে পঞ্জাব সরকার মনে করিলেন, ভারতে দ্বিতীয় 'সিপাহী-বিদ্রোহ' উপস্থিত; সুতরাং কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে।

১৩ এপ্রিল ১৯১৯ রবিবার, বৈশাখী পূর্ণিমা—সেদিন এক মেলা বসে অমৃতসরে। কেহ কেহ মনে করেন পুলিশের গুপ্তচর হংসরাজ চারিদিকে ঘোষণা করে এবার ঐদিনে জালিনবালাবাগে জনসভা হইবে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বাগে প্রায় ২৩।২৪ হাজার লোক সমবেত হইল। বাগের চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত, প্রবেশের একটি মাত্র পথ ছাড়া চারি পাঁচটি ফাঁক ছিল প্রাচীরগাত্রে, সেই-সব ফাঁক দিয়া অতি কষ্টে পার হওয়া যাইত। সরকার-পক্ষীয়রা বলেন যে, সভা নিষেধ করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল, লোকে জোর ও জিদ করিয়া সমবেত হয়। সভার কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে একখানি এরোপ্লেন উপর দিয়া উড়িয়া গেল; তাহা দেখিয়া লোকে চঞ্চল ও ভীত হইয়া উঠিলে গুপ্তচর হংসরাজ তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া বক্তৃতা করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে জেনারেল ডায়ার ২৫ জন রাইফেলধারী শিখ, ২৫ জন গুর্খা ও ৪০ জন খুকরীধারী সৈন্য একটি ছোটো কামান-গাড়ি লইয়া বাগের প্রবেশমুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাগের ভিতর একটা টিলার উপর সৈন্যগণ উঠিয়া গেল এবং ভিড় যেখানে খুব ঘন ডায়ার সাহেব সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িতে বলিলেন। গুলি ছুড়িবার পূর্বে জনতা বে-আইনি ঘোষণা করা হয় নাই। ১৬৫০টি টোটা ছোঁড়া হইয়াছিল এবং কামান যদি ভিতরে লওয়া যাইত তবে তাহাও ব্যবহার করিতেন—এ কথা তিনি পরে কবুল করিয়াছিলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই বাগের মধ্যে ৩৭৯টি লোক মারা পড়িল, আহতের সংখ্যা সহস্রাধিক। বে-সরকারী তদন্ত কমিটির মতে প্রায় হাজার লোক গুলিতে মারা পড়ে। হত্যাকাণ্ডের পর হত-আহতদের কোনো ব্যবস্থা না করিয়া ডায়ার সাহেব সৈন্যদল লইয়া ছাউনিতে ফিরিয়া গেলেন।

অমৃতসরের বাহিরে ধরপাকড় চলিল, লাহোর হইতে লালা হরকিষণ ও রামভূজ দত্ত চৌধুরী (রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নেয়ী সরলাদেবীর স্বামী) নির্বাসিত হইলেন। পঞ্জাবে ছয় সপ্তাহ সামরিক আইন বহাল থাকিল। এই সময়ের মধ্যে পঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান-শিখ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ভারতীয়দের উপর যে নির্যাতন ও অপমানকর ব্যবহার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সভ্য সমাজের ইতিহাসে অজ্ঞাত। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে একবার দেখা গিয়াছিল ইংরেজ কতদূর নীচ হইতে পারে। জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরও বিংশ শতকেও দেখা গেল স্বার্থে আঘাত লাগিলে তাহারা কতদূর হিংস্র হইতে

পারে। অমৃতসরে যেস্থানে মিস্ শেরউডকে উন্মত্ত জনতা আক্রমণ করিয়াছিল, সেই স্থানে মিলিটারী মোতায়েন করিয়া নিয়ম জারী হইল, যে সেখান দিয়া যাইবে—তাহাকে পশুর ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইবে। এমন-কি যাহাদের বাড়ি এই পথের ধারে তাহাদিগকে প্রত্যেকবার বাড়ি হইতে বাহির হইলেই বুকে হাঁটিতে হইত। প্রত্যেক ভারতীয়কে সাহেবমাত্রকেই তাহাদের ইচ্ছা ও কায়দা মাফিক সেলাম করিতে হইত। বেত মারিয়া শাস্তি দেওয়া তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বেত মারিবার 'টিকটিকি' খাড়া করা হয় চৌমাথার উপর। কোথাও বাজারের গণিকাগণকে সারিবদ্ধ দাঁড় করাইয়া উলঙ্গ পুরুষকে বেত্রাঘাত করা হইল। উকিলদিগকে স্পেশ্যাল কনেষ্টবল সাজিয়া সাধারণ পেয়াদা-পিয়নের ন্যায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য করা হয়। বিচারের জন্য 'স্পেশ্যাল আদালত' খোলা হইয়াছিল; কিন্তু সেখানে আইনের নামে বে-আইনী বিচারই চলিত স্বাভাবিক ভাবে। অমৃতসরে তিনজন বিচারক বিচারে বসিতেন, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার অধিকার তাহাদের ছিল; এবং তাঁহাদের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল চলিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর সামরিক কোর্টে বিচারক দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দিতে এবং সহস্র টাকা জরিমানা করিতে পারিতেন; ইহার বিরুদ্ধে আপীল চলিত না। প্রথম বিচারালয়ে ১৮৮ জনের বিচার হয়, মুক্তি পায় মাত্র তিন জন! অবশিষ্টের কি হইল বলা নিষ্প্রয়োজন।

লাহোর মুসলমানপ্রধান নগর, সেখানে তেমন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় নাই; তৎসত্ত্বেও সামরিক কর্তা জন্সন সামান্য কারণেই গুলি চালান। তিনি বলেন, পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানের লোকদের শিক্ষা দিবার জন্য লাহোরে সামরিক আইন জারি করিয়া অত্যাচার করা হয়। গুজরণবালা শহরে পৌঁছিবার রেলপথ হাঙ্গামাকারীরা উপড়াইয়া ফেলিয়াছিল; সেইজন্য এরোপ্লেন হইতে জনতার উপর গুলি বর্ষণ করা হয়। কোনো কোনো শহরে সদর রাস্তার উপরেই ফাঁসিকাষ্ঠে লোক লটকানো হইয়াছিল। নারীদের উপর সৈন্যেরা কম অত্যাচার ও অবমাননা করে নাই। এইরূপ অসংখ্য লোমহর্ষক বর্বর ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজের স্বরূপ প্রকাশ পাইল। পঞ্জাবের কাহিনী কলঙ্কের ইতিহাস; কারণ এই সময়ে সমগ্র পঞ্জাবে বীরত্বের বা মহত্ত্বের একটি দৃষ্টান্তও শাসক বা শাসিতের মধ্যে

দেখা যায় নাই। বাংলা দেশে অনুরূপ ঘটনা ঘটিলে বীরকেশরী পঞ্জাবিদের দ্বারা উপেক্ষিত 'ভীরু' বাঙালি যুবকরা চতুষ্পদের মতো সদর রাস্তা অতিক্রম করিত না।

পঞ্জাবে এই অমানুষিক অত্যাচার চলিতেছে, অথচ কঠোর সামরিক আইনের শাসনে তথাকার কোনো ঘটনা দেশের বাহিরে কেহ জানিতেও পারিতেছে না। রবীন্দ্রনাথ কোনো সূত্রে এই-সব ঘটনা জানিতে পারিয়া লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠি[১] লিখিয়া পঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদে সম্রাটপ্রদত্ত 'স্যর' উপাধি বর্জন করিলেন (২ জুন ১৯১৯)।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখিলেন (আষাঢ় ১৩২৬):

"পঞ্জাবে ঠিক যে কি হইয়াছে এবং কি কারণে হইয়াছে, তাহা বিস্তারিতভাবে জানিবার উপায় নাই। কারণ, সরকারী সেন্‌সরের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো খবর প্রকাশিত হইতে দেওয়া হয় নাই। ফলে কেবল পঞ্জাবের এংলো-ইন্‌ডিয়ান কাগজের খবর এবং সরকারী কর্মচারীদের দেওয়া খবরই দেশে প্রচারিত হইয়াছে; ভিন্ন প্রদেশের লোককে পঞ্জাবে যাইতে দেওয়া হয় নাই, কিন্তু ভিন্ন প্রদেশের কোনো কোনো এংলো-ইন্‌ডিয়ান সংবাদদাতা পঞ্জাবে যাইতে পাইয়াছে। পঞ্জাবে সামরিক আইন অনুসারে যাহাদের বিচার হইয়াছে তাহারা অন্য প্রদেশ হইতে নিজেদের উকিল ব্যারিষ্টার লইয়া যাইতে পায় নাই; পঞ্জাব হইতে যাহারা বাহিরে আসিয়াছে, তাহারা কোনো চিঠিপত্র লইয়া যাইতেছে কি না দেখিবার জন্য কোনো কোনো রেলওয়ে ষ্টেশনে তাহাদের খানাতল্লাসী হইয়াছে; পঞ্জাব হইতে যাহাতে ডাকযোগে কেহ বাহিরের কোনো কাগজে খবর দিতে না পারে তাহার চেষ্টাও হইয়াছে; যদিও তাহা সত্ত্বেও কিছু কিছু বে-সরকারী সামান্য খবর বাহির হইয়াছে ও গুজব রটিয়াছে, তাহা হইতে পঞ্জাবে যেসব কাণ্ড ঘটিয়াছে, তৎসম্বন্ধে লোকের একটা মোটামুটি ধারণা হইয়াছে।… এই অবস্থায়…রবীন্দ্রনাথ…ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন।"[২]

১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

২ রবীন্দ্রনাথের চিঠির উল্লেখমাত্র পট্টভি সীতারামাইয়ার কন্‌গ্রেস ইতিহাসে নাই!

রবীন্দ্রনাথের পত্র তড়িৎবেগে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় য়ুরোপের সাংবাদিক মহলে বেশ সাড়া পড়িয়া যায়। পঞ্জাবের বাহিরে ভারতে ও ভারতের বাহিরে সভ্যদেশে আন্দোলন শুরু হইলে ভারত সরকারকে বাধ্য হইয়া পঞ্জাবের অশান্তির বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য এক কমিটি নিয়োগ করিতে হইল। এই কমিটির নাম দেওয়া হয় Disorders Committee ; গবর্মেণ্ট যখন শান্তভাবে সমস্ত বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিলেন, তখন পঞ্জাবের অশান্তিকে বিদ্রোহ বলিতে পারিলেন না, বলিলেন Disorders বা অশান্তভাব। লর্ড হাণ্টার নামক জনৈক ইংরেজকে সভাপতি করিয়া তদন্ত কমিটি গঠিত হইল। কমিটিতে তিনজন ভারতীয় সদস্য ছিলেন, তাঁহারা শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া পৃথক প্রতিবেদন পেশ করিয়াছিলেন। অধিকাংশের অনুমোদিত রিপোর্টে মাইকেল ও'ডায়ার, সেনাপতি ডায়ার ও জনসন-এর কার্য সমর্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা এমন কিছুই বলিলেন না যাহাতে ভারতীয়দের অপমান ও আঘাতের উপশম হয়। ভারত সরকার মিস্ শেরউডকে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে চাহেন ; কিন্তু তিনি খাঁটি ইংরেজের আভিজাত্য বজায় রাখিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণ করিলেন না। যে কয়জন ইংরেজ নিহত হইয়াছিল তাহাদের জন্য ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ভারতীয়দের চাঁদা তুলিয়া দিতে হইয়াছিল। গড়ে এক একজন ইংরেজের ওয়ারিশ পায় ৬৮,৬১৭ টাকা! জালিনবালাবাগে যে ৩৭৯ জন লোক মারা পড়ে, তাহাদের মধ্যে মাত্র ৪০ জন লোকের আত্মীয় খেসারত পায়, কিন্তু ৫০০ টাকার অধিক কেহ পাইল না ; ভারতীয়দের জীবনের মূল্য নগদ পাঁচশত টাকা! আহত ইংরেজদের উপযুক্ত অর্থ প্রদত্ত হয়।

ও'ডায়ার ও ডায়ার এই ঘটনার পর কাজ ছাড়িয়া বিলাতে চলিয়া গেলেন, সেখানে তাহারা ব্রিটিশ পাবলিকের নিকট হইতে ভারতের রক্ষাকর্তার সমাদর লাভ করিলেন ; তাঁহাদের জন্য বিস্তর টাকা উঠিল, বহু উপঢৌকন তাঁহারা পাইলেন,— তথাকার লোকের ধারণা, ইহারা ভারতের দ্বিতীয় সিপাহী-বিদ্রোহ দমন করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন!

পঞ্জাবের ঘটনার অভিঘাতে ভারতীয়দের মনে ব্রিটিশ শাসনের ও ইংরেজ চরিত্রের উপর শ্রদ্ধা বিশেষভাবে হ্রাস পাইল।

সরকারী তরফ হইতে নিযুক্ত হাণ্টার কমিটির পাশাপাশি কন্‌গ্রেস হইতে

নিযুক্ত একটি বেসরকারী কমিটি পঞ্জাবের ব্যাপার তদন্তের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। এই কমিটির সদস্য ছিলেন গান্ধীজি, চিত্তরঞ্জন দাশ, আব্বাস তায়াবজী ও জয়াকর। এই দুই রিপোর্ট মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে সাধারণ লোকে পঞ্জাবের লোমহর্ষক কাণ্ডের সমগ্র চিত্রটি দেখিতে পাইল। কন্‌গ্রেসী রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ২৫ মার্চ, সরকারী হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট বাহির হইল (২৮ মে ১৯১৯)।

গান্ধীজিকে সকলেই পরামর্শ দিলেন যে, দেশের এই উত্তেজনার অবস্থায় সত্যাগ্রহ পুনঃপ্রবর্তন দেশের পক্ষে হিতকর হইবে না; ২১শে জুলাই তিনি এই মর্মে ইস্তাহার প্রকাশ করিলেন। ইহার এক স্থানে বলেন **'A civil resister never seeks to embarass the government.'** গবর্মেণ্টকে বিব্রত করা কখনো সত্যাগ্রহীর আদর্শ হইতে পারে না। প্রায় ঠিক এই সময়েই কলিকাতায় নিখিল ভারত কন্‌গ্রেস কমিটির অধিবেশনে স্থির হইল যে, আগামী কন্‌গ্রেসের অধিবেশন অমৃতসরেই হইবে। কিন্তু সেখানে অধিবেশন যাহাতে না হয় তাহার জন্য সরকার পক্ষ হইতে ভিতরে ভিতরে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। ইহার গূঢ় কারণ ছিল। ইংরেজ ভালো করিয়া জানিত, পঞ্জাবের শিখ ও মুসলমানের ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় ও যুদ্ধব্যবসায়ী জাতির পক্ষে রাজনীতির চর্চা ও আন্দোলন বাংলাদেশ হইতে ভীষণতর হইতে পারে। মহাযুদ্ধের সমরাঙ্গনে তাহারা শ্বেতাঙ্গ শত্রুর সহিত লড়াই করিয়াছে; আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতির অনেক কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিয়া ফিরিয়াছে—'রণনীতি'গ্রন্থ পড়িয়া তাহারা রণবিদ্যা শিক্ষা করে নাই। সেইজন্য মাইকেল ও'ডায়ার এমন নির্মমভাবে পঞ্জাবিদের উপর ব্যবহার করিয়াছিলেন। হাঙ্গামার পরে এখনো পঞ্জাব সরকারের সেই আতঙ্ক— পাছে কন্‌গ্রেসের আওতায় পঞ্জাবিরা আসিয়া যায়— যদিও গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য ইস্তাহার বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক— অবশেষে জনমত প্রবল হইল, অমৃতসরেই কন্‌গ্রেস বসিল। এই অধিবেশনে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়; পঞ্জাবের অত্যাচার-অনাচার যখন সংঘটিত হইতেছে, তখন তিনি সিমলা শৈলের লাটপ্রাসাদে কীভাবে নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহাতেই সভা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার অপসারণ দাবি করিলেন। কন্‌গ্রেসের সদস্যরা বোধ হয় জানিতেন না যে বাংলায় একটি প্রবাদ আছে—তস্করেরা মাতৃস্বসা-

সম্পর্কে ভ্রাতৃত্বসূত্রে আবদ্ধ—চেম্‌স্‌ফোর্ডের অজ্ঞাতে কোনো পাপানুষ্ঠানই হয় নাই।

এই ১৯১৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর মন্‌টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট অনুযায়ী আইন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত হইল; তখন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ 'লর্ড' উপাধি পাইয়া ব্রিটিশ হাউস অব লর্ডস-এর সদস্য এবং সহকারী ভারত-সচিব।

অসহযোগ আন্দোলন

১৯২০ সালে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন সমস্যা দেখা দিল। আমরা দেখিয়াছি যে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর য়ুরোপীয় মহাসমর আকস্মিকভাবে শেষ হইয়া যায়; ইহার কয়েকদিন পূর্বেই জারমানদের অন্যতম মিত্র তুর্কী-সুলতান মিত্রশক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া যুদ্ধবিরতি ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তুর্কীর পরাজয়ে য়ুরোপে দেখা দিল জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যা; আর ভারতে সেই সমস্যা দেখা দিল ধর্মকেন্দ্রিক খিলাফৎ আন্দোলনরূপে। তুর্কীর সুলতান মুসলমান জগতের খলিফা বা ধর্মগুরু; ইসলামের নিয়ম অনুসারে কোনো দুর্বল হৃতরাজ্য খলিফা হইতে পারে না; মুসলমানের কাছে রাজনীতি ও ধর্মনীতি এক।

ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য স্বধর্মাবলম্বী তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং উহার পরাজয়ে সহায়তাই করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদের খলিফার সাম্রাজ্য ধ্বংস ও তাহার রাজসম্মান ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে— ইহাই হইল ভারতীয় মুসলমানদের প্রশ্ন। মোসলেম জগতের মধ্যে ভারতেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়; আর কোনো দেশের মুসলমানের এই প্রশ্ন লইয়া শিরঃপীড়া দেখা দেয় নাই— এমন-কি ইসলামের জন্মভূমি আরাবিয়াতেও নয়— বরং মক্কার শরীফ তুর্কীর বিরোধীই ছিলেন। ১৯২০ সালের ১৪ই মে সেভার্সের সন্ধিশর্ত প্রকাশিত হইলে দেখা গেল, য়ুরোপীয় তুর্কীর অধিকাংশ গ্রীসের ভাগে পড়িয়াছে; এশিয়াতে সমস্ত অধীন আরব জাতিরা স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছে। মিশরকে যুদ্ধপর্বেই ইংরেজই তুর্কীর নামমাত্র শৃঙ্খল হইতে মুক্তি দান করে। সেখানকার খেদিভ (প্রদেশপাল) হইলেন মামলুক (রাজা)। তিনি ইংরেজের তাঁবে মিশর শাসন করিতেছেন। ভারতীয় মুসলমানরা মনে করিল যে, ইসলামজগতের 'খলিফা' তথা তুর্কীর সুলতানের সাম্রাজ্য ভাঙিয়া দেওয়ায়— খলিফার ইজ্জত নষ্ট হইতেছে— ইহার জন্য দায়ী ব্রিটিশরা— ইহার প্রতিবিধান করিতেই হইবে।

২

গান্ধীজি ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফত সম্বন্ধে দাবিকে ন্যায্য ও ধর্ম-সঙ্গত আন্দোলন বলিয়া অভিহিত করিলেন। তাঁহার যুক্তি, ধর্ম যখন বিপন্ন— সে ধর্ম হিন্দুরই হউক বা মুসলমানেরই হউক— তখন ধর্মপ্রাণতার খ্যাতিগুণে প্রত্যেক হিন্দুর বিপন্ন মুসলমানের সহায়তা করা আবশ্যিক কর্তব্য। ইহা হিন্দু-মুসলমান এক-জাতীয়ত্বের দোহাই নহে, ইহা বিপন্ন প্রতিবেশীর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। কিন্তু মুসলমানদের এই বহির্রাষ্ট্রীয় মনোভাব যে অখণ্ড জাতীয় জীবন গঠনের পরিপন্থী, তাহা-যে কালে ভারতের সাম্প্রদায়িকতাকে উগ্র করিয়া তুলিবে— তাহা বোধ হয় গান্ধীজি ভালো করিয়া বিচার করিয়া দেখেন নাই অথবা আপনার অন্তরের আলোয় ইহাকেই সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অথবা কোনো রাজনৈতিক অভিপ্রায় হইতে ইহাকে সমর্থন করিলেন। তিনি পঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের পর বলিয়াছিলেন যে, সত্যাগ্রহী কখনো গবর্মেণ্টকে বিব্রত করিবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে খিলাফত-দলের নেতা মহম্মদ আলী তাঁহার সহিত খিলাফৎ সম্বন্ধে সহযোগিতা প্রার্থী হওয়াতে তিনি তাঁহার পরিকল্পিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহিত খিলাফত আন্দোলনকে ভারতেরই আন্দোলন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। গান্ধীজিই খিলাফত কমিটির একমাত্র হিন্দু সদস্য ছিলেন।

১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় কন্‌গ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে প্রধানত এই চারটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হইল— পঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদ, খিলাফত আন্দোলনে হিন্দুদেরও যোগদান, শাসন সংস্কারের অসারত্ব ও অসহযোগ আন্দোলন। প্রথম তিনটি বিষয়ের প্রতিবিধান ও প্রতিকারের জন্য অসহযোগ আন্দোলন হইবে সংগ্রামের অস্ত্র। ১৯১৯ সালে মার্চ মাসে রৌলট আইন পাশ হয়— তাহার দেড় বৎসর পর অসহযোগনীতি গৃহীত হইল। কেমন করিয়া গবর্মেণ্টের সহিত সহযোগ বর্জন করিয়া দেশকে সবল করা যাইবে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার পর স্থির হইল যে, বর্জননীতির সোপানগুলি যথাক্রমে এইরূপ হইবে: ১. সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকুরি ত্যাগ করা; ২. সরকারী লেভী, দরবার প্রভৃতি ব্যাপারে যোগ না দেওয়া; ৩. সরকারি স্কুল-কলেজ বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় সমূহ

ত্যাগ করা ও নূতন জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন; ৪. উকীল প্রভৃতিদের সালিশী কাছারি গঠন; ৫. সামরিক জাতিগণের, কেরাণীগণের ও মজুরগণের মেসোপটেমিয়ায় চাকুরি গ্রহণে অস্বীকার; ৬. নূতন ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন ত্যাগ করা। কন্‌গ্রেসের অনুরোধ সত্ত্বেও যাঁহারা নির্বাচন-প্রার্থী হইবেন, ভোটদাতারা তাঁহাদের ভোট দিবেন না।

ইতিপূর্বে গান্ধীজি এক ইস্তাহারে ঘোষণা করেন পহেলা অগস্টের (১৯২০) মধ্যে ব্রিটিশ সরকার যদি খিলাফৎ সম্বন্ধে সুবিচার না করেন, তবে তিনি দেশকে অসহযোগের জন্য আহ্বান করিবেন। গত বৎসর সত্যাগ্রহ আন্দোলন যে গান্ধীজি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার কারণ, প্রায়ই হরতালাদি ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া বিবাদ বাধিত হিন্দু অসহযোগী ও মুসলমান অসহযোগ-বিরোধীদের মধ্যে। ফলে পদে পদে সত্যাগ্রহ বিপর্যস্ত হইত। এখন মুসলমানদের দলে পাইবেন এই ভরসায় খিলাফত আন্দোলনের ন্যায় একটা অলীক, সাম্প্রদায়িক ও রাষ্ট্রবহির্গত ব্যাপারে হিন্দুদের লিপ্ত করিলেন। তবে তাঁহার ভরসা স্বভাব-সংঘবদ্ধ মুসলমানদের পাইলে ব্রিটিশদের জব্দ করা সহজ হইবে— তাঁহার দাবি পূরণ হইতে পারে। তুর্কীর সমস্যাটাকে রাজনীতির দিক হইতে না দেখিয়া বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গোঁড়ামির দিক হইতে বিচার করিলেন; সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দিয়া গান্ধীজি ভারতের রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে আনিয়া ফেলিলেন। সেটি তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে নিশ্চয়ই— তবে তাহার ফল হইল বিষময়। আরও আশ্চর্যের বিষয়, গান্ধীজি যে খিলাফত আন্দোলনে হিন্দুকে যোগদান করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছিলেন, কিছু-কাল পরে সেই সুলতানের পদ তুর্কীরাই নাকোচ করিয়া দিল। ধর্মগুরু 'খলিফা'র পদই উঠাইয়া দিল এবং তাহার পরিবর্তে শাসন-সংবিধান গঠন করিল আধুনিকভাবে। তুর্কীদেশে যখন সুলতান-খলিফার বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজারাই জোর আন্দোলন চালাইতেছে—ঠিক সেই সময়ে ভারতের হিন্দুদের উপর আদেশ হইল মুসলমান ধর্মের একটি মধ্যযুগীয় ব্যাপারকে সমর্থন করিবার জন্য। খিলাফত আন্দোলনকে 'ন্যাশনাল' বা ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সহিত মিশাইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে জটিল করিয়া তুলিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ-রূপে গান্ধীজির। আশু রাজনৈতিক ফললাভের আশায় মধ্যযুগীয় ধর্মমূঢ়তায় ইন্ধন দিলে যাহা অতি অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তাহাই হইল ভারতের ভাগ্যে।

এক দিকে মুসলিম লীগ উগ্র, অপর দিকে হিন্দুমহাসভা প্রবল হইয়া উঠিল; কোনোপক্ষই কাহাকেও সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে।

১৯২০ সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশময় জনসাধারণের মধ্যে অসহযোগ সম্বন্ধে আলোচনা চলিল। ডিসেম্বরে নাগপুরে কন্‌গ্রেস অধিবেশনে কলিকাতার প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল। গান্ধীজি ঘোষণা করিলেন, অসহযোগ যদি সফল হয় তবে এক বৎসরের মধ্যে 'স্বরাজ' আসিবে। শর্তের মধ্যে প্রকাণ্ড 'যদি' শব্দটি থাকিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ এই ঐন্দ্রজালিক স্বরাজ প্রতিশ্রুতি দানের জন্য গান্ধীজির তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন।

নাগপুরের কন্‌গ্রেসে (ডিসেম্বর ১৯২০) অসহযোগ প্রস্তাব ছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়; সেটি হইতেছে, কন্‌গ্রেসের সংবিধান ও আদর্শ বিষয়ক। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯০৮ সালে কন্‌গ্রেসের সংবিধান লিপিবদ্ধ হয়। অতঃপর ১৯১৭ সালে কন্‌গ্রেস জাতীয় দলের হস্তগত হয়; ১৯০৮-এর সংবিধানই এত কাল চলিয়া আসিতেছিল; এইবার কন্‌গ্রেসীরা তাহাদের আদর্শমতো কন্‌গ্রেসকে গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কন্‌গ্রেসের আদর্শ হইল 'সর্বপ্রকার বৈধ ও নিরুপদ্রব পন্থা অবলম্বন করিয়া স্বরাজ্য লাভ করা এবং সেপক্ষে ভারতবাসীমাত্রকেই সাধনায় দীক্ষিত করাই ভারত রাষ্ট্রসভার (কন্‌গ্রেসের) ঈপ্সিত।' কন্‌গ্রেসের কার্য সুচারুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য সমগ্র ভারতকে ২১টি প্রদেশে ভাগ করা হইল এবং স্থির হইল ৫০ হাজার অধিবাসীপ্রতি এক জন প্রতিনিধি মহাসভায় আসিতে পারিবেন। নেতারা কন্‌গ্রেসকে কার্যকরী সভা ও জনতার পক্ষে আত্মপ্রকাশের সভা করিবার জন্য আগ্রহান্বিত— ইতিপূর্বে এভাবে প্রতিনিধি-মূলক নির্বাচন দ্বারা কন্‌গ্রেস সদস্য-সংগ্রহ প্রথা ছিল না। ভারতের নূতন সংবিধানেও প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা রাজ্যসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে।

নাগপুর-কন্‌গ্রেসে চিত্তরঞ্জন দাশ যোগদান করিয়া অসহযোগ-প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। গান্ধীজির স্পর্শে এই বিলাসী ধনবান ব্যারিষ্টারের জীবন আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত হইয়া গেল। কোথায় গেল বিলাস ব্যসন, কোথায় গেল ধনার্জনের আকাঙ্ক্ষা! তিনি তাঁহার বিপুল আইন-ব্যবসা বিসর্জন দিয়া, সর্বস্ব দেশের নামে উৎসর্গ করিয়া গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ

দিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি আজ যাহা বলিব কাল তাহা আমার জীবনে প্রত্যক্ষ করিবেন।.. যাহা-কিছু প্রত্যক্ষ যাহা-কিছু মহিমাময়, তাহার নামে আমি আপনাদিগকে অহিংসা অসহযোগতত্ত্ব কাজে পরিণত করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।... আপনারা গবর্মেণ্টের নিকট ঘোষণা করিবেন যে, ভারতবাসী ঈশ্বরদত্ত মানুষের সমগ্র অধিকার বুঝিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।" এই উক্তি চিত্তরঞ্জন বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন।

৩

১৯২১ সাল হইতে ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন নূতন পথে চলিল। গান্ধীজি হইলেন ইহার পরিচালক—সর্বময়কর্তা ও সকল শক্তির উৎস ও আধার। খিলাফত আন্দোলনের নেতা আলী ভ্রাতৃযুগল কন্‌গ্রেসের সহিত একযোগে কার্য আরম্ভ করিলেন। বাংলা দেশে চিত্তরঞ্জন নবীন দলের নেতা; তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন যুবক সুভাষচন্দ্র বসু; ইনি ইন্‌ডিয়ান সিবিল সার্বিস পাশ করিয়া সরকারী চাকুরি গ্রহণ করেন নাই—দেশের কাজে আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ দেশের মুদ্রা-বিভাগে শ্রেষ্ঠ কার্য পাইয়াও তাহা ত্যাগ করিলেন; নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী কলেজের অধ্যাপনার চাকুরি ছাড়িয়া আসিলেন; হেমন্ত সরকার, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি বহু যুবক সম্মানের পদ ত্যাগ করিয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। অন্যান্য প্রদেশে মতিলাল নেহেরু, জবহরলাল নেহেরু, রাজেন্দ্র-প্রসাদ, নরেন্দ্র দেব, কৃপালনী প্রভৃতি বহু প্রৌঢ় ও যুবক কন্‌গ্রেসের পতাকা-তলায় সমবেত হইলেন। প্রত্যেক প্রদেশে কন্‌গ্রেস কমিটি, জেলা কমিটিগুলি নূতন প্রাণশক্তি লাভ করিল। কন্‌গ্রেসী দল টিলক স্বরাজ্য তহবিলের মালিক হইলেন, এ ছাড়া নানা ভাবে তাহাদের হস্তে অর্থ আসিতে লাগিল। পুরাতন কন্‌গ্রেসী দলের মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রাজনৈতিক আকাশে আলোকহীন তারকার ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

নাগপুরের প্রস্তাবানুসারে ভারতের সর্বত্র ভলাণ্টিয়ার বা জাতীয় সেবক-বাহিনী গঠিত হইতে লাগিল। ইতিপূর্বে খিলাফত-কমিটি 'খিলাফত ভলাণ্টিয়ার' বা খিদমদগার গঠন করিয়া তাহাদের তুর্কী কায়দায় পোষাক-

পরিচ্ছদ পরাইয়া, মাথায় তুর্কী ফেজ দিয়া, ব্যাজ লাগাইয়া, কুচকাওয়াজ শিখাইয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল। কন্‌গ্রেস ও খিলাফতের স্বেচ্ছাসেবকগণ 'ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার' আখ্যা প্রাপ্ত হইল। এই-সকল কর্মীদের অধিকাংশই স্কুল-কলেজের ছাত্র অথবা বেকার যুবক। এ ছাড়া বহু দায়িত্বজ্ঞানহীন উৎকট হিন্দু গান্ধীজির নামে ও মুসলমানদের মধ্যে বহু উৎকট মুসলমান খিলাফতের নামে আন্দোলনকে মুখরিত করিয়া তুলিল। কালে এই উভয় সম্প্রদায়ের গোঁড়ার দল আন্দোলনের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়ায় এবং কী ভাবে স্বাধীনতার প্রচেষ্টাকে সাম্প্রদায়িক সংগ্রামে পরিণত করিয়াছিল তাহার আলোচনা যথাস্থানে হইবে।

৪

দেশের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতীয়দের জন্য নূতন সংবিধান ব্যবস্থা করিলেন। মন্‌টেগুর ১৯১৭ সালের ঘোষণার ফল ফলিল ১৯২১ সালে। সংবিধানের বিস্তারিত আলোচনা আমাদের বিষয়বহির্ভূত; সংক্ষেপে বলিতে ১৯২১ সালে নূতন সংবিধানমতে ভারতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তিত হইল। তবে ভারতীয়রা শ্রেণীত হইল মুসলমান ও অ-মুসলমান সংজ্ঞা দ্বারা; অর্থাৎ ভারতে 'হিন্দু' বলিয়া যে কোনো জাতি আছে তাহা সংবিধানে পাওয়া গেল না। হিন্দুরা অ-মুসলমান আখ্যা লাভ করিয়াও মহোল্লাসে ভোটরঙ্গে অবতীর্ণ হইলেন। নিজেদের আত্মসম্মানবোধ তীব্র থাকিলে এই লজ্জাত্মক 'অ-মুসলমান' সংজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিয়া নির্বাচন হইতে দূরে থাকিতেন; কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে সে আত্মসম্মানবোধ দেখা গেল না। মুসলমানেরা আপন গৌরবেই প্রতিষ্ঠিত থাকিল।

যাহা হউক ভারতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর নির্বাচন প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতের দ্বিজাতি তত্ত্ব সেইদিনই স্বীকৃত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া জমিদার, শিল্পপতি, বাগিচাওয়ালা এংলো-ইন্‌ডিয়ান প্রভৃতি নানা শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়া নির্বাচন ব্যবস্থাকে কণ্টকিত করিয়া তোলা হয়। ১৯২১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি নূতন দিল্লীতে নূতন ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Assembly) গৃহ উন্মোচনের জন্ত ইংলন্‌ড হইতে সম্রাট পঞ্চম জর্জের খুল্লতাত (সপ্তম এডওয়ার্ডের

পুত্র) ডিউক অব্ কনট আসিলেন ; আজও নয়া দিল্লীর একাংশ তাঁহার নামানুসারে কনটপ্লেস নামে সুপরিচিত।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৪৪ জন সদস্যের মধ্যে অধিকাংশই নির্বাচিত সদস্য ; ভারতীয় অধ্যক্ষ সভা বা কর্মসমিতি এবং প্রাদেশিক কর্মসমিতিতে দেশীয় মন্ত্রী কয়েকজন নিযুক্ত হইলেন। বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের প্রথম গবর্ণরের পদ অর্পিত হইল লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে ; নানা ভাবে সরকার বাহাদুর ভারতীয়দের প্রতি যে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল—এইটাই দেখাইতেছেন। কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় কন্‌গ্রেসের জাতীয় দলকে শান্ত করা গেল না—তাঁহারা শাসন-সংস্কার সহিত কোনোরূপ সহযোগিতা করিবেন না। নাগপুর কন্‌গ্রেসের সিদ্ধান্তানুসারে কাউন্সিল বর্জন করা স্থির। তদনুযায়ী ভারতের সর্বত্র ভোটারগণ যাহাতে নির্বাচনকালে ভোট না দেয় ও পদপ্রার্থীগণ যাহাতে নির্বাচিত হইবার জন্য উপস্থিত না হইতে পারে, তাহার জন্য খিলাফৎ কন্‌গ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ বিধিসঙ্গত ও বিধিবহির্ভূত বিচিত্র উপায়ে বাধা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। নির্বাচনের বিরুদ্ধে লোকের মন এমনই বিরূপ যে কোনো কোনো শহরে অতি অযোগ্য মূর্খ নগণ্য ব্যক্তিকে ধরিয়া ভোট দিয়া সদস্য করা হয় ; কোথাও বা গর্দভ বা ষণ্ডের গলদেশে 'আমাকে ভোট দাও' লিখিয়া লোকে রাজপথে ছাড়িয়া দেয়। এ হেন আন্দোলন সত্ত্বেও নির্বাচনে সদস্যপদপ্রার্থীর অভাব হইল না—ভোটারদের উৎসাহ হ্রাস পাইলেও তাহারা একেবারে নির্বিকার রহিল না। দেশের সুশাসনের জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অভাবে অযোগ্য লোকের হাতে ব্যবস্থাপনের ভার পড়ায় দেশের মঙ্গল হইল না। গবর্মেণ্টের আইন কানুন পাশ হইয়া যাইতেও কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি হইল না ; আদালতে উকিল কমিল না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রদের সংখ্যাও হ্রাস পাইল না।

দেশময় অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছে।

কন্‌গ্রেস-অনুমোদিত প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করিবার জন্য লোকের প্রয়োজন। কিন্তু সে কাজ কে করিতে পারে ? রাজনীতিজ্ঞদের একমাত্র ভরসা ভাবপ্রবণ ছাত্রসমাজ। এই উদ্দেশ্যে স্কুল-কলেজ এক বৎসরের জন্য বর্জন করিবার কথা ইতিপূর্বেই হইয়াছে। গান্ধীজি, মতিলাল নেহেরু ও চিত্তরঞ্জনের উৎসাহবাণীতে বহু যুবক বিদ্যালয় ত্যাগ করিল ; নেতারা

তাহাদিগকে এক বৎসরের জন্য কন্‌গ্রেসের পক্ষ হইতে 'গ্রামসেবা' করিবার জন্য বলিলেন ; যুবকরা চরকা, তকলি লইয়া গ্রামে গ্রামে চলিল— গান্ধীজি সকলকে চরকায় সূতা কাটিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

পাঠকদের মনে আছে ১৫ বৎসর পূর্বে বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের মুখে এইভাবেই বালক ও যুবকরা বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া আসে এবং ১৯০৬ সালে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশান' স্থাপিত হয় ; শহরে শহরে এমন-কি গ্রামের মধ্যেও 'জাতীয় বিদ্যালয়' স্থাপিত হইয়াছিল। এইবারও অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনায় ১৯২১ সালে বহুস্থানে পুনরায় 'ন্যাশনাল স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা গেল। কলিকাতায় কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয় ও গৌড়ীয় বিদ্যাপীঠ, কাশী ও আমেদাবাদে বিদ্যাপীঠ এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। কিন্তু এবারকার শিক্ষান্দোলনে স্বদেশীযুগের আবেগও নাই, আন্তরিকতাও নাই— অল্পকালের মধ্যেই সেগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। লোকে ভাবিয়াছিল এক বৎসরের মধ্যে 'স্বরাজ' আসিবে— কিন্তু তাহা যখন হইল না তখন লোকে কিসের ভরসায় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দূরে থাকিয়া আপনাদের 'ভবিষ্যৎ' নষ্ট করিবে ? আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, কন্‌গ্রেসের বাহিরে এই-সব ঘটনার সমান্তরালে হিন্দুরা হিন্দুমহাসভা, মুসলমানরা তাহাদের জমায়েত-উলমাগুলি সুদৃঢ় করিতেছে এবং বিপ্লবীরা সন্ত্রাসকর্মে লিপ্ত আছে। সকল আন্দোলনই সমান্তরালে চলিতেছে।

গান্ধীজি এইবার রাজনীতির সহিত অর্থনীতি আনিয়াছেন ; তিনি দেশবাসীকে চরকা কাটিবার জন্য উপদেশ দিলেন ; তাঁহার মতে চরকা কাটিলে 'স্বরাজ' আসিবে। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত শোনায়। কিন্তু বিষয়টি একটু প্রণিধান করিলেই ইহার তাৎপর্য বুঝা যাইবে। ভারতের সে সময়ে সর্বাপেক্ষা বড় আমদানী হইত 'বিলাতি' কাপড় ; সে-সব আসিত ইংলন্‌ডের ম্যানচেষ্টারের কল হইতে। প্রতি বৎসর ষাট কোটি টাকা কেবলমাত্র বস্ত্রখাতেই ভারত হইতে শোষিত হইত। কাপড় ছাড়া সুতা এবং কাপড়ের কল-কব্জাও আসিত বহু-কোটি টাকার। গান্ধীজির মতে স্বরাজ পাইবার প্রথম সোপান ইংরেজের এই শোষণপথ বন্ধ করা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'বস্ত্র বর্জন' প্রস্তাবমতে লোকে বিলাতি কাপড় বর্জন করিয়াছিল কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় গড়িয়া উঠে কানপুর, বোম্বাই, আমেদাবাদের কাপড়ের কল— ধনীদের শোষণচক্র। যুদ্ধের

সময় বস্ত্রাভাবে লোকে কী কষ্ট পাইয়াছিল, গান্ধীজি তাহা দেখিয়াছিলেন; তাঁহার তো কোনোদিন বস্ত্রাভাব হয় নাই। তাই দেশবাসীকে চরকা কাটিবার জন্য তাঁহার অনুরোধ। ভারতীয় মিলসমূহ মানুষকে যেরূপ নারকীয় পথে লইয়া যাইতেছে, তাহার প্রতিষেধক হইতেছে কুটীরশিল্প। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে, শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে ব্যবধান ও বিবাদ, হিংসা ও বিচ্ছেদ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে— এ সমস্যার সমাধান কোথায়? গান্ধীজি বলিলেন, ভারতীয়রা বস্ত্রব্যাপারে যদি স্বাবলম্বী হয় তবে বিদেশী ও দেশী মিল-মালিক, যাহাদের বর্ণের তফাৎ থাকিলেও স্বভাবের পার্থক্য নাই— সেই শোষক শ্রেণীর প্রভুত্ব নষ্ট হইবে— সাধারণ লোক আপন অর্থনীতির নিয়ামক হইবে, তাহাই স্বরাজ। এতদ্ব্যতীত একটা-কোনো বিষয়ে সর্বশ্রেণীর লোকের মনকে কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্যেই তিনি বোধ হয়, চরকা প্রবর্তন করেন; চরকা কাটার ফলে ম্যান্‌চেষ্টারের কাপড়ের কল, অথবা আমেদাবাদ ও বোম্বাই-এর কলগুলি অচল হইবে— এ আশা গান্ধীজি সত্যই করিয়াছিলেন বলিয়া তো মনে হয় না; তিনি চরকাকে দেশভাবনার প্রতীকরূপে গ্রহণ করিবার জন্য জনতাকে আহ্বান করিলেন।

গান্ধীজির চরকা বা খদ্দর কিছু কালের জন্য দেশব্যাপী হইয়াছিল, তবে ইহা যে সফল হইতে পারে না তাহা বলিয়াছিলেন একজন দ্রষ্টা—তিনি রবীন্দ্রনাথ। তকলি, চরকা মানুষের যে-বিজ্ঞানী বুদ্ধি হইতে আবিষ্কৃত— স্পিনিংজেনি, ফ্লাইশাটল প্রভৃতি যন্ত্র তো সেই বুদ্ধিবলেই সৃষ্ট। মানুষ পিছু ফিরিতে পারে, কিন্তু পিছু হাঁটিতে পারে না। সুতরাং 'চরকা' কবির মতে, কখনো পুনঃপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না, বিজ্ঞানকে অবহেলা করা যায় না।

৫

কন্‌গ্রেস স্বেচ্ছাব্রতী ও খিলাফতী স্বেচ্ছাসেবকগণ অসহযোগনীতি সফল করিবার জন্য একত্র কাজ করিতেছে সত্য, কিন্তু খিলাফতী কর্মীরা মুসলমান সমাজ ও খিলাফত সংক্রান্ত কার্যে এত ব্যস্ত থাকে যে, কন্‌গ্রেস-নির্দিষ্ট কার্যাবলীতে তাহারা যথেষ্ট মনোনিবেশ করিতে পারে না। ভারতীয় মুসলমান-সমাজের সহানুভূতি স্বভাবতই নিখিল জাগতিক মুসলিম সমাজের প্রতি ধাবিত।

খিলাফত আন্দোলন প্রবর্তনের পর হইতেই ইহা স্পষ্টতই বহির্মুখীন অতিরাষ্ট্রীয় এবং সাম্প্রদায়িকতার দিকে চলিতেছে। মহম্মদ আলী বলিলেন যে, তিনি প্রথমত মুসলমান, তৎপরে ভারতবাসী। মদ্রাজের খিলাফত সভায় তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলেন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন করিবার জন্য যদি আফগানিস্থানের আমীর এদেশে আসেন, তবে প্রত্যেক মুসলমান তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবে। এ কী সর্বনাশী উক্তি! অথচ কন্‌গ্রেসের আদিযুগে একজন মুসলমান নেতা সভাপতিরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রথমে ভারতীয় পরে মুসলমান। কিন্তু সে ভাবনা হইতে আজ মুসলমানরা বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে। মহম্মদ আলীর উক্তিতে সাধারণ হিন্দু নিশ্চয়ই আপ্যায়িত হয় নাই এবং সরকার বাহাদুরও প্রীত হইতে পারেন নাই। মুসলমান সমাজ কী ভাবে পার্থক্যনীতি অনুসরণ করিতেছে সে বিষয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

১৯২১ সালের মাঝামাঝি সময় হইতে ব্রিটিশ সরকার অসহযোগ আন্দোলন দমনের দিকে মন দিলেন। সাধারণ ফৌজদারী আইনানুসারে যে-সব বক্তৃতা বা লেখার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা যায়, সেইগুলি সম্বন্ধে যথাবিধি ব্যবস্থা তো চলিতেছে কিন্তু আন্দোলনকারীরা এমন-সব কার্য করিতেছে যাহাকে আইনের সাধারণ ধারায় ফেলা যায় না। স্বেচ্ছাব্রতীরা গ্রামের মধ্যে সালিশী কাছারি স্থাপন করে, সরকারী আদালতে মামলা যায় না। তখন প্রাদেশিক শাসনকর্তারা ইহা দমন করিবার জন্য উত্তর ভারতে দেশীয় লোকেরই সাহায্যে গ্রামে গ্রামে 'আম সভা' স্থাপন করিলেন; তাহাদের কাজ হইল সালিশী কাছারিতে কোথায় কোনো অবিচার, জুলুম জবরদস্তি হইতেছে কি না তাহা দেখা; সেরূপ কিছু ঘটিলেই অচিরে সরকারের গোচরীভূত করা ছিল ইহাদের কাজ।

অসহযোগী কর্মীরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চরকা ও খদ্দর -আন্দোলন, চারিত্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য মাদকসেবন নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। এই কার্যে ইঁহারা প্রচুর সফলতা লাভ করেন। ইহাতে সরকারের আবগারী বিভাগের আয় রীতিমতো হ্রাস পাওয়ায় মাদক সেবনের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রচারকার্য বিহার সরকার হইতে ব্যবস্থা হইল। নূতন শাসনতন্ত্রে কন্‌গ্রেসের বর্জননীতির জন্য অপদার্থ 'খয়ের খাঁ'র দল মন্ত্রিত্ব পাইয়া-

ছিলেন—তাঁহাদের দিয়া সকল কাজই করানো যাইত। ব্রিটিশ আই. সি. এস.-দের উপদ্রবে লর্ড সিংহকেও বিহারের লাট-পদ অসুস্থতার অজুহাতে ইস্তফা দিতে হয় বলিয়া শুনিয়াছি।

৬

কন্‌গ্রেস কর্মীদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিতেছে; শহর হইতে আগত যুবকের দল গ্রামে বসিয়া চরকা কাটায় ও গ্রামসেবার জন্য আর মনোনিবেশ করিতে পারিতেছে না। তাহারা এক বৎসরে 'স্বরাজ' লাভের স্বপ্ন দেখিয়া গ্রামে আসিয়াছিল; কলেজের সহপাঠীরা পাশ করিয়া বাহির হইয়া গেল—তাহারা এমনভাবে কতকাল চরকা কাটিবে!

অপরদিকে অসহযোগ আন্দোলনকারীরা সাধারণভাবে নিরুপদ্রব বা অহিংসক থাকিলেও নানা স্থানে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নামে গান্ধীজির অতিভক্তের দল 'নৈতিক জুলুম' করিতে লাগিল। সে জুলুম শারীরিক জবরদস্তি হইতে কম ভীষণ নহে— ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও গরম যুদ্ধের মধ্যে যে ভেদ।

গান্ধীজি দেশকে শান্ত থাকিয়া নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলন সফল করিবার জন্য উপদেশ করিতেছেন সত্য, কিন্তু অশিক্ষিত জনতার নিকট পঞ্জাব-কাহিনী বারংবার বলিয়া, তাহার প্রতিকারের জন্য তাহাদিগকে মুহুর্মুহু উত্তেজিত করিয়া পরক্ষণেই ধর্মের নামে অতি মিষ্টভাবে তাহাকে সংযত হইবার উপদেশদান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইতে বাধ্য। আবার মুসলমান-সমাজকে বিশেষভাবে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন যে, তাহাদের ধর্ম বিপর্যস্ত, দুষমন পাশ্চাত্যশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। মুসলিমরা স্বভাবধর্ম-পরায়ণ— এখন তাহাদের সেই ধর্মমোহকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিয়াই তাহাদিগকে অহিংসক ও নিরুপদ্রব থাকিবার জন্য উপদেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইল। এইরূপ উপদেশদান করা সহজ; কিন্তু অপাত্রে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সম্পূর্ণ বিপরীত। অসহযোগ আন্দোলন অহিংসক থাকিল না। চারিদিকে সামান্য ঘটনা কেন্দ্র করিয়া দাঙ্গা শুরু হইল; এবং সে-দাঙ্গা ঘটিতে লাগিল নিজেদের মধ্যে।

৭

অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া সুদূর আসামের চা-বাগিচার মধ্যে অকস্মাৎ দেখা দিল। আসামে তখনো বহু সহস্র কুলি চুক্তিবদ্ধভাবে যাওয়া-আসা করিত। ১৯২১ সালে জাহাজের অভাবেই হউক বা যে কারণেই হউক চা-এর বিদেশী চাহিদা কমিয়া যায়, ফলে কুলিরা প্রচুর কার্য পায় না। ইহার জন্য বাগিচার খুবই আর্থিক কষ্ট দেখা দেয়। কেমন করিয়া বলা যায় না, কুলিদের মাথায় ঢুকিল দেশে 'গান্ধীরাজ' হইয়াছে— সেখানে ফিরিয়া গেলে তাহাদের দুঃখ ভাবনা আর থাকিবে না। দলে দলে কুলিরা বাগিচা ত্যাগ করিয়া চাঁদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। পুলিশ তাহাদের ষ্টীমারে উঠিতে বাধা দিল— কারণ তাহারা ইংরেজ বাগিচাওয়ালাদের চুক্তিবদ্ধ কুলি। তাহারা চলিয়া গেলে সাহেবদের বাগান অচল হইয়া পড়িবে। সুতরাং কুলিদের বাধা দান ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারীদের অবশ্য করণীয় কাজ। কিন্তু তাহারা চুক্তিবদ্ধ— গবর্মেণ্টের সঙ্গে নয়, তাহারা চুক্তিবদ্ধ বাগিচাওয়ালাদের সঙ্গে। যাহাই হউক কুলিদের উপর চাঁদপুরে যথেষ্ট উৎপীড়ন হইল।

এই ঘটনার সুযোগ লইয়া পূর্ববঙ্গের অসহযোগী নেতারা আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়েতে ধর্মঘট বাধাইয়া তুলিলেন। রেলকর্মচারীদের নিজেদের কোনো অভিযোগ ছিল না; কেবলমাত্র রাজনৈতিক নেতাদের প্ররোচনায় পড়িয়া তাহারা 'ধর্মঘট' করিল; অথচ 'ধর্মঘট' সম্বন্ধে কোনো স্পষ্টধারণা কাহারও ছিল না। চট্টগ্রাম হইতে তিনসুকিয়া, পাণ্ডু, চাঁদপুর পর্যন্ত রেলপথে ধর্মঘট করার জন্য যে প্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহার কিছুই না করিয়া উচ্ছ্বাসের প্রেরণায় ধর্মঘট শুরু হইল।

গবর্মেণ্ট মীমাংসার জন্য অগ্রসর হইলেন না, সরকারী চিঠিপত্র ও ডাক বিশেষ ইঞ্জিন ড্রাইভার দিয়া যথাবিধি চলাচল করিতে লাগিল। দুর্ভোগ ভুগিল সাধারণ লোকে। রেল-কোম্পানি অধিকাংশ লোককে কাজ হইতে বরখাস্ত করিল; তাহাদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, বোনাস সমস্ত বাজেয়াপ্ত হইল। তার পর যাহারা ফিরিয়া গিয়া চাকুরি লইল, তাহাদের অপমানের শেষ রহিল না। কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই কাগজে লিখিলেন যে, নেতাদের রাজনৈতিক কর্মসিদ্ধির জন্য তাহাদের ন্যায় নিরীহ গৃহী দরিদ্রেরা ব্যবহৃত হইয়াছিল।

এই নেতাদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রামের ব্যারিষ্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, চাঁদপুরের হরদয়াল নাগ। শেষ পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহন রেলওয়ের ধর্মঘটীদের পোষণের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। চাঁদপুরের ব্যর্থ ধর্মঘট হইতে নেতারা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন যে, ট্রেড-ইউনিয়ন ছাড়া এ শ্রেণীর কাজ সফল হইতে পারে না। ট্রেড-ইউনিয়ানিজম্ রাজনীতি-নিরপেক্ষ হওয়া চাই। ট্রেড-ইউনিয়ন যখন বিশেষ রাজনীতিমতের দলপতিদের ক্রীড়নক হয় তখনই দেখা যায় অন্য দলের নেতারা তাহারই পাশাপাশি একটি বিকল্প ইউনিয়ন খাড়া করিয়াছেন; তখন অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

পূর্ববঙ্গের ধর্মঘটী কুলিরা ভাবিতেছে, দেশে 'গান্ধীরাজ' আসিয়াছে। ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণ ভারতের মালাবারে মোপ্‌লা নামে এক শ্রেণীর মুসলমান শুনিতেছে, ভারতে 'খিলাফত রাজ' হইয়াছে। তাহাদের মনে হইতেছে, ইস্‌লাম রাজ্য যখন প্রতিষ্ঠিত, তখন তাহাদের রাজ্য হইতে হিন্দু কাফের নিশ্চিহ্ন করাই ধর্মসঙ্গত কার্য হইবে। মোপ্‌লাদের বিশ্বাস যে, ইংরেজ গবর্মেণ্ট 'শয়তানী'তে পূর্ণ এবং 'খিলাফত রাজ' স্থাপন ব্যতীত মুসলমানের গতি নাই; এই ইস্‌লামি রাজ্যে হিন্দুরা কণ্টক— তাহাদের উৎপাটন করাই প্রথম কাজ। মালাবারে হিন্দুদের প্রতি যে নৃশংসতা অনুষ্ঠিত হইল, তাহা ১৯০৯-এ কোহাট ও ১৯১০-এ পেশাবারে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে কম ভীষণ নহে। এই বিদ্রোহ দমন করিতে সরকারকে খুবই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, অথবা পরাজয়ের ভান করিয়া হিন্দুদের উপর দীর্ঘকাল ধরিয়া অত্যাচার করিবার সুযোগ দান করা হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না; এ বিষয়ে অন্য পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

মোপ্‌লা-বিদ্রোহের কিছুকাল পূর্বে (জুলাই ১৯২১) করাচীর খিলাফত কন্‌ফারেন্সে আলী-ভ্রাতারা যে বক্তৃতা করেন, তাহা রাজদ্রোহাত্মক বলিয়া বিবেচিত হয়; অক্টোবর মাসে মহম্মদ আলী ও সৌকত আলীর দুই বৎসরের জন্য কারাবাসের আদেশ হইল। এই ঘটনায় গান্ধীজির দক্ষিণ হস্ত যেন ভাঙ্গিয়া গেল— মুসলমানদের উপর আলী-ভ্রাতাদের প্রভাব অপসারিত হইতেই তাহাদের মধ্যে উগ্র-সাম্প্রদায়িক শ্রেণীর আধিপত্য প্রবল হইল। খিলাফত গান্ধীজির প্রভাবে বহুল পরিমাণে শান্ত ও নিরুপদ্রব ছিল— কিন্তু

এখন হইতে বেসুর স্পষ্ট শোনা গেল। ১৯২১ হইতে ১৯৪৭ সালের ইতিহাস হইতেছে, হিন্দু-মুসলমানের গৃহযুদ্ধ বা 'সিভিল ওয়ার'—যাহার পরিণাম হইল ভারতের পার্টিশন ও পাকিস্তানী ইসলামিক রাজ্য গঠন।

৮

১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্[১] ভারত ভ্রমণে আসিলেন। ভারতের চারিদিকে সরকারী পক্ষ হইতে যুবরাজের রাজোচিত সম্বর্ধনার ব্যাপক আয়োজন চলিতে লাগিল; গান্ধীজি ঘোষণা করিলেন যে, তিনি যুবরাজের প্রতি কোনো বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন না; তবে কোনো অসহযোগী কন্‌গ্রেস কর্মীর পক্ষে রাজ-অভ্যর্থনায় যোগদান করা উচিত হইবে না। দেশময় অসহযোগীরা যুবরাজকে অভ্যর্থনা করিবার বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং রাজপুত্র যেখানে যেদিন উপস্থিত হইবেন সেদিন সেখানে 'হরতাল' পালিত হইবে এই নির্দেশ প্রদত্ত হইল। ১৭ই নভেম্বর যুবরাজ বোম্বাই বন্দরে নামিলেন; সেদিন শহরে হরতাল-পালন ও না-পালনকে কেন্দ্র করিয়া ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গেল। গুণ্ডাশ্রেণীর লোক অসহযোগী সাজিয়া রাজভক্ত প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করিল। দাঙ্গার ফলে ৫৩ জন হত এবং ৪০০ জন আহত হইল। গান্ধীজি সেদিন বোম্বাই শহরে উপস্থিত; তাঁহার উপস্থিতি, তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার ধর্মকথা কোনো কাজে আসিল না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার অহিংসার উপদেশ ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু জনতা সেদিন যে ব্যবহারই করুক—ইহা প্রমাণিত হইল যে, তাহারা ব্রিটিশ রাজকুমারকে চাহে না।

ইতিপূর্বে নিখিল ভারত কন্‌গ্রেস কমিটি স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রাদেশিক কমিটি ইচ্ছা করিলে সার্বজনিক শাসন-অমান্য বা সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স নীতি অবলম্বন করিতে পারেন। এই ফতোয়া অনুসারে গুজরাটের বরদৌলী তালুকে গান্ধীজি স্বয়ং সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিবেন স্থির হইল। তিনি গুজরাটের সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীকে কাজে ইস্তফা দিবার অনুরোধ

[১] পরে যিনি অষ্টম এডওয়ার্ড হইয়া কয়েক মাস রাজত্ব করেন।

জানাইলেন এবং করাচীতে যে প্রস্তাব পাশ করার জন্য আলী-ভ্রাতাদের জেল হইয়াছে সেই প্রস্তাব সর্বত্র পড়িবার ব্যবস্থা করিলেন। ২৩শে নভেম্বর হইতে তিন সপ্তাহ বরদৌলীতে সত্যাগ্রহ চলিয়াছিল। সত্যাগ্রহের কারণ খাজনা বৃদ্ধি। তৎকালীন ভূমি সংক্রান্ত আইনানুসারে ২০।৩০ বৎসর অন্তর শস্যের মূল্যাদি বিচার করিয়া জমির খাজনা বৃদ্ধি করা যাইত। বরদৌলীর উপর শতকরা ২৫ ভাগ কর বৃদ্ধি করা হইলে লোকে আপত্তি করিয়া ট্যাক্স্ দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। এই লইয়া সংগ্রাম ; ইহার নেতা বল্লভ-ভাই প্যাটেল ; ইনি ছিলেন ব্যারিষ্টার, পুরাদস্তুর সাহেব, তারপর গান্ধীজির সংস্পর্শে আসিয়া জীবনের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল ; তিনি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। বলিতে পারা যায় বরদৌলীতে সত্যাগ্রহ সর্বপ্রথম যথার্থ রূপ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ১৭ই ডিসেম্বর বোম্বাই বন্দরে যুবরাজের অবতরণের দিন যে বীভৎস কাণ্ড ঘটিল, তাহা দেখিয়া বরদৌলী সত্যাগ্রহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

যুবরাজের প্রতি অসম্মান উদ্রেকচেষ্টা, চারিদিকে হিন্দু-মুসলমানের মন-কষাকষি, অসহযোগীদের নিরুপদ্রব 'নৈতিক জুলুম', বিরোধীদের প্রতি সামাজিক উৎপীড়ন, আইন অমান্য করিবার শাসানী, প্রতিষ্ঠিত শাসন-সংস্থার বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রচার প্রভৃতি বন্ধ করিবার জন্য এবার ভারত সরকার প্রস্তুত হইলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশমতে প্রাদেশিক গবর্নরগণ রুদ্রমূর্তি ধারণ করিলেন। প্রথমেই কন্‌গ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল। ভারতের সর্বত্র ধরপাকড় শুরু হইল , যাহারা কন্‌গ্রেসের ব্যাজ লইয়া সরকারী হুকুম অমান্য করিল, পুলিশ তাহাদিগকে চালান দিল। কলিকাতায় দলে দলে যুবকরা স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিল। দেখিতে দেখিতে ভারতের সর্বত্র জেলা-কন্‌গ্রেস কমিটির সম্পাদক ও কর্মীগণকে প্রথমে ও পরে প্রাদেশিক কন্‌গ্রেসের সম্পাদকগণকে একের পর একে সরকার কারারুদ্ধ করিলেন। ভারতের নানাস্থানে প্রায় ত্রিশ হাজার কন্‌গ্রেস কর্মী কারাগারের অন্তরালে চলিয়া গেল। অতঃপর গবর্মেণ্ট চিত্তরঞ্জন দাশকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন (ডিসেম্বর ১৯২১)।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রমুখ রাজনীতিজ্ঞরা দেশের এই অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা গান্ধীজির সহিত

বড়লাটের সাক্ষাৎ ঘটাইয়া একটা আপোষের চেষ্টা করেন; কিন্তু গান্ধীজি বলিলেন যে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি না দিলে তিনি কোনো প্রকার মীমাংসার কথা ভাবিতে পারেন না। তিনি তাঁহার চাহিদা কমাইতে এবং গবর্মেণ্ট তাঁহার প্রেসটিজ ক্ষুণ্ণ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। সুতরাং দুই দিকেরই ধনুর্ভঙ্গ পণের জন্য কোনো মীমাংসায় উপনীত হওয়া গেল না। গান্ধীজির প্রতিপক্ষদের অভিযোগ যে, গান্ধীজি সংগ্রাম হইতে মীমাংসার জন্য অধিক উদ্‌গ্রীব; গান্ধীজি জানিতেন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন-সংস্থার বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম করা যায় না, তিনি নূতন নূতন চাল্ বা টেক্‌নিক লইয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

১৯২১ সালের ডিসেম্বরে আহমদাবাদে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন; মনোনীত সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ ও জাতীয়তাবাদী কন্‌গ্রেস কর্মীদের সকলেই প্রায় কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ। কিন্তু গান্ধীজির উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস বিন্দুমাত্র অবসাদগ্রস্ত নহে। তিনি অবিচলিত। কিন্তু দেশের মধ্যে সক্রিয় সংগ্রাম করিবার আবহাওয়া না থাকায় তিনি মোসলেম রিপাবলিক দলের নেতা হসরৎ মোহানীর 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন যে, এই দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রস্তাবে তিনি মর্মাহত (It has grieved me because it shows lack of responsibility.)।

ভারত গবর্মেণ্ট আহমদাবাদের কন্‌গ্রেসের অবস্থা দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন; বড়লাট বিলাতে ভারত-সচিবকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইলেন, Gandhi has been deeply impressed by the rioting at Bombay— the rioting had brought home to him the dangers of mass civil disobedience.[১]

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া গান্ধীজি অন্য পথ আবিষ্কারের জন্য চেষ্টান্বিত হইলেন। কন্‌গ্রেসের অধিবেশনের পর গান্ধীজি বরদৌলীতে চলিয়া গেলেন— সত্যাগ্রহ পুনরায় চালু করিবার জন্য জনতাকে প্রস্তুত করিবেন। কিন্তু নিরুপদ্রব অহিংসক অসহযোগনীতির সাধনা— সাময়িক

১ R. P. Dutt, India to-day P. 286.

কুচকাওয়াজ শিক্ষার ন্যায় যান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধ হয় না ; উহা আধ্যাত্মিক সাধনা— সংযমের উপর উহার প্রতিষ্ঠা— সামরিক শিক্ষা হইতে ইহার কঠোরতা কিছু কম নহে। অশিক্ষিত ধর্মহীন জনতার দ্বারা ইহা বিপর্যস্ত হইতে বাধ্য।

সত্যাগ্রহ পরিচালনার কথা যখন তিনি ভাবিতেছেন তখন তিনি আর-একটি প্রচণ্ড আঘাত পাইলেন। ১৯২২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় চৌরিচৌরা থানায় লোমহর্ষক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। কিছুকাল হইতে স্থানীয় পুলিশ চারিদিকের লোকজনের উপর নানাভাবে অপমান করিতেছিল। লোকে এই ব্যাপারে উত্তেজিত হইয়া থানার ঘর আক্রমণ করে ও ২১ জন দেশীয় পুলিশ ও চৌকিদারকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই ব্যাপারের মধ্যে কয়েকজন তথাকথিত কন্‌গ্রেসকর্মীও লিপ্ত ছিলেন।

এই ঘটনার পর ভারতের চিন্তাশীল লোকমাত্রই বুঝিলেন যে, রাজনীতিকে অত-সহজে আধ্যাত্মিক করা যায় না। গান্ধীজিও বুঝিলেন, সত্যাগ্রহের সময় উপস্থিত হয় নাই। এই ঘটনার তিনদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ গুজরাটের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নানালাল দলপতরামকে এক পত্র লেখেন ; তাহাতে গান্ধীজি যেভাবে অহিংসানীতিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতেছেন তাহার প্রতিবাদ ছিল। কবি লিখিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর মহাপুরুষগণ আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য প্রেম, ক্ষমা, অহিংসাদি প্রচার করিয়াছেন বিশেষ কোনো রাজনৈতিক অভীষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করেন নাই। No doubt through a strong compulsion of desire for some external result, men are capable of repressing their habitual inclinations for a limited time, but when it concerns an immense multitude of men of different traditions and stages of culture, and when the object for which such repression is exercised needs a prolonged period of struggle, complex in character, I cannot think it possible of attainment.[১]

[১] The Bengalee, 8 Feb 1922 দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড পৃ. ৭৮

চৌরিচৌরার ব্যাপারে গান্ধীজি চিন্তান্বিত হইয়া কন্‌গ্রেস কমিটিকে বরদৌলীতে আহ্বান করিলেন; সেখানে দেশের মধ্যে সংগঠন কার্যের এক খসড়া পেশ করিলেন। দেশবাসীকে সরকারের আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ করিতে নিষেধ করিয়া তিনি গঠনমূলক কার্যে[১] মনোনিবেশ করিতে বলিলেন; ইহার মধ্যে চরকা কাটা ও খদ্দর প্রচার হইল প্রথম কাজ; অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও মাদকসেবন নিবারণ কর্মপদ্ধতির মধ্যে থাকিল; গ্রাম্য সালিশী বিচারে বিশেষভাবে মনোযোগ দিবার জন্যও সকলকে বলিলেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ দিল্লীর বিশেষ কন্‌গ্রেস অধিবেশনে বরদৌলী প্রস্তাব গৃহীত হইল।

কিন্তু চারিদিকের আবহাওয়া হইতে বুঝা যাইতেছে যে, রাজনীতিক আন্দোলন অচিরেই ভিন্ন পথাশ্রয়ী হইবে। মহারাষ্ট্রী হিন্দু ও খিলাফতী মুসলমানের মধ্যে কিছুকাল হইতেই চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল—এখন হইতে তাহা মুখর হইতে চলিল। প্রতিষ্ঠিত শাসন-সংস্থার নিরন্তর নিন্দাবাদ ও শাসনকর্তাদের জব্দ করিবার বা জাতীয় জীবনের অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য জনতাকে নিরন্তর উত্তেজিত করিয়া তোলা,—আইন অমান্য ও নিয়ম ভঙ্গ করিবার 'প্ররোচনা ও প্রশ্রয়দান প্রভৃতি হইতে উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্‌ভব অবশ্যম্ভাবী হইবে', —সেকথা নেতারা বিশেষ ফললাভের আশায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন; অথবা এইরূপ risk বা বিপদসম্ভাবনাকে বরণ করিয়া মুক্তি আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া পরাধীনের আর কোনো পথই মুক্ত ছিল না বলিয়াই তাহারা এই পথাশ্রয়ী হইয়াছিলেন। এই নেতিধর্ম আন্দোলন হইতে মঙ্গল বা শিবের জন্ম হয় কি না—সে প্রশ্ন করিবার সময় কাহারও নাই—অগ্রসর হইতেই হইবে ইহাই সকলের পণ। মিসেস বেসাণ্ট বলিয়াছিলেন যে, আপাত-দৃষ্টিতে আমরা এই আন্দোলনের দ্বারা ফললাভ করিতে পারি, কিন্তু জাতির মজ্জার মধ্যে এই আইন অমান্যের বিষ রহিয়া যাইবে। উচ্ছৃঙ্খলতা আজ যে দেশব্যাপী হইতেছে তাহার কারণ এই আইন অমান্য করিবার শিক্ষা।

গান্ধীজি সত্যাগ্রহ চালাইবেন বলিয়া সরকারকে এক ইস্তাহার পাঠাইয়া জানাইলেন যে, অসহযোগী দলকে সরকার বাধ্য করিয়া সত্যাগ্রহ অবলম্বন

১ প্রসঙ্গত বলিতে পারি ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে গ্রামসংস্কার ব্যবস্থা আরম্ভ করেন।

করাইতেছেন; তিনি বলিলেন, মানুষের কথা বলিবার, সভা করিবার স্বাধীনতা গবর্মেণ্ট নানাভাবে হরণ করিতেছেন। সরকার পক্ষীয় বলিলেন যে, রাজ-প্রতিনিধি যুবরাজকে অবমাননা করিবার জন্য প্রজাবর্গকে উত্তেজিত করা, আইন অমান্য করিবার জন্য জনতাকে উপদেশ এবং খাজনা বন্ধ করিবার জন্য কৃষককে প্ররোচিত করা প্রভৃতি কর্মপ্রচেষ্টাকে সরকার কখনো প্রজার জন্মগত অধিকার বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না; এবং সেই-সকল অপকর্ম নীরবে অনুষ্ঠিত হইতে দিতে পারেন না, সরকারের মতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পুনরায় উত্থাপিত হইলে দেশে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশান্তি বাড়িবেই; সুতরাং ইহাকে বন্ধ করিতেই হইবে। তজ্জন্য ১০ই মার্চ (১৯২২) বোম্বাই পুলিশ গান্ধীজিকে সবরমতী আশ্রম হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। বিচারালয়ে গান্ধীজি মুক্তকণ্ঠে নিজেকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিলেন; অসহযোগ আন্দোলনের জন্য যত কিছু অনাচার হইয়াছে তাহার জন্য তিনিই দায়ী; তবে এ কথাও বলিলেন যে, মুক্তি পাইলে তিনি পুনরায় অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন করিবেন। তিনি গবর্মেণ্টের নিকট হইতে কোনো করুণা ভিক্ষা করিতেছেন না— এবং তাঁহার অপরাধের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি গ্রহণ করিতেও তিনি প্রস্তুত। বিচারে তাঁহার ছয় বৎসর জেল হইল। তিন বৎসর পূর্বে তাঁহার গ্রেপ্তারের গুজব মাত্র প্রচারিত হইলে উত্তর ভারতে জনবিপ্লব শুরু হইয়াছিল।— আজ ভারতের কোনোখানে কোনো চাঞ্চল্য, কোনো আপত্তিকর ঘটনা ঘটিল না! চতুর গবর্মেণ্ট ইতিপূর্বে কর্মী নেতাদের কারাগারের অন্তরালে প্রেরণ করিয়া দেশ কর্মীশূন্য করিয়া দিয়াছিলেন; এইবার আন্দোলনের স্রষ্টাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া ব্রিটিশ সরকার ভাবিলেন, আর ভয় নাই।

দেশের মধ্যে অবসাদ দেখা দিয়াছে; গান্ধীজি লোকের কাছে 'স্বরাজ' লাভের জন্য নানা উপায় বলিতেছিলেন— এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ আসিবে, আইন অমান্য করিলে স্বরাজ আসিবে, চরকা কাটিলে স্বরাজ আসিবে ইত্যাদি বাণী ভুল ভাবে লোকে গ্রহণ করিতেছিল। এত বড় দেশ, এত ভাষাভাষী অসংখ্য জাতি উপজাতি কোথায় তাহাদের মিলনভূমি— কোন্ পথ ধরিলে স্বাধীনতা আসিবে কে তাহা বলিতে পারে? নানা লোকে নানা দল গঠন করিয়া মুক্তিচেষ্টায় রত। মুসলিম লীগের এক চিন্তাধারা, হিন্দুমহাসভার অন্যরূপ;

সন্ত্রাসবাদীদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিচিত্র পদ্ধতির মধ্যে গান্ধীজিরও পরীক্ষা চলিতেছে; কোন্‌টি যে পথ তাহা কেহই বলিতে পারে না; অন্ধকারে গান্ধীজি পথ খুঁজিতেছেন, আর অন্তরের মধ্যে আলোকের সন্ধান করিতেছেন, যাহাকে তিনি বলেন 'inner voice'।

—

ছয় মাস কারাবাস করিয়া চিত্তরঞ্জন বাহিরে আসিলেন (জুন ১৯২২)। দেশের অবস্থা দেখিয়া তিনি ও তাঁহার সহকর্মীরা বুঝিলেন যে, দেশের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি অন্য পথে নিয়ন্ত্রিত না করিতে পারিলে জাতীয় আন্দোলন অগ্রসর হইবে না। নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতেই হইবে; সেই নূতন পন্থা হইতেছে কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া সরকারী কাজে বাধা দান করিবার পদ্ধতি (obstruction)।

দিল্লীতে কন্‌গ্রেস কমিটির অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি কয়েকজনকে লইয়া একটি সত্যাগ্রহ-কমিটি গঠিত হইল। এই কমিটি দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া একবাক্যে বলিলেন যে, সত্যাগ্রহের জন্য দেশ মোটেই প্রস্তুত নহে। কিন্তু কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে কন্‌গ্রেসের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ। অসহযোগের প্রথম পর্বে কন্‌গ্রেসীদের মধ্যে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ সম্বন্ধে যে গোঁড়ামি ছিল বাস্তব রাজনীতির সম্মুখীন হইয়া তাহা এখন অনেক কমিয়া আসিয়াছে। চট্টগ্রামের প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন বলিলেন, অসহযোগী হইয়াও কাউন্সিলের সদস্য হইবার কোনো বাধা থাকিতে পারে না; কারণ তাঁহারা সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য কাউন্সিলে প্রবেশ করিতেছেন না, কাউন্সিলের কাজ অচল করিবার জন্যই সদস্যপদ গ্রহণ করিবেন। আবার অসহযোগী সদস্যের সংখ্যাধিক্যের বলে তাঁহারা যাহা চাহিবেন, ভোটের দ্বারা তাহা আদায়ও করিয়া লইতে পারিবেন। তাঁহাদের জিদ বজায় না থাকিলে, পদে পদে সরকারের সকল অর্থ-চাহিদা (demand) ভোটাধিক্যে নাকোচ করিবেন। নূতন সংবিধানে দেশীয় মন্ত্রীদের উপর কতকগুলি বিষয়ের ভার অর্পিত হইয়াছিল; সেই বিষয়গুলির অর্থ-বরাদ্দ কাউন্সিলের মতসাপেক্ষ; শান্তি আইন শৃঙ্খলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আর-এক শ্রেণী মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত—সেগুলি কাউন্সিলের ভোট নিরপেক্ষ। মোটকথা, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতারা কাউন্সিলে প্রবেশের জন্য আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলেন; গান্ধীজি এখনো জেলে আছেন। ইনি মুক্তি পান ১৯২৪ সালের গোড়ায়।

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে গয়ায় কন্‌গ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন সভাপতি। তিনি এই সভায় ঘোষণা করেন যে, তিনি 'যে-স্বরাজ' স্থাপনের জন্য চেষ্টান্বিত তাহা ধনী বা শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের জন্য নহে, তাহা ভারতের আপামর সাধারণের স্বরাজ, কিন্তু সে স্বরাজ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার আলোচনা গয়ার কন্‌গ্রেসে হইল না। কাউন্সিলে প্রবেশের প্রশ্ন লইয়া সম্মেলনে মতভেদ স্পষ্ট হইয়া উঠিল ; একদল গান্ধীজির বরদৌলী প্রস্তাব ও অসহযোগ-নীতি হইতে একপদও নড়িবেন না ; তাঁহারা চরকা, খদ্দর প্রভৃতি কাজে মনোযোগী হইলেন।

১৯২৩ সালের ১লা জানুয়ারী চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্যদল গঠন এবং দলের মুখপত্র হিসাবে 'Forword' নামে দৈনিক কাগজ প্রকাশ করিলেন। ইহাই বাংলাদেশে বোধ হয় প্রথম দলগত বা পার্টি পত্রিকা। এই কার্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইলেন সুভাষচন্দ্র বসু। স্থির হইল স্বরাজ্যদল কন্‌গ্রেসের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিবেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে দেশে দুইটি দল—অসহযোগীরা No-changer নামে ও স্বরাজ্যদল Revisionist নামে পরিচিত হইল। টিলক-স্বরাজ্য ভাণ্ডারের মালিকানা কন্‌গ্রেসের উপর ছিল, এখন প্রশ্ন উঠিল, কন্‌গ্রেসের কোন্ দল সেই ধন-ভাণ্ডারের উপর মাতব্বরী করিবেন ; তাহা লইয়া বেশ অশান্তি দেখা গেল। তখন স্বরাজ্যদল নিজেদের ভাণ্ডার নিজেরাই সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। গান্ধীপন্থী অসহযোগীদের পক্ষ হইতে গঠনমূলক কার্য করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থসংগ্রহের চেষ্টা তেমন সফল হইল না। বরিশাল কনফারেন্সে উভয় দলের মধ্যে মতভেদ বিচ্ছেদে পরিণত হইল। কারণ সেখানে গান্ধীবাদীদের সংখ্যাধিক্যহেতু কাউন্সিল্ প্রবেশ-প্রশ্ন গৃহীত হইল না। ভারতের অন্যত্র স্বরাজ্যদল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানেও কাউন্সিল প্রবেশের প্রশ্ন তীব্রভাবে আলোচিত হইয়াছে। অবশেষে বোম্বাই-এর নিখিলভারত কন্‌গ্রেস কমিটির এক অধিবেশনে স্থির হইল যে, কন্‌গ্রেসের তরফ হইতে কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে কোনো প্রতিবাদ করা হইবে না। এই প্রস্তাবে কয়েকজন গোঁড়া গান্ধীবাদী কন্‌গ্রেস ত্যাগ করিলেন ; তাঁহারা কন্‌গ্রেসের প্রস্তাব হইতে গান্ধীজির মতকে বেশি মান্য করিতেন—যাহাকে বলে Personality cult-এর উপাসনা। ইহার পর স্বরাজ্যদল ভারতের সর্বত্র কাউন্সিল, কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বা তালুক

বোর্ডে প্রবেশের জন্য প্রচারকার্য আরম্ভ করিলেন ; ভারতের রাজনীতি নূতন পর্বে প্রবেশ করিল। কলিকাতার কর্পোরেশন 'স্বরাজ'দল কর্তৃক অধিকৃত হইলে চিত্তরঞ্জন দাশ হইলেন প্রথম মেয়র ও সুভাষচন্দ্র বসু প্রধান কর্মকর্তা বা একজিকুটিভ অফিসার (বর্তমানে যে-পদের নাম কমিশনর)। স্বরাজ্যদলের বহুলোক কর্পোরেশনের নানা চাকুরিতেও প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইলেন। রাজনীতিতে দলগত কার্যপদ্ধতি বা দলাদলের প্রশস্ত ক্ষেত্রে লোকে প্রবেশ করিল।

স্বরাজ্যদল চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে কর্ম আরম্ভ করিলেন তাহা আপাতদৃষ্টিতে গান্ধীজির আধ্যাত্মিকতা নহে। চিত্তরঞ্জন রাজনীতিকে রাজনীতি বলিয়াই জানিতেন এবং দলপুষ্ট করিবার এবং বিরোধীপক্ষকে পরাভূত করিবার কোনো কূটনীতিই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। এই সময়ে বাংলাদেশে মুসলমানরাও আপনাদের স্বার্থ, অধিকার ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ ও আত্মচেতন। খিলাফত-আন্দোলন এখন নিষ্প্রভ, কারণ যে 'খলিফা'র হৃতগৌরবের জন্য ভারতীয় মুসলমানদের এত উদ্বেগ ও ভাবনা, সেই খলিফার পদ তুর্কীতে নাকোচ হইয়াছে— কামাল পাশার ভয়ে খলিফা তথা তুর্কীর সুলতান ব্রিটিশ জাহাজে উঠিয়া দেশত্যাগ করিয়াছেন। খিলাফত প্রশ্ন যাঁহাকে লইয়া কেন্দ্রিত, তাঁহার অন্তর্ধানে আন্দোলন অর্থশূন্য হইয়া পড়িল। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতালাভের যে বাসনার উদয় হইয়াছে, তাহা নির্বাপিত হইল না। এই অবস্থায় চিত্তরঞ্জন গান্ধীজির পথ অবলম্বন করিয়া বাংলাদেশে কন্‌গ্রেসকে সুদৃঢ় করিবার আশায় মুসলমানদের সহিত প্যাক্‌ট বা কতকগুলি শর্ত মানিয়া লইয়া মিতালি করিলেন। এই ঘটনায় রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমানের জাতিগত পার্থক্য প্রকারান্তরে আবার মানিয়া লওয়া হইল এবং স্বরাজ্যদল যে মুসলমানেতর 'নন-মুসলিম' তাহাও স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত চাকুরি ও নির্বাচনের ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া মিত্রতাকে পাকা করিবার চেষ্টা চলিল। যতদিন খিলাফত-আন্দোলন প্রবল ছিল ততদিন হিন্দুরা মুসলমান সমাজকে দলে টানিবার জন্য খিলাফতীদের সকল প্রকার চাহিদা মানিয়া লইয়া রাজনৈতিক প্রেম বজায় রাখিয়াছিল। এবারও বাংলাদেশে স্বরাজদল আপন দলগত প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য মুসলমানদের সহিত সেইরূপ রাজনৈতিক প্রেমে আবদ্ধ হইলেন। ফলে বাংলার ব্যবস্থাপক সভায়

হিন্দু-মুসলমান সভ্যদের অধিকাংশই 'স্বরাজ্য'দলের সদস্য হইলেন। সরকারী কাজকর্ম পণ্ড করিবার উদ্দেশেই ইহাদের দল-গঠন।

বাজেটের সময় অবস্থা এমনই সঙ্কটময় হইল যে দেশীয় মন্ত্রীদের বেতন-খাতে ভোট পাওয়া গেল না; ফলে গজনভী সাহেব, ফজলুল হক সাহেব প্রভৃতি মন্ত্রীগণ গদিচ্যুত হইলেন— দেশীয় মন্ত্রীদের পদ উঠিয়া গেল— স্বরাজদল ইহাই চাহিয়াছিলেন। ভারতের এই দোটানা গভর্মেণ্ট বা দ্বৈরাজ্য যে স্বরাজ্যলাভের পরিপন্থী ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য এই পরিস্থিতির উদ্ভবপ্রচেষ্টা। ইতিপূর্বে মধ্যপ্রদেশেও মন্ত্রীরা কর্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় রাজ্য প্রশাসনের ভার পড়িল অধ্যক্ষ বা কর্মসমিতির উপর। প্রকারান্তরে ইংরেজের যথেচ্ছাচারের উপর শাসনভার গিয়া বর্তাইল।

১৯২৪ সালের আরম্ভভাগে গান্ধীজি কারাগারে কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে গবর্মেণ্ট তাঁহাকে বিনাশর্তেই মুক্তিদান করিল— ছয় বৎসরের মধ্যে দুই বৎসর মাত্র তাঁহাকে কারাগারে বাস করিতে হইয়াছিল। এই দুই বৎসরের মধ্যে স্বরাজদল সর্বত্রই আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

এই বৎসরের জানুয়ারী মাসের মধ্যেই ভারতের কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির নির্বাচন কার্য শেষ হইয়া গেলে এপ্রিল মাস হইতে নূতন পরিষদের কার্য আরম্ভ হইল। স্বরাজদল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্টেগু-চেম্স্ফোর্ড সংবিধান পরিবর্তন দাবি করিলেন— দ্বৈরাজ্য যে অচল তাহা এই তিন বৎসরের মধ্যে সকলেই বুঝিতেছিলেন; কিন্তু ইংরেজ বড় রক্ষণশীল জাত, সহজে কিছু কবুল করিতে চায় না, পরিবর্তন করিতে আরও নারাজ।

ইতিমধ্যে বিপ্লবীদের অস্তিত্ব পুনরায় দেখা গেল; কলিকাতার রাজপথে গোপীনাথ সাহা নামে এক যুবক বহুনিন্দিত, অতিঘৃণিত, অসামান্য কর্মী পুলিশ কমিশনর টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করিতে গিয়া ভ্রমবশতঃ মিঃ ডে নামে এক নিরীহ ইংরেজকে হত্যা করে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ১৯২০ সালে সম্রাটের আদেশে মুক্তিপ্রাপ্ত আন্দামান-প্রত্যাবৃত্ত রাজনৈতিকদের কয়েকজনকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া অন্তরীণাবদ্ধ করা হইল।

সিরাজগঞ্জে (পাবনা জেলা) এই বৎসর প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে সভাপতি মৌলনা আক্রম্ খাঁ। সভা হইতে গোপীনাথ সাহা কর্তৃক মিঃ ডে-র

হত্যাকার্যের নিন্দাবাদ করা হইল ; কিন্তু চিত্তরঞ্জন গোপীনাথের স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করিলেন। জুন (১৯২৪) মাসের আহমদাবাদের নিখিল ভারত কন্‌গ্রেস কমিটিতেও চিত্তরঞ্জন গোপীনাথের আত্মত্যাগের জন্য প্রশংসাবাদ করেন ; কিন্তু গান্ধীজি উপস্থিত থাকাতে সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই ; কিন্তু দেশের সহানুভূতি কোন্ দিকে যাইতেছে তাহা অস্পষ্ট থাকিল না।

কিন্তু স্বরাজ্যদল ও গান্ধীপন্থীরা যেখানে বসিয়া রাজনীতির আলোচনা ও কলহ করিতেছেন— তাহা হইতে বহু দূরে জনতা ধর্ম লইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা আবার শুরু করিয়া দিয়াছে— নানা স্থানেই হিন্দু-মুসলমান বিরোধ দেখা দিল, কিন্তু কোহাটে (১৯২৪) যে কাণ্ডটা হইল, তাহার তুলনা ইতিপূর্বে কোথাও দেখা যায় নাই। এই ঘটনার পর গান্ধীজি দিল্লীতে মৌলানা মহম্মদ আলীর বাড়িতে থাকিয়া অনশন আরম্ভ করিলেন (২২ সেপ্টেম্বর) ; তিনি ভাবিতেছেন, তাঁহার এই আত্মপীড়ন দ্বারা মুসলমান-সমাজের অনুতাপ হইবে এবং তাহাদের হিংসাত্মক মনোভাবের পরিবর্তন হইবে। দিল্লীতে ঐক্য-সম্মেলন হইল— সকলেই সাম্প্রদায়িকতার নিন্দাবাদ করিলেন, মৈত্রীর জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু ব্যর্থ হইল গান্ধীজির আত্মপীড়ন ও অনশন— দেশ যে নারকীয় সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে চলিয়াছে সেখান হইতে উহাকে উদ্ধার করিয়া আনিবার সাধ্য তাঁহার নাই— কাহারো নাই— ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতিচর্চার অনিবার্য পরিণামের দিকে উহা অগ্রসর হইয়া চলিল।

এমন সময়ে বাংলা গবর্মেণ্ট এক অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া অকস্মাৎ কলিকাতার 'স্বরাজ'-দলের ৭২ জন কর্মীকে অন্তরীণাবদ্ধ করিলেন (২৫ অক্টোবর ১৯২৪)। ইহার মধ্যে ছিলেন কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা সুভাষচন্দ্র বসু, অনিলবরণ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি। বিপ্লববাদের সহিত ইহারা যুক্ত— এই ছিল গবর্মেণ্টের মত— ছিলেন না এ কথাও কেহ বলিতে পারেন নাই। সরকারের এই আদেশের প্রতিবাদে সমগ্র বঙ্গদেশ এক হইল ; নিখিলবঙ্গের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের স্বাক্ষরিত এক ইস্তাহারে দেশের ক্ষোভ প্রকাশ পাইল। ৩০শে অক্টোবর (১৯২৪) কলিকাতার টাউন হলে লর্ড লীটনের এই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা এবং পরদিন সমগ্র দেশে হরতাল ঘোষিত হইল। গান্ধীজি তাঁহার 'ইয়ং ইন্‌ডিয়া' পত্রিকায় লিখিলেন, "এই ঘটনায় যেন আমাদিগকে বিভীষিকাগ্রস্ত না করে ; আজ রাওলাট এক্‌ট মরিয়াছে, কিন্তু

যে-ভাব রাওলাট একটকে জন্ম দেয় তাহা অক্ষুণ্ণ ও অম্লান হইয়া রহিয়াছে। যতদিন ভারতবাসীর স্বার্থের সহিত ইংরেজের স্বার্থ মিলিবে না, ততদিন বৈপ্লবিক অরাজকতা অথবা তাহার আশঙ্কা সংশয় থাকিবেই, এবং ততদিন রাওলাট একটের নব নব সংস্করণ প্রকাশিত হইবে—ইহা অনিবার্য। ইহার উত্তরে একমাত্র অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনই মুক্তির উপায় করিতে পারিত। কিন্তু আমাদের তাহা পরীক্ষা করিবার যথেষ্ট ধৈর্য ও যথেষ্ট সামর্থ্য ফুটিয়া উঠিল না।"

রবীন্দ্রনাথ তখন দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায়; তিনি এক কবিতাপত্রে লিখিলেন—

"ঘরের খবর পাই নে কিছুই গুজব শুনি নাকি,
কুলিশপাণি পুলিশ সেথায় জাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলাদেশে গান-হাসি সব ঠেলে,
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।"

এই পত্রের আর একটি অংশে কবি বলিলেন—

"প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই!
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়;
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।"

বাংলার এই আতঙ্কিত অবস্থায় গান্ধীজি ও মতিলাল নেহেরু কলিকাতায় আসিলেন। সকলের ইচ্ছা, স্বরাজদল, সত্যাগ্রহীদল এক হইয়া কন্‌গ্রেসের কার্য করেন; গান্ধীজির সহিত স্বরাজদলের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তিনি বিপুলভাবে অভিনন্দিত হইলেন। গান্ধীজি, মতিলাল, চিত্তরঞ্জন— এই তিন জনের মধ্যে কাউন্সিল প্রবেশাদি বিষয়ে যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল তাহা এইবার কিয়দপরিমাণে শমিত হইল।

১৯২৪ সালের শেষে কন্নাড়দেশে বেলগাঁও শহরে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন— গান্ধীজি সভাপতি; এই একবারই তিনি সভাপতি হন। তিনি এই অধিবেশনে

বলিলেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়াই স্বরাজলাভ সম্ভব। তবে যদি ব্রিটেনের সহিত আমাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবার প্রয়োজন হয়, তবে তাহা করিতেও আমরা দ্বিধাবোধ করিব না।" স্বরাজলাভের জন্য তিনি তিনটি পথ নির্দেশ করিলেন—চরকাকাটা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপন ও অস্পৃশ্যতা বর্জন। গান্ধীজির এই গঠনমূলক কর্মে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ বহু খ্যাতনামা পুরুষ নামিলেন। বাংলাদেশের বাহিরে বিহার, গুজরাট, মদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের বহুস্থানে কাটুনি সংঘ ও আশ্রম স্থাপিত হইল; হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি, অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতির কাজ চলিল, কিন্তু কোথাও তেমন প্রাণ পাইল না।

সক্রিয় সংঘাতের অবশ্যম্ভাবী পরিণামে পৌঁছিবার মতো কোনো লক্ষণ গান্ধীজি দেখিতে পাইতেছেন না— এই ধর্মমূঢ় জাতিদের কীভাবে উদ্‌বুদ্ধ করা যায় ইহাই তাঁহার ভাবনা।

চারিদিকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ কুৎসিত ও বীভৎস আকার ধারণ করিতেছে— দেশের মধ্যে কোথাও শান্তি নাই। এমন সঙ্কটের সময় দার্জিলিঙে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু ঘটিল (১৬ জুন ১৯২৫)। রবীন্দ্রনাথ দুইটি মাত্র ছত্রে চিত্তরঞ্জনের জীবনের মর্মকথাটি ব্যক্ত করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন—

> "সাথে করে এনেছিলে মৃত্যুহীন প্রাণ
> মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

২

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর স্বরাজদল প্রদেশে ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রধান বিরোধী দলরূপে স্বীকৃত হইল; সেপ্টেম্বর মাসে কন্‌গ্রেস সম্পূর্ণরূপে স্বরাজদলের হস্তগত হইল— গান্ধীজি নিখিলভারত চরকাসংঘের ভার গ্রহণ করিয়া গঠনমূলক কার্যে ব্রতী হইলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে স্বরাজদলই সরকার-পক্ষীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রহিলেন।

স্বরাজদল ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছেন, কিন্তু তাহারা কোনো পদ গ্রহণ করিবেন না— ইহাই স্থির ছিল; কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই সেখানেও মতভেদ দেখা দিল। গান্ধীপন্থী, স্বরাজ্যদল (Rivisionist) ব্যতীত তৃতীয়

দলের উদ্‌ভব হইল। ইহারা Responsive co-operation পথ গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ 'ডাকিলেই আসিব' ভাবখানা। অসহযোগের তৃতীয় ধাপ। তাম্বে, কেলকার, মুঞ্জে, জয়াকর প্রভৃতি অনেকেই ব্যর্থ বাধাদান নীতি বর্জন করিয়া দ্বৈরাজ্য প্রশাসনকে সফল করিবার জন্য গবর্মেণ্টকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইহারা সকলেই মহারাষ্ট্রীয়— তাঁহাদের রাজনীতির চাল্ একটু অন্য রকমের। তাঁহারা গান্ধীজির অহিংসা অসহযোগ টেকনিক কোনোদিনই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন নাই। আজও কোনো প্রকারেই উহাকে স্বীকার করিতে পারিলেন না; তাঁহারা মন্ত্রিত্বও গ্রহণ করিলেন।

গান্ধীপন্থীরা প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে ইতিমধ্যেই সরিয়া গিয়াছেন; এখন বিরোধ বাধিল গোঁড়া স্বরাজ্যদল ও নূতন সহযোগী স্বরাজদলের মধ্যে। স্বরাজ্যদলের মধ্যে মতভেদ ও ভাঙন দেখা দিবার মুখে বা লাদেশে মুসলমানগণ স্বরাজ্যদল ত্যাগ করিল।

১৯২৬ সালের এপ্রিল ও মে মাসে কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গেল— বিরোধের কারণ মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজানো। ইহার পটভূমি অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। এই দাঙ্গার সময়ে নূতন বড়লাট লর্ড আরউইন ভারতে আসিলেন (৬ এপ্রিল)। হিন্দু মুসলমানের মনের তিক্ততা চরমরূপ ধারণ করিল এই বৎসরের শেষ দিকে। গৌহাটিতে কন্‌গ্রেস অধিবেশন হইতেছে— ঠিক সেই সময়ে দিল্লীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মুসলমান আততায়ীর গুলিতে নিহত হইলেন (১৯২৬)। যে দিল্লীতে পাঁচ বৎসর পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মিলনপ্রহসন নাটকীয় রূপ লইয়াছিল— আজ তাহা বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইল (ডিসেম্বর ১৯২৬)। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "যে দুর্বল সেই প্রবলকে প্রলুব্ধ ক'রে পাপের পথে টেনে আনে। পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। অতএব যদি মুসলমান মারে, আমরা পড়ে পড়ে মার খাই— তবে জানব এ সম্ভব করেছে আমাদের দুর্বলতা।··· দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে— কেউ বাধা দিতে পারে না।"[১]

এক দিকে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতির দশা এই— অন্য দিকে কত শত

১ রবীন্দ্রজীবনী ৩য় পৃ. ২০২

হিন্দু বলিষ্ঠ যুবক যে অন্তরীণাবদ্ধ—তাহা কেহ বলিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ একখানা চিঠিতে (৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭) গবর্মেন্টের চণ্ডনীতির তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন। হিন্দু-মুসলমানের প্রেম পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশায়— কত ঐক্য-সম্মেলন ধর্মের নামে আহূত হইল। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য হইল না। ১৯২১ হইতে ১৯২৫ পর্যন্ত কন্‌গ্রেসের সহিত যুক্তভাবে মুসলিম লীগের বার্ষিক সভা বসিয়াছিল। ১৯২৬ হইতে তাহারা পৃথক হইয়া রীতিমতভাবে সভা আরম্ভ করিল। তাহারা মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত, নিখিল-ভারতের, সর্ব মানবের ভাবনা তাহাদের নাই। কিন্তু কন্‌গ্রেস যে স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী তাহা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নহে— তাহা সমগ্রের জন্য সাধনা।

আইন-অমান্য আন্দোলন

১৯২৭ সালের শেষভাগে জাতীয় আন্দোলন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতে চলিল। মদ্রাজের কন্‌গ্রেসে (ডিসেম্বর ১৯২৭) যুবক জবহরলাল নেহরু সভাপতি হইয়া পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, উহা ডোমিনিয়ন স্টেটাস নহে। সর্ব সম্প্রদায়ের ভারতীয়দের পক্ষ হইতে পূর্ণ স্বরাজের দাবি— এ দাবির মধ্যে কোনো 'কিন্তু' 'যদি' ছিল না।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের জন্য বিচিত্র প্রকারের কর্মধারা দেখিয়া ভারতের সংবিধান পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে এক কমিশন গঠনের প্রস্তাব করিলেন। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, মণ্ট্‌ফোর্ড সংবিধান প্রবর্তিত হইবার পর হইতে দ্বৈরাজ্যিক শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য কন্‌গ্রেস হইতে বহু বার বহু প্রকারের প্রস্তাব হইয়াছিল। সেই সূত্রে স্যর জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন বসাইবার কথা ঘোষণা করা হয় (৮ নভেম্বর ১৯২৭) কিন্তু কমিশনের সদস্যদের মধ্যে একজনও ভারতীয়ের নাম দেখা গেল না। ভারতীয়দের নিজের দেশে শাসনব্যবস্থা কী হইবে তাহা তদারক ও বিচার করিবার জন্য কমিটিতে ভারতীয় নাই! কিন্তু সরকারের পক্ষেও বলিবার কথা আছে; বহু দলে উপদলে বিভক্ত রাজনীতিকদের মধ্য হইতে সদস্য নির্বাচন এক জটিল সমস্যার বিষয়; কোন্ দলকে বাদ দিয়া কোন্ দলকে লইবেন— কোন্ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কত জন লোক লইতে হইবে— তাহা লইয়া নিশ্চয়ই একটা দারুণ কোলাহল সৃষ্ট হইত; যেমনটি হইয়াছিল ভারত স্বাধীনতা দানের অব্যবহিত পূর্বে কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্‌ব্লি গঠন করিবার সময়। আমাদের বোধ হয়, সেই অচল অবস্থার সৃষ্টি যাহাতে না হয় তজ্জন্য গবর্মেণ্ট একেবারে শ্বেতাঙ্গ সদস্য দ্বারা কমিশন গঠন করিলেন।

এই ব্যাপার লইয়া ভারতের সর্বত্র তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ পাইল। কন্‌গ্রেস প্রমুখ সকল দলই সাইমন কমিশন বর্জন করিবার পক্ষপাতী। কমিশন ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি ভারতে আসেন ও প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ করিয়া মার্চ মাসের শেষে দেশে ফিরিয়া যান। দ্বিতীয়বার ভালো করিয়া

তদন্ত করিবার জন্য আসিলেন। কমিশন দেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া নানা দলের প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত কথাবার্তা কহিয়া শাসন-সংস্কার বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যেখানে যান সর্বত্র হরতাল ও বিক্ষোভ। লাহোরের বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব করেন হিন্দুমহাসভার অন্যতম নেতা মদনমোহন মালবীয় ও আর্যসমাজের বিশিষ্ট নেতা লালা লাজপৎ রায়। বিক্ষোভকারী জনতার উপর লাঠি চার্জ হয়— লালাজি গুরুতররূপে আহত হন; ইহার কয়েকদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়— লোকে মনে করে, আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার মৃত্যু ত্বরান্বিত হইয়াছিল।

সাইমন কমিশন আপনার কাজ করিতেছেন। মদ্রাজ কন্‌গ্রেসের প্রস্তাব মত দিল্লীতে সর্বদলের এক সম্মেলন আহূত হইল। নানা দলের নানা মত মন্থন করিয়া একটি কমিটির উপর ভারতের ভাবী সংবিধান রচনার ভার অর্পিত হইল। মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে এই কমিটি গঠিত হয়। মোটামুটিভাবে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের আদর্শে সংবিধান রচিত হইল। সুভাষ বসু, জবহরলাল প্রভৃতি যুবকরা এই সংবিধান অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তাঁহারা স্বাধীন ভারত স্থাপনের পক্ষপাতী। ১৯২৮-এর শেষে কলিকাতায় কন্‌গ্রেস অধিবেশনে মতিলাল নেহরু সভাপতি; পূর্বোল্লিখিত সংবিধান-খসড়া এই অধিবেশনে গৃহীত হইল; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি প্রস্তাবে বলা হইল যে, আগামী এক বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই সংবিধান ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সম্পূর্ণভাবে মানিয়া না লইলে কন্‌গ্রেস পুনরায় অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিবে। কিন্তু নেহরু-সংবিধান-খসড়া রচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক প্রভুত্ব রক্ষার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ সকলেই শাসনব্যাপারে আপন প্রভুত্ব, ধর্মসম্প্রদায় বা দলগত স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য উত্তেজিত; তাহাদের আচরণ দেখিয়া মনে হইল, দেশ বা ভারতবর্ষ বলিয়া কোনো কিছুর অস্তিত্ব নাই; তাহাদের কাছে জাতি হইতে 'জাত' বড়, দেশ হইতে প্রদেশ বড়, মানবিক বিশ্বধর্ম হইতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম মহান্।

এই সময়ে দুইটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য; একটি হইতেছে কলিকাতায় প্রথম যুবসম্মেলন— ইহার উদ্বোধক সুভাষচন্দ্র বসু। দ্বিতীয়টি হইতেছে শ্রমিকদের

লইয়া সংঘগঠন। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯১৭ সালে গান্ধীজি সর্বপ্রথম আহমদাবাদের বয়নশিল্পের মজুরদের লইয়া সংঘ গড়িয়াছিলেন। অতঃপর ১৯২১-এ নিখিল ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন গঠিত হয়। গত আট বৎসরের মধ্যে এই ট্রেড-ইউনিয়ন বেশ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিয়াছে। ১৯২১-এ বোম্বাই মহানগরীতে সর্বপ্রথম নিখিল ভারত ট্রেড-ইউনিয়নের সম্মেলন বসিয়াছিল। ১৯২৩-এ লাহোরের ট্রেড-ইউনিয়ন সম্মেলনের সভাপতি হন চিত্তরঞ্জন দাশ। এইভাবে ভারতের শ্রমশক্তির জন্ম হইয়াছিল। কালে শ্রমিকরাও নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট আদর্শবাদে চরমপন্থীরা অনুপ্রাণিত। ১৯১৭ হইতে ১৯২৯-এর মধ্যে কম্যুনিষ্ট-ভাবনা দেশমধ্যে প্রচারলাভ করিয়াছিল। এই ট্রেড-ইউনিয়নের ৩১ জন বামপন্থী নেতাদের লইয়া মীরট ষড়যন্ত্র মামলা এই সময়ে দায়ের হয়। ইহার পূর্বে ১৯২৪ সালে কানপুর মামলায়— ডাংগে, সৌকত উসমান, মুজাফর আহমেদ ও দাশগুপ্তের পাঁচ বৎসর করিয়া জেল হয়। ট্রেড-ইউনিয়ন নেতাদের অপরাধ যে, তাঁহারা শ্রমিকদের লইয়া সংগঠন চেষ্টা করেন ও তাহাদের দুঃখদারিদ্র্য দূর না হইলে ধর্মঘট দ্বারা মালিকদের ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তাঁহাদের চেতনা সম্পাদন করিবার জন্য আন্দোলন করিতেন। শিল্পপ্রধান নগরগুলিতে ট্রেড-ইউনিয়ন কয়েক বৎসরে শক্তিশালী সংঘ হইয়া উঠিতেছে।

২

১৯২৯ সালের শেষভাগটি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। অক্টোবরের শেষ দিকে লর্ড আরউইন ঘোষণা করিলেন যে, অল্পদিনের মধ্যে বিলাতে গোলটেবিল আহূত হইতেছে। সেখানে ভারতীয় প্রতিনিধিরা ভাবী শাসন বিষয়ক সকল প্রশ্নের আলোচনা করিবেন। ভারতীয় নেতারা জানিতে চাহিলেন গোলটেবিলের বৈঠকে ভারতে ডোমিনিয়ন-স্টেটাস-সম্মত শাসনবিধি প্রবর্তনের কথা আলোচিত হইবে কি না। বড়লাট জবাবে জানাইলেন যে, ডোমিনিয়ন স্টেটাস কখন ভারতে প্রবর্তিত হইবে সেকথা আলোচনার জন্য যে গোলটেবিল বৈঠক আহূত হইতেছে তাহা নহে; তবে ডোমিনিয়ন স্টেটাস কী ভাবে ভারতে প্রযুক্ত হইতে পারে সে বিষয়ে কথাবার্তা হইবে। "The

conference is to meet not to discuss when dominion states is to be established, but to form a scheme of Dom. constitution for India."

ভারত-সচিব স্তর ওয়েজ্‌উড্‌-বেন বলিলেন, ভারত তো স্বায়ত্তশাসন পাইয়াই আছে— তাহার প্রতিনিধি হাই-কমিশনার লন্ডনে নিযুক্ত ; জেনেভার রাষ্ট্রসংঘ বা লীগ-অব-নেশন্‌সে ভারত-সদস্য উপস্থিত, মহাযুদ্ধের সময় কমন-ওয়েলথের সদস্যরূপে ভারত-প্রতিনিধিরা আমন্ত্রিত হন, যুদ্ধশেষে সাম্রাজ্য সম্মেলনেও ভারত আহূত হয়। অতএব ভারত তো স্বায়ত্তশাসন পাইয়াই গিয়াছে ; ইহা হইল বেন্‌ সাহেবের স্বায়ত্তশাসন লাভের চিত্র !

এইবার (১৯২৯) লাহোর কন্‌গ্রেসে সভাপতি যুবক জবহরলাল নেহেরু। এই সভায় স্থির হইল যে কন্‌গ্রেস পক্ষীয়রা বিলাতের গোলবৈঠকে যোগদান করিতে যাইবে না ; দ্বিতীয়ত, ভারত ডোমিনিয়ন স্টেটাস চাহে না— চাহে পূর্ণ স্বাধীনতা। গত বৎসর এই প্রস্তাবই জবহরলাল মদ্রাজে করিয়াছিলেন। ১৯২৮ সালে অগস্ট মাসে তাঁহার চেষ্টায় independence of India League স্থাপিত হয়। এইবার কন্‌গ্রেসের সভাপতির স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হইল। কন্‌গ্রেস স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিল যে তাহারা complete independence বা পূর্ণ স্বাধীনতা চাহে। আর ইতিপূর্বে মতিলাল নেহরুর নামে সংবিধানের যে খসড়া প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সিদ্ধান্ত এই সভা বর্জন করিল অর্থাৎ ডোমিনিয়ন স্টেটাস আজিকার কন্‌গ্রেস চাহে না। গত বৎসরের ঘোষণামতে ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে কন্‌গ্রেসের সদস্যগণ স্বাধীনতা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন ; সেই সময় স্থির হইল যে ২৬শে জানুয়ারি (১৯৩০) প্রতি বৎসর স্বাধীনতার সংকল্প-মন্ত্র সর্বত্র পঠিত হইবে। তদবধি ঐ দিবস ভারতে 'স্বাধীনতা দিবস' নামেই উদ্‌যাপিত হইতেছিল। এই ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের সংবিধানও গৃহীত হয়।

১৯২৯-এর শেষ দিনের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের আপোষের কোনো মনো-ভাব দেখা গেল না। গান্ধীজি ইতিপূর্বে লর্ড আরউইনের নিকট ভারতের পক্ষে কী কী সংস্কারের আশু প্রয়োজন তাহার এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পাঠাইয়া-ছিলেন ; তাহার মধ্যে বন্দীমুক্তির দাবি অন্যতম। অতঃপর ফেব্রুয়ারি মাসের (১৯৩০) মাঝামাঝি সময়ে সবরমতীতে কন্‌গ্রেস কর্মসমিতির নিকট গান্ধীজি

তাঁহার নূতন সত্যাগ্রহ পরিকল্পনা পেশ করিলেন। বিনা প্রতিবাদে তাঁহার প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল। সংগ্রামের জন্য গান্ধীজি দেশবাসীকে আহ্বান জানাইলেন। ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার ৭২ জন সদস্য পদত্যাগ করিলেন; মদনমোহন মালবীয় অসহযোগী গান্ধীপন্থী ছিলেন না, তিনিও ভারতের স্বার্থবিরোধী ব্রিটিশ সরকারের শুল্ক ও শিল্প -বিষয়ক আইনাদির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ ত্যাগ করিলেন। এবার কেবলমাত্র অসহযোগ নহে, এবার সক্রিয়ভাবে আইন অমান্য করিতে হইবে।

গান্ধীজি ২রা মার্চ (১৯৩০) বড়লাটকে পত্রযোগে তাঁহার সত্যাগ্রহ পরিকল্পনা জানাইয়া দিলেন। অতঃপর ৮৯ জন আশ্রমবাসী কর্মী লইয়া সবরমতী আশ্রম হইতে পদব্রজে যাত্রা করিলেন— তাঁহাদের গম্যস্থান বোম্বাই প্রদেশের দণ্ডী নামক সমুদ্রকূলস্থিত স্থান; সেখানে লবণ-আইন ভঙ্গ করা হইবে। ব্রিটিশ যুগে লবণ ছিল সরকারের নিজস্ব ব্যবসায় সামগ্রী, উহার উপর কর ছিল বলিয়া সমুদ্র-জল হইতে কোনো লোক লবণ প্রস্তুত করিতে পারিত না। সেই লবণ-আইন ভঙ্গ করা হইল সত্যাগ্রহীদের প্রতীকমূলক অনুষ্ঠান মাত্র। দুই শত মাইল পথে সত্যাগ্রহ প্রচার করিতে করিতে গান্ধীজি ৫ই এপ্রিল দণ্ডী পৌঁছিলেন, ৬ই হইতে ১৩ই জাতীয়সপ্তাহ বলিয়া ঘোষিত হইল। ১৯১৯ সালে এই সময়ে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং ১৩ই এপ্রিল জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটে, গান্ধীজি সেই ঘটনাস্মৃতি জিয়াইয়া রাখিয়াছেন। এখন সেইটিকে জাতীয়সপ্তাহ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। গান্ধীজি ৬ই সমুদ্র-জলে নামিয়া সরকারী লবণ-আইন ভঙ্গ করিলেন; সেইদিন সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও বঙ্গীয় সত্যাগ্রহীরা মহিষবাথান নামক স্থানে লবণ-আইন ভঙ্গ করিলেন।

সরকারের পক্ষে আইন-ভঙ্গকারী মাত্রই দণ্ডার্হ। ইতিপূর্বেই তাঁহারা দমননীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন; কলিকাতায় সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁহার সঙ্গীরা 'স্বাধীনতা দিন' উদ্‌যাপিত হওয়ার পূর্বেই ২৩ জানুয়ারি ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলন; যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, জবহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি নেতৃস্থানীয়দের বন্দী করা হয়। উত্তর ভারত, পশ্চিম ভারত ও বঙ্গদেশ নেতাশূন্য হইয়া গেল। বাংলাদেশের অবস্থা

সর্বাপেক্ষা শোচনীয়, কারণ মন্ত্রীরা ব্রিটিশের অনুগত স্তাবক, প্রতিক্রিয়াশীল, কন্‌গ্রেসবিরোধী ও বর্ণহিন্দুবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক। পশ্চিম ভারতে গুজরাট সাড়া দিয়াছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়রা গোলবৈঠকের সহিত কন্‌গ্রেসের সহযোগিতা করিবার পক্ষপাতী বলিয়া লবণ-সত্যাগ্রহে তাহাদের কোনো উৎসাহ দেখা যায় নাই। ধরসনার সরকারী লবণ গোলা আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা গান্ধীজি পূর্বাহ্নে সরকারকে জানাইয়াছিলেন; উহা কার্যে পরিণত হইবার পূর্বরাত্রে ৫ই মে (১৯৩০) বোম্বাই পুলিশ গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করিল। ইহার পর ধরসনা গোলা লুণ্ঠন করিবার জন্য সত্যাগ্রহীরা দলের পর দল চলিতে লাগিল ও তাহাদের উপর পুলিশের যথাবিধি অত্যাচারও চলিল।

দেখিতে দেখিতে দাবানলের ন্যায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন দেশব্যাপী হইল—তাহার প্রকাশভঙ্গী হইল নানা ভাবে। বিলাতি দ্রব্য বর্জন, বিলাতি সিগারেট বর্জন প্রভৃতি কীভাবে দেশব্যাপী হইল তাহার উৎস কেহ জানে না। গবর্মেণ্ট ইতিপূর্বে প্রেস অর্ডিন্যান্স পাশ করিয়াছিলেন (২৩ এপ্রিল); ইহার প্রতিবাদে ভারতের সমস্ত দেশীয় কাগজ দুইদিন প্রকাশ বন্ধ রাখিল, এই অর্ডিন্যান্সের আওতায় পড়িয়া ১৩০ খানি দেশীয় কাগজ ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা জামিন দিতে বাধ্য হইল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনকালে আবির্ভূত হয়। এককালে বিপ্লবী সুরেশচন্দ্র মজুমদার ইহা প্রকাশ করেন; অর্ডিন্যান্স জারি হওয়ায় ছয় মাস তিনি কাগজ বন্ধ রাখিলেন।

সরকারের চণ্ডনীতি নানা ভাবে নানা স্থানে মূর্ত হইতেছে; ধীরে ধীরে পূর্বের ন্যায় জেলা কন্‌গ্রেস কমিটি, প্রাদেশিক কন্‌গ্রেস কমিটি বে-আইনী ঘোষিত হইল। অবশেষে একদিন কন্‌গ্রেস কর্মসমিতি বে-আইনী ঘোষিত হইলে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কারারুদ্ধ হইলেন।

লবণ-সত্যাগ্রহ চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নানা স্থানে উত্তেজিত জনতার উপর পুলিশের লাঠি ও গুলি চলিতে শুরু হয়। পেশাবারের দুর্ধর্ষ পাঠানরা আবদুল গফ্‌ফর খানের নেতৃত্বে 'খুদাই খিতমদগার' নামে অহিংসক সত্যাগ্রহী সংঘে গঠিত হইয়াছে; তাহারা অনেকে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিল। গাড়োয়ালি সৈন্যরা নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি করিতে অস্বীকৃত হইলে তাহারা সামরিক সাজা (কোর্টমার্শাল) পাইল।

গাড়োয়ালি সৈন্যরা হিন্দু, এবং পেশাবার অঞ্চল মুসলমানপ্রধান স্থান। এই ক্ষেত্রে নিরস্ত্র জনতার উপর গাড়োয়াল সৈন্যরা গুলিবর্ষণ না করিয়া তাহাদের সহিত মিতালি করিল। ২৫ এপ্রিল হইতে ৪ মে পর্যন্ত পেশাবার সম্পূর্ণরূপে এই অহিংসক সত্যাগ্রহীদের হাতে থাকে। তারপর নানাস্থান হইতে সৈন্য আনিয়া পেশাবার 'অধিকৃত' হইলে সত্যাগ্রহীরা কোনো বাধা দান করিল না; তাহারা 'সত্যের 'পর মন করেছে সমর্পন' বলিয়া অসহ্য অত্যাচার নীরবে সহ্য করিল।

গান্ধীজি গাড়োয়ালি সৈন্যদের ব্যবহার সম্বন্ধে বলিলেন যে, তিনি সৈন্যদের নিকট সৈনিকের ন্যায়ই ব্যবহার আশা করিয়াছিলেন। তাহারা যতক্ষণ সৈনিক বিভাগে আছে— ততক্ষণ আদেশ মানিতে বাধ্য। তিনি বলিলেন, "If I taught them to disobey I should be afraid that they might do the same when I am in power." অর্থাৎ ভারত যদি স্বাধীন হইয়া ক্ষমতা লাভ করে তখনো তো এই প্রকারের আদেশ পালন না-করিবার ঘটনাও ঘটিতে পারে।

এইখানে গান্ধীজির সহিত অপরের পার্থক্য; সৈন্য বিভাগে থাকিয়া sabotage করা, বিদ্রোহের জন্য উৎসাহিত করা ইত্যাদি অধর্ম; এই অধর্মের উপর সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। গান্ধীজির মতে সরকারের সহিত মত না মিলিলে কাজ ছাড়িয়া দিতে পার, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা দেশ ও সমাজ সেবা করা যায় না। কিন্তু এ মত সকলে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের শিক্ষায় end justifies the means। গান্ধীবাদ হইতে অন্যান্য মতবাদের এইখানে বড় রকম ভেদ। রুশিয়ার বল্‌শিভিক বিদ্রোহ সফল হইল সেই দিন, যে দিন সৈনিকদল নিকোলাসকারের পক্ষ ত্যাগ করিয়া জনতার পক্ষ অবলম্বন করে।

আইন-অমান্য আন্দোলন বিপর্যস্ত করিবার জন্য সরকার নানা উপায় অবলম্বন করিলেন। বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলায় কর-বন্ধ আন্দোলনের সময় জনতার উপর অকথ্য অত্যাচার চলে। সোলাপুরে মিল ধর্মঘট কেন্দ্র করিয়া অশান্তি দেখা দিলে 'মার্শাল ল' বা 'ফৌজী আইন' প্রবর্তিত হয়। এইভাবে ভারতের সর্বত্র জনতার স্বৈরাচার ও পুলিশের অত্যাচার সমান ভাবে চলিল। ১৯৩০-৩১ সালে ভারতে প্রায় নব্বই হাজার নরনারী কারাবরণ করে।

গান্ধীজি যখন নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহ করিতেছেন ভারতের পশ্চিম সমুদ্র তীরে, ঠিক সেই সময় বাঙালি একদল যুবক ভারতের পূর্ব সাগর তীরে চট্টগ্রামে অঘটন ঘটাইল— তথাকার অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়া তাহারা 'স্বরাজ' স্থাপন করিল। ভারতের দুই প্রান্তে ভারতের মুক্তির জন্য সম্পূর্ণ দুই নীতি অবলম্বিত হইতেছে— এক স্থানে গীতার দোহাই দিয়া অহিংসক কর্মযোগ— অন্য স্থানে গীতার নামে হত্যা বিভীষিকা! আমরা চট্টগ্রাম সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিব।

ভারতের কন্‌গ্রেস কর্মীরা সকলেই কারারুদ্ধ— বলিতে গেলে যথার্থ জাতীয়তাবাদী কর্মী একজনও বাহিরে নাই, এই অবস্থায় মডারেটগণ বিলাতের গোলবৈঠকে যোগদান করাই স্থির করিলেন।

আলোচ্য পর্বে (১৯৩১) বিট্রেনের প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনালড্ শ্রমিক দলের নেতা। গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের প্রধান রাজনীতিক দল কন্‌গ্রেসের কোনো প্রতিনিধি নাই— এ অবস্থায় যে সুষ্ঠু মীমাংসা হইতে পারে না, তাহা কূটনীতিজ্ঞ ইংরেজরা বুঝিল; তাই প্রধানমন্ত্রী বৈঠকের শেষে বলিলেন যে, তিনি আশা করেন আগামী বৈঠকে কন্‌গ্রেসী সদস্যদের পক্ষে যোগদানের পথ সুগম হইবে।

আইন-অমান্য আন্দোলন এখনো চলিতেছে। ১৯৩১ সালের গোড়ায় বড় লাট লর্ড আরউইন কন্‌গ্রেস পক্ষীয় ও গান্ধীজির সহিত আপোষ-মীমাংসার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; উভয় পক্ষই বুঝিতেছেন— এ অবস্থায় কোনো গঠন-মূলক সংবিধান রচিত হইতে পারে না; বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যে-সব ভারতীয়রা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যস্থতায় আরউইন-গান্ধী সাক্ষাৎকার হইল (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১)। দীর্ঘ পক্ষকালব্যাপী আলোচনার পর গান্ধীজির সহিত আরউইনের একটি রফা হইল। এই চুক্তিমতে সত্যাগ্রহীরা মুক্তিলাভ করিল, কিন্তু যাহারা হত্যাদি কর্মে লিপ্ত ছিল তাহারা এই শর্তের মধ্যে পড়িল না। স্থির হইল সমুদ্রতীরবাসীরা নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য লবণ প্রস্তুত করিতে পারিবে; কর-বন্ধ আন্দোলন স্থগিত হইবে; ভারতের ভাবী সংবিধান কীভাবে রচিত হইবে তাহাও আভাসে আলোচিত হয়।

১৯৩১ সালের মার্চ মাসে করাচীতে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন— সভাপতি

বল্লভভাই প্যাটেল। এই একই সময়ে এখানে যুব-সম্মেলন হয়—তাহার সভাপতি সুভাষচন্দ্র— তিনি নয় মাস জেল খাটিবার পর সন্ত মুক্ত হইয়াছেন। যুব-সমাজের চক্ষের মণি এখন জবহরলাল ও সুভাষচন্দ্র।

এই কন্‌গ্রেসে গান্ধীজির উপর দেশ পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পিত হইল; এখন হইতে দেশের রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার ব্যবস্থা চালিত হইবে। এই অধিবেশনে 'স্বরাজ' শব্দ বলিতে কী বুঝাইবে তাহার একটি অতিবিস্তৃত আলোচনা হইয়াছিল। আমরা স্বাধীন ভারতের সংবিধানে মানুষের যে বুনিয়াদী অধিকার বা ফানডামেন্‌টাল রাইটস্‌-এর কথা সর্বদাই শুনিয়া থাকি, সেই বুনিয়াদী অধিকার কী তাহা ব্যক্ত করিয়া কন্‌গ্রেস বলিলেন ইহারই নাম 'স্বরাজ'। কন্‌গ্রেসের এই মূলগত অধিকারতত্ত্বের উপর বর্তমান সংবিধান-অনুমোদিত Fundamental rights-এর ধারাগুলি রচিত। ভারতীয়রা তাহাদের জন্মগত মানব-অধিকার পাইবার ভরসা পাইল।

৩

কন্‌গ্রেস কর্মীরা এখন শান্ত— কয়েক মাস পরেই বিলাতে দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠক বসিবে। ইতিমধ্যে এপ্রিল (১৯৩১) মাসে লর্ড আরউইনের পরিবর্তে লর্ড উইলিংডন বড়লাট হইয়া আসিলেন; তিনি পাকা বুরোক্র্যাট্‌। ইতিপূর্বে মদ্রাজের গবর্নর ছিলেন— ভারতীয়দের তিনি ভালোভাবেই চিনিতেন। তিনি আসাতে ইংরেজ সিবিল সার্বিসের কর্মচারীরা আশ্বস্ত হইল। কারণ তাহারা ভারতীয়দের হস্তে তিলমাত্র অধিকার দিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা প্রকাশ্যে ও ভিতরে ভিতরে আরউইন-চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ধীরে মন্থরে উৎপীড়ন শুরু করিয়াছিল— এ গুলি বেশি হইতেছিল বরদৌলী তালুকে। উইলিংডনকে এই-সব তথ্য জ্ঞাপন করিলে তিনি তদন্ত করিতে সম্মত হন; তদনন্তর গান্ধীজি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করা স্থির করিলেন। ২৯ অগস্ট ১৯৩১, গান্ধীজি বিলাত রওনা হইয়া গেলেন; কন্‌গ্রেস তরফের তিনিই একমাত্র প্রতিনিধি।

কিন্তু নূতন সংবিধান রচনার প্রস্তাবে ভারতের এত সাম্প্রদায়িক দল বা শ্রেণীর অভ্যুত্থান হইল এবং সকলেই এমনভাবে নিজ নিজ সম্প্রদায় ও শ্রেণীর

বা ভৌগোলিক অঞ্চলের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে, নিখিল ভারত বা অখণ্ড ভারত সত্তার যে অস্তিত্ব আছে তাহা যেন তাঁহারা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। সকলেই নিজের ক্ষুদ্রকে লইয়া উন্মত্ত— দেশের যে কী হইবে সে ভাবনা যেন তাহাদের নহে।

গোল বৈঠকে ১০৭ জন ভারতীয় সদস্য উপস্থিত; আর গান্ধী একা চলিলেন—সঙ্গে কোনো পরামর্শদাতা লইলেন না; তিনি ভাবিতেছিলেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক বাণীর দ্বারা তিনি সকলকে জয় করিবেন। একটি ব্যক্তির উপর সমস্ত দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া কন্‌গ্রেস রাজনীতিক বুদ্ধির পরিচয় দেন নাই। বিলাতে গিয়া গান্ধীজি দেখিলেন, ভারত হইতে আগত তথাকথিত প্রতি-নিধিরা সেখানেও ভারতের ভেদবুদ্ধি লইয়া উপস্থিত। মুসলমান ও শিখরা সর্ববিষয়ে পৃথক অস্তিত্বের দাবিদার; গান্ধীজি মুসলিম নেতাদের বলিলেন যে, তিনি সাদা চেকে সহি করিয়া দিতেছেন দেশে গিয়া তাহারা যাহা চাহিবেন পাইবেন; এখন এই বৈঠকে সকলে একমত হইয়া দাবি পেশ করা যাক। কিন্তু তাহা হইল না। সংখ্যালঘিষ্ঠেরা সকলে মিলিয়া প্যাক্ট করিল— কন্‌গ্রেস থাকিল তাহাদের বাহিরে। প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড ভারতীয়দের মূল দাবি স্বায়ত্ত শাসনাদি প্রশ্ন হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের দাবির প্রতি অধিক মনোযোগী হইয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষকে গাঁজাইয়া তুলিলেন।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ক্যাবিনেট সঙ্কট দেখা দিল; স্যর সামুয়েল হোর নূতন ভারত-সচিব হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, সাধারণ বৈঠক আর দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই--যাহা হইবার তো হইয়া গিয়াছে। গোলটেবিল বৈঠকের উপর যবনিকা পড়িয়া গেল (১ ডিসেম্বর ১৯৩১)।

গোলটেবিল বৈঠকের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্বত্র বড়লাট উইলিংডনের জন বুল্ মূর্তি প্রকটিত হইল; কারণ এখন বিলাতে শ্রমিক প্রাধান্য নাই, রামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী আছেন বটে, তবে তিনি রক্ষণশীলদের কুক্ষিগত। সাম্রাজ্যবাদী স্যর সামুয়েল হোর এখন ভারত-সচিব। ভারতে পুনরায় অশান্তির আভাস দেখা দিল। নানা কারণে বিপর্যস্ত ও অভাবগ্রস্ত উত্তর (যুক্ত) প্রদেশের কৃষকদের খাজনাদানের অসামর্থ্য সরকারের গোচরীভূত করা হয়; সরকারবাহাদুর পুনরায় করদান আন্দোলন আশঙ্কা করিয়া দমননীতি গ্রহণ করিলেন। গান্ধীজি বিলাত হইতে ফিরিয়াছেন

—জবহরলাল বোম্বাই-এ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন—তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইল। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 'খুদাই খিতমদগার' সংঘ বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল। আবদুল গফর খান্ ও তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার খান্ সাহেব অল্পকালের মধ্যে কারারুদ্ধ হইলেন। গান্ধীজি ২৮ ডিসেম্বর বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াই জানিতে পারিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে আরউইন-চুক্তি ভঙ্গ করিয়া সরকার নানা স্থানে উপদ্রব শুরু করিয়াছেন। অপরদিকে সরকারপক্ষ হইতেও অভিযোগ যে, কন্‌গ্রেস কর্মীরাই চুক্তি ভঙ্গ করিয়া অশান্তিকর কার্যে লোকদের উত্তেজিত করিতেছে। উভয় পক্ষের এই অভিযোগাদি সম্পর্কে আলোচনার জন্য গান্ধীজি বড়লাট লর্ড উইলিংডনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। লাটসাহেব সরাসরি জানাইয়া দিলেন যে সাক্ষাৎকারের কোনো প্রয়োজন নাই। কন্‌গ্রেস কমিটিও স্থির করিলেন যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পুনঃ প্রচলিত হইবে। গবর্মেণ্টও ৪ঠা জানুয়ারি (১৯৩২) গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করিয়া পুণা য়েরবাদা জেলে আটক করিল। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের এক সপ্তাহের মধ্যে এইটি ঘটিল। গান্ধীজিকে যেদিন বন্দী করিয়াছেন সেইদিনই বড়লাট ৪টি অর্ডিন্যান্স জারি করিলেন, সকল গুলিরই উদ্দেশ্য ভারতীয়দের রাজনীতি আন্দোলনের সকল প্রকার স্বাধীনতাহরণ। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, এই সময় কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী উৎসব চলিতেছিল; গান্ধীজির গ্রেপ্তারের সংবাদে উৎসব বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

গোলটেবিলের বৈঠকে দেখা গিয়াছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংবিধান রচনার কোনো আশা নাই। মুসলমানরা শরীকি শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাস করে না— ইসলাম পৃথিবীর নানাস্থানে বহু শতাব্দী হইতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে —রাজনীতি কি তাহা তাহারা ভালো করিয়াই জানে। হিন্দুরা রাজত্ব করিয়াছিল স্মরণাতীত কাল পূর্বে; তাহাদের সমাজ বিচ্ছিন্ন; তাহারা মুসলমানকেও যেমন অস্পৃশ্য জ্ঞান করে, আপন-আপন শ্রেণী বা জাতের বাহিরের হিন্দুকেও তদপেক্ষা অধিক সম্মান লৌকিক জীবনে দান করিতে অপারক। আপনাদের সংস্কৃতি ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য মুসলমানরা বহুকাল হইতেই পৃথক

নির্বাচন দাবি করিয়া আসিতেছে; এবার 'অস্পৃশ্য' হিন্দুদের জন্য রক্ষাকবচের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কথা উঠিল।

সর্বদলসম্মত কোনো রাষ্ট্রকাঠামো বা সংবিধান রচনা অসম্ভব হইলে প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের উপর উহার রচনার ভার অর্পিত হইল; কূটনীতিক ইংরেজ এইটাই চাহিতেছিল— হিন্দু-মুসলমান উভয়ের নিকট হইতে এই কথাই কবুল করাইতে চাহে যে, ভারতীয়দের পক্ষে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতা ছাড়া সংবিধান রচনা অসম্ভব। তা ছাড়া ১৯৩২ সালের গোড়ায় কন্‌গ্রেসের সকল জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, কনিষ্ঠ কর্মীই কারাগারে বাস করিতেছেন। সংবিধান রচনার এই অনুকূল অবস্থায় ম্যাকডোনাল্ড যে খসড়া প্রস্তুত করিলেন— তাহারই উপর ১৯৩৫ সালের ভারত সংবিধান রচিত হইয়াছিল। প্রাধান মন্ত্রী ভাবী প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচন নীতির মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভেদ তো রাখিলেনই, ইহার উপর হিন্দুদের মধ্যে বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত কয়েকটি জাতি-উপজাতির একটা তালিকা বা সিডিউল বা তপশীল তৈয়ারি করিয়া তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব দিবার সুপারিশ করিলেন। এই সংবাদ ১৭ই অগস্ট (১৯৩২) প্রকাশিত হইলে গান্ধী পুণার য়েরবাদা জেল হইতে পর দিনই জানাইয়া দিলেন যে, হিন্দুর পক্ষে এই সর্বনাশী প্রস্তাব দেশবাসীকে প্রতিরোধ করিতেই হইবে। তজ্জন্য তিনি অপেক্ষা করিবেন এবং তারপর ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে আ-মরণ অনশনব্রত গ্রহণ করিবেন। ভারতময় চাঞ্চল্য দেখা দিল; কিন্তু কন্‌গ্রেসীরা কেহই কারাগারের বাহিরে নাই— বিবাদ বাধিয়াছে বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত হিন্দুদের নেতাদের মধ্যে; বর্ণহিন্দুর নেতা মদনমোহন মালবীয় এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ডাঃ আমবেদকর। গান্ধীজির জীবন বিপন্ন দেখিয়া হিন্দু-সমাজের উভয় শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে একটা মীমাংসা হইল বটে, তবে সেদিন হিন্দুসমাজের মধ্যে ভেদবুদ্ধির বিষবীজও রোপিত হইল। পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব নাকোচ হইল বটে, তবে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আসন সংরক্ষিত করিয়া যুক্ত নির্বাচনরীতির ব্যবস্থা করা হইল। গান্ধীজি এই সিদ্ধান্তে সম্মত হইয়া অনশন ত্যাগ করিলেন; রবীন্দ্রনাথ অনশনের সংবাদ পাইয়া শান্তিনিকেতন হইতে পুণায় আসিয়াছিলেন।

অনুন্নত সমাজ গান্ধীজির নিকট হইতে 'হরিজন' নামে নূতন অভিধা লাভ করিল। দেশের চারিদিকে হরিজন উন্নয়ন আন্দোলন আরম্ভ হইল; হরিজন-

সেবকসংঘ গঠন করিয়া গান্ধীজি 'হরিজন' নামে ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদন করিলেন। হিন্দু ধনী মাড়োয়ারীরা অকাতরে অর্থদান করিলেন এই মহা হিন্দু-আন্দোলনে। এই হরিজন-আন্দোলন ভারতে হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য আনিতে পারিল না; বরং খিলাফৎ-আন্দোলনের সমর্থনে মুসলমানরা যেমন ধীরে ধীরে হিন্দু-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল,— এই হরিজন-আন্দোলনেও সেইভাবে কালে বর্ণহিন্দু-বিদ্বেষ ও হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির উপর অশ্রদ্ধা ও আক্রোশ দেখা দিয়াছিল। কালে হরিজনরা সাম্প্রদায়িকতার বিষরসপানে কী উগ্র হইয়াছে তাহার প্রমাণ তামিলনাডের দ্রবিড় কাজকামদের আচরণ ও উক্তি।

কন্‌গ্রেসের কাজ প্রায় বন্ধ। গান্ধীজি ২৩ আগস্ট (১৯৩৩) জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দেখিলেন যে সভাসমিতি প্রায় সবগুলিই বে-আইনী বলিয়া সরকার কর্তৃক ঘোষিত। বে-আইনী কন্‌গ্রেস কমিটি কয়েক স্থানে জোর করিয়া সভা আহ্বান করে। সংঘশক্তির অভাবে স্থির হইল যে, এখন হইতে ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য ও প্রতিরোধ নীতি অনুসৃত হইবে। গান্ধীজি সবরমতী আশ্রম ভাঙিয়া দিয়া হরিজন লোকসংঘের উপর উহার ভার সমর্পণ করিলেন। এ দিকে নিখিল ভারত কন্‌গ্রেস কমিটি— যাহা বে-আইনী ঘোষিত হয় নাই— তাহারা দেখিলেন দেশের আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে— এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের কর্মপদ্ধতির মধ্যেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। মুসলমান-সমাজ তো সাধারণভাবেই আপনাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া পৃথকভাবে আন্দোলনকে আপনাদের অনুকূলে সফল করিবার জন্য চেষ্টান্বিত। কন্‌গ্রেসের মধ্য হইতে পৃথকভাবে একদল আপনাদিগকে সমাজতন্ত্রবাদী বা সোসিয়ালিস্ট বলিয়া সংঘ সৃষ্টি করিলেন। হরিজন সেবক-সংঘের চেষ্টায় 'তপশীলি' সম্প্রদায় ক্রমশই দানা বাঁধিতেছে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের সর্বত্র কম্যুনিষ্টরা শ্রমিকদের মধ্যে সংঘকার্য সাফল্যের সহিত করিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে। শিখরাও আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা সম্বন্ধে ক্রমেই অত্যন্ত আত্মচেতন হইয়া উঠিতেছে।

এই অবস্থায় নিখিল ভারত কন্‌গ্রেস কমিটির পক্ষে আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিল না। দেশে এখন বহু মত বহু পথ।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, গুজরাট ও বঙ্গদেশ ছাড়া সর্বত্রই কন্‌গ্রেসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা সরকার প্রত্যাহার করিলেন। বোম্বাই-এ ১৯৩৪ সালের

অক্টোবরে কন্‌গ্রেস অধিবেশন হইল; ১৯৩১-৩২-৩৩ সালে কন্‌গ্রেসের স্বাভাবিক সভা হয় নাই। কন্‌গ্রেস ম্যাকডোনাল্‌ডি শাসনব্যবস্থার খসড়া মানিয়া লইলেও, দেশের এক অংশ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধী; ইহার কারণ, বর্ণহিন্দু প্রার্থীদের এখন হইতে তপশীলিদের ভোটের উপর নির্বাচনে নির্ভর করিতেই হইবে—তপশীলি প্রার্থীদেরও বর্ণহিন্দুর ভোটের অপেক্ষা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদটা হইতেছিল সাধারণত বর্ণহিন্দুর পক্ষ হইতেই বেশি করিয়া। বর্ণহিন্দুর এই মনোভাব দেখিয়া তপশীলি সম্প্রদায়ের নেতারা স্বভাবতই তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া উঠিতে লাগিলেন; বহুচেষ্টা করিয়া তপশীলিরা ভোটদান ও পৃথক নির্বাচনের যে অধিকার লাভ করিয়াছে— তাহা হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিবার এই আন্দোলন তাহাদের চক্ষে অত্যন্ত কটু বোধ হইল। কন্‌গ্রেসের আদি যুগে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতরা মনে করিতেন আপামর সাধারণের তাহারাই যোগ্যতম প্রতিনিধি। আজও সেই মনোভাব বর্ণহিন্দুদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন।

এইবারকার কন্‌গ্রেসের সভাপতি হন রাজেন্দ্রপ্রসাদ (১৯৩৪)। গান্ধীজি এখন হইতে কন্‌গ্রেসের সহিত সকল প্রত্যক্ষযোগ ত্যাগ করিয়া হরিজন-সেবায় ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নাদির জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। দেশের নানা দলের এবং নানা মতের সমর্থন এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৩৫ সালের ২রা অগস্ট ভারতের জন্য নূতন সংবিধান পাশ হইল। নূতন বিধান অনুসারে প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রের উপর প্রভূত ক্ষমতা অর্পিত হয়। পূর্বের দ্বৈরাজ্য রদ হইল, দেশীয় মন্ত্রীরা সমস্ত বিষয়ের ভার পাইলেন। কিন্তু গভর্নরের উপর শাসন-সঙ্কটকালে কায চালাইবার জন্য অসীম ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। স্থির হইল ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে নূতন শাসন ব্যবস্থা চালু হইবে।

কন্‌গ্রেসপক্ষীয়রা এই শাসন ব্যবস্থার ভার গ্রহণ বা সহযোগিতা করিবেন কি না— সে বিষয়ে তাঁহাদের দ্বিধা যাইতেছে না। ১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ারিতে লখনৌ-এ ও ঐ বৎসরের ডিসেম্বরে মহারাষ্ট্রদেশের ফৈজপুর গ্রামে যে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হয় উভয় স্থলেই জবহরলাল নেহরু সভাপতি। ইতিপূর্বে কখনো এক সভাপতি পর পর দুই বৎসর এই পদ প্রাপ্ত হন নাই।

জবহরলাল কন্‌গ্রেসের সভাপতি হইবার পর হইতেই কন্‌গ্রেসের মধ্যে ও দেশের সর্বত্র রাজনীতি নূতন পথে চালিত হইল। ভারতের জাতীয় আন্দোলন

বা মুক্তিসংগ্রামের সহিত পৃথিবীর সকল দেশের স্বাধীনতাকামীরা আজ জড়িত; পৃথিবীতে এক দিকে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ, অন্য দিকে গণতন্ত্রবাদ ও সমাজ-তন্ত্রবাদ— এই দুই বিপরীত শক্তিই প্রবল ; ভারতবর্ষকে এই বৃহত্তর জগতের কথা ভুলিয়া থাকা সম্ভব হইবে না। য়ুরোপে ফ্যাসিস্ত ও নাৎসী এবং সোবিয়েত রাশিয়ার কম্যুনিষ্টদের মধ্যে নূতন প্রাণশক্তি দেখা দিয়েছে। ইতালির আবিসিনিয়া গ্রাস, স্পেনের মধ্যে গণতান্ত্রিক মতবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ প্রভৃতি নূতন কালের নূতন সমস্যার দ্যোতক। ভারতীয়রা জাগতিক এই বিচিত্র আন্দোলন ও সমস্যার অঙ্গ ও অংশীদার— এক দেশের সমস্যা আজ সকল দেশের ভাবনার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত হইয়া আসিয়াছে ; সর্বত্র মানুষ সাম্য ও সুবিচার চাহিতেছে। জবহরলালের মতে, দরিদ্র ভারতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-শাসন প্রথা প্রবর্তিত হইবে, ইহাই কন্‌গ্রেসের আদর্শ।

আসন্ন ভারত শাসনবিধি সংস্কারের মুখেও ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের মনে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না, তাহাদের কড়া আইন কঠোরভাবেই প্রযুক্ত হইয়া চলিতে থাকিল। সুভাষ বসু দীর্ঘকাল ভারতের বাহিরে নির্বাসিত থাকিয়া ১৯৩৬-এর এপ্রিল মাসে দেশে ফিরিবামাত্র বোম্বাই-এ গ্রেপ্তার হইলেন। এই শ্রেণীর সরকারী স্বৈরাচারের বহু ঘটনা সমসাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়। লখ্‌নৌ কন্‌গ্রেস অধিবেশনের এক সপ্তাহ পূর্বে সুভাষকে বন্দী করা হইয়াছিল। গভর্মেণ্টের ভয় যে, জবহরলাল ও সুভাষ একযোগে কন্‌গ্রেস কর্মে ব্রতী হইবার সুযোগ পাইলে সরকারের শাসনকার্য পদে পদে ব্যাহত হইবে।

১৯৩৬-এর এপ্রিলে বোম্বাই-এ মুসলিম লীগের চতুর্বিংশ সম্মেলন আহূত হয় ; এই সম্মেলনে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার মধ্যে অনেকগুলি কন্‌গ্রেসের অনুরূপ দেশহিতকর প্রস্তাব ; রাজনীতি সম্বন্ধে বিচ্ছেদমূলক কোনো প্রস্তাব এখানে গৃহীত হয় নাই। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে পট পরিবর্তন হইয়া গেল। কথা উঠিল, হিন্দু মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি।

কন্‌গ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

১৯৩৬-এর মাঝামাঝি সময়ে কন্‌গ্রেসপক্ষীয়রা আশু নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন; মদনমোহন মালবীয়ের ন্যাশন্যালিষ্ট পার্টি বা জাতীয়দলও কন্‌গ্রেসের সহিত মিলিতভাবে তাঁহাদের নির্বাচনকালীন প্রচারপত্র প্রকাশ করিলেন। এই জাতীয়দল গঠিত হইয়াছিল পুণা-প্যাক্টের পর; মালবীয় প্রমুখ নেতাদের মতে বর্ণহিন্দুর স্বার্থ এই চুক্তির দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল, এমন-কি তপাশলী নামের দ্বারা ভেদবুদ্ধি ক্রমেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াও তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল। এই জাতীয়দল কালে হিন্দুমহাসভা, কোথাও রামরাজ্য-পরিষদ, কোনো স্থানে বর্ণাশ্রম স্বরাজ্যসংঘ, কোথাও জনসংঘ নামে রূপায়িত হইয়াছে। যাহা হউক ১৯৩৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে নূতন সংবিধানমতে যে নির্বাচন হইল তাহাতে অ-মুসলমান ভারতে কন্‌গ্রেসই ছিল প্রবলতম দল। নূতন সংবিধানে ভারত সাম্রাজ্যে ১১টি প্রদেশ— বর্মা পূর্বেই পৃথক রাজ্য হইয়াছিল। এবার সিন্ধু ও ওড়িশা নূতন প্রদেশ সৃষ্ট হইল।

নির্বাচনে ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টিতে (মদ্রাজ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, ওড়িশা) কন্‌গ্রেসী সদস্যরাই সংখ্যাধিক্যতা লাভ করিল। এ প্রদেশগুলি হিন্দুপ্রধান। কিন্তু মুসলমান নির্বাচন কেন্দ্র হইতে লীগের প্রভুত্ব সর্বত্রই দেখা গেল— কেবল বাংলা দেশে ও পঞ্জাবে মুসলমান সংখ্যাধিক্যতা সত্ত্বেও লীগ প্রবল পক্ষ হইতে পারিল না; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানরা কন্‌গ্রেস পক্ষেই ভোট দিয়াছিল। অতঃপর প্রাদেশিক শাসন-সংস্থায় কন্‌গ্রেসীরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন কি না— তাহাই হইল সমস্যা। কন্‌গ্রেসপক্ষ সরকারপক্ষ হইতে জানিতে চাহিলেন যে, প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা গভর্নরগণ তাঁহাদের অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে মন্ত্রীদের কার্য ব্যাহত করিবেন না, এই কথা না জানাইলে তাঁহারা মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করিবেন না। লাট সাহেবেরা সে প্রতিশ্রুতি দিলেন না এবং ১লা এপ্রিল হইতে ৬টি প্রদেশে ঠিকা মন্ত্রীদের নিয়োগ করিলেন। অপর ৫টি প্রদেশে মুসলমানপ্রধান মন্ত্রী-

পরিষদ গঠিত হইল। তবে মুসলমান মন্ত্রীদের মধ্যে অধিকাংশেরই হিন্দুদের প্রতি আক্রোশ থাকা সত্ত্বেও ভারত-বিরুদ্ধ আত্মঘাতী মনোভাব তখনো স্পষ্ট হয় নাই; তখন মুসলমানদের সরকারী চাকুরি প্রাপ্তির জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার এই সঙ্কট বুদ্ধিমান বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগোর মধ্যস্থতায় দূর হইল; তিনি জানাইলেন, প্রদেশপালরা মন্ত্রীদের পরামর্শ লইতে আইনত বাধ্য; তাঁহাদের উপর ন্যস্ত বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কেও এই কথাই প্রযোজ্য; তবে তৎসত্ত্বেও তাঁহারা যদি পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া কিছু করেন তবে সে দায়িত্ব অবশ্যই তাঁহাদের। এই রফা হইবার পর ৬টি প্রদেশে কন্‌গ্রেসী পক্ষ হইতে মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করা হইল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে মন্ত্রী-পরিষদ এই কয়মাস কাজ করিয়াছিলেন তাহারা কন্‌গ্রেসী সদস্যদের নিকট অনাস্থা ভোট পাইয়া কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য হইলেন; আবদুল গফর খানের ভ্রাতা ডাঃ খান সাহেব (সেপ্টেম্বর ১৯৩৭) কন্‌গ্রেসী মন্ত্রী-পরিষদ গঠন করিলেন।

কন্‌গ্রেস সৃষ্টির প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর ভারতীয়রা রাজ্যশাসন ব্যাপারে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব লাভ করিল।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। মুসলমানরা যখন আপনাদের মধ্যে সংহতি রক্ষার চেষ্টা করিতেছে, সেই সময়ে হিন্দুরা বাঁটোয়ারা প্রশ্ন লইয়া এমনই মত্ত হইয়া উঠিলেন যে, অনেক বড় বড় সমস্যা তাঁহাদের কাছে চাপা পড়িয়া গেল। জবহরলাল নেহরু তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিতেছেন, "তথাকথিত কন্‌গ্রেস জাতীয়দলের মনোভাব আমার নিকট অতিমাত্রায় শোচনীয় মনে হইল, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতি তাঁহাদের তীব্র বিরোধিতার অর্থ বুঝা যায়, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির আশায় অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত মিলিত হইলেন। এমন-কি ভারতে রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়া সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াপন্থী সনাতনীদের সহিত, এবং সেই সঙ্গে বহুনিন্দিত চরিত্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াপন্থীর সহিত একত্র মিলিত হইলেন। বাংলাদেশে অবশ্য কতকগুলি বিশেষ কারণে একটি শক্তিশালী কন্‌গ্রেসী দলের সমর্থন তাঁহারা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ছাড়া তাঁহাদের মধ্যে

অনেকে সকল দিক দিয়াই কন্‌গ্রেসবিরোধী ছিলেন, এমন-কি অনেকে খ্যাতনামা কন্‌গ্রেস-বিরোধী।"[১]

দেশের এই উন্মত্ত অবস্থার সময়ে জাতীয়দল রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করিয়া বাঁটোয়ারা সম্পর্কে প্রতিবাদ-জ্ঞাপন করিতে বলিলে তিনি তাঁহার ভাষণে বলিলেন, "এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রস্তাব আমাদের রাজনৈতিক জীবনে বিভেদ ও ব্যবচ্ছেদের যে দুর্বহ অভিশাপ বহন করিয়া আনিল, দেশ তাহা চাহে নাই।…মুসলমান সম্প্রদায় তাহাদের সংখ্যাগুরুত্বের সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হউক ইহা আমরা কথনোই চাহি না; তবে ভবিষ্যতে পারস্পরিক সহযোগিতার সমস্ত সম্ভাবনা তিরোহিত হউক ইহাও কাহারো পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে। আলোচ্য ব্যবস্থায় বিশ্বাসের পরিবর্তে সন্দেহই ডাকিয়া আনিবে, ধর্মান্ধ নেতারা এই সাম্প্রদায়িক উন্মাদনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিবে। জাতির রক্ত এভাবে কূট রাজনীতির বিষে জর্জরিত করিলে চরম অশুভক্ষণ উপস্থিত হইবে; এ কথা আজ শাসকবৃন্দকে স্মরণ করাইয়া দিই।" তিনি আরও বলিলেন, "সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা, এ ব্যাপারে যে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর আজ আমাদের প্রচণ্ড ক্রোধ উদ্রিক্ত হইয়াছে, তাহাদিগকেও এই ধ্বংসাত্মক নীতির কুফল সমপরিমাণেই ভোগ করিতে হইবে। তাহারা হয়তো এ প্রস্তাবের মাদকতায় প্রথমটা মুগ্ধ হইবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায়ই হইবে, আমাদেরও শান্তিভঙ্গের কারণ হইবে।"[২]

এইটি রবীন্দ্রনাথ বলেন ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে। তাহার দশ বৎসর পরে ১৯৪৬-এর অগস্ট মাসে বাংলাদেশে ও বিহারে হিন্দু-মুসলমানের রক্তস্নান হইয়াছিল।

বাংলাদেশে শাসন ব্যবস্থার যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল; ১৯৩৫-এর সংবিধান অনুসারে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু তাহারা ব্যবস্থাপক সভায় অধিক প্রতিনিধিত্ব লাভ করিল; আবার তাহারা সর্ববিষয়ে পশ্চাদপদ বলিয়া বিশেষভাবে তাহাদের সংখ্যাভার বাড়াইয়া দেওয়া হয়, ইহাকে বলে weightage। স্থানীয় বোর্ড, কমিটি, চাকুরি লাইসেন্স প্রভৃতি সকল বিষয়ে মুসলমানদের সংখ্যানুপাতে তাহাদের স্থান নির্দিষ্ট হইল; উপযুক্ত মুসলমান-

১ বাংলা অনুবাদ পৃ. ৬৬২-৭০।

২ রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ পৃ. ৬৫-৬৬।

প্রার্থীর অভাবেও হিন্দুদের নিয়োগ করা হইত না ; সরকারী কলেজে নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলমান ছাত্র পাওয়া না গেলেও হিন্দুরা তাহা পূরণ করিতে পারিত না। এইভাবে সেখানকার রাজনীতি নানাভাবে বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে। মুসলিম লীগ সদস্য সংগ্রহের জন্য গ্রামের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এজেণ্ট পাঠাইতে থাকে এবং প্রত্যেক শহরে স্থানীয় অঞ্জুমান তীব্রভাবে মুসলমানের স্বার্থরক্ষার জন্য সচেতন। তবে এখানে একটি কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইতিপূর্বে অর্থাৎ নূতন শাসন প্রবর্ত্তনের পূর্বে— যখন বাংলাদেশে লীগের প্রাধান্য ছিল, তখন প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের যে সংস্কার হয়, তাহার দ্বারা সাধারণ কৃষক— রায়তদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। বাংলাদেশের জমিদার মহাজনরা ছিলেন হিন্দু, প্রজারা ছিল মুসলমান ও হরিজন। সুতরাং অনেকগুলি আইনই সাধারণ লোকের মঙ্গলার্থে কার্যকারী হয়। এই ভূমিসংস্কার আইন পাশের সময় হিন্দুরা ছিলেন ইহার প্রধান বাধা। শিক্ষা-সেস বসাইয়া জনশিক্ষা প্রসারের জন্য আইন-প্রণয়নের প্রস্তাবে হিন্দুদেরই আপত্তি ছিল প্রবল, কারণ জমিদারদের উপর শিক্ষা-সেসের (cess) ভাগটা পড়ে বেশি করিয়া ; এই শিক্ষার নিয়ন্তা মুসলিম লীগের সরকারী লোকে। তা ছাড়া নিরক্ষর হরিজনরা যে লেখাপড়া শেখে— তাহা উচ্চবর্ণের ঈপ্সিত ছিল না। কৃষকদের ঋণমুক্ত করিবার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তির ব্যবস্থা করিয়া যে আইন হয়, তাহাতে মহাজন হিন্দুদেরই আপত্তি ছিল। মোট কথা দরিদ্রের অনুকূলে বহু আইন বিধিবদ্ধ হয় ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বকালে।

প্রাদেশিক নূতন শাসন ব্যবস্থায় অচিরেই সমস্যা বাধিল রাজবন্দী ও রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিতদের মুক্তির প্রশ্ন লইয়া। কন্‌গ্রেস প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীরা নিজেদের দায়িত্বে বন্দীদের মুক্তি দিলেন। সর্বত্র তাহা সহজসাধ্য হয় নাই, যুক্তপ্রদেশের সিবিলিয়ানরা যথেষ্ট বাধাদানের চেষ্টা করেন এবং মন্ত্রীসঙ্কট উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলে লাট সাহেব আপোষ করেন ও বন্দীদের একে একে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন ; এমন-কি কাকোরী ট্রেন লুণ্ঠনকারী অপরাধীরাও মুক্তি পাইল।

কিন্তু সমস্যা হইল বঙ্গদেশে ; সেখানে প্রায় দুই সহস্রের উপর রাজবন্দী ও রাজনৈতিক অপরাধে বন্দীর সংখ্যাও বহু শত। গান্ধীজি বাংলাদেশে আসিয়া

প্রায় তিন সপ্তাহ থাকিয়া বঙ্গীয় সরকারের সহিত অনেক ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করিয়া তাহাদের আংশিক মুক্তি ব্যবস্থা করিলেন। মুক্তিদানে সরকারের বিলম্ব হওয়াতে দেশের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভ হইয়াছিল।

এইবার কলিকাতায় নিখিল ভারত কন্‌গ্রেস কমিটির অধিবেশন (২৯-৩১ অক্টোবর ১৯৩৭)। এই অধিবেশনে ভারতের 'জাতীয় সঙ্গীত' সম্পর্কে যে তীব্র বাদানুবাদ চলিতেছিল, তাহার অবসান হয়। 'বন্দেমাতরম্' এতকাল সর্বত্র গীত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের পক্ষেও এই সংগীতকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করা সম্ভব নহে। বাংলাদেশের মুসলমান ছাত্ররা বিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠানে 'বন্দেমাতরম্' গান গাওয়া হইলেই আপত্তি করিত। অনেক সময়ে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটিত। এইবার কন্‌গ্রেস কমিটিতে 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের প্রথম কয়েক পংক্তি জাতীয় সংগীতরূপে স্বীকৃত হইল। বলাবাহুল্য হিন্দুভারত ও বিশেষভাবে হিন্দুবঙ্গ যাহারা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া গত ত্রিশ বৎসর ভারতের মুক্তি সংগ্রাম করিয়াছে— তাহারা স্বভাবতই ক্ষুণ্ণ ও কন্‌গ্রেসের উপর বিরূপ হইল। হিন্দুমহাসভা ও তজ্জাতীয় প্রতিষ্ঠান-গুলি তো কন্‌গ্রেসের উপর নানা কারণে খড়্গহস্ত ছিল— জাতীয় সংগীতের অঙ্গহানি করায় তাহাদের ক্ষোভ আরও বাড়িল। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কন্‌গ্রেসের অনুকূলে মত দেন বলিয়া লোকে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া শ্রদ্ধাহীন উক্তি করে— সাম্প্রদায়িকতার বিষে তাহাদের মন এমনই জর্জরিত।

কলিকাতায় যখন নিখিল কন্‌গ্রেস কমিটির সভা চলিতেছে ঠিক সেই সময়ে আহমদাবাদে নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার অধিবেশন বসিয়াছে। গত কয়েক বৎসর হইতে মহাসভার অধিবেশন হইতেছে বটে, তবে তাহা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো তেমন শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই। আহমদাবাদের মহাসভার সভাপতি হইলেন সাভারকর। সাভারকর ২৮ বৎসর দেশে-বিদেশে নির্বাসনে ও কারাগারে বাস করিবার পর নূতন শাসন প্রবর্তিত হইলে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; অতঃপর হিন্দুভারতের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অসামান্য বীরের ত্যাগ, সাহস ও দেশভক্তিতে সকলেই মুগ্ধ।

ইহার প্রায় কাছাকাছি সময়ে কয়েকদিন পূর্বে (অক্টোবর ১৯৩৭) লখ্‌নৌতে মোসলেম লীগের বার্ষিক অধিবেশন বসে। লীগের স্থায়ী সভাপতি

মিঃ জিন্না অধিবেশনের সভাপতি। সাতটি প্রদেশে কন্‌গ্রেসের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত। বহু বৎসর কন্‌গ্রেসের সহিত যুক্ত থাকিয়া এখন তিনি ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক। তাঁহার এই পরিবর্তন কেন হইয়াছিল তাহা আমরা অন্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব। মোটকথা তিনি কন্‌গ্রেসকে একটি হিন্দুপ্রতিষ্ঠান বলিয়াই দেখিতেছেন— এবং পাকিস্তান বা মুসলমানপ্রধান অঞ্চলের জন্য পৃথক শাসন-সংস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য আলোচনা করিতেছেন।

এইটি হইতেছে ভারতের ১৯৩৭ সালের শেষ দিকের অবস্থা।

নূতন বৎসরে কন্‌গ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হইল গুজরাটে বরদৌলী তালুকের হরিপুরা গ্রামে; গত বৎসর হইতে গান্ধীজি স্থির করিয়াছেন গ্রামে কন্‌গ্রেস বসাইবেন; আপাতদৃষ্টিতে ইহা আদর্শবাদী কর্ম; কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গ্রামের মধ্যে নকল শহরের সমস্ত সুখসুবিধা ও আধুনিকতা সৃষ্টির মধ্যে বাস্তবতাবোধের অভাব ছিল বলিয়া একশ্রেণীর মত। তবে গান্ধীজি সাধারণ মানুষের কাছে যাইবার জন্য এইটি করেন; ইহার সহিত গ্রাম-শিল্প প্রদর্শনীও হয়।

হরিপুরা কন্‌গ্রেসে সুভাষচন্দ্র সভাপতি। সমস্যা বাধিল কেন্দ্রীয় ভারত শাসন-সংস্থার গঠন ও ক্ষমতা লইয়া। সে কথা তিনি সভাপতিরূপে খুবই স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। তাঁহার মতে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে গঠিত হইতেছে তাহা ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের পরিপন্থী।

গবর্মেণ্ট এই শাসনব্যবস্থার নাম দেন ফেডারেল; অর্থাৎ ১১টি প্রদেশ ও দেশীয় রাজন্যবর্গ মিলিয়া ভারতশাসন ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে। সংবিধান-মতে নূতন পার্লামেণ্টের দুটি কোঠা— একটি রাষ্ট্রীয় পরিষদ্ (Council of State) ও অপরটি ফেডারেল এসেমব্লি; এ ছাড়া 'নরেন্দ্র মণ্ডল' নামে রাজন্য-বর্গের এক সভা হইতেছে। নূতন সংবিধান মতে প্রথম দুই পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ আসিবেন ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলি হইতে; কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে সদস্যেরা আসিবেন সরকারের মনোনীত প্রতিনিধিরূপে; উভয় পরিষদ মিলিতভাবে ভারতের আভ্যন্তরীণ বিধিবিধান প্রণয়নের মতামত ও ভোটদান করিতে পারিবেন, কিন্তু সেই পরিষদদ্বয়ের দেশীয় রাজ্যের শাসনাদি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকিবে না। ইহা গেল রাজনৈতিক কথা।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয়-সরকার আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ ব্যয় করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত হইল বড়লাটের উপর। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, রেলওয়ে প্রভৃতি বহু বিষয় তাঁহার হাতে। মোটকথা যে দ্বৈরাজ্য ছিল প্রদেশে— তাহা গিয়া বর্তাইল কেন্দ্রে। বিদেশী মূলধনী মালিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল— বিদেশ হইতে কোম্পানি আসিয়া 'ইন্‌ডিয়া লিমিটেড' নাম দিয়া কারখানা ও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। এ-সব ছাড়া ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স বা সাম্রাজ্যান্তর্গত রাজ্যের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা সুযোগের ব্যবস্থা হয়। এই-সব বিষয়ের প্রতিবাদ হইল এবার কন্‌গ্রেসে। ফেডারেশন বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সুভাষ বসুর কন্‌গ্রেস-সভাপতিকালে ভারতের বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম খসড়া পেশ হয়; এবং তাঁহার সময়ে জবহরলালের নেতৃত্বে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয়। সাতাশটি সাব-কমিটির উপর ভারতের নানা বিষয়ের উন্নতির জন্য সুপারিশ করিবার ভার পড়ে। এই প্ল্যানিং-এর প্রথম পরিকল্পনা পেশ করেন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বুনিয়াদ গঠিত হয় এই প্ল্যানিং কমিটির তথ্যাদির উপর।

ভারতের দেশীয় রাজ্য হইতে প্রজার নির্বাচিত প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রেরিত না হওয়ায়— প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে জনতার মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যে না আছে সুশাসন, না আছে প্রজার প্রতিনিধিদের সহিত সলাপরামর্শ করিবার কোনো পরিষদ; অথচ তাহারা দেখিতেছে তাহাদের দেশের সংলগ্ন ব্রিটিশ-ভারতে কন্‌গ্রেস আন্দোলন দ্বারা বিদেশী গবর্মেণ্টের কৃপণ হস্ত হইতে কত সুযোগসুবিধা আদায় করিয়া লইতেছে; কিন্তু তাহাদেরই দেশীয় রাজারা তাঁহাদের প্রজাগণকে সমস্ত-কিছু হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিতেছেন। প্রত্যেক দেশীয়রাজ্যে জনতার মধ্যে নূতন চেতনা দেখা দিয়াছে; কন্‌গ্রেসের সমর্থনে বহুস্থানে আন্দোলনও দেখা দিল। রাজারা তাঁহাদের মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারের অবসান-আশঙ্কায় কন্‌গ্রেস-আন্দোলনকে দেশমধ্যে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য যে-ভাবে দমনকার্য চালনা করেন তাহা ব্রিটিশদের আচরণকেও ধিক্কৃত করে। ওড়িশার নগণ্য রাজা হইতে হায়দরাবাদের নিজাম, স্বাধীন নেপাল হইতে অর্ধস্বাধীন কাশ্মীরের

শাসকগোষ্ঠী প্রজা-আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু মহাকাল অচিরে প্রমাণ করিলে যে, এই-সব মধ্যযুগীয় রাজা ও নবাবরা কালাতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন; দশ বৎসর পরে তাঁহারা সকলেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যান। সেটা-যে কত বড় বিপ্লব, অতি সহজভাবে নিষ্পন্ন হওয়ায় তাহার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না।

কন্‌গ্রেসী শাসনে প্রদেশগুলিতে ফল ভালোই হইতেছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাব, প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা, শক্তি ও উচ্চপদ -লাভ হেতু মাৎসর্য, হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করিবার উৎকট বাসনা, বিহার ওড়িশা আসাম প্রদেশে প্রান্তদেশীয় লোকদের সম্বন্ধে বিদ্বেষমূলক মতবাদ পোষণ, বাঙালি প্রবাসীদের উৎখাত করিবার জন্য প্রবাসন সম্পর্কে নানাপ্রকার কূট নিয়মকানুন পাশ করা প্রভৃতি ঘটনা কন্‌গ্রেসকে লোকচক্ষে হীন করিতে লাগিল। বিহারে বাঙালিদের প্রবাসন সম্বন্ধে প্রাদেশিক কন্‌গ্রেস কমিটি ও কন্‌গ্রেসী সরকারের গ্রাম্য মনোভাব অত্যন্ত নিন্দিত হইয়াছিল। ইহাদের ব্যবহার উভয় প্রদেশের সম্বন্ধকে এমন তিক্ত করিয়া তোলে যে সে তিক্ততার অবসান এখনো হয় নাই। সে-সময়ে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষারূপে চালাইবার জন্য যে-সব পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল তাহা আদৌ রাজনীতিজ্ঞ জনোচিত কার্য হয় নাই— ভাষাপ্রচার নীতির মধ্যে শক্তিলাভের ঔদ্ধত্যই মাত্র প্রকাশ পাইতেছিল। ভাষা-বিষয়ে একীকরণের জন্য অতি উৎসাহের ফলে আজ ভারতে হিন্দীবিরোধী জনমত কী তীব্র হইয়া উঠিয়াছে তাহা সংবাদপত্র খুলিলেই জানা যায়। ইহার পরিণাম কি তাহা কে জানে? লর্ড অ্যাক্টনের উক্তি—All power corrupts and absolute power corrupts absolutely— তাহার আভাস পাওয়া গেল নানাস্থানে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি ফেডারেশন শাসন প্রবর্তন সম্বন্ধে সুভাষ বসু ও তাঁহার তরুণ অনুবর্তীগণ বিরোধিতা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কন্‌গ্রেসের মাতব্বরগণ (হাই কমাণ্ড) এই বিরোধী মতবাদকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না— আবার সাহসভরে পরীক্ষা করিতেও ভরসা পাইতেছেন না। তাহাদের আপোষী মনোভাব; যেমন করিয়া সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা স্বীকার করিয়া কয়েকটি প্রদেশে তাঁহারা কন্‌গ্রেসী শাসন প্রবর্তন

করিতে সক্ষম হইয়াছেন— তেমনি করিয়া তাঁহাদের ভরসা কেন্দ্রীয় সরকারে আপনাদের আসন ও কিছুটা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন ; তাঁহাদেরও বিশ্বাস শক্তি পাইলে কিছুটা কাজ নিজেদের অনুকূলে করাইয়া লইতে পারিবেন। সুভাষ মাতব্বরদের এই আপোষ-মনোভাবের প্রতিবাদ করিবার জন্যই পুনরায় কন্‌গ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইলেন। তাঁহার সঙ্কল্প, কন্‌গ্রেস হইতে ফেডারেশন বাধা দিতেই হইবে,— কন্‌গ্রেসকে সক্রিয়ভাবে সংগ্রামে নামিতে হইবে— আপোষ নহে— পিছু-হটা নহে— প্রতিরোধ করিতেই হইবে। গান্ধী প্রমুখ নেতারা প্রমাদ গণিলেন— তাঁহারা এই দৃপ্ত বাঙালি যুবকের দৃঢ়তায় বিরক্ত হইয়া পট্টভি সীতারামাইয়াকে কন্‌গ্রেসের সভাপতি পদপ্রার্থী হইবার জন্য খাড়া করিলেন। এই দ্বন্দ্বে পট্টভির পরাজয় হয়— সুভাষ কন্‌গ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। গান্ধীজি এই সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা আমারই পরাজয়। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে গান্ধীজির এই মনোভাবের সমর্থন করা যায় না ; কারণ যদি ডিমক্রেসীই স্বাধীন ভারতের কাম্য হইয়া থাকে, তবে তাহাকে সেই পথেই চলিতে দেওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু তাহা তিনি করিতে না পারায় দেশমধ্যে তাঁহার বিরোধী দল আরও পুষ্ট হইল। ইতিমধ্যে কন্‌গ্রেসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানদের শ্রদ্ধাও তিনি হারাইয়াছিলেন, এখন কন্‌গ্রেসের মধ্যেই ভাঙন দেখা দিল।

সুভাষ কন্‌গ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হইলে কন্‌গ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বারো জন গান্ধীপন্থী সদস্য পদ ত্যাগ করিলেন ; ইহার দ্বারা কন্‌গ্রেসের মর্যাদা বাড়িল কি কমিল তাহার চিন্তা তাঁহারা করিলেন না ; আপাতত দলগত জয়পরাজয়ের প্রশ্নেই তাঁহাদের সকল কর্ম আচ্ছন্ন, নহিলে ঘরের লোকের সহিত অসহযোগ করিয়া বা গোসা করিয়া এ ভাবে তাঁহারা সরিয়া পড়িতেন না। আর সত্যই তাঁহারা তো নিষ্ক্রিয় থাকিলেন না— তাঁহারা কী ভাবে সুভাষকে অপদস্থ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে কোনো ত্রুটি করিলেন না। সুভাষও পাল্টা জবাব দিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন। ভারতের রাজনৈতিক কর্মশক্তি দলগত মর্যাদাভিমান রক্ষার অপচেষ্টায় বহুধা হইতে চলিল।

এবার মধ্যপ্রদেশে ত্রিপুরীতে কন্‌গ্রেস (১০-১২ মার্চ ১৯৩৯) ; সুভাষ অসুস্থ অবস্থায় উপস্থিত হইলেন— সভাপতির কার্য করিলেন মৌলানা আবুল

কালাম আজাদ। গান্ধীজি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তখন তিনি রাজকোটে অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়া বাস করিতেছেন, সেখানে দেশীয় রাজাদের সহিত প্রজাদের শক্তি পরীক্ষা চলিতেছে।

ত্রিপুরী কন্‌গ্রেসে বুঝা গেল যে, গান্ধীপন্থীরা দলে পুষ্ট এবং তাহারা সুভাষের প্রাগ্রসর নীতির পোষক নহে। সেদিন সভায় গান্ধীজিকে হিটলারের সহিত তুলনা করিলে সদস্যদের জয়ধ্বনি দ্বারা একদল নিশ্চয়ই বিস্মিত হইয়াছিলেন। গান্ধীপন্থীদের ধারণা হইয়াছিল, সুভাষের সভাপতিত্ব না-মঞ্জুর করিয়া গান্ধীজি যে দৃঢ়তা দেখাইতেছেন তাহা হিটলারের ন্যায়। রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক এক পত্রে মর্মাহত হইয়া লিখিলেন, "অবশেষে আজ এমন-কি কন্‌গ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলার-নীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল! ·· স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করিবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট, সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে।"

ত্রিপুরী কন্‌গ্রেসে যাহা হইবার তাহা হইল; কিছুকাল হইতেই বাঙালি বামপন্থী যুবকের সহিত কন্‌গ্রেসী প্রধানদের মতভেদ দেখা দিয়াছিল নানা কারণে। ফেডারেশন সম্বন্ধে মতভেদের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। চীনের প্রতি জাপানের উপদ্রবের বিরুদ্ধে কন্‌গ্রেস হইতে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়— সে-বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের আন্তরিকতার অভাব ছিল; সুভাষের সহানুভূতি ছিল বরং জাপানের প্রতি। জাপান যে দৃপ্ত তেজে চীনদেশের সদা-বিবদমান রণধুরন্ধরদের অরাজকতার অবসান ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে— প্রাচ্যে একটি বিশাল কল্যাণ-সংস্থা স্থাপন করিবার আদর্শ প্রচার করিতেছে — তাহাতেই সুভাষের ভাবপ্রবণ মন আকৃষ্ট হইয়াছিল।

ত্রিপুরী কন্‌গ্রেসের পর সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কন্‌গ্রেস প্রধানদের মতভেদ মনান্তরে পরিণত হইল। কর্তৃপক্ষের কোপ কিছুতেই শমিত হইল না— কয়েকমাস পরে সুভাষকে তাহারা কন্‌গ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথ সুভাষ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য গান্ধীজিকে পত্র দেন; গান্ধীজি কবিকে জানাইলেন যে, সুভাষকে সম্পূর্ণভাবে কন্‌গ্রেসের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ 'হাইকমাণ্ড'-এর মত মানিয়া চলিতে হইবে— নতুবা শাস্তি প্রত্যাহৃত হইতে পারে না। কন্‌গ্রেসের মধ্যে অন্তর্বিবাদ আরম্ভ হইল। তবে এখানে একটি কথা বলিতে চাই যে, এই দ্বন্দ্ব ভারতেরই বৈশিষ্ট্য নহে, রাশিয়া

আয়ারলন্ড, পোল্যন্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশেও স্বাধীনতা-সংগ্রামে দলগত বহু মর্মভেদী ঘটনাই ঘটিয়াছিল।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের এই সঙ্কটকালে[১] এবং তাঁহার সংগ্রামী অভিযানে তরুণ বাংলা তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সুভাষবাদীরা গান্ধীজি তথা কন্‌গ্রেসের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি কখনো হুমকি প্রদর্শন ও কখনো তাহার পরই আপোষ করিবার জন্য তাহাদেরই দ্বারস্থ হইবার মনোভাবের কোনোক্রমে সমর্থন করিতে পারিতেছে না; তাহাদের মতে অসহযোগ নেতিধর্মী-সক্রিয় বিপ্লব ব্যতীত দেশের সর্বশ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করা যায় না— সে সংগ্রাম ধর্ম বা সম্প্রদায়ের স্বার্থভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

দশ বৎসর পূর্বে কন্‌গ্রেসে এই সঙ্কট দেখা গিয়াছিল যখন চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্যদল গঠন করিয়াছিলেন; সেদিন কন্‌গ্রেসকে স্বরাজ্যদলের পদ্ধতিকে মানিতে হইয়াছিল। কিন্তু এবার তাহা হইল না কেন— তাহার বিশ্লেষণ করিতে গিয়া যে-সব তথ্য ও কন্‌গ্রেসীদের মনস্তাত্বিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, তাহা উচ্চগ্রামের আদর্শ কি না সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে।

এইখানে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদয় হয়; আজ পর্যন্ত এইভাবে কন্‌গ্রেস-প্রধানরা কত ভাবে কত লোককে কন্‌গ্রেস হইতে বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন তাহার সম্যক গবেষণা হয় নাই। মুসলিম লীগ, সোসিয়ালিষ্ট, হিন্দুমহাসভা, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি দলের নেতৃস্থানীয় পুরুষেরা অনেকেই এককালে কন্‌গ্রেসের উৎসাহী সদস্য ছিলেন— কেন তাঁহারা দলত্যাগ করিয়া গেলেন? প্রতিরোধী দল থাকিবেই, কিন্তু এভাবে বারে বারে ভাঙন কেন ধরিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রতিপক্ষীদেরই স্কন্ধে স্বার্থপরতা এবং ক্ষমতাপ্রিয়তাদি সকল দোষ কি আরোপ করা যায়?

১ জবহরলাল লিখিতেছেন, "He (Subhas) did not approve of any step being taken by the Congress which was anti-Japanese or anti-German or anti-Italian...there was a big difference in outlook between him and others in the Congress Executive, both in regard to foreign and internal matters, and this led to a break early in 1939. He then attacked Congress policy publicly and early in August 1939 the Congress Executive took the very unusual step of taking disciplinary action against him, who was an ex-president"—the Discovery of India-P. 354.

কন্‌গ্রেসের এই-সকল ঘটনাপরম্পরা লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন (২০ মে ১৯৩৯) তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"পৃথিবীতে যে দেশেই যে কোনো বিভাগেই ক্ষমতা অতিপ্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে সেখানেই সে ভিতরে ভিতরে নিজের মারণ-বিষ উদ্‌ভাবিত করে। ইম্‌পিরিয়ালিজম্ বলো, ফ্যাসিজম্ বলো অন্তরে অন্তরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে। কন্‌গ্রেসের অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি ।..... মুক্তির সাধনা তপস্যার সাধনা। সেই তপস্যা সাত্ত্বিক -এই জানি মহাত্মার উপদেশ। কিন্তু এই তপঃক্ষেত্রে যাঁরা রক্ষকরূপে একত্র হয়েছেন তাঁদের মন কি উদারভাবে নিরাসক্ত ? তাঁরা পরস্পরকে আঘাত ক'রে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্যে, তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারে নেই, যে উত্তাপ শক্তিগর্ব ও শক্তিলোভ থেকে উদ্‌ভূত ? ভিতরে ভিতরে কন্‌গ্রেসের মন্দিরে এই-যে শক্তিপূজার বেদী গড়ে উঠছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাই নি যখন মহাত্মাজিকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলিনী ও হিটলারের সমকক্ষ বলে বিশ্ব-সমক্ষে অপমানিত করতে পারলেন।..."

"আমি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি জওহরলালকে, যেখানে ধন বা অন্ধধর্ম বা রাষ্ট্রপ্রভাব ব্যক্তিগত সংকীর্ণ সীমায় শক্তির ঔদ্ধত্য পুঞ্জীভূত করে তোলে সেখানে তার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, কন্‌গ্রেসের দুর্গদ্বারের দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করে নি ?" এই পত্রখানি যখন লিখিত হইতেছে, তখন আটটি প্রদেশে কন্‌গ্রেস মন্ত্রিত্ব করিতেছে। কবি এই পত্রমধ্যে লিখিতেছেন, "দেশে মিলন-কেন্দ্ররূপে কন্‌গ্রেসের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এক প্রদেশের সঙ্গে আর-এক প্রদেশের বিচ্ছেদের সাংঘাতিক লক্ষণ নানা আকারেই থেকে থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের অনৈক্য শোচনীয় এবং ভয়াবহ সেকথা বলা বাহুল্য।......এই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে আচার ও ধর্ম এক সিংহাসনের শরিক হয়ে মানুষের বুদ্ধিকে আবিল করে রেখেছে।" ভারতের প্রত্যেক "পাঁচ-দশ ক্রোশ অন্তর অতলস্পর্শ গর্ত......এবং সেই গর্তগুলোকে দিন রাত আগলে রয়েছে ধর্মনামধারী রক্ষকদল।" নানা কারণে "প্রদেশে প্রদেশে জোড় মেলেনি। মহাত্মাজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষে যে অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার কথা

স্বীকার করিয়াও কবি লিখিয়াছেন, "তবু তাঁর স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়।"[১]

বিশ বৎসর পূর্বে লিখিত হইলেও— ভারত স্বাধীনতালাভের একাদশ বৎসর অন্তেও কবির এই কথাগুলিকে আমরা অবাস্তব বলিয়া পরিহার করিতে পারিতেছি না। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের কন্‌গ্রেস-বিদ্রোহকে সমর্থন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে 'দেশনায়ক' বলিয়া অভ্যর্থনা করিবেন বলিয়াও ভাবিয়াছিলেন।

১৯৩৯ সালে পহেলা সেপ্টেম্বর অকস্মাৎ য়ুরোপের বহুদিনের সঞ্চিত পাপ মহাযুদ্ধ আকারে দেখা দিল। জারমেনীর সৈন্যবাহিনী পোল্যান্‌ড আক্রমণ করিল; পোল্যান্‌ডের পক্ষ লইয়া দুই দিন পরে ইংল্যান্‌ড ও ফ্রান্স মিলিতভাবে জারমেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল; অপর দিকে সোবিয়েত রুশ পোল্যান্‌ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল এবং ইতিহাসের পাতা দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া চলিল। ব্রিটেন য়ুরোপীয় যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ায় ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত ভারতও এই যুদ্ধের অংশীদার হইয়াছে— ইহাই হইল ব্রিটিশসরকারের অভিমত। এতবড় একটা জীবন-মরণ ব্যাপারের সম্মুখীন হইয়াও ভারতের ব্যবস্থাপক সভার মতামত গ্রহণ করার যে প্রয়োজন আছে তাহা ব্রিটেনের মনে হইল না— সাম্রাজ্য তাহাদের আজ্ঞাবহ দাস। অর্ডিন্যান্সের দ্বারা যাহা করণীয় তাহা করিবার পূর্ণ এক্তিয়ার তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত। ব্রিটিশ ও তাঁহাদের তাঁবেদার ভারত-গবর্মেণ্টের ব্যবহারে কন্‌গ্রেসীরা আশ্চর্য ও বিচলিত হইলেন। কন্‌গ্রেস ওয়ার্কিংকমিটি পৃথিবীর এই সঙ্কটময় অবস্থায় একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ভারত গণতন্ত্রনীতির পক্ষপাতী ও নাৎসীবাদের বিরোধী। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট পোল্যান্‌ডের স্বাধীনতারক্ষার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ,— হিটলারের এই আক্রমণদ্বারা গণতন্ত্র আজ বিপন্ন; আক্রান্ত পোল্যান্‌ডের প্রতি ভারতের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ জানিতে চাহে, এই যুদ্ধশেষে ভারত স্বাধীনতালাভ করিবে কি না। ব্রিটেন কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষিত হইবার পাঁচ দিন পরে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিদের স্বাক্ষরে (৮ সেপ্টেম্বর) যে প্রচারপত্র প্রকাশিত হয় তাহার একস্থানে ছিল— "গণতন্ত্র রক্ষাকল্পে স্বাধীন-

১ রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ, পৃ ১৭৩-৭৪

ভারত যাহাতে স্বাধীনভাবে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্য করিতে পারে, তজ্জন্য ব্রিটেন জগতের শান্তির খাতিরে ভারতবর্ষে স্বশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সহিত চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনের এই মহাসুযোগ যেন না হারান।" গান্ধীজি ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যান্ডকে (আর্ল অব রোনালডশে) জানাইলেন, "কন্‌গ্রেসের ইহা জানিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, যুদ্ধের শেষে স্বাধীন দেশ বলিয়া ভারতবর্ষের দাবি ও মর্যাদার নিশ্চয়তা— ব্রিটেনের স্বাধীনদেশ বলিয়া দাবি ও মর্যাদার সমান হইবে।" ভারতীয়দের প্রশ্নের ও দাবির উত্তরে ব্রিটিশ সরকার কোনোপ্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহারা শর্তহীন আনুগত্য দাবি করেন— কারণ তাঁহারা ভারতেশ্বর !

কন্‌গ্রেস কর্মসমিতি ভারতের প্রাদেশিক কন্‌গ্রেসী মন্ত্রীদের শাসন-সংস্থার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার নির্দেশ দিলেন— সকলেই বুঝিলেন সংগ্রাম অনিবার্য। যুদ্ধ ঘোষণার অনতিকালের মধ্যে লর্ড লিন্‌লিথগো সর্বদলের প্রতিনিধিদের সমবেত করিলেন। তিনি জানাইলেন, প্রাদেশিক সরকারকে এই সংগ্রামে সহায়তা দান করিতে হইবে— তাঁহারা যদি অপারগ হন, তবে তাঁহারা মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিতে পারেন ; এবং যদি পদত্যাগ না করেন তবে গবর্নরগণ তাঁহাদের পদাধিকার বলে তাঁহাদের পদচ্যুত করিবেন এবং শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। নভেম্বর মাসের মধ্যেই কন্‌গ্রেসীমন্ত্রীরা পদত্যাগ করিলেন। কন্‌গ্রেসী শাসন অবসান হইলে মিঃ জিন্নার আদেশে ভারতের সর্বত্র মুসলমানরা 'মুক্তির দিবস' বলিয়া উৎসব করিল। কন্‌গ্রেসের প্রতি মুসলমানদের মনোভাব কী তীব্ররূপ ধারণ করিয়াছে ইহা তাহারই দ্যোতক। প্রাদেশিকতা ও হিন্দি-ভাষার দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইয়া কোনো কোনো প্রদেশে হিন্দুরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া থাকিবে।

ব্রিটিশ সরকার জানিতেন, ভারতের সৈন্যবিভাগে মুসলমানদের প্রতিপত্তি ও শক্তি যথেষ্ট - তাহাদের তুষ্ট করিতেই হইবে ; তাই জিন্না-সাহেবের নিকট সরকার এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যুদ্ধশেষে যে সংবিধান রচিত হইবে তাহাতে এমন-কিছু করা হইবে না, যাহাতে ভারতের ৮।৯ কোটি মুসলমানকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের শাসন-স্বৈরাচারের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় ; সহজ ভাষায় সেইদিনই পাকিস্তানের জন্মাভাস পাওয়া গেল।

কন্‌গ্রেসের দাবি, ভারতের সংবিধান ভারতীয়রা রচনা করিবেন, ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীনে উহা রচিত বা পরিকল্পিত হইবে না। সুতরাং লীগ ও কন্‌গ্রেসের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ১৯৪০ সাল আরম্ভ হইল।

১৯৪০ সালে মার্চ মাসে রামগড়ে কন্‌গ্রেস অধিবেশনে সভাপতি মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বিহারের বিশিষ্ট কর্মী রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বলিলেন যে, পূর্ণস্বাধীনতা ভিন্ন ভারতবাসীর নিকট কিছুই গ্রাহ্য হইবে না। ভারতের অধিবাসীরাই ভারতের সংবিধান রচনা এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনের একমাত্র অধিকারী। গণপরিষদ (Constituent assembly) গঠিত হইবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিরা পরস্পর সম্মত হইয়া সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষায় মনোযোগী থাকিবেন। মৌলানা-সাহেবের এই ভাষণে ভাবী স্বাধীন ভারতের সংবিধানের আভাস পাওয়া যায়। সেদিন কন্‌গ্রেস হইতে এই কথা অতি স্পষ্ট করিয়া বলা হইল যে, ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করিয়াছেন—ভারতবর্ষ যুদ্ধে নামিয়াছে ; অথচ ভারতবাসীর কোনো মতামতের অপেক্ষা না করিয়া ব্রিটিশ সরকার এই ঘোষণা করিয়াছেন—ইহা তাহারা মানিতে বাধ্য নহেন ; তাহারা ব্রিটেনের মিত্ররূপে সর্বস্ব পণ করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু দাসরূপে প্রভুর আদেশে ও হুমকিতে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত নহে।

কন্‌গ্রেস ১৯৩৯ সালে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামে না নামিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত না করিয়া— মুসলিম লীগ, হিন্দুমহাসভা, ফরওয়ার্ডব্লক, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতিদের সহিত তাঁহারা কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। এক শ্রেণীর সমালোচকের মত, কন্‌গ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ না করিয়া বরখাস্ত হইয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামিলে ভালো করিতেন।

রামগড় কন্‌গ্রেস প্যাণ্ডেলের অদূরে আর একটি প্যাণ্ডেলে সুভাষ বসু-স্থাপিত নবগঠিত 'ফরওয়ার্ডব্লক' দলের অধিবেশন হইল। পাঠকের স্মরণ আছে, সুভাস কন্‌গ্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়া নূতন দল গঠন করিয়াছিলেন— ইঁহাদের উদ্দেশ্য সরকারের যুদ্ধোদ্যমে বাধা দান করা। এখন

হইতে তাঁহার কাজ হইল একাধারে কন্‌গ্রেসকে বাধা দান ও সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম। এই দ্বিবিধ প্রচেষ্টায় তরুণের দল সবিশেষ উৎসাহিত। গান্ধীজির চরকা, খদ্দর, অহিংসানীতিতে বামপন্থীদের মন ভরে না, তাহারা সক্রিয় প্রতিরোধ করিবার জন্য কৃতসংকল্প। কী ভাবে গবর্মেণ্টকে বিব্রত করা যায় তাহারই রন্ধ্র অনুসন্ধান করিতে ও জনতাকে উত্তেজিত ও সচকিত করিয়া রাখিবার জন্য এমন-একটা কাজে হাত দিলেন যাহা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও আত্মসম্মান জড়িত। সুভাষের দৃষ্টি গেল হলওয়েল মনুমেণ্টের উপর। ১৭৫৬ সালে অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী সৃষ্টি করিয়া কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথের মধ্যস্থলে (ডালহৌসিস্কোয়ারে) এই স্তম্ভ স্থাপিত হয়; যে-সব সৈন্যরা অন্ধকূপে (Black Hole) মারা পড়ে বলিয়া একটা অর্ধসত্য কাহিনী প্রচলিত ছিল— ঐ স্তম্ভের চারিদিকে তাহাদের নাম খোদিত। সুভাষচন্দ্র কলিকাতার হিন্দু-মুসলমান যুবকদের লইয়া ইহা ধ্বংস করিবার জন্য অগ্রসর হইলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া স্বগৃহে অন্তরীণাবদ্ধ করা হইল।

এ দিকে রামগড় কন্‌গ্রেসের পর কন্‌গ্রেসকর্মীরা ভারতের স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হইবেন ভাবিতেছে; আর মুসলিম লীগ পাকিস্তান পাইবার প্রতিশ্রুতি পাইলে ব্রিটিশের সহিত সহযোগিতার কথা চিন্তা করিতেছেন। গান্ধীজি ও কন্‌গ্রেস ইংরেজের জয় ও যুগপৎ নাৎসী-ফ্যাসিস্তদের ধ্বংস কামনা করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে কোনোপ্রকার সহৃদয় সহযোগিতার আভাসমাত্র না পাইয়া যুদ্ধে সহায়তা দানের জন্য অগ্রসর হইলেন না। কিছুদিন পূর্বে নেহরু বলিয়াছিলেন যে, ইংল্যান্‌ডের দুর্যোগকে কখনো ভারতের সুযোগ বলিয়া ধরা উচিত হইবে না, গান্ধীজিও বলিয়াছিলেন, যুদ্ধের উষ্মা হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহারা অপেক্ষা করিবেন। কিন্তু রাজনীতিক পটভূমি এত দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছিল যে ভারতীয়দের পক্ষে ঐ মনোভাব রক্ষা করা সম্ভব হইল না।

ভারত সরকার কোনো প্রতিরোধী শক্তিকে এই যুদ্ধের সময়ে সহ্য করিবেন না বলিয়া কৃতসংকল্প। ১৯৪০ সাল শেষ হইবার পূর্বে দেখা গেল প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রের প্রাক্তন মন্ত্রীদের ৩১ জন, ব্যবস্থাপক সভায় ৩২০ জন, কন্‌গ্রেস-কার্য-নির্বাহক-সভার ১১ জন ও নিখিল ভারত কন্‌গ্রেস কমিটির ১৭৪ জন

সদস্য কারারুদ্ধ হইয়াছেন। ১৯৪১ সালের ৩রা জানুয়ারি কন্‌গ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলনা আবুল কালাম আজাদকে গ্রেপ্তার করিয়া আঠারো মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে সত্যাগ্রহী বন্দীর সংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় সাত হাজার! কিন্তু অল্পকাল পরেই ইহাদের মুক্তিদান করা হয়।—বিলাত হইতে সংবিধান রচনা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ক্রীপস আসিতেছেন।

ইতিমধ্যে ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে বোম্বাই মহানগরীতে ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন[১] বা উদার নৈতিক দল মিলিত হইয়া গবর্মেণ্টকে একটা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে ভারতে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' দিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন, আর বলিলেন, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় শাসন-ভার সম্পূর্ণভাবে দেশীয়দের উপর ন্যস্ত করা হউক।

বড়লাট কয়েকজন ভারতীয়কে তাঁহার অধ্যক্ষ সভায় গ্রহণ করিলেন ও যুদ্ধাদি ব্যাপারে পরামর্শ দিবার জন্য একটি কাউন্সিল গঠন করিলেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দান বা ব্যবস্থাপক সভা সম্পূর্ণভাবে 'ভারতীয় করণ'-এর কোনো প্রস্তাবই তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কয়েকজন ভারতীয়কে অধ্যক্ষ সভায় যে গ্রহণ করা হইল, তাহার প্রত্যক্ষ কারণ, মহাযুদ্ধ ভীষণভাবে মিত্রশক্তির প্রতিকূলে যাইতেছে; ব্রিটেন জারমান বোমার দ্বারা নিদারুণ ভাবে বিধ্বস্ত হইতেছে এবং ফ্রান্সের অধিকাংশই জারমেনীর কবলগত। সেইজন্য ভারতীয়দের সাহায্য নানাভাবে প্রয়োজন। ইহার পর ১৯৪১ সালের জুন মাসে উন্মত্ত জারমান বাহিনী সোবিয়েত রুশ আক্রমণ করিল—দুই বৎসর পূর্ব্বে সম্পাদিত অনাক্রমণ চুক্তি ভাসিয়া গেল। এই বৎসরের শেষ দিকে ডিসেম্বর মাসে জারমেনীর মিত্র জাপান যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া অতর্কিতভাবে প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপে মার্কিনী নৌঘাঁটি পার্ল হারবার বোমারু বিমান দিয়া ধ্বংস করিল। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এই

১ পাঠকের স্মরণ আছে, ১৯১৮ সালের অগষ্টমাসে বোম্বাই-এ ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন নামে সভা স্থাপিত হয়; স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি হন। এই সভা আদিযুগের কন্‌গ্রেসের মনোভাব লইয়া কর্মে অবতীর্ণ হন। নাগপুরের অধিবেশনে কন্‌গ্রেসের পুরাতন সংবিধান পরিত্যক্ত হইয়াছিল; ফেডারেশন সেই পুরাতন সংবিধানই একপ্রকার মানিয়া চলিলেন।

আক্রমণ। জাপানের বিরুদ্ধে পরদিন (৮ ডিসেম্বর '৪১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

এ দিকে জাপান তাহার বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর হইয়া এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বস্থ দেশ ও দ্বীপগুলি জয় করিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে রেঙ্গুন অধিকৃত হইল (৮ মার্চ ১৯৪২)।

ভারতের মধ্যে রাজনীতি ক্ষেত্রে কোনো ঐক্যমত দেখা যাইতেছে না; কন্‌গ্রেস দুর্বলভাবে তাহাদের মহান আদর্শ আঁকড়াইয়া আছেন। বিনাযুদ্ধে বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভের আশায় 'অহিংস' 'সংগ্রাম' করিবার জন্য উৎসুক, কিন্তু ব্রিটেনের যুদ্ধোদ্যম চেষ্টা ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ নিবারণ করিবার জন্য কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে দেশবাসীকে নির্দেশ দিলেন না, সক্রিয় বিপ্লব ভাবনা তাহাদের মধ্যে দেখা গেল না। সুভাষচন্দ্র এই সক্রিয় বিপ্লব করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া বিদেশে চলিয়া যান। মুসলিম লীগের নেতা জিন্না-সাহেব, পাকিস্তানের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে হিন্দুপ্রধান কন্‌গ্রেসের সহিত কোনোপ্রকার আপোষ-আলোচনা চালাইতে অসম্মত হইয়া মুসলমান সমাজকে সুদৃঢ় সংঘবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন।

কম্যুনিষ্টরা ১৯৩৯ হইতে ১৯৪০ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করিতেছিল; ত্রিপুরী কন্‌গ্রেসে সুভাষ কম্যুনিষ্টদের ভোটও পাইয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪০-এ রামগড়ে কন্‌গ্রেসের অদূরে আহূত সুভাষচন্দ্রের পৃথক সভায় তাহারা যোগদান করিতে পারে নাই—তাহারা কন্‌গ্রেসের মধ্যে থাকিতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু গবর্মেণ্ট কর্তৃক কন্‌গ্রেস পুনরায় নিষিদ্ধ হইল, কমুনিষ্ট দলও। এ দিকে জাপান ভারতের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে—দূরের যুদ্ধ দ্বারে আসিল। কম্যুনিষ্টরা তখন ব্রিটিশের ভারতরক্ষার জন্য যুদ্ধকে জনতার যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিল। কিন্তু প্রশ্ন—জনতা বা পীপল্ কোথায়? কোন্ People's war— দেশে সেকথা স্পষ্ট না হওয়ায় কন্‌গ্রেস ও কম্যুনিষ্টদের মধ্যে মতভেদ ও মনোমালিন্য তীব্র হইতে লাগিল। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ব্রিটিশ ও মিত্রপক্ষের এই যুদ্ধ ফ্যাসিস্ত বা নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান। ১৯৪১-৪২ সালে হিটলারের উন্মত্ত নাৎসী বাহিনী সোবিয়েত রুশকে ধ্বংস করিতে উদ্যত—এ দিকে জাপান ভারতের দিকে অগ্রসর রত। কম্যুনিষ্টরা জাপানের অগ্রসর

বন্ধ করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিল— অর্থাৎ গোঁড়া কন্‌গ্রেসীয় মতে ব্রিটিশের পক্ষে সহায়তারই নামান্তর উহা। সাম্রাজ্যলোভী, নাৎসীমিত্র জাপানকে 'রুখিতে' হইবে— এই হইল কম্যুনিষ্টদের শ্লোগান।

যুদ্ধারম্ভ হইতেই ফ্যাসিস্ত, নাৎসী মতবাদের বিরোধী পক্ষে কন্‌গ্রেস; তাহারা মিত্রপক্ষের জয়াকাঙ্ক্ষা করিতেছিল। জাপানের চীন-আক্রমণ কন্‌গ্রেস হইতে তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছিল— যদিও সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত সহানুভূতি ছিল জাপান-জার্মান-ইতালির অক্ষশক্তির প্রতি। কন্‌গ্রেস তো ইহার সপক্ষে নহে; কিন্তু তাঁহারা অক্ষশক্তির পরাজয় কামনা করিয়া যুদ্ধে ব্রিটিশকে সহায়তা করিবার জন্য অন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলেন— কম্যুনিষ্টদের ইহাই ছিল সমস্যা। তাহাদের মতে সর্বাগ্রে অক্ষশক্তির পরাভব আনিবার জন্য সর্বশক্তি কেন্দ্রীত করা প্রয়োজন; তার পর বিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করিবার জন্য সংগ্রাম অনিবার্য। কিন্তু সে সংগ্রাম করিবে ভারতের জনতা— পীপলস্ ওয়ার— সে পীপল্ হইতেছে সংঘবদ্ধ শ্রমিক, চাষী ও মজুর। যুদ্ধের সময় ইহা হইতেছে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা।

ব্রিটিশ সরকার এতকাল কন্‌গ্রেসের বিরুদ্ধতা করিয়া মুসলমানদের তোষণ ও হিন্দুদের পেষণ করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু এখন দেখিতেছেন, তাঁহাদের সৃষ্ট ভেদনীতির পরিণাম হইল পকিস্তানের দাবি; জিন্না ১৯৪০ সালে ঘোষণা করিলেন যে, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই যে পাকিস্তানকে বাধা দিতে পারে। ইংরেজ জানে, বহু জাতিতে বিভক্ত হিন্দুর হস্তে রাজনীতি কখনো কার্যকারীভাবে ভীষণ হয় নাই; কিন্তু মুসলমানের হস্তে রাজনীতি কখনই অহিংস ও নিরুপদ্রব থাকিবে না। তা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। তাহাদের মধ্যে যাতে বিক্ষোভ না হয় সে ভাবনাও যে ইংরেজের ছিল না, তাহা বলা যায় না। সর্বোপরি পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়া দিলে কন্‌গ্রেসও শায়েস্তায় থাকিবে এ ভাবনাও কূটনীতিবিশারদ ইংরেজের মনে ছিল কি না বলা কঠিন। পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইবার দশ বৎসর পরেও দেখা যাইতেছে ব্রিটিশ রাজনীতিকরা স্বাধীন ভারতের সহিত পাকিস্তানের বিরোধকে নানা অজুহাতে জিয়াইয়া রাখিবার জন্য নির্লজ্জভাবে যুক্ত রহিয়াছে; অথচ ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই কমন-ওয়েল্থের সদস্য এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা U. N. O.-র সভ্য।

১৯৪২ সালের ১১ই মার্চ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিলেন যে, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ভারতের সহিত সংবিধানাদি রচনা সম্বন্ধে আলোচনার জন্ম প্রেরিত হইলেন। ২২ মার্চ ক্রীপস দিল্লী আসিলেন। ক্রীপসের প্রস্তাব কন্‌গ্রেস অগ্রাহ্য করিলেন; কারণ তাঁহার প্রস্তাবের মধ্যে ভারতকে বিভক্ত করিবার আভাস স্পষ্টভাবে দেওয়া ছিল; এবং সামরিকনীতি পরিচালনায় ভারতীয়দের কর্তৃত্বদানেও তাঁহাদের অনিচ্ছা। মুসলমানরা ক্রীপসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল— 'পাকিস্তান গঠিত হইবেই' এই স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি তাহারা পাইল না বলিয়া। ক্রীপস হিন্দুমহাসভাকে আহ্বান করিয়া ছিলেন, তাহারাও ভারত-বিভাগের সপক্ষে মত দিতে পারিলেন না। ক্রীপসমিশন ব্যর্থ হইল— অর্থাৎ ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যস্থাপনের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তবে এ কথা সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, এককালে ভারত বিভক্ত হইবেই; গান্ধীজি ইংরেজের উদ্দেশ্যে বলিলেন 'কুইট ইন্‌ডিয়া' বা 'ভারত ছাড়ো'। জিন্না সাহেব ঘোষণা করিলেন 'ভাগ করিয়া ভারত ছাড়ো'। কন্‌গ্রেসের আদর্শগত ভাবনা—ভারত কিছুতেই বিভক্ত হইতে পারে না; মুসলিম লীগের দুর্দমনীয় সংকল্প ভারত বিভক্ত করিতেই হইবে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই চতুর ইংরেজ উভয়কেই সন্তুষ্ট করিয়া ভারত ত্যাগ করিল— জিন্না পাইলেন ইসলামিক স্টেট, গান্ধী পাইলেন রামরাজ্য বা utopia.

এই সময়ে রাজাগোপালাচারী মদ্রাজ হইতে একটি প্রস্তাবে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, পাকিস্তান-রচনায় মত দেওয়া কন্‌গ্রেসের পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে। তখন জাপানী স্থলসৈন্য ভারতের পূর্বদ্বারে; তাহার জাহাজ বঙ্গোপসাগরে, তাহার বোমারু বিমান আকাশে— এই অবস্থায় কন্‌গ্রেস-লীগের পক্ষে সমবেতভাবে মন্ত্রী-পরিষদ গঠন করা উচিত। রাজাজির এই প্রস্তাবে কন্‌গ্রেস কমিটি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। রাজাজি আপোষের পথ রুদ্ধ দেখিয়া কন্‌গ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করিলেন। এই রাজাজি কন্‌গ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ পর্বে মদ্রাজে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কন্‌গ্রেসের সদস্যরা অধিকাংশই হিন্দু, তাহারা কোনো মীমাংসায় আসিতে রাজি হইলেন না।

শেষ পর্যন্ত জিন্নার জিদ বজায় থাকিল— হিন্দু-মুসলমান ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হইয়াছিল। এখন সেই সংগ্রাম দেখা দিল হিন্দু-মুসলমানেরই মধ্যে।

এইখানে একটি কথা স্মরণীয়: দশ বৎসর পূর্বে 'গোলটেবিল' বৈঠকে

পাকিস্তান সম্বন্ধে কথা উঠিলে ভারতের মুসলমান প্রতিনিধিদের অনেকেই বলেন যে, এই প্রস্তাব কোনো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির রচনা নহে—এইটির উদ্‌ভাবক এক জন ছাত্র। সৌকত আনসারী তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষে কেহ পাকিস্তানের নামও শোনে নাই, বলেও নাই ; গোলটেবিল-বৈঠকে মুসলমান প্রতিনিধিরা ইহার আলোচনা করিতে কিছুমাত্র আগ্রহ দেখান নাই ; অথচ বিলাতের রক্ষণশীল দলীয় পত্রিকাগুলি এবং চার্চিল-লয়েড প্রমুখ রক্ষণশীল দলীয় নেতৃগণ পাকিস্তান পরিকল্পনার প্রশংসায় একেবারে মুখর হইয়া উঠিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহারা অতি মূল্যবান ব্যবস্থার ইঙ্গিত আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ফলে পার্লামেণ্টে একাধিকবার ইহা লইয়া আলোচনা উপস্থিত হইল।"[১]

দেশের এই মনোভাবের মধ্যে বোম্বাই-এ নিখিল ভারত কন্‌গ্রেস কমিটি ৭-৮ই অগস্ট (১৯৪২) সমবেত হইয়া বিখ্যাত 'অগস্ট প্রস্তাব' পাশ করিলেন। এই দীর্ঘ প্রস্তাবে বলা হইল যে, ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মন আশায় ও উৎসাহে পূর্ণ হইবে। এই জন্য ভারতে ব্রিটিশরাজত্বের অবসান সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে আফ্রোশিয়ান পরিবেশের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে যুক্ত—এই ভাবনা ক্রমশই ভারতীয়দের মনে সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করিতেছে। ভারেতর স্বাধীনতা-প্রাপ্তির উপরই মহাযুদ্ধের ভবিষ্যৎ এবং গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। অগস্ট-প্রস্তাবে ঘোষিত হইল যে, জনসাধারণ যেন ধৈর্য ও সাহসের সহিত বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হইয়া গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে অনুগত সৈন্যের ন্যায় তাঁহার আদেশ মানিয়া চলে। তাহারা যেন মনে রাখে অহিংসাই এই আন্দোলনের ভিত্তি। তাঁহারা এই আশঙ্কাও করিলেন যে, এমন সময় আসিতে পারে যখন কন্‌গ্রেস কমিটির অস্তিত্বই থাকিবে না ; তখন যেন প্রত্যেক ব্যক্তি কন্‌গ্রেসের প্রচারিত নীতি লঙ্ঘন না করিয়া নিজেরাই কার্য করেন। মুক্তিকামী প্রত্যেক ভারতবাসী সংগ্রামকালে নিজেই নিজের পথ-প্রদর্শক হইবেন। দেশের মন্ত্র হইল Do or die কাজ করো না হয় মরো। ইহা যুদ্ধঘোষণার নামান্তর মাত্র— অহিংসা এই যুদ্ধের অস্ত্র।

১ দ্রঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, খণ্ডিত ভারত, পৃঃ ২৪৩

কন্‌গ্রেসে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন জবহরলাল নেহরু, সমর্থন করেন বল্লভভাই প্যাটেল।

ক্রিপসের মিশন ব্যর্থ হইবার পাঁচ মাস পরে ৮ই অগস্ট এই প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং পরদিন (৯ই, ১৯৪২) প্রাতে গান্ধীজি প্রমুখ সকল নেতা পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইলেন। গান্ধীজি ভাবিয়াছিলেন যে, পূর্ব এশিয়া হইতে বিজয়ী জাপানীরা যেভাবে বঙ্গদেশের ধারে উপস্থিত হইয়াছে— এখন বিব্রত ইংরেজকে ভয় দেখাইয়া 'স্বাধীনতা' আদায় করা যাইবে; প্রস্তাব পাশ হইতে দেখিলেই ইংরেজ দেশত্যাগ করিবে। ব্রিটিশরাজনীতি বা কূটনীতি ও ব্রিটিশ সামরিক শক্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার জন্যই গান্ধীজি ভাবিলেন, চারিদিকের যুদ্ধে-বিপর্যস্ত ইংরেজ কন্‌গ্রেসের প্রস্তাবে আতঙ্কিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইংরেজ সমস্ত পরিস্থিতির জন্য ভারতে প্রস্তুত ছিল; তাই ১৯৪২-এর বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমন করিতে সক্ষম হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টলটলায়মান— এ অবস্থায় সরকারের ভাবিবার সময় নাই— তাঁহারা আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিবার জন্য দেশকে নেতৃহীন করিলেন। এই ঘটনা দেশময় প্রচারিত হইতে তিলমাত্র বিলম্ব হইল না। হঠাৎ লোকে উন্মত্ত হইয়া উঠিল; আন্দোলন অহিংস ও নিরুপদ্রব থাকিল না। জবহরলাল পরে ১৯৪২-এর অগস্ট-আন্দোলনকে ১৮৫৭-র সিপাহী-বিদ্রোহের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন— 'নেতা নাই, সংগঠন নাই, উদ্যোগ-আয়োজন নাই, কোনো মন্ত্রবল নাই অথচ একটা অসহায় জাতি আপনা হইতে কর্ম-প্রচেষ্টার অন্য কোনো পন্থা না পাইয়া বিদ্রোহী হইল— এ দৃশ্য প্রকৃতই বিপুল বিস্ময়ের ব্যাপার।" বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলায় অকথিত অত্যাচার চলিল সত্যাগ্রহীদের উপর; বিহারে, ওড়িশায়, যুক্তপ্রদেশে, মধ্য-প্রদেশেও অত্যাচার কম হয় নাই। জনতাও কম উপদ্রব করে নাই— টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া, রেলপথ উপড়াইয়া, আদালতে আপিসে সত্যাগ্রহ করিয়া, কারখানায় ধর্মঘট করিয়া ভীষণ কাণ্ড করিল। এইবার সরকার উপদ্রুত অংশে জনতার উপর পিউনিটি ট্যাক্স চাপান— ৯০ লক্ষ টাকা ধার্য হয়, তার মধ্যে ৭০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা তাঁহারা আদায় করেন।

কন্‌গ্রেসকর্মীরা সকলেই ১৯৪২ সালের অগস্ট মাসে কারাগারে প্রেরিত হইলেন। ১৯৪৫ সালের জুন মাসে যুদ্ধাবসানের পর তাঁহারা মুক্তি পান। গান্ধীজি মুক্তি পাইয়াছিলেন ১৯৪৪ সালের মে মাসে। তখনও রাজাগোপালাচারী

আর একবার 'পাকিস্তান' স্বীকার করিয়া লইবার জন্য গান্ধীজিকে বলিয়াছিলেন।

এই পার্টিশন যতই বেদনাদায়ক হউক বাস্তবতার দিক হইতে উহাকে মানিয়া লইবার নজীর ছিল। গ্রীক ও তুর্কীর মধ্যে যুদ্ধের শেষে স্থির হয় যে, এশিয়া-মাইনরের তুর্কীরাজ্য হইতে গ্রীক বা গ্রীস হইতে তুর্কীজনতার বিনিময় হইবে। সম্মিলিত রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় যে-সব গ্রীক আড়াই হাজার বৎসর এশিয়ার বাসিন্দা, তাহাদের দেশত্যাগ করিতে হইল; গ্রীসে যে-সব তুর্কী ৪।৫ শত বৎসর বাস করিতেছে তাহাদেরও সরিতে হয়। পোল্যন্ড ও জারমেনীর মধ্যে পোল ও জারমানদের অনুরূপ বিনিময় হয়। সুতরাং এই-সব নজীর হইতেই বোধ হয় রাজাগোপালাচারী ভারতকে পার্টিশন মানিয়া লইতে বলেন।

যুদ্ধ পূর্বে তিন বৎসর কন্‌গ্রেস কর্মীরা জেলে আবদ্ধ থাকা কালে মুসলিম লীগ প্রতিদ্বন্দ্বীহীনভাবে তাহাদের সংঘশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ও হিন্দুবিদ্বেষবীজ স্বজাতি মধ্যে সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হয়। এই কাজে ব্রিটিশ কুটনীতির উসকানি ছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। এ ছাড়া ব্রিটিশ কুটনীতিকরা ভারতের বাহিরে বিশেষ করিয়া আমেরিকায় ভারত সম্বন্ধে কুৎসা প্রচারের বিরাট যন্ত্র রচনা করেন। এই প্রচার কার্যের প্রধান ছিলেন লর্ড হালিফাক্স—ভারতের পূর্বতন ভাইসরয় আরউইন সাহেব।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া চলিতেছে। জাপানী বোমা কলিকাতায় পড়িল—লক্ষ লক্ষ লোক কলিকাতা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল—সে দৃশ্য অবর্ণনীয়। শোনা গেল ভারতের বাহির হইতে মালয় বার্মার ভারতীয় সৈন্যরা ভারত উদ্ধার করিবার জন্য জাপানীদের পশ্চাত পশ্চাত আসিতেছে। ইহার নেতা সুভাষচন্দ্র। শত্রুর আগমন আশঙ্কায় সরকার হইতে তাহাদের বাধাদানের জন্য বিচিত্র পন্থা অবলম্বন করা হইল। তাঁহারা পূর্ব বাংলার নৌকা, পশ্চিম বাংলার মোটরগাড়ি, সাইকেল প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ ও বাজেয়াপ্ত করিলেন। তাঁহাদের ভয়, পাছে জাপানী সৈন্য এই-সব যানবাহন হস্তগত করিয়া বাংলাদেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বসে। তারপর শুরু হইল খাদ্য নিয়ন্ত্রণ। ইহার ফলে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; অনুমান পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালি হিন্দু-মুসলমান অনাহারে মরিল; ইহা

সরকারকৃত অন্নাভাব সৃষ্টি। লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও অনুচরদের জন্য খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই; সমস্ত কলকারখানার উৎপন্ন সামগ্রী সামরিক বিভাগের চাহিদা মিটাইবার পর সাধারণের জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ-বিধির দ্বারা বিক্রীত হইতেছিল। এই সময়ে বাংলা ভাষায় নূতন শব্দ শোনা গেল 'চোরাবাজার', 'কালো-বাজার'— ইংরেজি 'ব্ল্যাক-মার্কেট' শব্দ চালু হইল। ইংরেজ কয়েক বৎসর পর ভারত ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু তার পূর্বে একটা ধর্মভীরু জাতির মজ্জাগত নীতিবোধকে একেবারে দেউলিয়া করিয়া দিয়া গেল; সেই ব্যাধিবীজ ভারতীয়দের রক্তের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়ে গিয়াছে যে, তাহা কবে ও কীভাবে দূর হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারেন না।

বাংলাদেশে শাসন সরকারে ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রিত্ব চলিতেছিল; তিনি ১৯৩৭-এ হিন্দুদের লইয়া মন্ত্রীপরিষদ গঠন করিয়া কাজ করিতেছিলেন। কন্‌গ্রেসী সদস্য লইয়া 'কোয়ালিশন' বা যৌথ মন্ত্রিত্ব করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কন্‌গ্রেস মাতব্বরদের দুর্বুদ্ধি, তাঁহারা বাংলাদেশে যৌথমন্ত্রিত্বে রাজী হইলেন না; অথচ অল্পকাল মধ্যে আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যা-গরিষ্ঠদের লইয়া মন্ত্রিত্ব গঠনের ব্যবস্থা দান করিয়াছিলেন। কন্‌গ্রেসের এই অপরিণামদর্শী রাষ্ট্রবুদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের সর্বনাশ সাধিত হইল।

১৯৪২ সালের আন্দোলনের পর লীগের ষড়যন্ত্রে ও সরকারী কুচক্রান্তের ফলে ফজলুল হকের গর্বমেণ্ট অপসারিত হইল (মার্চ ১৯৪৩)। ইহার পর বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়াপন্থী হিন্দুবিরোধী লীগ-মনোনীত নাজীমুদ্দিন মন্ত্রীসভা গঠন করিলেন। পঞ্জাবেও স্যর সেকেন্দর হায়াতের ইউনিয়ন মন্ত্রিত্ব লীগের নিকট পরাজিত হইল।

১৯৪২-এর অগস্ট আন্দোলনের পর মুসলমানরা জিন্না-সাহেবের নেতৃত্বে এই কথাই গবর্মেণ্টকে জানাইলেন যে, কন্‌গ্রেসের কয়েকজন হিন্দু কারাগারে আছেন বলিয়া ভারতের শাসন ব্যাপার কাহারো উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায় না, এ যুক্তি শ্রদ্ধেয় নহে। তিনি দিল্লী ও করাচীতে আহূত লীগ সম্মেলনে ঘোষণা করিলেন, গান্ধীজি, কন্‌গ্রেস ও হিন্দুরা ভারতের স্বাধীনতালাভের অন্তরায়। তিনি বলিলেন, আমরা মুসলমানরা অখণ্ড হিন্দুস্তানের পরিকল্পনা কি করিতে পারি? এই মহাদেশে মুসলিম-ভারত কি হিন্দুরাজ মানিয়া

লইতে পারে? অথচ ইহাই হিন্দু কন্‌গ্রেসের মনোভাব। হিন্দুরা এখনো সেই স্বপ্ন দেখিতেছেন,— অপরপক্ষে যখন তাহারা স্বাধীনতালাভের কথাও বলেন, তখন তাহারা মুসলিম-ভারতের দাসত্বের কথাই ভাবে।

আশ্চর্যের বিষয়, মুসলমানরা গত ষাট বৎসর এই একই ধুয়া ধরিয়াছে— হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি— একাসনে উভয়ে বসিবার স্থান সংকুলান হইবে না। ১৮৮৩ অব্দে স্যর সৈয়দ আহমদ ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন। সুতরাং এক শ্রেণীর মুসলমানের বাক্য ও ব্যবহারের মধ্যে এই পৃথকীকরণের ভাবনা বরাবর চলিয়া আসিতেছে।

গান্ধীজি পুণায় আগা খাঁর প্রাসাদে অন্তরীণাবদ্ধ। জিন্না-সাহেবকে প্রথম যে চিঠি লিখিলেন তাহা জেলের কর্তৃপক্ষ জিন্নার কাছে প্রেরণ করিলেন না— অন্তরীণাবদ্ধ ব্যক্তির পত্র সরকারী নিয়মে পাঠানো যায় না। ইহার কিছুদিন পরে গান্ধীজি ও রাজাগোপালাচারী জিন্নাকে পত্র দেন। গান্ধীজি লিখিয়াছিলেন যে, জিন্না-সাহেব যদি কন্‌গ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিতে চাহেন, তবে মুসলমানরা যাহা চাহিবেন তাহাই প্রদান করা হইবে বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন। কিন্তু জিন্না-সাহেব এ ধরণের কথায় কর্ণপাত করিবার লোক নহেন। গান্ধীজি ও জিন্না সাহেবের মধ্যে কথাবার্তা পরেও চলে; কিন্তু পাকিস্তান ও মুসলমানদের পৃথকজাতিবাদ স্বীকার করিতে না পারিলে তাঁহার সহিত মীমাংসার কোনো আশা দেখা গেল না। দুই জন দুই বিপরীত দিকে চলিলেন— একজন চাহেন, অখণ্ড ভারতের হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশীর ন্যায় বাস করিবে; অপরজন চাহেন, পাকিস্তান ও মুসলমানদের পৃথক নেশনত্বের ও রাজ্যের দাবি হিন্দুদের স্বীকার করিতে হইবে। মিলনের আশা ক্রমেই সুদূরে যাইতে লাগিল।

ইংরেজ কূটনীতিকদের ভাবনা বহুদূর প্রসারী— তাহারা জন্মগত রাজনীতি-বিশারদ। লর্ড ওয়াভেল ভারতের বড়লাট হইয়া আসিয়াছেন। জাপান যুদ্ধে নামিবার পর প্রাচ্য রণাঙ্গনের সেনাপতি ওয়াভেলকে ভারতে বড়লাট করিয়া পাঠান হইয়াছিল (১৯৪৩); জাপানীদের কীভাবে বাধা দিতে হইবে এবং তজ্জন্য কী কী করণীয় সেই-সব ব্যবস্থা তাহারই সময় সুদৃঢ় হয়। বাংলার দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি তাঁহারই সময়ের ঘটনা। এ দিকে যুদ্ধের গতি মিত্রশক্তির অনুকূলে ফিরিয়াছে। ১৯৪৫ সালে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু হইয়া আসিল;

নাৎসীবাহিনী সোবিয়েত রুশকে ধ্বংস করিবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া নিজের সর্বস্ব খোয়াইয়াছে ও অবশেষে পরাভব মানিয়া রুশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। জারমেনী পরাভব মানিল শুধু নয়— তাহার দেশ রুশ, ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকানরা ভাগাভাগি করিয়া দখল করিয়া বসিল। নাৎসীবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইল জারমেনির ধ্বংস। ফ্যাসিজিমের অবসান ঘটিল ইতালিতে— বিদ্রোহীরা তাহাদের একছত্র নেতা মুসোলিনীকে গুলি করিয়া হত্যা করিল। সুভাষচন্দ্রের ভরসা ছিল জাপান-জারমেনী-ইতালি ত্রি-অক্ষশক্তির উপর; তাঁহার শ্রদ্ধাও ছিল এই এক-নায়কত্বে। সেদিক হইতে সুভাষের ভারত-মুক্তির স্বপ্ন বুদ্‌বুদের ন্যায় ভাঙিয়া গেল।

ভারতের অচল অবস্থার অবসান করিবার জন্য বড়লাট ওয়াভেল বিলাতে গিয়া (জুন ১৯৪৫) প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও ভারত-সচিব আমেরীর সহিত পরামর্শ করিয়া আসিলেন এবং সিমলায় একটি বৈঠক আহ্বান করিলেন। হিন্দু ও মুসলমান, কন্‌গ্রেস ও লীগের ১৩ জন প্রতিনিধি বৈঠকে আহূত হইলেন। কন্‌গ্রেসের পক্ষ হইতে মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন। আজাদ সাহেব ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরোভাগে আছেন দীর্ঘকাল, ইঁহার ন্যায় ইসলামী পণ্ডিত দুর্লভ। ইঁহাকেই জিন্না-সাহেব একবার বলেন, "I refuse to discuss with you by correspondence or otherwise, as you have completely forfeited the confidence of Muslim India." লীগের শাসনকালে কলিকাতায় ঈদের নমাজের সময়ে আজাদকে তাহারা ইমামের কাজ করিতে দেয় নাই— তাহাদের চক্ষে তিনি খাঁটি মুসলমান নহেন —যেহেতু তিনি হিন্দুদেরও মঙ্গল চাহেন ও একত্র প্রতিবেশীর ন্যায় বাস করিতে বলেন। অথচ তাঁহার ন্যায় বড় উলেমা মুসলমান-জগতে তখন কমই ছিল।

সিমলার বৈঠকে (২৫ জুন—১৪ জুলাই ১৯৪৫) জিন্না-সাহেব দাবি করিলেন যে, শাসন-পরিষদের সকল সদস্যই মুসলিম লীগের মনোনীত হইবেন। বড়লাট এই মনোভাব সমর্থন করিতে না পারায় সিমলা-বৈঠক ভাঙিয়া গেল। সিমলা-বৈঠক শেষ হইতে না হইতে জানা গেল ১৯৪৫-এর জুলাই মাসে গ্রেট ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীলদের পরাজয় ঘটিয়াছে—মিঃ চার্চিল প্রধান

মন্ত্রীর পদ হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইয়াছেন। এবার পার্লামেণ্ট অধিকার করিয়াছেন শ্রমিক দল; মিঃ এটলী হইলেন প্রধান মন্ত্রী, পেথিক লরেন্স ভারত-সচিব।

শ্রমিক দল পার্লামেণ্টে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হইয়াই ভারতের সহিত শান্তি স্থাপন করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে চার্চিল প্রধান মন্ত্রী হইয়া ভারত-স্বাধীনতা সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যকে ধোঁয়া করিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য মন্ত্রিত্ব লন নাই। আজ তাঁহার পরবর্তী প্রধান মন্ত্রীর মনে হইতেছে যে, ভারতকে সময়মত ছাড়িতে পারিলেই ব্রিটেনের ভাবী মঙ্গল।

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে শ্রমিক সরকার ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসার জন্য ক্যাবিনেট মিশন পাঠাইলেন; এই মিশনে ছিলেন ভারত-সচিব পেথিক লরেন্স, ষ্ট্রাফোর্ড ক্রীপস ও আলেকজাণ্ডার। চারি বৎসর পূর্বে চার্চিল প্রধান মন্ত্রী থাকা কালে ক্রীপসকে তিনি ভারতে পাঠাইয়াছিলেন (মার্চ ১৯৪২)। সেবার ক্রীপসের দৌত্য ব্যর্থ হয়। এই মন্ত্রীত্রয় ও বড়লাট ওয়াভেল ভারতীয় নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহা বুঝিলেন, তাহার নির্গলিত অর্থ হইতেছে, কন্‌গ্রেস ও লীগের মধ্যে মিলনের কোনো আশা নাই; কন্‌গ্রেস দাবি করেন, তাঁহারা নিখিল ভারতের প্রতিনিধি—তাঁহাদের কাছে রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন গৌণ— তাহারা ভারতবাসী—ইহাই তাহাদের মুখ্য পরিচয়। মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগ মনে করেন তাঁহারাই মুসলমান জাতির (Nation) হইয়া কথা বলিবার একমাত্র অধিকারী, কন্‌গ্রেস হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান, মিঃ গান্ধী হিন্দুদের নেতা।

কন্‌গ্রেস-লীগের তিন সপ্তাহ ব্যাপী ব্যর্থ কথাবার্তার পর মিঃ জিন্না ফিরিয়া গেলেন বোম্বাই-এ মালাবার হিলে তাঁহার প্রাসাদোপম অট্টালিকায়; গান্ধীজি ফিরিয়া গেলেন সেবা-গ্রামের পর্ণ কুটিরে।

গান্ধীজি বলিলেন, "Mr Jinnha is sincere, but I think he is suffering from hallucination when he imagines that an unnatural division of India could bring happiness or prosperity to the people concerned." জিন্না-সাহেব বলিলেন, "Here is an apostle and a devotee of non-violence threatning us with a fight to the

knife···for an ordinary mortal like me there is no room in the presence of his inner-voice."

মুসলমান স্বতন্ত্র স্টেট বা রাষ্ট্র চায়—তাহারা হিন্দুর সহিত শরীকিয়ানায় বাস করিতে অনিচ্ছুক। ক্যাবিনেট মিশন বিলাত হইতেই ফেডারেশন শাসন তন্ত্রের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া আসিয়া ছিলেন। ইহাদের প্রস্তাবে ভারতের প্রদেশগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; ভারতের দেশীয় রাজাদের ও ফেডারেশনে যোগদানের ব্যবস্থা প্রস্তাবের মধ্যে ছিল। কিন্তু মুসলিম লীগের দাবি, উত্তর-পশ্চিম ভারত ও উত্তর-পূর্ব ভারত লইয়া পাকিস্তান নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাই; এ প্রস্তাবে ক্যাবিনেট মিশন সরাসরি সম্মত হইতে পারিলেন না। পঞ্জাব ও বঙ্গদেশ ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাব সমীচীন হইবে না বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন। মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলিতে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের সুপারিশ করিয়াও পাকিস্তানের পৃথক রাষ্ট্র পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত তখনই গ্রহণ করিলেন না। তবে এইটুকু বলিলেন, প্রত্যেক প্রদেশকে কালক্রমে রাষ্ট্রসংহতি বা ফেডারেশন হইতে বাহির হইয়া আসিবার অধিকার দেওয়া হইবে। এই মিশন সম্মিলিত গণপরিষদ (Constituent assembly) বা অন্তর্বর্তী সরকার (Interim Government) গঠনের সুপারিশ করিয়া গেলেন। যতদিন না গণপরিষদকৃত সংবিধান প্রস্তুত ও নূতন শাসন-সংস্থা গঠিত ও কার্যকারী হয় ততদিন অন্তর্বর্তী সরকার বা ইন্‌টেরিম গর্বমেণ্ট কার্য চালাইবেন।

মুসলিম লীগ সরাসরি পাকিস্তান স্বতন্ত্র রাষ্ট্র না পাইয়া উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল। ১৯৪২ সালের অগস্টমাসে কন্‌গ্রেসের প্রস্তাবানুসারে দেশব্যাপী যে বিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহা ভারতের স্বাধীনতার জন্য; ১৯৪৬ সালে অগস্ট মাসে মুসলমানরা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (direct action) বা জেহাদ শুরু করিল— তাহা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হইয়া পড়িল গিয়া হিন্দু প্রতিবেশীর উপর, — কারণ, হিন্দুরাই তাহাদের পৃথক রাষ্ট্রগঠনের প্রতিবন্ধক ;— অতএব তাহাদের ধ্বংস করো— আতঙ্কিত করো। কলিকাতায় ও পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলায় হিন্দু-নিধন চলিল; তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সহীদ সুরাবর্দী, মুসলিম লীগের নেতা। তাঁহার প্রত্যক্ষ প্ররোচনা না থাকিলেও তাঁহার অজ্ঞাতে কোনো কার্যই হয় নাই ইহাই সমসাময়িক লোকবিশ্বাস। কারণ মুসলিম লীগ

পূর্বাহ্নে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া দিবালোকে হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল— কলিকাতা ফোর্ট হইতে সৈন্য আসিয়া তাহা দমন করিবার কোনো চেষ্টা করিল না। নোয়াখালিতে অকথ্য অত্যাচার চলিল সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুর উপর।

কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড এক-তরফায় সীমিত থাকিল না। অচিরকালের মধ্যে বিহারের হিন্দুপ্রধান স্থানে মুসলমাননিধন চলিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের নানাস্থানে হত্যার তাণ্ডব চলিল। অহিংসাবাদী কন্‌গ্রেস দাঁড়াইয়া মার খাইবার নীতি শিক্ষা পাইয়াছিল— মুসলমানরা এই ক্লীবধর্মে শ্রদ্ধাহীন, কম্যুনিষ্টরা অসহায়ভাবে 'শান্তি হউক' আওয়াজ হাঁকিতে লাগিলেন। পরিস্থিতি সর্বত্র এমনিই গুরুতর হইয়া উঠিল যে, হিন্দু শিখ সকলেই তারস্বরে বলিতে লাগিল মুসলমানকে 'পাকিস্তান' দেওয়া হউক। হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে উৎপীড়িত মুসলমানরাও পাকিস্তানে যাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিল।

সেই হইতে মুসলমানসংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হইতে হিন্দুরা আতঙ্কিত হইয়া দেশত্যাগী হইতে আরম্ভ করিল। এক বৎসরের মধ্যে 'পাকিস্তান' স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় হিন্দুপ্রধান অঞ্চল হইতেও মুসলমানরা তাহাদের ইসলামিক রাষ্ট্রে মুহাজরিন করিল। পূর্ববঙ্গ হইতে ১৯৪৬ হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে প্রায় ২১ লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে; আসাম ও ত্রিপুরার মধ্যেও বহু লক্ষ নিরাশ্রয় আশ্রয় লয়। সেই স্রোত ১৯৫৭ সালেও বন্ধ হয় নাই।

পশ্চিম পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুদেশ প্রায় হিন্দু ও শিখশূন্য হইয়াছে; আবার পূর্ব পঞ্জাব হইতেও বহু লক্ষ মুসলমান পশ্চিম পঞ্জাবে ও সিন্ধু প্রদেশে গিয়াছে। এইভাবে পাকিস্তানের সূত্রপাত হইল।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবমত ১৯৪৬ সালের ২২ জুলাই বড়লাট লর্ড ওয়াভেল অন্তর্বর্তী শাসন-পরিষদ গঠনের সংকল্প গ্রহণ করিলেন; মুসলিম লীগ সরাসরি প্রথমে এই পরিষদে যোগদান করিবেন না স্থির করিলেন, কিন্তু কন্‌গ্রেস রাজি হইলেন। অবশ্য পরে মুসলিম লীগ যোগদান করিলেন বটে, কিন্তু তাহা বাধা সৃষ্টির জন্য, যুক্তরাজ্য চালনার অভিপ্রায়ে নহে। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবমত ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবার কথা। কিন্তু মুসলিম লীগের আপত্তি হইল এই বলিয়া যে, মুসলমানপ্রধান যে

প্রদেশ গঠিত হইবার কথা ক্যাবিনেট মিশন স্বীকার করিয়াছেন— সেই-সব প্রদেশের উপর এই সাধারণ গণপরিষদের সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত কার্যকারী হইতে পারে না, তাহারা পৃথকভাবে ঐ-সকল প্রদেশের জন্য রাষ্ট্রকাঠামো বা সংবিধান রচনা করিবেন। অর্থাৎ অন্তর্বর্তী শাসন-পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াও তাঁহারা যৌথভাবে নিখিল ভারতীয় সংবিধানাদির খসড়া প্রস্তুত করিতে রাজি নহেন। জবহরলালের যুক্তি এই যে, মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মানিয়াই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা অসহযোগ করিলেও গণপরিষদের কার্য মুলতুবী হইতে পারে না। অসম্ভব পরিস্থিতি। এই-সকল বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে ৯ই ডিসেম্বর (১৯৪৬) গণপরিষদের অধিবেশন বসিল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ হইলেন ইহার অস্থায়ী সভাপতি। ভারতের সংবিধান রচনা শুরু হইল।

১৯৪৭ সালের জুন মাসে ব্রিটিশ সরকার লীগের কঠোর ও অনমনীয় মনোভাব দেখিয়া অথবা আরও কোনো গভীর উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, যে সকল প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য, তথাকার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি পৃথক গণপরিষদ রচনায় ভোট দিতে পারিবেন; লন্ডন হইতে ভারত-বিভাগের ফিরিস্তি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, তাহাই ঘোষিত হইল। ১৯৪৭ সালের জুন মাসের তিন তারিখে জানানো হইল, পনেরোই অগস্ট ভারত বিভক্ত করিয়া দুইটি রাষ্ট্র গঠিত হইবে। বাহাত্তর দিনের মধ্যে দুই দেশের ভাগবাঁটোয়ারা, অসংখ্য জটিল প্রশ্নের মীমাংসা অসম্ভব বুঝিয়াও নূতন রাষ্ট্র পাইবার জন্য উভয় দলেরই ব্যস্ততা— তাহার একটা কারণ, চারি দিকে মনকষাকষি, দাঙ্গাহাঙ্গামা, অবিশ্বাস লাগিয়াই আছে। উভয় পক্ষই ত্বরিত মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, কারণ কোথাও শান্তি নাই। কূট-নীতিজ্ঞ ব্রিটিশরাও আড়াই মাসের মধ্যে কোনোরকমে দুই দলকে সন্তুষ্ট করিয়া সরিয়া পড়িয়া নিষ্কৃতি চায়। ইংরেজ জানে, যেভাবে এলোমেলো করিয়া সব রাখিয়া তাহারা ভারত ত্যাগ করিতেছে— তাহা লইয়া হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধ চিরস্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে। ঘোষণার এক বৎসর পরে বা আরো দীর্ঘ সময় লইয়া ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় দিয়া পার্টিশন কায়েম হইলে উভয়েরই সুবিধা হইত। হয়তো পরবর্তীকালে উভয় স্টেটের মধ্যে মতান্তর মনান্তরের অনেক প্রশ্ন পূর্বাহ্লেই মীমাংসিত হইয়া যাইত।

ভারত ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাব হইতে জানা গেল, পঞ্জাবের পশ্চিম অংশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান লইয়া একটি অংশ এবং বঙ্গদেশের উত্তর ও পূর্বাংশ এবং আসামের সিলেট লইয়া পাকিস্তান রাজ্য গঠিত হইবে। ভারত-সম্রাটের শেষ ঘোষণায় বলা হইল যে, ১৪ই অগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ই অগস্ট ভারত স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে গণ্য হইবে।

পঞ্জাব ও বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইবার প্রস্তাব-মুহূর্ত হইতে অ-মুসলমানদের সহিত মুসলমানদের দাঙ্গা বাধিয়া গেল। বহুকাল হইতে শিখদের সহিত পঞ্জাবের মুসলমানদের মন-কষাকষি চলিতেছিল; শিখরা মনে করিত, পঞ্জাব তাহাদেরই— যেহেতু শতাব্দীকাল পূর্বে ঐ দেশ শিখরাজ্যই ছিল— ব্রিটিশ যদি ভারত ত্যাগ করে তবে তাহারাই হইবে ঐ রাজ্যের উত্তরাধিকারী। শিখরা পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব-মুহূর্ত হইতেই ভীষণ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছিল। মাষ্টার তারা সিংহ ভারতে আশ্রয় পাইবার পূর্বে পঞ্জাবে যথেষ্ট দম্ভ প্রকাশ করিতেন। সুস্থ মস্তিষ্ক লোকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, ইহাদের আচরণের প্রতিক্রিয়ায় একদিন গভীর দুর্ঘটনা ঘটিবে। হিন্দুদের মধ্যে রাষ্ট্রীয়-সেবক-সংঘের সদস্যেরা কম উগ্র ছিলেন না। সাম্প্রদায়িক উগ্রতায় মুসলমান, হিন্দু, শিখ কেহই পশ্চাদপদ ছিলেন না। আজ পূর্ব পঞ্জাবে মুসলমানরা নগণ্য, কিন্তু শিখ ও হিন্দুরা সুখে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে পারিতেছে না।

জুন মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্র হইবে ঘোষিত হইবার পর হইতে প্রদেশময় দাঙ্গা বিক্ষোভ আরম্ভ হইল। তারপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব মুহূর্ত হইতে মুসলমানরা শিখ ও হিন্দুদের ধ্বংস করিবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। সে-ঘটনা পশ্চিম-পঞ্জাবে সীমিত থাকিল না; পূর্ব-পঞ্জাবে মুসলমানদের উপর শিখ ও হিন্দুরা সেই হত্যাকাণ্ডাদি বীভৎসভাবেই করিতে লাগিল। কয়েকটি শিখ রাজ্য হইতে মুসলমান প্রায় নিশ্চিহ্ন হইল। পাকিস্তান সরকার পরে মোটামুটিভাবে হিসাব করিয়া বলেন যে, পার্টিশনের প্রতিক্রিয়ায় ভারত হইতে প্রায় ৬৫ লক্ষ লোক পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবেশ করে— অধিকাংশই আসে পূর্ব পঞ্জাব হইতে— তবে দিল্লী উত্তর-প্রদেশেরও বহু সহস্র লোক পলায়ন করে। হিন্দু ও শিখ কম করিয়াও ৫৫ লক্ষ পঞ্জাব হইতে নিশ্চিহ্ন হয়—

ইহাদের মধ্যে নিখোঁজ ও নিহতের সংখ্যা কম নহে। পঞ্জাবের মুসলমানরা ১৯৪৬ হইতে যুদ্ধাবশিষ্ট সামরিক-সামগ্রী-সরবরাহ-কেন্দ্র হইতে জীপ মোটর-গাড়ি, হাতবোমা ও বহুবিধ যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয় করিয়াছিল। ১৯৪৭-এ তাহারা সেই-সব সামগ্রীর ব্যাপক ব্যবহার করিয়া পশ্চিম-পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ হইতে হিন্দু ধ্বংস ও বিতাড়ন করিয়াছিল।

বাংলাদেশে পূর্বাঞ্চলে মুসলমান জনতার তাণ্ডব চলিল হিন্দুদের উপর। ধনী ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোকেরা দেশের অবস্থা বেগতিক দেখিয়াই সরিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। উভয় গবর্মেণ্ট মারাত্মক ভুল করিলেন— সরকারী কর্মচারীগণ কোথায় চাকুরি করিবেন সে সম্বন্ধে ১৫ই অগস্ট-এর মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদের প্রতিক্রিয়ায় প্রায় একদিনের মধ্যেই পূর্ববঙ্গ হিন্দু সরকারী কর্মচারী শূন্য হইয়া গেল। পশ্চিম বাংলাদেশেও সেই দশা হইল। মুসলমান কর্মচারীরা পূর্ববঙ্গে চলিয়া গেলেন।

এই নিদারুণ পরিবেশের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্রদ্বয়ের জন্ম হইল। গত অর্ধশতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনের পরিণাম হইল খণ্ডিত ভারতের সৃষ্টি— হিন্দু-মুসলমানের মিলন-স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। তাহার স্থলে প্রচণ্ড বৈরীভাব উভয় রাষ্ট্রবাসীরই দেহ ও মনকে জীর্ণ করিতে লাগিল। বাংলা-দেশে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম ও আচার ছাড়া সর্ববিষয়ে একটি জাতি ছিল— এইবার তাহারা হইল দুইটি জাতি— বাঙালি ও পাকিস্তানী।

১৫ই অগস্ট হইতে ভারত স্বাধীন হইলেও লর্ড মাউণ্টবেটনই গবর্নর-জেনারেল থাকিলেন, কারণ এখনো ভারতের সংবিধান বা কনষ্টিটিউশন প্রস্তুত হয় নাই। প্রধান মন্ত্রী হইলেন জবহরলাল নেহরু। পাকিস্তানের সৃষ্টিকর্তা মিঃ জিন্না হইলেন প্রথম গবর্নর জেনারেল বা কায়েদা আজম; লিয়াকৎ আলি প্রধান মন্ত্রী।

ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করিল গান্ধীজির দাবি পূরণ করিয়া; তাহারা ভারত খণ্ডিত করিল মিঃ জিন্নার দাবি রক্ষা করিয়া। ব্রিটিশরা প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে মুসলমান-সমাজকে তৃপ্ত করিবার জন্য বঙ্গচ্ছেদ করিয়াছিলেন; বাঙালি— বিশেষ করিয়া হিন্দু বাঙালি যুবকরা এই দীর্ঘকাল নানাভাবে উত্তর ভারতে বিদ্রোহ ও বিপ্লব আনিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া সরকারকে ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল— তাহার অবসান হইল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান-অধ্যুষিত

পূর্ববঙ্গ বা পূর্বপাকিস্তান সৃষ্টির দ্বারা। ব্রিটিশের দূর প্রসারিত ভাবনা রূপ লইল; ভারত মহাদেশে দুই বিবদমান তথাকথিত 'ধর্মপ্রাণ' জাতিকে দুইটি রাষ্ট্র দান করিয়া ও বিবাদের বহু সূত্র রাখিয়া তাহারা ভারত ত্যাগ করিল। ব্রিটিশ ডিপ্লমেসি বা কূটনীতিরই জয় হইল।

ভারতে বিপ্লববাদ

ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য বিচিত্র পন্থা অনুসৃত হইয়াছিল ; বিধি-সংগত আন্দোলন দ্বারা সাংবিধানিক সংস্কার ও শাসন -ব্যাপারে ভারতীয়দের অধিকার সাব্যস্ত করার চেষ্টা চলে একটি ধারায়। অপরটি বিপ্লবাত্মক সন্ত্রাস-বাদের পথ ধরিয়া চলে। আন্দোলনের আদিযুগ হইতে স্বাধীনতালাভের সময় পর্যন্ত দীর্ঘকাল সুযুক্তিপূর্ণ নিবন্ধাদি রচনা ও প্রকাশ এবং ন্যায় অধিকার সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দ্বারা দেশের সুপ্ত মনকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। 'ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের কিছু দিল না', 'ইংরেজ প্রজার অভিযোগে আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করিল না' এই বলিয়া আমরা অভিমানভরে ইংরেজের সংসর্গ-ত্যাগ, তাহার পণ্যবর্জন, তাহার বিদ্যালয় বয়কট প্রভৃতি বিচিত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলাম। 'বয়কট' আন্দোলনের পরে আসিয়াছিল 'অসহযোগ' আন্দোলন ; বলা বাহুল্য বয়কট বা বর্জননীতির নামান্তর অসহযোগ। সকল আন্দোলনের মূল অভিপ্রায় ইংরেজকে জব্দ করা এবং তজ্জন্য বিচিত্র পন্থা অবলম্বন করিয়া তাহার কৃপণ হস্ত হইতে সুবিধাসুযোগ আদায়। এই পদ্ধতি বা মনোবৃত্তিকে বিপ্লব বা রেভোলিউশন আখ্যা দেওয়া যায় না।

বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য, মানুষের মনের মধ্যে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করা ; সে-স্বাধীনতাস্পৃহা মানবমনের সর্বোদয় অর্থাৎ ধর্মে, সমাজে, অর্থনীতিতে ও রাজনীতির সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা। কিন্তু ভারতের বিপ্লববাদের মধ্যে এই সর্বোদয়ের ভাবনা আসিয়া ছিল কি না, তাহাই বিবেচ্য। আমরা এই গ্রন্থের প্রথমাংশে ভারতীয় নেতাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের জন্য প্রচেষ্টার কথা বিবৃত করিয়াছি— তাহাতে মনের মুক্তি বা মানসিক বিপ্লব-সৃষ্টির আবেদন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। যাঁহারা সমাজে মানুষের অধিকার দানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা সমাজসংস্কারক বা সমাজ-বিপ্লবী ; যাঁহারা ধর্মের রাজ্যে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহারা ধর্মতত্ত্বের সীমানা অতিক্রম করিতে পারে নাই ; এবং যাঁহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের

মূলে কোনো দার্শনিকতা ছিল না বলিয়া বিপ্লবপ্রচেষ্টা সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থ-মরুতে দিশাহারা হইয়াছিল ;—বিপ্লব মানুষের জীবনে সর্বোদয় আনিবে— ইহাই আদর্শ, ইহাই কাম্য ; কিন্তু তাহা আমাদের জাতীয় জীবনে সফল হয় নাই— তাহার প্রমাণ স্বাধীনতালাভের পর ভারতের সামাজিক অরাজকতা ও অনাচার এবং ধর্মীয় অন্ধতা ও মূঢ়তার বিরামহীন আলোড়ন। ভারতীয় বিপ্লব বা সন্ত্রাসবাদের পশ্চাতে না ছিল দার্শনিক তত্ত্ব, না উহার প্রতিষ্ঠা ছিল বিজ্ঞানসম্মত মতের উপর। বিপ্লববাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল গীতার কদর্থ ও হিন্দুধর্মের শক্তিমন্ত্রের উপর। সাম্প্রদায়িক ধর্মাশ্রয়ী বিপ্লববাদ দেশব্যাপী বিপ্লব আনিতে পারে না। মুসলমান-সমাজে বিপ্লববাদ বা সন্ত্রাসবাদ আসে নাই ; তবে ধর্ম ও সম্প্রদায়ের স্বার্থে 'কাফের' হত্যা বা হিন্দুর উপর জবরদস্তি করিয়া তাহারা শহীদ হইয়াছে। ভারতেব মুক্তির জন্য যে-সব যুবক 'নিহিলিষ্ট' পদ্ধতি বা সন্ত্রাসবাদের পথাশ্রয়ী হয়, তাহাব মধ্যে মুসলমানদের খুব কমই পাওয়া গিয়াছিল।

ভারতের উপর ব্রিটিশ আধিপত্য অবসানের জন্য বিচিত্রপ্রয়াস হইয়া আসিতেছে। সিপাহী-বিদ্রোহ ইহার প্রথম ব্যাপক প্রচেষ্টা। কিন্তু সে বিদ্রোহের পটভূমে কোনো দার্শনিকতত্ত্ব ছিল না, কোনো বিরাট সাহিত্যে মানুষের মনে তাহার বুনিয়াদ পাকা করিতে পারে নাই। ইহা আংশিকভাবে ব্যাপক হয়— কিন্তু আদৌ গভীর হয় নাই। স্বাধীনতালাভের প্রথম আত্মপ্রকাশ হয় বাঙালির সাহিত্যে— তাহার কাব্যে, গানে, নাটকে, ব্যঙ্গরচনায়, গল্পে, প্রবন্ধে। সাহিত্যের মধ্য দিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু লেখক অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বিদ্রোহের কাহিনী নাটকে, কাব্যে, উপন্যাসে বর্ণিত করিয়াছিলেন। মধ্যযুগীয় নায়ক-নায়িকাদের মুখে যে সব কবিতা বা বাণী প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা এককালে বাঙালির মুখে মুখে আবৃত্তি হইত—'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়', হেমচন্দ্রের ভারত-সংগীতের 'বাজরে শিঙা বাজ ঐ রবে' মুখস্থ ছিল না এমন শিক্ষিত যুবক দেখা যাইত না। নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধে' মোহনলালের খেদোক্তি অনেকেই আবৃত্তি করিতে পারিত। স্বদেশী-আন্দোলনের সময় হইতে

বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' বাঙালির ভাবপ্রবণ হৃদয়কে একেবারে জয় করিয়া লইল—দেবীচৌধুরাণীর বাস্তবতাশূন্য আদর্শবাদ বাঙালিকে এক দিন ডাকাতি করিতে উদ্‌বোধিত করে।

আর-এক শ্রেণীর সাহিত্য হইতেছে পাশ্চাত্য দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম কাহিনী। ইংরেজি শিক্ষার গুণে ভারতীয় যুবকগণ য়ুরোমেরিকার অত্যাচারী রাজা ও সংস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইতিহাস পাঠ করিয়া ভারতে তাহার প্রয়োগ-পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখে। ক্রমওয়েলের কীর্তি, ফরাসী-বিপ্লবের কাহিনী, আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম, অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইতালির বিদ্রোহ প্রভৃতির ইতিহাস পাঠ করিয়া বাঙালি প্রথম উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বাঙালিকে সর্বাপেক্ষা বেশি আকর্ষণ করিয়াছিল প্রায় সমসাময়িক ইতালির স্বাধীনতা-সংগ্রাম। বাংলায় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ম্যাৎসিনি, (১৮০৫-৭২) গ্যারিবলডী (১৮০৭-৮২) জীবনকথা অতি বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন। উইলিয়ম ওয়ালেস স্কটল্যাণ্ডে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া কী ভাবে প্রাণ দেন সে কাহিনীও তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এতদ্‌ব্যতীত রুশে জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিহিলিস্টদের গুপ্তহত্যাকাহিনী বাঙালি শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত যুবকদের কম উত্তেজিত করে নাই।

ভারতের মধ্যে ইংরেজদের প্রভুত্ব ধ্বংস করিবার জন্য উনবিংশ শতকের শেষ সিকায় রাজনারায়ণ বসু প্রমুখের 'সঞ্জীবনী' সভার কাজকর্ম ম্যাৎসিনীর কার্বোনারি সমিতির আদর্শে গঠিত হয়; কিন্তু ইহার সঙ্গে তাঁহারা জুড়িয়া দেন লাল-শালু-মোড়া বেদস্পর্শ, রক্ত দিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র সহি ইত্যাদি রাহস্যিকতা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'আত্মপরিচয়ে' বলিতেছেন, "জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন। ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি, আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান। রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত। সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলুম।"

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বাঙালি উহাতে যোগদান করে নাই বলিয়া উত্তর ভারতের লোকে বাঙালিকে কৃপার চক্ষে দেখিত এবং 'ভীরু বাঙালি' অপবাদে তাহাকে ধিক্কৃত করিত। সৈনিক বিভাগে ইংরেজ সরকার বাঙালিকে লইত না—সে দেহে অপটু বলিয়া। মহারাষ্ট্রীয় উচ্চ বর্ণদের লইত না সেই

অজুহাতে। আসলে বাঙালি ও মারাঠির মনের দৃঢ়তা ও বুদ্ধির প্রাখর্যকে তাহারা ভয় পাইত। বাঙালি ও মারাঠির মনে প্রায় যুগপৎ এই দৈহিক দৌর্বল্য দূর করিয়া ভারতে শক্তিমান জাতিরূপে পরিচয় লাভের তীব্র বাসনা দেখা দিয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশে পুণা নগরে বাল গঙ্গাধর টিলক যে-সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় সেখানে যে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হইয়াছিল, তাহার ইতিহাসও বলিয়াছি।

বাংলাদেশে শারীর চর্চার আবেদনও একদিন বাঙালিকে স্পর্শ করিল; রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নেয়ী সরলা দেবী ও ব্যরিষ্টার পি· মিত্র. প্রভৃতি কতিপয় উৎসাহীহৃদয় কলিকাতায় উনবিংশ শতকের শেষ দিকে যুবকদের লইয়া একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতির উদ্দেশ্য যুবকদের নৈতিক, মানসিক, দৈহিক উন্নতি সাধন। এই শ্রেণীর সমিতি বা club গঠন একটি নূতন প্রয়াস; অবশ্য ইহাও য়ুরোপের ইতিহাস হইতে সংগৃহীত পদ্ধতি। এই প্রচেষ্টাই কালে অনুশীলন-সমিতি নামে খ্যাত হয়। 'অনুশীলন' কথাটি বঙ্কিমচন্দ্রের এক গ্রন্থ হইতে গৃহীত। এই সমিতিতে প্রথম দিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। কালে (১৯২১) ধীরে ধীরে এই-সকল আখড়ায় গুপ্ত-সমিতির ভাবলক্ষণ দেখা গেল।

বাংলাদেশে ১৯০২ সালে বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'New India' সাপ্তাহিক মামুলি রাজনীতি চর্চার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভ্যালেনটাইন ফিরোল তাঁহার 'ভারতে অশান্তি' (Unrest in India) নামক গ্রন্থে টিলককে Father of Indian unrest আখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার মতানুসারে বাঙালির মধ্যে টিলকের দুইজন প্রধান শিষ্য— বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ। ইঁহারা উভয়ে নাকি টিলকের মহিমাময় প্রভাবে দীক্ষিত হইয়া 'ভারতবাসীর জন্য ভারতবর্ষ' এই ভয়ঙ্কর মতের প্রচার করিয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র New India-র মাধ্যমে নবভাবের বীজটিকে আপন মৌলিক প্রতিভার আলোকে বেশ যোগ্যতার সহিত প্রচার করেন। এই পত্রিকার মূল মন্ত্র ছিল স্বাজাত্যবোধ ও আত্মনিষ্ঠা। স্বদেশী বা বয়কট আন্দোলনের বহুপূর্বেই বিপিনচন্দ্র ভারতেও বিশেষভাবে বাংলাদেশে যুবকদের মনে বিপ্লবীভাব আনয়ন করিয়াছিলেন।

ভারতের পশ্চিম দিকে বড়োদা নগরে গয়কাবাড়ের রাজকীয় কলেজের

অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ নীরবে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। অরবিন্দের চেষ্টায় বাংলাদেশ হইতে আগত যতীন্দ্রনাথ (পরে নিরলম্বস্বামী) সামরিক শিক্ষালাভ উদ্দেশ্যে ছদ্মনামে সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন। ১৯০২ সালে অরবিন্দ স্বয়ং বাংলাদেশে আসেন সেখানে গুপ্তসমিতির বীজ বপনের উদ্দেশ্যে। আমরা বাংলাদেশের বৈপ্লবিক সমিতির কথা অন্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব।

পশ্চিম ভারতের পুণা ও নাসিক হিন্দুদের প্রধান কেন্দ্র। পুণার শিবাজী-উৎসব ও তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলীকে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার আদিযজ্ঞ বলা যাইতে পারে। তবে প্লেগ-অফিসারদের হত্যাদি ব্যাপারকে যথার্থভাবে জাতীয়-আন্দোলন বা মুক্তি-আন্দোলন আখ্যা দিতে না পারিলেও দেশমধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ গুমরাইয়া উঠিতেছিল, ইহা তাহারই প্রকাশ বলিয়া মানিতেই হইবে।

কিন্তু ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বিপ্লবী কর্ম আরম্ভ হয় বিংশ শতকের প্রারম্ভভাগে। শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা নামে জনৈক কাঠিয়াবাড়ি (গুজরাটি) ইংল্যন্ডে গমন করেন। ১৯০৫ সালে জানুয়ারি মাসে অর্থাৎ বাংলাদেশে যখন বঙ্গচ্ছেদ লইয়া তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময়ে কৃষ্ণবর্মা লন্ডনে Indian Home Rule Society স্থাপন করেন এবং 'Indian Sociologist' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ভারতের জন্য হোমরুল বা স্বায়ত্ত শাসন দাবি। কৃষ্ণবর্মা য়ুরোপের ধনী ভারতীয়দের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কয়েকজন যুবককে ভারত হইতে য়ুরোপে লইবার ব্যবস্থা করেন। এই অর্থ-সাহায্যে তাঁহার প্রধান সহায় হন প্যারিস নগরীর শ্রীধর রণজিৎ রাণা নামে জনৈক কচ্ছি জহরত ব্যবসায়ী। শ্রীধর দুই হাজার টাকা করিয়া শিবাজী, প্রতাপসিংহ প্রভৃতির নামে বৃত্তি দান করেন। যে-সকল যুবক শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার ব্যবস্থায় য়ুরোপে উপস্থিত হন তাঁহাদের মধ্যে বিনায়ক সবরকারের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। লোকমান্য টিলকের সুপারিশে সবরকারকে শিবাজী পুরস্কার প্রদত্ত হয়। এই সময়ে ইংল্যন্ডে ছিলেন শ্রীমতী কামা (পারসি মহিলা), লালা হরদয়াল ও ভাই পরমানন্দ— সকলেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত।

বোম্বাই প্রদেশে নাসিক নগরীতে বিনায়ক ও তাঁহার ভ্রাতা গণেশ সবরকার বহুকাল হইতে মারাঠি যুবকদের মধ্যে নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য চেষ্টা

করিতেছিলেন। ১৮৯৯-এ উভয়ে মিলিয়া 'মিত্রমেলা' নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। ইহা অনেকটা অনুশীলন-সমিতির ন্যায় সঙ্ঘ। গণেশ সবরকার মহারাষ্ট্রীয় বালক ও যুবকদের শারীরিক ব্যায়াম ও কুচকাওয়াজ প্রভৃতি তত্ত্বাবধান করিতেন।

বিলাতে গিয়া বিনায়ক সবরকার 'ইন্‌ডিয়া হাউস' নাম দিয়া একটি বাড়ি ভাড়া করেন; ইহা হইয়া দাঁড়াইল ভারতীয় ছাত্র ও অতিথিদের একটি বোর্ডিং-হাউস। তাছাড়া উহা কৃষ্ণবর্মা ও সবরকার প্রভৃতিদের বিপ্লব-প্রচারের কেন্দ্র হয়। লন্‌ডন বাসকালে সবরকার সিপাহী-বিদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রকাশকরূপে কোনো ব্রিটিশ কোম্পানি পাওয়া গেল না— অবশেষে উহা প্রকাশিত হইল হল্যান্‌ডে। সিপাহী-বিদ্রোহ সম্বন্ধে এতাবৎকালের বদ্ধমূল ধারণার বিরুদ্ধে ইহা প্রথম জেহাদ। এই পর্বে বাংলাদেশে অক্ষয় মৈত্রে লেখেন 'সিরাজদৌল্লা'; যাহাতে অন্ধকূপহত্যার অতিরঞ্জিত কাহিনী মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

এ দিকে বিলেতে হাউস অব কমন্সে কৃষ্ণবর্মা ও তাঁহার সঙ্গীদের কর্মপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা হইতে দেখিয়া কৃষ্ণবর্মা বুঝিলেন ইংল্যান্‌ডে বাস করা আর নিরাপদ নহে,— তিনি ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্রিকা 'Indian Sociologist' লন্‌ডন হইতেই প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ১৯০৮ সালের বিপ্লব-কাহিনী প্রকাশিত হইলে ইন্‌ডিয়ান সোসিওলজিস্ট-এর উপর ব্রিটিশ গুপ্ত পুলিসের শ্যেনদৃষ্টি পড়িল ও রাজদ্রোহ অপরাধে মুদ্রাকরকে দুইবার কারাবাস করিতে হইল। তখন অগত্যা কৃষ্ণবর্মা তাঁহার পত্রিকাখানিকে ফ্রান্সের প্যারিস নগরীতে লইয়া গেলেন। ১৯০৭ হইতে কৃষ্ণবর্মা ও তাঁহার সঙ্গীদের প্রধান চেষ্টা হইয়াছিল, ভারতের মধ্যে গুপ্ত-সমিতি স্থাপন। রুশীয় নিহিলিষ্ট বা সন্ত্রাসবাদীরা যেমন করিয়া রুশীয় গবর্মেণ্টকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে, তেমনি করিয়া ভারতের ইংরেজ গবর্মেণ্টকেও আতঙ্কিত করিতে হইবে। কৃষ্ণবর্মা যেকথা য়ুরোপে প্রচার করিতেছিলেন তাহারই প্রতিধ্বনি যেন ভারতের বিপ্লবীদের মুখে শোনা গেল। রুশীয় শাসন সরকারকে সন্ত্রাসবাদীরা যেভাবে বিব্রত করিতেছিল তাহার ইতিহাস মারাঠি ভাষায় 'কাল' নামক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। বাংলাদেশেও 'যুগান্তর' এই বিপ্লববাদের কথাই প্রচার করিতে আরম্ভ করে। বিলাতে ইন্‌ডিয়া

হাউসের সভ্যগণ নানাপ্রকার বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা ছাপাইয়া দেশ-বিদেশেও বিশেষভাবে ভারতে প্রেরণ করিতেছিলেন। ইন্‌ডিয়া হাউসের সদস্য সংখ্যা খুব বেশি না হইলেও তাহাদের মনের উৎসাহ এতই প্রচুর ও কল্পনাশক্তি এতই প্রবল ছিল যে, ইংল্যান্‌ডে বসিয়া ভারতের মধ্যে বিদ্রোহ জাগ্রত করিবার প্রচেষ্টার মধ্যে কোনো বাস্তববোধহীনতা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। শ্যামজি ফ্রান্সে আশ্রয় লইবার পর হইতে বিনায়ক সবরকারের উপর ইন্‌ডিয়া হাউস পরিচালনার ভার গিয়া পড়ে। সবরকার প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের নেতৃস্থান অধিকার করেন। প্রতি রবিবারে সবরকার তাঁহার লিখিত 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থ হইতে উদ্দীপক অংশগুলি পাঠ করিয়া ছাত্রদের শোনাইতেন। ভারতের (তৎকালীন) দুর্দশা সম্বন্ধে আলোচনা ও ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে উদ্‌ভট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্র বিপ্লবীদল সর্বদাই উদ্দীপ্ত থাকিতেন।

এ দিকে নাসিকেও যুবকদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচারে নিরত আছেন গণেশ সবরকার। তিনি নাসিকে 'অভিনব ভারত' (Young India) নামে এক সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন। এই স্থানে বিপ্লবাত্মক সাহিত্য- পাঠ ও আলোচনা হইত; ম্যাৎসিনীর প্রবন্ধ ও জীবনী পাঠ ও মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহার প্রচার চেষ্টা চলিত। এখানেও ইতালির বিপ্লবকারীদের Young Italy সমাজের অনুকরণে ইহারা Young India নাম ব্যবহার করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে গোপনে হত্যাদির আলোচনা চলিত। বিনায়ক সবরকার বিলাত হইতে বোমা তৈয়ারীর জন্য উপদেশ কপি করিয়া নানাস্থানে প্রেরণ করিতেন। নাসিকে গণেশ সবরকারের বাড়ি খানাতল্লাসির সময় সাইক্লোস্টাইল-করা বোমা তৈয়ারীর ফরমুলা পাওয়া গিয়াছিল; আবার কলিকাতার মানিকতলায় বোমা তৈয়ারীর উপদেশপূর্ণ যে কাগজপত্র পাওয়া যায়, তাহা নাসিকে প্রাপ্ত কপিরই অনুরূপ; তবে গণেশের কপিতে বিস্তর ছবি ও প্ল্যান দেওয়া ছিল। গণেশের বাড়ি খানাতল্লাসি হইলে সরকার বুঝিতে পারেন যে, ষড়যন্ত্র দেশব্যাপী। বাংলা-দেশের মানিকতলা-বোমার মামলা যখন চলিতেছে সেই সময়ে (১৯০৯) গণেশ 'লঘু ভারত-মেলা' নামে কতকগুলি বিদ্রোহাত্মক কবিতা প্রকাশ করেন ও রাজদ্রোহ অপরাধে ধরা পড়িয়া শাস্তি পান। বিনায়ক ইংল্যানড অবস্থানকালে ভ্রাতার কারাদণ্ডের সংবাদ পাইলেন। ইন্‌ডিয়া হাউসে এই লইয়া খুবই

উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলে। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় ইন্‌ডিয়া আপিসের কর্মী কার্জন-ওয়ালি নামে জনৈক ইংরাজ মদনলাল ধিংড়া নামে এক পঞ্জাবী যুবকের গুলিতে নিহত হইলেন; কার্জন-ওয়ালি নিরপরাধ; তাহাকে হত্যা করিবার কোনোই কারণ ছিল না— কেবলমাত্র ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ এই হত্যার প্ররোচক। ধিংড়ার ভাষায় তাহার তৎকালীন মনোভাব কী ছিল, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে; "I attempted to shed English blood intentionally and of purpose as an humble protest against the inhuman transportation and hangings of Indian youths" ইহার পূর্বে বাংলা-দেশে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে, ইহা যেন তাহারই প্রত্যুত্তর। গণেশ সবরকারের রাজদ্রোহ মামলার বিচার করেন নাসিকের ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসন সাহেব। তখনকার বিপ্লবীদের কর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিহিংসা ও আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যই সাধিত হইত। বাংলাদেশে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা হয়— তিনি বিপ্লবীদের আইনসঙ্গতভাবে শাস্তি দিয়াছিলেন বলিয়া। নাসিকেও বিপ্লবীদের ক্রোধ জ্যাকসন সাহেবের উপর গিয়া পড়িল এবং ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হইলেন। ইতিপূর্বে বিনায়ক বিলাত হইতে কতকগুলি ব্রাউনিং-পিস্তল একজন লোক মারফৎ গণেশকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; গণেশের গ্রেপ্তারের পূর্বে তিনি অন্যান্য বিপ্লবীদের হস্তে সেই পিস্তলগুলি চালান করিয়া দেন এবং এই একটি পিস্তলের গুলিতে জ্যাকসন নিহত হন। এই ঘটনার পর চারি দিকে খুব ধর-পাকড় চলিল এবং নাসিক-ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করিয়া আটত্রিশ জন মহারাষ্ট্রীয় যুবককে চালান দেওয়া হইয়াছিল। বিচারে ২৭ জনের নানা প্রকার শাস্তি হয়। জ্যাকসনের হত্যার জন্য সাত জন আসামীর মধ্যে তিন জনের ফাঁসি হইল।

নাসিক-ষড়যন্ত্র মামলার সময় দেখা গেল, মারাঠি বিপ্লবীদল বিলাতের বিপ্লবীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; বাংলাদেশে বোমার কারখানায় প্রাপ্ত বোমা তৈয়ারীর ফর্মুলা ও গণেশের গৃহে প্রাপ্ত কপি ও হায়দরাবাদে টিখে (Tikhe) নামক এক নাসিক-বিপ্লবী সমাজের সদস্যের নিকট প্রাপ্ত কপি— সবগুলিই সবরকারের দ্বারা প্রেরিত। গণেশের বাড়িতে Frost-লিখিত Secret Societies of European Revolution 1776 to 1896 নামে গ্রন্থ পাওয়া যায়। দেখা গেল গ্রন্থখানি বিপ্লবীরা খুব ভালো করিয়া অধ্যয়ন

করিয়াছে। বিনায়ক বিলাত হইতে ম্যাৎসিনীর আত্মজীবনী মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করিয়া এবং তদুপযুক্ত একটি ভূমিকা লিখিয়া গণেশের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ১৯০৭ সালে তাহা মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। চঞ্জেরী রাও নামে এক মারাঠি বিলাত হইতে ভারতে আসিলে তাহার নিকট 'বন্দেমাতরম্' নামে এক পুস্তিকা পাওয়া গেল; এই পুস্তিকায় রাজনৈতিক হত্যা সমর্থন করিয়া ক্ষুদিরাম, কানাইলাল দত্ত ও অন্যান্য শহীদদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পূর্ণ।

নাসিকের বাহিরে গবালিয়রে এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল; আহমদাবাদে বড়লাট লর্ড মিণ্টো ও লেডি মিণ্টো আসিলে তাহাদের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। সাতারায় অনুরূপ ষড়যন্ত্র মামলায় বহু যুবক শাস্তি পাইল। এই-সকল ঘটনার পর গবর্মেণ্টের আর সন্দেহ থাকিল না যে, এই সন্ত্রাস কর্মের মন্ত্রনাদাতা হইতেছেন বিনায়ক সবরকার। ব্রিটিশ পুলিস বিনায়ককে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের জন্য ভারতে আনিতে ছিল; এক ফরাসী বন্দরে জাহাজ থামিলে বিনায়ক স্নানের ঘর হইতে লাফাইয়া জলে পড়েন ও সাঁতরাইয়া ফরাসী দেশে আশ্রয় লন; জাহাজ হইতে পুলিস দেখিল বিনায়ক পলায়ন করিল; কিন্তু ফ্রান্সে আশ্রয়প্রার্থী কোনো অপরাধীকে গ্রেপ্তারের অধিকার ব্রিটিশ পুলিসের ছিল না; একজন ফরাসী পুলিস উৎকোচ পাইয়া বিনায়ককে ব্রিটিশ পুলিসের হস্তে সমর্পন করিয়া দেয়। অতঃপর বন্দী অবস্থায় বিনায়ককে ভারতে আনা হইল। বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইল। আটাশ বৎসর পরে— ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পান।

১৯১৮ সালে জুলাই মাসে Sedition Committee-র রিপোর্ট প্রকাশিত হয়; এই গ্রন্থের প্রথম চৌদ্দ পৃষ্ঠা বোম্বাই-এর ষড়যন্ত্র কাহিনী এবং সমগ্র বিপ্লবী প্রচেষ্টার মোট ১৮০ পৃষ্ঠার মধ্যে বাংলাদেশের বিপ্লব ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে ১৫ পৃষ্ঠা হইতে ১২৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অর্থাৎ ১১০ পৃষ্ঠা। বিহার-উড়িষ্যার কথা ৪ পৃষ্ঠায়, যুক্ত (উত্তর) প্রদেশের ৫ পৃষ্ঠা, মধ্যপ্রদেশ ২ পৃষ্ঠা, পঞ্জাব ২০ পৃষ্ঠা, মদ্রাজ ৪ পৃষ্ঠা, বর্মা ৪ পৃষ্ঠা, মুসলমানদের কথা ৬ পৃষ্ঠা। ইহা হইল সিডিশন কমিটির প্রথমাংশের বর্ণনা। দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশের বিপ্লব ইতিহাসই কমিটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার কারণ অতি সুস্পষ্ট— বাঙালির মতো ব্রিটিশকে সে যুগে আর কোনো জাতি এমন বিব্রত করে নাই। বোম্বাই-এর মধ্যে বিপ্লব ম্লান হইয়া আসে বিনায়ক সবরকারের দ্বীপান্তরের পর হইতে। পঞ্জাব দীর্ঘকাল বাঙলার সহিত হাত মিলাইয়া কাজ করিয়াছিল; কিন্তু প্রথম যুদ্ধের শেষ দিক হইতে সেখানে আর সে আগ্রহ দেখা গেল না। একমাত্র বাঙলাদেশে বাঙালিই এবং বিশেষভাবে হিন্দু বাঙালি যুবকরাই এই বিপ্লব-আন্দোলন প্রায় চল্লিশ বৎসর (১৯০৬-১৯৪৬) চালু রাখিয়াছিল। এই আন্দোলনের শেষ পরিণতি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ভারত-উদ্ধার প্রচেষ্টা।

বাঙলাদেশ ও পঞ্জাব মুসলমানপ্রধান দেশ; এই দুই দেশ ও দুই জাতির মধ্যে বুদ্ধি ও শক্তির সমবায়ে কালে বিপ্লব মারাত্মক হইতে পারে— এ দুর্ভাবনা ইংরেজ কূটনীতিকদের মনকে সদাই আলোড়িত করিত। এই বাঙালি ব্রিটিশ আধিপত্যের শুরু হইতে কেরাণীগিরি করিয়া, মাস্টারি করিয়া, ডাক্তারি করিয়া ইংরেজের সাম্রাজ্য প্রসারণের প্রধান সহায়তা করিয়া আসিতেছে। ব্রিটিশ আধিপত্য কায়েম হইবার পর পঞ্জাবের শিখ ও মুসলমানরাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করিবার কাজে প্রধান সহায় হয়। কালে দেখা গেল, এই দুই প্রান্তেই অসন্তোষ-বহ্নি সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহার প্রতিষেধক অস্ত্র হইল— divide and rule— রোমান সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্র;

তাহাই প্রয়োগ করিয়া ভারতে আসিল সাম্প্রদায়িক মনোভাব— হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ। স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের শেষ পরিণতি হইল বঙ্গ ও পঞ্জাব রাজ্যের দ্বিখণ্ডীকরণ। ভারত ত্যাগের পূর্বে ইংরেজ বাঙালি ও পঞ্জাবিকে চরম শাস্তি দান করিয়া গেল। আজ স্বাধীন ভারতের 'প্রধান সমস্যা পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গের সীমান্তে ও পশ্চিম পাকিস্তান বা পঞ্জাবের সীমান্তে।

বাংলাদেশের বিপ্লববাদের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই পাঠককে অখণ্ড বঙ্গের কথা স্মরণ করিতে হইবে। কলিকাতা বিপ্লবের কেন্দ্র-স্থল হইলেও পূর্ববঙ্গ ও আসামের যে অংশ আজ পূর্ব পাকিস্তান বলিয়া উক্ত হইতেছে— সেই পূর্ব বাংলা ছিল বিপ্লবীদের প্রধান কর্মস্থল। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, মাদারিপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, রঙপুর প্রভৃতি স্থান ছিল বিপ্লবীসন্ত্রাসবাদের প্রধান পীঠস্থান।

বাংলাদেশকে বলা যাইতে পারে land of extremes। কঠোর যুক্তিবাদ ও ন্যায়শাস্ত্রের পাশাপাশি শক্তিপূজা ও ভক্তিবাদের চরমচর্চা ও সাধনা— বাঙালির জীবনকে চিরদিন বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে তিনি বিচিত্রের দূত— ইহা বাঙালি কবিরই উপযুক্ত উক্তি। তাই এই বাংলাদেশে রাজনীতিক্ষেত্রে যে সাংবিধানিক আন্দোলন চলিতেছিল স্বাধীনতার জন্য—তাহারই পাশাপাশি চলিয়াছিল বিপ্লববাদের ভাবালুতা; 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' এ উক্তি বাঙালি যুবকদের সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য— মনে হয় আর কোনো দেশ সম্বন্ধে এ উক্তির এমন সার্থকার্থ আর হয় নাই।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলন হইতে বাংলার রাজনীতি নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করে; কিন্তু তাহার পূর্বেই বিপ্লববাদের জন্ম হয়। বড়োদা রাজকলেজের অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ ১৯০২ সাল হইতে কীভাবে ইহা আরম্ভ করেন তাহার আভাস আমরা পূর্বে দিয়াছি। অরবিন্দের কনিষ্ঠভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার কলিকাতায় ১৯০৪ সালে আসিয়া পি. মিত্র প্রমুখ ব্যক্তির সহিত মিলিত হন; কিন্তু সে যাত্রায় দেশের অবস্থা অনুকূল নয় বুঝিয়া তিনি বড়োদায় ফিরিয়া যান। বিপ্লবযুগের পূর্বে সার্বজনীন বিপ্লবপন্থা অনুসরণ করিয়া গুপ্তসমিতি গঠন করিবার চেষ্টার মধ্যে নেতাদের একটি পদ্ধতি ছিল;

তাঁহারা কল্পনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, অন্তত দশ সহস্র স্বেচ্ছাসেবক ও এক লক্ষ টাকার অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিবার পর পাহাড় অঞ্চলে যুদ্ধের মর্মপীঠ (base) রচনা করিয়া তবে বৈপ্লবিকসমিতির অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিবেন ; এরূপ একটা সংযম তাহার মধ্যে বর্তমান ছিল ('প্রবর্তক', ১৩৩১ আশ্বিন)।

বঙ্গচ্ছেদ লইয়া দেশে আন্দোলন উপস্থিত হইলে বারীন্দ্রকুমার পুনরায় বাঙলা দেশে আসিয়া বিপ্লবকর্ম সাধনে মন দিলেন। বাংলার প্রায় প্রত্যেক প্রধান শহর ঘুরিয়া 'অনুশীলন-সমিতি'গুলি তিনি আয়ত্তে আনিলেন ; শারীরচর্চা ও নৈতিক জীবন সুন্দরতর করিবার জন্য এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত ; পি. মিত্র ইহার সভাপতি। তিনি জানিতেন যে, শারীরিক বলচর্চা ব্যতীত দেশোদ্ধার হইবে না। লাঠিখেলা, অশ্বারোহণ, ব্যায়াম, কুস্তি, জুজুৎসু ছিল অনুশীলন-সমিতির প্রধান কাজ। এমন-কি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সানো সান নামে জাপানী জুজুৎসু-শিক্ষক নিযুক্ত করেন ছাত্রদের ব্যায়ামচর্চার জন্য। বারীন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবীরা বাংলাদেশের সমিতিগুলির মাধ্যমে বালক ও যুবকদের সহিত ভাবচর্চা, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতেন। তাহাদের গীতা পড়াইয়া বুঝাইতেন আত্মা অমর, হত্যা পাপ নহে ইত্যাদি। এইভাবে বিপ্লববাদের বীজ বপন করা হইল। ১৯০২ সালে অরবিন্দ যখন বাংদেশে আসেন, তখন তিনি মেদিনীপুরে হেমচন্দ্র কানুনগোকে এক হাতে গীতা ও আর এক হাতে তরবারি দিয়া গুপ্তসমিতির কার্যে দীক্ষা দেন।

১৯০৬ সালে অরবিন্দ বড়োদার কাজ ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় আসিলেন ; এখন হইতে বিপ্লবীদল তাঁহার অদৃশ্য ইঙ্গিতে চালিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে বারীন্দ্রকুমার পূর্ববঙ্গ আসামের ছোটলাট ফুলারকে হত্যা করিবার জন্য প্রেরিত হন ; তিনি ফুলারের নাগাল পাইলেন না। এই ঘটনাই বোধ হয় বাংলাদেশের প্রথম হত্যার চেষ্টা। শোনা কথা যে, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বারীন্দ্রকে এই কার্যাদির জন এক সহস্রমুদ্রা দিয়াছিলেন।

১৯০৫ সালের শেষদিকে অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকা বারীন্দ্র কলিকাতায় আনিয়া প্রকাশ ও প্রচার করেন— অবশ্য গোপনেই। সেইজন্য এ কথা বোধ হয় নিঃসংকোচে বলা যাইতে পারে যে, অরবিন্দ ছিলেন বিপ্লব-আন্দোলনের ব্রহ্মা— নির্বিকার, নির্বাক! কিন্তু তাঁহার লেখনী হইতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইতেছিল— তাহার স্পর্শে সকলেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়।

১৯০৬ সালের মার্চ মাসে অর্থাৎ বঙ্গচ্ছেদ হইবার পাঁচমাস পরে 'যুগান্তর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা যুবকদিগকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্রয় করিতে দেখা গেল। যাহারা পড়িল তাহারা চমকিয়া উঠিল— ইহার ভাব ও ভাষা 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী' 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি সাপ্তাহিক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শারীরিক শক্তির দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসিতে হইবে, হত্যা পাপ নহে— গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে হত্যায় প্ররোচিত করিয়াছিলেন ;—আত্মা অমর— এই শিক্ষা দিয়া 'যুগান্তর' যুবকগণকে মৃত্যুভয়হীন করিয়া তুলিবার প্রয়াসী। রাজনৈতিক হত্যাকে আধ্যাত্মিক করিবার চেষ্টা হইল ;— পরযুগে গান্ধীজিও অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক করিবার জন্য প্রাণ পণ করিয়াছিলেন। ভারতীয়রা সাধারণভাবে অতিধার্মিক ; বোধ হয় সেইজন্যই সকলেই ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি জড়াইয়া জট পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে ভবানীপূজা, রামধুন-কীর্তন বা খিলাফৎ-আন্দোলন কোনোটিই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রপত্তনের সহায়ক নহে বরং উগ্রভাবে পরিপন্থী।

যাহাই হউক 'যুগান্তর' সত্যই যুগান্তর আনিল ; ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন যুগান্তরের প্রধান কর্মী—'যুগান্তর' নামটি তিনি গ্রহণ করেন শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাস 'যুগান্তর' হইতে ; উপন্যাসে সামাজিক যুগান্তরের কথা ছিল— ইহাদের ভাবনা রাজনীতিতে যুগান্তর আনয়ন। বারীন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্র দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন যুগান্তরের পরিচালকবর্গের প্রথম দেড় বৎসরে। ইতিমধ্যে হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল (পরে সন্ন্যাসী), অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি যুবকরা আসিয়া জুটিলেন। উল্লাসকর দত্ত নামে এক যুবক শিবপুরে তাঁহার পিতা অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্তের বাসায় থাকিয়া গোপনে বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক প্রস্তুত করিবার প্রণালী অভ্যাস করিতেছিলেন। তিনি বলেন, ১৯০৬ সালে এপ্রিল মাসে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতিতে ইংরেজ কর্মচারী ও পুলিসের অত্যাচার কাহিনী তাঁহার মনকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে এবং সেই হইতে তিনি বিপ্লবী হইবার সাধনা আরম্ভ করেন। মেদিনীপুর নিবাসী হেমচন্দ্র ইহার কিছুকাল পূর্বে বিষয়সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফ্রান্সে যান ও তথাকার রুশীয় বিপ্লবপন্থীদের নিকট হইতে গুপ্তসমিতি স্থাপনাদি বিষয় শিক্ষালাভ করিয়া আসেন। এই হেমচন্দ্রকে ১৯০২-এ অরবিন্দ স্বয়ং মেদিনীপুরে সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিত করিয়াছিলেন— সে কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি।

এই বিপ্লববাদীদের নূতন দল প্রাক্ যুগান্তরযুগের গোপন বিপ্লবনীতি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বারীন্দ্র প্রমুখ যুবকদের মধ্যে আপনাদের অস্তিত্ব ঘোষণার জন্য ঔৎসুক্য অধিক। বারীন্দ্র মনে করিয়াছিলেন যে, গবর্মেণ্ট তাঁহাদের এই গুপ্তসমিতির শক্তিকে বহুগুণিত করিয়া দেখিবেন এবং মহাভীতির তাড়নায় দেশমধ্যে উৎপীড়ন আরম্ভ করিবেন; তাঁহাদের বিশ্বাস যে, উৎপীড়নে দেশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে এবং বিপ্লব দেশব্যাপী হইবে। এই ভাব লইয়া তাঁহারা তাড়াতাড়ি এক ষড়যন্ত্র পুষ্ট করিয়া তুলিলেন এবং কলিকাতার মানিকতলার খালের অপর পারে একটি পরিত্যক্ত বাগানবাড়িতে গুপ্তসমিতির আখড়া ও বোমার কারখানা স্থাপন করিলেন। বিপ্লবী নেতারা জানিতেন না যে, নির্বীর্য, নিরস্ত্র, ম্যালেরিয়ারোগাক্রান্ত, দুর্বল, সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত, ধর্মহীন জনতা কখনো বিপ্লব কর্ম করিতে পারে না। নেতারা য়ুরোমেরিকার ইতিহাস পড়িয়া কল্পনা করিতেন যে, পাশ্চাত্যদেশে যেভাবে সশস্ত্র বিপ্লব হইয়া আসিয়াছে ভারতেও তাহা সম্ভব।

কলিকাতার অনুশীলন-সমিতি ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে ফরাসী রাজ্য চন্দননগর ছিল বিপ্লবীদের আর একটি প্রধান কেন্দ্র। ফরাসীদের অধিকৃত শহরে বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল বলিয়া এখানে কেন্দ্র স্থাপিত হয়। কিন্তু এক দিন ফরাসী শাসকরাও ইহাদের গোপন কর্ম প্রতিহত কবিবার জন্য চেষ্টা শুরু করেন।

পূর্ববঙ্গে ঢাকায় পি. মিত্র মহাশয় ইতিপূর্বে অনুশীলন-সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে এক অদ্ভুতকর্মা নেতা পাওয়া যায়, তাঁহার নাম পুলিনবিহারী দাস। ইনি যুগান্তর-দলের অভ্যুত্থানের পূর্বে ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে অনুশীলন-সমিতি স্থাপন করিয়া বালক ও যুবকদিগকে শারীরচর্চা ও নির্ভীকতায় প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যুগান্তরের নব-বিপ্লবী মতবাদ ইহাদের স্পর্শ করিল। চন্দননগরের দলের সহিত ঢাকার অনুশীলন-সমিতির সংযোগ হয় ও উভয়েই টেররিজম্ বা আতঙ্কসৃষ্টি নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রথম দিকে ঢাকার সমিতি আত্মরক্ষা অর্থাৎ দলের স্বার্থ ও নৈরাপত্তের জন্য হত্যাকর্ম করিতেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহারা চন্দননগরের সহিত মিলিত হইয়া aggressive অর্থাৎ অগ্রসর হইয়া

হত্যাকর্মে লিপ্ত হইলেন। এই সমিতি সমূহের কীর্তিকলাপ আমরা ক্রমশ জানিতে পারিব।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভে প্রেস-আইন পাশ হয় নাই। সুতরাং ন্যায্য-অন্যায্য সকল কথাই ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হইবার বাধা ছিল কম। বিপ্লবীরা ইহার সুযোগ লইয়া 'যুগান্তর' পত্রিকায়, 'সোনার বাংলা' নামক অনিয়মিত-প্রকাশিত পুস্তিকায় তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করিতেন। 'সন্ধ্যা' নামক দৈনিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া কিছুকাল পূর্বে বাহির হইয়াছিল। 'যুগান্তর' প্রকাশের পর দেখা গেল সেই কাগজেও স্পষ্ট কথা লেখা হইতেছে। 'যুগান্তরের' ভাষা ছিল বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের ভাষার ন্যায় ওজগুণপূর্ণ সংস্কৃতবহুল বাংলায়; ইহার পাঠক ছিল শিক্ষিত যুবকরা। আর 'সন্ধ্যার' ভাষা ছিল দোকানী মুদির চল্‌তি ভাষা। শোনা যায়, কোনো কোনো লেখক এই দুই পত্রিকায় দুই ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

সাময়িক পত্রিকা ব্যতীত অন্যান্য রচনার মধ্য দিয়াও বিপ্লবীরা তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করিতেছিলেন। অবিনাশ ভট্টাচার্যের 'বর্তমান রণনীতি', বারীন্দ্র রচিত 'মুক্তি কোন্ পথে', অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' (বাংলায়) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'মুক্তি কোন্ পথে' গুজরাটি ভাষাতেও অনূদিত হয়। 'ভবানী মন্দির' গ্রন্থে বিপ্লববাদের সকল কথা, গুপ্তসমিতি গঠন প্রণালী, দেশীয় সৈন্য ভাঙ্গাইবার কথা, বোমার কথা সমস্তই খুলিয়া বলা হইয়াছিল।

বৈপ্লবিক কর্মধারার ইতিহাস বর্ণিবার পূর্বে— বাংলাদেশে বিপ্লববাদ আর-একটি দিক হইতে কীভাবে সঞ্জীবিত ও প্রচারিত হইতেছিল, তাহার কথা বলা প্রয়োজন। এই বৈপ্লবিক মতবাদের কেন্দ্রে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা ও ওকাকুরা। নিবেদিতা বা মিস মার্গারেট নোবেল ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা; ইনি আইরিশ ও ইঁহার পিতা আইরিশ স্বরাজ্যদলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন— ইংরেজের প্রতি আইরিশদের জাতক্রোধ সুবিদিত। স্বামীজি কখনো প্রত্যক্ষ বিপ্লববাদ প্রচার করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার তীব্র দেশাত্মবোধ তাঁহার প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা উদ্রিক্ত করিয়াছিল;

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রথম যুগের অধিকাংশ বিপ্লবী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ও বিবেকানন্দের স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত যুবক। স্বামীজির মৃত্যুর পর (জুলাই ১৯০২) ভগিনী নিবেদিতাকে বেলুড় মঠের অধ্যক্ষরা তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে বলেন, কারণ সন্ন্যাসীরা কোনো বৈপ্লবিক কর্মের সহিত যুক্ত থাকিতে পারেন না। নিবেদিতা থাকিতেন উত্তর কলিকাতার বোসপাড়া লেনের এক ক্ষুদ্র বাড়িতে। সেই বাড়ি হইল বিপ্লববাদের গুপ্ত কেন্দ্র; এই অদ্ভুতকর্মা রমণী সকল মতবাদের নেতাদের সহিত যোগরক্ষা করিয়া কীভাবে আপন মতানুযায়ী কার্য করিয়া যাইতেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, টিলক, জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ওকাকুরা ইঁহারা সকলেই কী বিভিন্ন প্রকৃতির লোক, অথচ সকলেই নিবেদিতার অত্যন্ত গুণমুগ্ধ। আবার তরুণ বিপ্লবীরাও তাঁহার নিকট হইতে সকল প্রকার সহায়তা লাভ করিত; 'সকল প্রকার' শব্দটি বহুব্যাপকভাবে গ্রহণ করিবার কারণ যথেষ্ট আছে।

ওকাকুরা ভাববাদী শিল্পশাস্ত্রী। জাপান হইতে তিনি আসিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্য। সেসময়ে বিবেকানন্দ হইতে বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় দ্বিতীয়টি ছিল না। ওকাকুরার ভাবনা Asia is one— এই মন্ত্র রূপদানকল্পে তিনি ভারতকেও জাপানের সহিত সংযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন।

বাংলার বিপ্লবীদের অন্তরালে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় নিবেদিতা ও ওকাকুরা। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও অন্তরালে ছিলেন, অর্থ দিয়া তিনি সাহায্য করিতেন বিপ্লবীদের; বারীন্দ্র যখন ১৯০৬ সালে ফুলারকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সহস্রমুদ্রা গোপনে দেন বলিয়া শোনা যায়।

১৯০৬ সালে বিপ্লবীদের অস্তিত্বের প্রথম আভাস পাওয়া গেল, তবে তাহা কার্যকারীভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই। ১৯০৭ ডিসেম্বর মাসে বঙ্গদেশের ছোটলাট স্যর এনড্রু ফ্রেজারের জীবন লইবার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অতঃপর মেদিনীপুর হইতে যে স্পেশ্যাল ট্রেনে ছোটলাট আসিতেছিলেন, তাহা 'উড়াইয়া' দিবার চেষ্টা হয়, ট্রেন লাইনচ্যুত হইল বটে, কিন্তু ট্রেন 'উড়াইয়া' দিবার মতো

শক্তিশালী বোমা সেগুলি নয়। কিন্তু দশ বৎসর পরে বিপ্লবীরা এমন-সব বোমা তৈয়ারী করিয়াছিল যাহার দ্বারা একটা গোটা রেজিমেণ্টের অনেক সৈন্য ধ্বংস হইতে পারিত। মেদিনীপুরের ঘটনার কয়েকদিন পরে পূর্ববঙ্গে নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমারে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এলেন-এর জীবন লইবার চেষ্টা হইয়াছিল; এলেন সাহেব আহত হন। ১৯০৮ সালের প্রথম দিকে সামান্য ডাকাতির চেষ্টা এদিক-সেদিকে দেখা দিল।

এখন প্রশ্ন, এই-সকল ডাকাতির উদ্দেশ্য কী এবং করিতই বা কাহারা। ডাকাতির উদ্দেশ্য 'বিপ্লবে'র জন্য অর্থসংগ্রহ, সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা ব্রিটিশ শক্তির উচ্ছেদ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। রিভলভার, পিস্তল, টোটা কিনিতে হইবে;— মোটা দাম দিয়া সে-সব কিনিতে হয় চোরাকারবারীদের গোপনপথে। টাকা কোথা হইতে আসিবে? দেশের লোক হত্যাদি কার্যের জন্য টাকা দিতে সাহস পায় না— যদি জানাজানি হয়! দুই চারিজন যুবক ব্যারিস্টার কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। বিপ্লবীরা প্রথমে ভাবিয়াছিল যে, ইংরেজ ট্রেজারী বা সাহেবদের ব্যাংক আপিস লুঠ করিবে। কিন্তু তাহাদের যে সম্বল তাহা লইয়া ঐ-সব কর্মে লিপ্ত হওয়া দুঃসাহসিকতা মাত্র; তাই ডাকাতি হইতে লাগিল দেশীয় লোকের বাড়িতে— জমিদার, মহাজন, বড় জোতদার। ইহার কারণ, নিরস্ত্র দেশের নিরীহ লোকদের উপর অতর্কিতভাবে হানা দেওয়া সহজ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী-চৌধুরাণী' পড়িয়া তরুণদের মনে একটা বীরত্বের ভাবালুতাও দেখা দিয়াছিল; ইহা তাহারই প্রয়োগ। ইহা তো দস্যুবৃত্তি নয়, ইহা তো দেশের জন্য অর্থ সংগ্রহ— ইহাতে পাপ নাই। এই-সব ধারণায় কর্মীরা দীক্ষিত হইত নেতাদের দ্বারা। ডাকাতির পর তাহাদের আপিস হইতে লিখিয়া পাঠানো হইত যে, লুণ্ঠিত অর্থ তাহারা ধার লইয়াছে; দেশ স্বাধীন হইলে এই অর্থ সুদ সমেত প্রত্যাবৃত্ত হইবে।

স্বদেশী ও বয়কট-আন্দোলনের অবৈধ অংশ বন্ধ করিবার জন্য এইবার গবর্মেণ্ট সচেষ্ট হইলেন। ১৮১৮ সালের এক পুরাতন রেগুলেশান অনুসারে পঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় ও সর্দার অজিত সিংহকে রাওয়ালপিণ্ডি ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানের দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী করিয়া নির্বাসিত করিলে বাংলাদেশেও সেই উত্তেজনার তরঙ্গ আসিয়া পৌছাইল।

আমাদের আলোচ্য পর্বে 'বন্দেমাতরম্' নামে ইংরেজি দৈনিকের আবির্ভাব হইয়াছে; অরবিন্দ, বিপিন পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি ছিলেন সম্পাদক-গোষ্ঠীর মধ্যে। 'বন্দেমাতরম্' পঞ্জাব নেতাদের নির্বাসনের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। 'বন্দেমাতরম্' ইংরেজি কাগজ, তাহার আবেদন ভারতের সর্বত্র পৌঁছিতেছে। বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের জ্বালাময়ী রচনা পাঠের জন্য শিক্ষিতেরা উন্মুখ হইয়া থাকিত। আর সাধারণ বাঙালি যুবককে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিল 'যুগান্তরের' রচনা। ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি 'যুগান্তরের' তথা-কথিত সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রাজদ্রোহ উত্তেজনার অপরাধে এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাবাসে প্রেরিত হইলেন। অরবিন্দের নির্দেশে বা পার্টির ব্যবস্থায় ভূপেন্দ্রনাথ নিজেকে 'যুগান্তরে'র সম্পাদক বলিয়া স্বীকার করিয়া কারাবরণ করিলেন। ইহা শাপে বর হইল— তাহা না হইলে মানিকতলার বোমার মামলায় তিনি জড়াইয়া পড়িতেন ও দীর্ঘকালের জন্য তাঁহাকে কারাগারে বাস করিতে হইত। এক বৎসর পরে মুক্তি পাইয়া ভূপেন্দ্রনাথ বিদেশে চলিয়া গিয়া ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বিপ্লব প্রচেষ্টায় রত হইলেন। 'যুগান্তরে'র পরে 'সন্ধ্যা'র বিরুদ্ধে পুলিস লাগিল। 'সন্ধ্যা'-সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব গ্রেপ্তার হইলেন; কিন্তু তাঁহার বিচারের পূর্বে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল— ইংরেজের শাস্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। ইহার পরেই 'বন্দেমাতরমে'র কোনো রচনার জন্য অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তার হইলেন; কিন্তু প্রমাণ হইল না উক্ত প্রবন্ধের লেখক কে। বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদকরূপে আনীত হইলেন— তিনি (passive resistance) নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধধর্মী রাজনীতির পোষক হইয়া আদালতে সাক্ষী দিতে অস্বীকৃত হইলেন— 'আদালতের অবমাননা' অপরাধে তাঁহার ছয় মাস জেল হইল। এই ঘটনার পর মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সম্পাদিত 'নবশক্তি'র মুদ্রাকরের কারাদণ্ড হয়। মোট কথা গবর্মেণ্ট আর নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারিতেছেন না। ১৯০৭ সালের পহেলা নভেম্বর রাজদ্রোহ-উত্তেজনা-সভা-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইলে পুলিস ও ম্যাজিস্ট্রেটদের হস্তে প্রভূত ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

কলিকাতায় 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতির মামলার বিচার হয় ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড-এর এজলাসে। এ ছাড়া তিনি সুশীল সেন নামক কোনো বালককে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন; বালকের অপরাধ, বিপিন পালের মামলার দিনে

(২৬ অগস্ট ১৯০৭) আদালত-প্রাঙ্গণে সমবেত জনতার উপর পুলিসকে নির্দয়ভাবে চাবুক চালাইতে দেখিয়া ইন্সপেক্টর হেনরীকে কয়েকটি ঘুসি দেয়; সেই অপরাধে তাহার বেত্রদণ্ড হয়। এই ঘটনার প্রতিহিংসায় কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার কল্পনা হইল বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে।

মানিকতলার বোমার আড্ডায় জল্পনা শুরু হইল কিংসফোর্ডকে হত্যা কীভাবে করা যায়— কে এই কর্ম করিতে প্রস্তুত। দুই জন তরুণ বালককে পাওয়া গেল— ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। ক্ষুদিরাম ইতিপূর্বে মেদিনীপুরে 'সোনার বাংলা' নামক বিপ্লবী পুস্তিকা বিতরণ লইয়া পুলিসের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিল। বোমা, রিভলভার প্রভৃতির ব্যবহার শিক্ষা দিয়া উভয় বালককে মজঃফরপুরে পাঠানো হইল,— কারণ ইতিমধ্যে কিংসফোর্ড কলিকাতা হইতে সেখানে বদলী হইয়া গিয়াছিলেন। বিপ্লবীরা মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের গৃহের সম্মুখে এক ঘোড়ার গাড়ির উপর বোমা নিক্ষেপ করিল; সেই গাড়িতে ছিলেন তথাকার ব্যারিস্টার মিঃ কেনেডির স্ত্রী ও তাঁহার কন্যা। বোমা বিস্ফোরণে দুইটি নিরপরাধ রমণীর প্রাণ গেল (৩০ এপ্রিল ১৯০৮)। কিংসফোর্ড মরিল না। ক্ষুদিরাম পুলিসের হাতে ধরা পড়িল, প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়িবার সম্ভাবনায় রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করে। ইতিপূর্বেও কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বিপ্লবীরা একখানি পুস্তকের মধ্যে বোমা কৌশলে ভরিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল; কিংসফোর্ড সেই বই-এর প্যাকেট খোলেন নাই— ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার এক বন্ধু কিছুদিন পূর্বে তাঁহার নিকট যে-একখানি বই লইয়াছিলেন এইটি সেই বই। খুলিবার চেষ্টা করিলে বোমা ফাটিয়া যাইবার ব্যবস্থা ছিল। ক্ষুদিরামকে যে পুলিস কর্মচারী গ্রেপ্তার করিয়াছিল, তাহাকে পর বৎসর বিপ্লবীরা কলিকাতায় হত্যা করে; এই-সব হত্যার কারণ কেবলমাত্র আতঙ্কসৃষ্টি— দেশমধ্যে একটি বিরাট সশস্ত্র আন্দোলন চলিতেছে— সেই ভাব গবর্মেণ্টের মনে অঙ্কিত করিবার জন্য। যাহা হউক, যথা সময়ে বিচারাদির পর মজঃফরপুরে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়াছিল (অগস্ট ১৯০৮)।

এ দিকে পুলিসের গুপ্তচরগণ মানিকতলার বোমার আড্ডা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। কিছুকাল হইতে বারীন্দ্রের বিপ্লবীদল দেওঘরে বোমা লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন; সেখানে বোমার পরীক্ষা করিবার সময়ে প্রফুল্ল চক্রবর্তী নামে

একটি যুবক বিস্ফোরক পরীক্ষাকালে মারা যায়। অবশেষে নানা অসুবিধার মধ্য দিয়া গিয়া তাঁহারা মানিকতলার আখড়া জাঁকাইয়া বসেন। কিন্তু পুলিস তাঁহাদের পিছনে ছিল। মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের দুই দিন পরে (২ মে ১৯০৮) ভোরবেলা সশস্ত্র পুলিস আখড়া হানা দিল, দলের প্রধান প্রায় সকল বিপ্লবীই ধরা পড়িলেন। এখানকার কাগজপত্র হইতে অনেক বিপ্লবীর নাম-ধাম সংগ্রহ করিয়া পুলিস অল্পকালের মধ্যে সর্বশুদ্ধ ৩৮ জন যুবককে বিচারের জন্য চালান দিল। অরবিন্দ ঘোষও কলেজ স্কোয়ারের কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাসা হইতে গ্রেপ্তার হইলেন। নেতাদের অসতর্কতার জন্য বিপ্লবীদের অনেকেই ধৃত হইলেন— বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ বসু, চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত ও শ্রীরামপুরের নরেন্দ্র গোঁসাই।

নরেন্দ্র গোঁসাই এই বোমার মামলায় রাজসাক্ষী বা এপ্রুভার হয়। নরেন্দ্র ধনী-পুত্র, যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিয়া হঠাৎ তাহার দেশের জন্য প্রাণ দিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। পরে দলের লোকের ধারণা হয় যে, পুলিসের দ্বারাই নিযুক্ত হইয়া দলে সে ভর্তি হইয়াছিল। তাহার চাল-চলন হাব-ভাব দেখিয়া বুদ্ধিমান বিপ্লবীদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, নরেন্দ্র একদিন সকলকে মজাইবে। সে নির্বোধ প্রকৃতির লোক ছিল; অন্যের সহিত বড় বড় কথা বলিয়া তাহাদের মতামত ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিত। গ্রেপ্তারের পর পুলিস নরেন্দ্রকে বিপ্লবীদের দল হইতে পৃথক করিয়া য়ুরোপীয়ান কয়েদী বিভাগে রাখিল। নরেন্দ্র রাজসাক্ষী হইবে জানিতে পারিয়া বিপ্লবীরা তাহার উপর অতিশয় বিরক্ত হইল। চন্দননগরের কানাইলাল অতিশয় শান্ত প্রকৃতির যুবক; সে প্রায়ই বলিত, 'দেশ মুক্ত হউক আর না হউক, আমি হইবই; বিশ বৎসর জেল খাটা আমার পোষাইবে না।' সে কথার অর্থ তখন কেহ বুঝিতে পারে নাই। মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্র ক্ষয়রোগে ভুগিতেছিল, সে-ও জানিত তাহার আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছে। কানাই, সত্যেন্দ্র ও আরও তিনজন বিপ্লবীদের মধ্যে কি পরামর্শ হইয়া গেল। জেলে বাসকালে আবদ্ধ বিপ্লবীরা বাহিরের বিপ্লবপন্থী ও সহানুভূতিসম্পন্ন লোকদের সহিত নানারূপ সলাপরামর্শ করিতেন; কর্মচারীদের চক্ষে ধূলি দিয়া বাহির হইতে রিভলভার টোটা কানাইরা হস্তগত করিল। নরেন্দ্রকে তাহারা হত্যা করিবেই— কিন্তু বারীন্দ্রকে তাহারা এই পরামর্শের মধ্যে লইল না। তিনি কেমন করিয়া জেল

হইতে পলায়ন করিবেন, কেমন করিয়া পুনরায় বিপ্লব সৃষ্টি করা যাইতে পারে ইত্যাদি উদ্ভট কল্পনায় মগ্ন। বারীন্দ্র খানিকটা আত্মকীর্তি জাহির করিবার জন্য নরেন্দ্রের নাম করেন; নরেন্দ্র রাজসাক্ষী হইয়া অরবিন্দকে জড়াইয়া ফেলিয়াছিল; এই ভাবুকতার পরিণাম হইল নরেন্দ্রের হত্যা ও অবশেষে কানাই ও সত্যেনের ফাঁসি।

দীর্ঘ এক বৎসর ধরিয়া মানিকতলার বোমার মামলা চলিল (আলিপুর বোম্ব কেস)। এই সময়ে বিপ্লবী বালক ও যুবকদের ব্যবহার ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অরবিন্দ তাঁহার 'কারাকাহিনী' গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন; "কোর্টে ইহাদের আচরণ দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি বঙ্গে নূতন যুগ আসিয়াছে; সেই নির্ভীক সরল চাহনি, সেই তেজপূর্ণ কথা, সেই ভাবনাশূন্য আনন্দময় হাস্য এই ঘোর বিপদের সময়ে সেই অক্ষুণ্ণ তেজস্বিতা, মনের প্রসন্নতা, বিমর্ষতা বা ভাবনা বা সন্তাপের অভাব— সেকালের তমঃক্লিষ্ট ভারতবাসীর নহে, নূতন যুগের নূতন জাতির নূতন কর্মস্রোতের লক্ষণ। তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য বা মোকদ্দমার ফলের জন্য লেশমাত্র চিন্তা না করিয়া কারাবাসের দিন আমোদে, হাস্যে, ক্রীড়ায়, পড়াশুনায়, সমালোচনায় কাটাইয়াছিলেন। তাঁহারা জেলের সকলের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছিলেন।"

বারীন্দ্র পুলিসের কাছে তাঁহার বিপ্লব প্রচেষ্টার কথা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মামলার সময় শোনা যায় অরবিন্দ এই-সব স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার (retract) করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু বারীন্দ্র তাহাতে রাজী হয় নাই। বারীন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।'... "আমাদিগকে প্রকাশ্য রাজদ্বারে ঘাতক হস্তে স্বেচ্ছায় যাচিয়া জীবন দিতে না দেখিলে, বুঝি এ মরণভীরু জাতি মরিতে শিখিবে না।"

১৯০৯ সালে মে মাসে— অর্থাৎ মানিকতলায় ধরা পড়িবার এক বৎসর পরে মামলায় রায় বাহির হইল। উল্লাসকর ও বারীন্দ্রের ফাঁসির হুকুম এবং উপেন্দ্র, হেমচন্দ্র, বিভূতি, অবিনাশ, হৃষীকেশ প্রভৃতি অন্যদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং এতদ্ব্যতীত অনেকের জেল হইল। শোনা যায়, ফাঁসির হুকুম হইয়া গেলে উল্লাসকর গান ধরেন 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এদেশে।' আপীলে তাঁহাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল। অরবিন্দ ও দেবব্রত বসু মুক্তি পাইলেন। এক বৎসর পরে অরবিন্দ বাংলাদেশ হইতে গোপনে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন এবং

পণ্ডিচেরীতে গিয়া ধর্মে মন দিলেন; জেলে বাসের সময়েই তাঁহার ধর্মজীবনে নূতন আলোক দেখা গিয়াছিল। দেবব্রত বসু রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হইয়া গেলেন।

মজঃফরপুর হত্যাকাণ্ডের পর টিলক মহারাজ এই বিপ্লববাদ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন, যাহার ফলে তাঁহার ছয় বৎসর জেল হইয়া গেল। নাসিকের ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসন সাহেব বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হইলেন প্রায় এই সময়ে (ফেব্রুয়ারি ১৯০৯)।

আলিপুর বোমার মামলা শুরু হইলে সরকার ভাবিলেন বিপ্লবীরা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। কিন্তু দেখা গেল মামলা যখন চলিতেছে সেই সময়েই কানাই ও সত্যেন্দ্রের মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস পুলিস কোর্টের সম্মুখে বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হইলেন। ক্ষুদিরামকে যে পুলিস দারোগা— নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ধরিয়াছিলেন, তাহাকে কলিকাতায় সারপেণ্টাইন লেনে জনৈক বিপ্লবী হত্যা করিল। সরকারী পক্ষের অন্যতম উকিল সামসুল হুদাকে বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত হত্যা করিয়া ফাঁসি গেল (ফেব্রুয়ারি ১৯০৯)। এইভাবে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যাবলী চলিতেছে কলিকাতায়।

পূর্ববঙ্গে ঢাকার অনুশীলন-সমিতি পুলিন দাসের নেতৃত্বে রাজনৈতিক কাজ-কর্মের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছে ডাকাতি করিয়া। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি অর্থের বড় প্রয়োজন অস্ত্রশস্ত্র চাই, কর্মীদের আহারবস্ত্রাদি চাই, মামলার সময় কৌন্সিলীদের ফী চাই। অবশ্য শেষাশেষি তাহারা আর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অর্থব্যয় করিত না।

ঢাকা অনুশীলন-সমিতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলা দরকার, কারণ আজকের ঢাকা ও অর্ধশতাব্দী পূর্বের ঢাকাব মধ্যে অনেক ব্যবধান; ঢাকা এখন বিদেশ। আমাদের আলোচ্য পর্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পীঠস্থান ছিল এই মহানগরী। ঢাকা-সমিতির কার্যপদ্ধতি কলিকাতার বারীন্দ্র প্রমুখদের কার্যপ্রণালী হইতে কিছু ভিন্ন ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যখন পি. মিত্র দেশের নানাস্থানে শারীরিক ব্যায়ামের জন্য আখড়া স্থাপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পুলিনবিহারী দাস ঢাকা যুব সমাজের নেতা। পুলিনবিহারী ১৯০৩ সালে লাঠিখেলা শেখেন;—এককালে বাঙালি জমিদাররা লাঠিয়াল রাখিতেন, নিজেরাও লাঠি চালাইতে জানিতেন; কালে

তাঁহারা শহরবাসী বিলাসী 'ভদ্রলোক' হইয়া উঠিলেন— এই-সব গিয়া পড়িল সাধারণ লাঠিয়ালদের উপর। বঙ্কিমচন্দ্র এককালে লাঠির গুণগান করিয়া প্রবন্ধ লেখেন। আধুনিক যুগে 'ভদ্রলোকে'র ছেলেদের মধ্যে লাঠিখেলার রেওয়াজ হয় অনুশীলন-সমিতি স্থাপনের পর। পুলিনবিহারী লাঠিখেলা শেখেন মুর্তাজা নামে এক বিখ্যাত লাঠিয়ালের নিকট; মুর্তাজাকে আনা হয় লর্ড কর্জনের ঢাকা সফর কালে বিনোদনের জন্য। শোনা যায়, মুর্তাজা ঠগীদের নিকট হইতে এই বিদ্যা আয়ত্ত করেন। পুলিনবিহারী তাঁহার চেলাগিরি করিয়া ওস্তাদ হন এবং কালে অনুশীলন-সমিতি স্থাপন করিয়া হিন্দুবালকদের লাঠি-শিক্ষা ও শরীর-চর্চার ব্যবস্থা করেন। ১৯০৬ হইতে ১৯০৮ সালের মধ্যে ঢাকা-সমিতির অধীনে প্রায় পাঁচশত সমিতি স্থাপিত ও প্রায় ত্রিশ হাজার সভ্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল। এই সংগঠনের মূলে ছিল মুসলমানদের হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা; পরে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি হইল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই ঢাকা-সমিতির ব্যবস্থায় ঢাকা জেলার বারহা গ্রামে যে ডাকাতি হয় (২ জুন ১৯০৮) তাহাতে বিপ্লবীদের হস্তে পঁচিশ হাজার টাকা আসে। এই ধরণের ডাকাতি নানাস্থানে হইতে লাগিল। শুধু ডাকাতিই নহে, কলিকাতায় হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে Y M. C. A এর ওভারটুন হলে ছোটলাট এনড্রু ফ্রেজারকে হত্যার যে চেষ্টা হইয়াছিল (নভেম্বর ১৯০৮) তাহা ঢাকা-সমিতির সদস্যের কার্য। এ ছাড়া সঙ্ঘদ্রোহিতার জন্য কয়েকজন যুবককে দলের লোকে হত্যা করে। ঢাকা-সমিতির শাসন দলগত বিধি বড়ো কড়া ছিল— তাহারা যেমন নির্মম তেমনি সঙ্ঘপ্রাণ। সঙ্ঘপতির আদেশে তাহারা প্রাণ নিতে বা প্রাণ দিতে দ্বিধা করিত না।

১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া নির্বাসনে পাঠাইয়াছিলেন। এই মাসেই ফৌজদারী বিধি সংশোধন করিয়া নূতন আইন পাশ হয়। নিয়ম হইল যে, এই শ্রেণীর অপরাধে আর জুরির বিচার হইবে না, হাইকোর্টের তিন জন জজ বিচার করিবেন। এ ছাড়া সরকারের আদেশে বাংলাদেশের বহু সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল—ঢাকার অনুশীলন-সমিতি, বরিশালের বান্ধব-সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী-সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ-সমিতি ও সাধন-সমিতি। রেগুলেশন আইনে যাঁহারা নির্বাসিত

হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট পুলিনবিহারীও এই দলের মধ্যে ছিলেন। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইল এই-সকল নেতাদের নির্বাসনে পাঠাইয়া ও সমিতিগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া দেশের বিপ্লবপ্রচেষ্টা শমিত হইল। কিন্তু ফল বিপরীত হইল; সহস্র সহস্র চক্ষুর সম্মুখে যে-সব বালকরা ক্রীড়া-ব্যায়ামাদি করিত তাহারা এখন লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেল; তাহাদের বৈপ্লবিক কার্যাদির সন্ধান আর অভিভাবকরাও রাখিতে পারিলেন না। বালক ও যুবকদের মন 'আনন্দ-মঠের' সন্ন্যাসীদের আদর্শে ভাবুকতায় পূর্ণ।

১৯০৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি চৌদ্দমাস পরে পুলিনবিহারী মুক্তি পাইলেন এবং পুনরায় বিপ্লবীদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে যত্নবান হইলেন। পুলিস ইহাদের খোঁজ রাখিত; ইহাদের দ্বারা ইতিমধ্যে বহু ডাকাতি ও খুন হইয়া গিয়াছে। এই-সব সূত্র ধরিয়া ১৯১০ জুলাই মাসে সরকার বিরাট ঢাকা-ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করিয়া পুলিনবিহারী ও বহু যুবককে জড়িত করিল। বিচারে ১৫ জনের দুই হইতে সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও পুলিনবিহারী সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হইলেন। এই ঘটনার পর পূর্ববঙ্গের বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গেল।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবীরা এখনো সক্রিয়; তাহাদের কার্য গোপন হইতে গোপনতর পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। ১৯১১ সালের শেষে বঙ্গচ্ছেদ রদ হইল—১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে বিভক্ত বঙ্গ পুনর্মিলিত হইল। কিন্তু বিপ্লব কর্ম নিশ্চিহ্ন হইল না, রৌলট কমিটির হিসাবে ১৯১২ সালে বঙ্গদেশে ১৪টি রাজনৈতিক ডাকাতি, ১ হত্যা—১৯১৩ সালে ১৬টি—১৯১৪ সালে ১৭টি ঘটনা ঘটিয়াছিল।

ইতিমধ্যে কলিকাতার আপার সার্কুলার রোডের এক বাড়িতে (২৬০।১নং) বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইল। এই রাজাবাজারের কারখানা হইতে প্রস্তুত বোমা প্রথমে মেদিনীপুরের এক রাজসাক্ষীর বাড়িতে নিক্ষিপ্ত হয়; এখানকার প্রস্তুত বোমা ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিংজের উপর চক্ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; মৌলভী বাজারে (সিলেটে) এই বোমা বিস্ফোরণের ফলে এক ব্যক্তি নিহত হয়। ময়মনসিংহেও রাজাবাজারের বোমা পাওয়া গেল। পুলিস বুঝিল যে, এই ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাসবাদ আর বাংলাদেশের

মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই—উহা উত্তর-পশ্চিম ভারতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে; আরও বুঝা গেল, বৈপ্লবিক কর্ম আন্তর-প্রাদেশিক হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

রাজাবাজারের বোমার ব্যাপারের অনতিকাল পূর্বে বরিশালে একটি ষড়যন্ত্র পুলিস ধরিয়া ফেলে; তাহাতে ২৬ জন আসামী ছিল—১২ জনের নানারূপ শাস্তি হইল। বরিশালের দল ঢাকা-সমিতির সহিত যুক্ত ছিল।

১৯১৪ সালে জুলাই মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতীয় বিপ্লবীরা বুঝিল যে—ইংরেজ এখন বিব্রত, সুতরাং বিপ্লব-আন্দোলনের সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত। য়ুরোপীয় যুদ্ধের জন্য ভারতে মোতায়েন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ও ভারতীয় শিক্ষিত সিপাহীদলের অধিকাংশ বিদেশে রণাঙ্গনে প্রেরিত হইয়াছে; ভারতরক্ষার ভার থাকিল অশিক্ষিত টেরিটোরিয়াল ও ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর উপর।

পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবীদল ১৯১২ সালের হাওড়া-ষড়যন্ত্র মামলার পর কিছুকাল শান্ত ছিল। কিন্তু ১৯১৪ সাল হইতে তাহারা পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ হইল। এই সময়ে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) নামে এক অসমসাহসিক, স্বাস্থ্যবান বলশালী যুবক বিপ্লবীদলের নেতৃস্থানীয় আসন গ্রহণ করেন। ইহার চেষ্টায় অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন দল সঙ্ঘবদ্ধ হইল;— তবে সকল দল আসে নাই - ইহাও সত্য। যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব গ্রহণের সময় হইতে ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্ম-পদ্ধতি আরো কঠোর ও ব্যাপক হইয়া উঠিল। এতদিন বিদেশের সাহায্য-লাভের চেষ্টা হয় নাই—এখন এই বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে সেদিকেও বিপ্লবীদের মন গেল; সেকথা আমরা অন্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, বিপ্লবীদের প্রয়োজন ছিল খাঁটি মানুষ আর তার সঙ্গে অর্থ ও শস্ত্রের। অর্থের জন্য তাহারা ডাকাতি করিত ও সুবিধা পাইলেই বন্দুক পিস্তল চুরি করিত। কখনো ছলে কখনো বলে এই-সব আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ হইত। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতার বিখ্যাত বন্দুক-ব্যবসায়ী রডা (Rodda) কোম্পানি হইতে বিপ্লবীরা আগ্নেয়াস্ত্র হরণের ব্যবস্থা করিল। ১৯১৪ সালের ২৬ অগস্ট শ্রীশ সরকার নামে কোম্পানির জনৈক কর্মচারী কাস্টাম হাউস হইতে বন্দুক ও টোটা প্রভৃতি পূর্ণ ২০২টি বাক্স খালাস

করে; ইহার মধ্যে ১৯২টি বাক্স কোম্পানির গুদামে উঠাইয়া অবশিষ্ট ১০টি বাক্স লইয়া সে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। যথাসময়ে সেগুলি বিপ্লবীদের হাতে পড়িল। বাক্সগুলিতে ৪০টি মসার (Mauser) পিস্তল ও ৪৬ হাজার টোটা ছিল। মসার পিস্তলের সুবিধা এই যে সেগুলিকে ইচ্ছা করিলে সাধারণ বন্দুকের ন্যায় কাঁধে লাগাইয়া ব্যবহার করা যায়। এই শ্রেণীর এতগুলি বন্দুক ও টোটা বিপ্লবীদের হস্তগত হওয়ায় তাঁহাদের শক্তি ও সাহস দুইই বাড়িয়া গেল।

পুলিস বিভাগের লোকদের হত্যা ও উহার সঙ্গে চলিতেছে মোটর-ডাকাতি। ১৯১৫ সালে কলিকাতায় বার্ড কোম্পানির প্রায় আঠারো হাজার টাকা বিপ্লবীরা মোটরের সাহায্যে লুণ্ঠন করিয়া লয়। বেলিয়াঘাটার এক ধনী চাউল ব্যবসায়ীর গদি হইতে কুড়ি হাজার টাকা লুণ্ঠন করিয়া মোটরযোগে তাহারা পলায়ন করে। ইহার কয়েকদিন পরে চিত্তপ্রিয় ঘোষ নামে এক ফেরারী রাজনৈতিক আসামী দিবালোকে সাব-ইন্সপেক্টর সুরেশচন্দ্রকে হত্যা করিয়া সরিয়া পড়িল—তাহাকে ধরা গেল না। এই পর্বে কত পুলিস-কর্মচারী যে নিহত হয় তাহার তালিকা দীর্ঘ করিয়া লাভ নাই। মোট কথা আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার জন্য বহু তরুণ প্রাণও উৎসর্গিত হয়।

১৯১৫ সালের প্রথমেই ভারত সরকার ভারতরক্ষা-আইন পাশ করিয়া পঞ্জাব ও বঙ্গদেশের বহুশত যুবককে বিপ্লবী সন্দেহে অন্তরীণাবদ্ধ করিলেন। বিপ্লবীরা আঘাত পাইতে পাইতে ক্রমে এতই সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে যে, পুলিসের পক্ষে মামলা খাড়া করা কঠিন হইয়া পড়ে; অথচ তাহারা জানিত কাহারা এই-সকল কর্মে লিপ্ত। এই শ্রেণীর লোকই অন্তরীণাবদ্ধ হইয়া পড়ে—তৎসত্ত্বেও কিন্তু বিপ্লবকর্ম নিশ্চিহ্ন হইল না।

ভারতে স্বাধীনতা আনিবার জন্য এই বিপ্লবপন্থা অবলম্বন করিয়া কত মহাপ্রাণ যুবক ও বালক শহীদ হইয়াছে, তাহাদের সম্যক ইতিহাস এখনো অজ্ঞাত— তাহাদের কঙ্কালের উপর দিয়াই স্বাধীনতার রথ চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের যোগ্য স্বীকৃতিদান ভারত করে নাই। বিপ্লবীদের মধ্যে অনেক প্রতিভাশালী যুবক ছিল; তাহাদের চরিত্রবলে বিপ্লবসঙ্ঘগুলির মধ্যে আশ্চর্য নিষ্ঠা ও সংযম বাড়িয়া ওঠে। বাঙালি যুবকদের মধ্যে সংগঠনের ক্ষমতা কতদূর ব্যাপক ও মারাত্মক হইতে পারে, তাহা ইতিপূর্বে বাঙালি নিজেই বুঝিতে পারে

নাই— বাংলাদেশের বাহিরে কোনো জাতির পক্ষে ইহা বিশ্বাস্য হয় নাই। ইংরেজ রাজপুরুষরাও ইহা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, 'ভীরু' 'ভেতো' বাঙালি এমন-সব দুঃসাহসিক কর্ম এমন নির্ভীকভাবে নিয়মতান্ত্রিকতার সহিত নিষ্পন্ন করিতে পারে। অনুশীলন-সমিতিগুলি বিপুল সংগঠনের পরিচায়ক; যুগান্তরদল অসমসাহসের পরিচয় দিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

বিপ্লবীরা ভাবপ্রবণতার আতিশয্যে প্রথমে বুঝিতে পারে নাই যে, ব্রিটিশ-শাসনের বুনিয়াদ কী কঠিন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, উহা কী বিস্তৃত, কী নিষ্ঠুর ও thorough। বিপ্লবীরা বারে বারে এই বিপুল রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইয়া ক্রমশই নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিকতর গোপনশীল, কর্মীদিগকে অধিকতর নিষ্ঠাবান করিয়া তুলিয়াছিল। পুলিসের চর যেমন নানাভাবে নানা বেশে বিপ্লবীদিগকে অনুসরণ করিত, বিপ্লবীদের চরগণ পুলিসের গতিবিধির উপর তেমনি শ্যেনদৃষ্টি রাখিত।

বিপ্লবীনেতারা দলের জন্য কর্মী সংগ্রহের বিশেষ সাবধানতা করিতেন; প্রথমত বিদ্যালয় ও কলেজ হইতে অল্পবয়সী বালক ও যুবকদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া নেতারা ধীরে ধীরে তাহাদিগকে ধর্মচর্চা ও শারীরিক চচার জন্য একত্র করিতেন। দলের মধ্যে আসিলেই কাহাকেও বিপ্লবমন্ত্র দেওয়া হইত না; ইহার মধ্যে নানা স্তর ও শ্রেণী ছিল। সকলকে ভীষণ গোপনতা মানিয়া চলিতে হইত। সুতরাং দলের বাহিরের নবাগত কোনো ছেলে ভিতরের খবর জানিতে পারিত না। অনেক পরীক্ষা, শপথ ও দীক্ষার মধ্য দিয়া গিয়া তাহারা বিপ্লবের রূপ দেখিতে পাইত। দীক্ষার প্রথমে শিক্ষার্থীকে এই বলিয়া 'আদ্য প্রতিজ্ঞা' করিতে হইত যে, সে কখনো সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না; সে সমিতির প্রত্যেকটি নিয়ম পালন করিয়া চলিবে, পরিচালকের আদেশ বিনাবাক্যে মানিবে, নায়কের কাছে সত্য ছাড়া মিথ্যা কখনো বলিবে না বা কিছুই গোপন করিবে না। এই-সব নিষ্ঠাপালনের মধ্য দিয়া যাইবার পর বিপ্লবীদলের অঙ্গীভূত হইবার জন্য অন্য 'প্রতিজ্ঞা' করিতে হইত। এইবার শিক্ষার্থীকে বলিতে হইত যে, সে সমিতির আভ্যন্তরীক অবস্থা কখনো প্রকাশ করিবে না, কাহারও সহিত বৃথা তর্ক-বিতর্ক করিবে না, পরিচালককে না জানাইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া-আসার স্বাধীনতা সে নিজের উপর

রাখিবে না এবং যখন যেখানে থাকুক, পরিচালককে সে তাহা জ্ঞাপন করিবে। কোনো ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইলে তখনই পরিচালককে তাহা জানাইবে এবং তাঁহার আদেশমতো যথানির্দিষ্ট কার্য করিবে; ইহার পর যাহারা সন্ত্রাসকর্মের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করিত, তাহাদিগকে 'প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা' করিয়া বলিতে হইত, "ঈশ্বর, মাতা, পিতা, গুরু ও পরিচালকের নামে আমি শপথ করিতেছি যে, সমিতির উদ্দেশ্য যতদিন না সিদ্ধ হয়, ততদিন আমি ইহাকে ত্যাগ করিব না। এবং সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, কোনো প্রকার অছিলা না দেখাইয়া পরিচালকের আদেশ পালন করিব।" 'দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা'য় বিপ্লবীকে বলিতে হইত যে, সে নিজের জীবন দিয়া শেষ পর্যন্ত সমিতির কার্য করিবে।

বাঙালির কোমল চরিত্রের মধ্যে এই কঠোর কর্মনিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতা জাগ্রত করিয়া উহাদিগকে যিনি বিপ্লবপথে লইয়া গিয়াছিলেন তিনি হইতেছেন পুলিনবিহারী দাস— ইঁহার কথা বলা হইয়াছে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, ঢাকা-ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিন দাসের সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর হয়। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে মুক্তিলাভ করিলেন বটে কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্তরীণাবদ্ধ হইলেন। ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি মুক্তি লাভ করিলেন। এই দীর্ঘ আন্দোলনের তীব্র অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিলেন যে, সন্ত্রাসবাদ দ্বারা দেশের মুক্তি হইতে পারে না— তিনি পুনরায় বাঙালি যুবককে শরীরচর্চার দিকে মনোযোগী করিবার চেষ্টায় ব্রতী হইলেন, তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের অবসান হইয়া গেল।

বিপ্লবী-সংস্থায় কর্মীদের নানাপ্রকার কর্ম ছিল; অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য অর্থের প্রয়োজন, অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতি করা। ডাকাতি করিলে বা গুপ্তসমিতি স্থাপন করিয়া বাস করিলে পুলিসের দৃষ্টি পড়ে এবং যে-পুলিস কর্মচারী বা গোয়েন্দা বা সজ্যভেদী লোকের নিকট হইতে কোনো-প্রকার বিপদের সম্ভাবনা থাকে, তাহাকে হত্যা করা। ডাকাতি করিবার পূর্বে বিপ্লবীদের চর জেলার গ্রামগুলির সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিত; পথঘাট সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ, রেলওয়ে ট্রেনের সময়সূচী জানা, প্রত্যেক কর্মীর কার্যভাগ, পরিচালকের আদেশ যন্ত্রবৎ পালন করা প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় তাহা-দিগকে মানিতে হইত। মাঝিগিরি, মাল্লাগিরি জানা, টেলিগ্রাফের তার

কাটিতে জানা, বন্দুক পিস্তল ছুঁড়িতে জানা, নিশ্চল হইয়া মারিতে ও নির্বাক হইয়া মরিতে জানা প্রভৃতি অনেক বিদ্যার সাধনা করিতে হইত। ডাকাতি করিয়া কয়েকজন টাকাকড়ি লইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত; কয়েকজন যন্ত্রপাতি লইয়া, কয়েকজন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সরিয়া পড়িত। "১৯০৬ হইতে ১৯১৭ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত ডাকাতিগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের কষ্ট-সহিষ্ণুতা, নিয়মানুবর্তিতা, ক্ষিপ্রকারিতা নির্ভিকতা, লোভশূন্য মনোবৃত্তি প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।" ডাকাতির পর দলের প্রত্যেক ব্যক্তির গাত্র খানাতল্লাস করা হইত, পাছে কেহ লোভবশত কিছু সংগ্রহ করে। কিন্তু সর্বত্র ও সর্বদা পূর্বোল্লিখিত কঠোর সংযমঅভ্যাস ও বহুবিধ পরীক্ষা গৃহীত হয় নাই বলিয়া বহু মেকি লোক নানা সূত্রে ও অভিসন্ধিতে দলের মধ্যে প্রবেশ করে; দলপুষ্টি ও আশু ফললাভের জন্য নীচ প্রকৃতির লোককে দলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত; ইহার ফলে বিপ্লবীদলের মধ্যে ভাঙন দেখা দিয়াছিল। সরকার বিভাগের কর্মচারীবা যে কেবল তাহাদের বুদ্ধিবলেই বিপ্লবীদের ধরিয়া ফেলিত তাহা নহে, অনেক সময়ে দুর্বলচিত্ত বিপ্লবীরাই পীড়ন ভয়ে পুলিসকে সাহায্য করিয়াছিল। উপযুক্ত নেতার অভাবে দলের মধ্যে অনেক স্বার্থপরতাও প্রবেশ করে।

বাংলার বিপ্লববাদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ, বাঙালি জনসাধারণ এই আন্দোলনে যোগদান করে নাই। বিপ্লববাদের পটভূমিতে কোনো দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ছিল না। এই বিপ্লববাদ হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে সীমিত ছিল। কালীপূজা, চণ্ডী ও গীতা পাঠ প্রভৃতি বিষয় রাজনৈতিক কর্মসাধনার মধ্যে আনিয়া তাহার উদ্দেশ্যকে ধর্মীয় আকার দান করা হয়। ভারতের বাহিরে অনুরূপ সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে ধর্মীয়তার আড়ম্বর দেখা যাইত না। এই ধর্মীয়তার জন্য হয়তো বাঙালি মুসলমান খ্রীষ্টান সমাজের লোক এই বিপ্লববাদে যোগদান করিতে পারে নাই। বিপ্লব প্রচেষ্টা ধ্বংস হইবার প্রধান কারণ ব্রিটিশ শাসন-সংস্থায় পুলিসের কর্মতৎপরতা; এ সব পুলিস কর্মচারীদের সকলেই প্রায় বাঙালি— কিন্তু যে-সব ইংরেজ উপরের দিকে ছিলেন তাহারাও দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তা ছাড়া, দরিদ্র দেশে সামান্য বেতন ও পুরস্কারের লোভে বিপ্লবীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবার মতো লোকের অভাব কোনো দিনই হয় নাই।

বাঙালির বিপ্লবসাধনা বাংলাদেশের মধ্যে সীমিত থাকে নাই। 'যুগান্তরে'র ভাবোন্মত্ততা অল্পবিস্তর ভারতের সকল প্রদেশকেই স্পর্শ করিয়াছিল। ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লী নগরে বড়লাট লর্ড হার্ডিংজের উপরে বোমা নিক্ষিপ্ত হইলে বুঝা গেল, বিপ্লববাদ বাংলার সীমান্ত ছাড়িয়া বহুদূর গিয়াছে—কলিকাতার রাজাবাজারে প্রস্তুত বোমা দিল্লীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পঞ্জাব ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বশেষ অধিকৃত দেশ। তাহাদের দেশ ব্রিটিশদের অধিকারভুক্ত হইবার মাত্র আট বৎসর পরে সিপাহী-বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল—অথচ শিখ ও পঞ্জাবিরা এই বিদ্রোহে যোগদান করে নাই। এতদিন পরে শিখ ও পঞ্জাবি নূতন চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে; বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ স্পর্শে তাহাদের এই পরিবর্তন। ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে পঞ্জাবের তৎকালীন ছোটলাট স্যর ডেনজিল ইবেটসন লেখেন যে, পঞ্জাবের মধ্যে নবজাতীয়তাবাদের উত্তেজনা প্রবেশ করিতেছে, ইংরেজের বিরুদ্ধে অধিবাসীদের মনকে বিষাইয়া তুলিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় আন্দোলনকারীরা গ্রহণ করিতেছে, শিখদের মন ভাঙাইবার চেষ্টা চলিতেছে, লোকে সরকারী-চাকরকে অপমান করিতেছে ইত্যাদি। ছোটলাট বাহাদুর পঞ্জাবের মোটামুটি অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক মনে করিয়া ভারত সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

পঞ্জাবিদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল রাওয়ালপিণ্ডিতে; ব্যাপারটি রাজস্ব বিষয়ক— খাল অঞ্চলের ট্যাকস লইয়া আরম্ভ হইলেও আন্দোলন সেই স্তরে সীমিত ছিল না; অসন্তোষ অল্পকাল মধ্যে দাঙ্গায় পরিণত হয়— জনতা উত্তেজিত হইয়া পিণ্ডির ডাকঘর লুণ্ঠন ও একটি গির্জাঘর ভাঙিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে; অবশেষে সৈনিক আসিয়া দাঙ্গাকারীদের নিবৃত্ত করে। এই অশান্তির জন্য সরকার বাহাদুর পঞ্জাবের নেতৃস্থানীয় লালা লাজপত রায় ও সর্দার অজিত সিংহকে দায়ী করিয়া তাঁহাদিগকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। ছয় মাস পরে সর্দার অজিত সিংহ মুক্তি পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি আরো ব্যাপকভাবে বৈপ্লবিক কর্ম করিবার উদ্দেশ্যে সুফী অম্বাপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া করাচীর পথে ভারত ত্যাগ করিলেন।

পঞ্জাবে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে স্বাদেশিকতা ক্রমশই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। শিখ ধর্মের সংস্কার আন্দোলনের ফলে শিখদের মধ্যে আত্মচেতনা

আসিয়াছে,— আর্যসমাজ ও দেবসমাজের প্রচারের ফলে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মের ও সমাজের সংস্কারের দিকে তাহাদের মন গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না— দয়াল সিংহ কলেজ তাহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত।

১৯০৫ সালে হরদয়াল নামে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অসাধারণ কৃতী ছাত্র গবর্মেণ্ট বৃত্তি (State Scholarship) লইয়া বিলাত যান। ইহার কিছুদিন পরে ভাই পরমানন্দ নামে আর-একজন কৃতী যুবক ইংল্যন্ডে উপস্থিত হন। ইহারা উভয়ে লন্ডনে বাসকালে শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া পড়েন। হরদয়াল বিলাতে অবস্থানকালে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া স্থির করেন যে, ইংরেজের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোনো উপাধি লইবেন না এবং ভারত সরকারের বৃত্তিও ত্যাগ করিবেন। ভাই পরমানন্দ লন্ডন বাসকালে ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার সহিত মিশিতেন বটে, তবে বিপ্লবীভাব পোষণ করিতেন না বলিয়া আত্মকাহিনীতে লিখিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লববাদীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়া পুলিসের দৃষ্টি তাঁহার উপর বরাবরই নিবদ্ধ ছিল। দেশে ফিরিবার পরই পঞ্জাব গবর্মেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে ও মুচলেকা লইয়া সে-যাত্রায় অব্যাহতি দেয়। সরকারের চোখে পরমানন্দ একজন ভীষণ বিপ্লবী, কিন্তু তিনি আত্মকাহিনীতে বলিয়াছেন যে, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

ইতিমধ্যে বৈপ্লবিক মতবাদে উত্তেজিত হইয়া ১৯০৮ সালে হরদয়াল দেশে ফিরিলেন, ও লাহোরের যুবকদের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক কাণ্ডকারখানা সর্বজনবিদিত হইয়াছে। এই-সব ঘটনার সংবাদে পঞ্জাব খুবই উত্তেজিত। //

১৯১১ সালে হরদয়াল দেশত্যাগ করিয়া আমেরিকায় চলিয়া গেলেন। তার পূর্বে তিন বৎসরের মধ্যে পঞ্জাবের যুবজনের মনে বিপ্লবের বীজ বপন ভালোভাবেই করিয়া যান। কিছু কিছু বৈপ্লবিক সাহিত্যও ইতিমধ্যে প্রচারিত হয়। হরদয়াল দেশত্যাগের সময় দিল্লীর আমীর চাঁদকে তাঁহার প্রতিনিধি ও বিপ্লবের পাণ্ডা করিয়া রাখিয়া যান এবং দীননাথ নামক এক ব্যক্তিকে লাহোরে সহকারী মনোনীত করিয়া যান। এই দীননাথ ও

বসন্তকুমার নামে এক বাঙালি যুবক লাহোরের লরেন্স-উদ্যানে একটি তাজা বোমা রাখিয়া আসে; সেখানে সর্বদাই ইংরেজ মেম-সাহেবরা বেড়াইতে আসিত— তাহাদের হত্যার জন্য উহা উদ্যানে রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু বোমা বিদীর্ণ হইয়া মরিল বাগানের এক দরিদ্র মালী। দীননাথ গুপ্তসমিতির নিকট গিয়া বলে যে, লালা হংসরাজের পুত্র বলরাজ ও ভাই পরমানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র বালমুকুন্দ এই বোমা রাখিয়া আসিয়াছিল।

ইতিমধ্যে দেহরাদুন বনবিভাগের হেডক্লার্ক রাসবিহারী বসু পঞ্জাবের ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন; অল্পকাল মধ্যে তিনি উত্তর ভারতের নেতৃস্থান অধিকার করিলেন। তাঁহার সাহায্যে প্রধানত বোমা প্রভৃতি কলিকাতা হইতে আনীত হইত। রাজাবাজার বোমার কারখানা খানাতল্লাসির ফলে সেখানকার কাগজপত্রের মধ্যে দিল্লীর অনেক তথ্য পুলিসের করতলগত হইল। সেই সূত্র ধরিয়া পুলিস দিল্লীর আমীর চাঁদকে ও লাহোরের দীননাথকে গ্রেপ্তার করে; দীননাথ পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়া প্রাণভয়ে রাজসাক্ষী হইয়া যায় ও ষড়যন্ত্রের সকল কথা ফাঁস করিয়া দেয়। এই মামলায় আমীর চাঁদ, বালমুকুন্দ, আউদবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসির আদেশ হয় (বসন্তের অল্প বয়স বলিয়া তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল)। বলরাজের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল— দীননাথ বাঁচিয়া গেল রাজসাক্ষী হইয়া। রাসবিহারীর উপর সরকারের হুলিয়া জারি হইল।

ইতিমধ্যে ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড হার্ডিংজ যখন নূতন দিল্লী রাজধানীতে শোভাযাত্রা করিয়া প্রবেশ করিতেছিলেন তখন চকের একটি বাড়ির ছাদ হইতে বড়লাটের উপর বোমা পড়িল। মাহুত তৎক্ষণাৎ নিহত হয় এবং বড়লাট ও তাঁহার পত্নী আহত হন। লেডি হার্ডিংজ বোমার আওয়াজে এমনি আঘাত পান যে তিনি আর সুস্থ হইতে পারিলেন না এবং উহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া শোনা গিয়াছিল। দীননাথের স্বীকারোক্তি হইতে গবর্মেণ্ট জানিতে পারিলেন যে, রাসবিহারী ও তাঁহার সঙ্গীদেরই এই কীর্তি; সত্যই ইহা রাসবিহারীরই কাজ। রাসবিহারীকে পুলিস ধরিতে পারিল না, পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন করিল এবং দেহরাদুনে গিয়া সভা করিয়া এই প্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করিল।

দিল্লীর ষড়যন্ত্র মামলা ১৯১৪ সালে শেষ হইল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি

আসামীদের ফাঁসি ও দ্বীপান্তর হইয়াছিল। এই আসামীদের মধ্যে বাল-মুকুন্দের পূর্বপুরুষ মতিদাসকে আরঙজেব যেখানে করাত দিয়া চিরিয়া হত্যা করিয়াছিলেন, সেইস্থানে বালমুকুন্দ হাসিতে হাসিতে শহীদ হইল; বালমুকুন্দের স্ত্রী রামরাখী 'সতী' হইলেন— কয়েকমাস পূর্বে তাহাদের বিবাহ হয়; শ্রীমতী স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে আত্মঘাতী হইল। এই ঘটনাটি পঞ্জাবময় খুবই আলোচিত হয় এবং বিপ্লবীদের কর্মপ্রসারে সহায়তা করে।

দিল্লী-ষড়যন্ত্র মামলা শেষ হইয়া গেলে সরকার বাহাদুর ভাবিলেন দেশ শান্ত হইবে— অপরাধীদের যে প্রকার শাস্তি প্রদত্ত হইয়াছে সে-শিক্ষার পর আর কোনো লোক সহজে এ পথে আসিবে না। কিন্তু গবর্মেণ্ট অশান্তির কারণ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল বিচ্ছিন্ন বিপ্লব-প্রচেষ্টাগুলিকে দমন করিয়া ভাবিতেছেন দেশে শান্তি ফিরিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যে কী ভ্রান্ত তাহা বুঝিতে সময় লাগিল না।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি ১৯১৬ সালে হরদয়াল ভারত ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় আশ্রয় লন। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে বহুসহস্র ভারতীয় বিশেষভাবে পঞ্জাবি শিখ শ্রমজীবী বাস করিত; তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহ-প্রচার ছিল হরদয়ালের উদ্দেশ্য। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগর তীরস্থ বন্দর সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে তিনি 'যুগান্তর আশ্রম' নামে এক প্রকাশন কার্যালয় স্থাপন করিলেন ও 'গদর' (বিদ্রোহ) নামে এক পত্রিকা উর্দু ও হিন্দিতে মুদ্রিত করিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন। 'গদর' পত্রিকা ভারতে বহু খণ্ড প্রচারিত হইত। হরদয়ালের অদম্য উৎসাহ ও কর্মশীলতার ফলে আমেরিকায় সর্বশ্রেণী ভারতীয়দের মধ্যে বিপ্লবভাব জাগ্রত হয়। কিন্তু কালে এই হরদয়াল হিন্দু-মহাসভার বিশিষ্ট পাণ্ডা হইয়া নিখিল ভারতে হিন্দুরাজ্য গঠনে স্বপ্নোন্মত্ত হন সে কথা যথাস্থানে আসিবে।

আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের অর্থোপার্জন ব্যতীত অন্য কোনো ভাবনা ছিল না, লেখাপড়া জানিত মুষ্টিমেয় লোক। কিন্তু হরদয়াল ও তাঁহার দুই সহায়ক রামচন্দ্র ও বরকৎউল্লার প্রচেষ্টায় এই প্রায়-নিরক্ষর শ্রমজীবীদের মধ্যে দেশপ্রীতি ও বিপ্লবভাব দেখা দিল। বিদেশে বাস করিয়া ইহাদের চক্ষু খুলিয়া গিয়াছিল।

কানাডা ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন— সেখানে প্রশান্ত মহাসাগরতীরেও বহু ভারতীয় শ্রমজীবীর বাস। সেখানে কিছুকাল হইতে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ ভেদ দেখা দিয়াছে; ভারতীয়, চীনা এবং জাপানী শ্রমিকরা কম-মজুরিতে কাজ করে বলিয়া শ্বেতকায় শ্রমিকদের উপার্জনে অসুবিধা হয়। কিন্তু চীন ও জাপান স্বাধীন দেশ— তাহাদের সম্বন্ধে ভেদনীতি প্রয়োগ করিতে তখনো ইতস্তত ভাব ছিল। ভারতীয়দের কানাডা প্রবেশ সম্বন্ধে বাধা সৃষ্টির অন্তরায় ছিল না।* কিন্তু সরাসরি ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ করিয়া নিয়ম করা কটু দেখায়; তাই কানাডা সরকার নিয়ম করিলেন যে, যাহারা নিজদেশ হইতে সরাসরি কানাডায় আসিবে তাহারাই সে দেশে নামিতে পারিবে। চীন ও জাপানের লোকেরা আপনাদের বন্দর হইতে জাহাজে সরাসরি কানাডায় পৌঁছাইতে পারিত; ভারতের নিজস্ব জাহাজ নাই এবং কোনো জাহাজ ভারতের বন্দর হইতে সোজা কানাডায় যায় না। এই নিয়ম পাশ হইলে যে-সব ভারতীয় শ্রমজীবী হংকং হইতে জাহাজ ধরিয়া কানাডায় গিয়াছিল, তাহাদের তীরে অবতরণ করিতে দেওয়া হয় নাই। তাহারা হংকং-এ ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের অবস্থা কল্পনীয়।

গুরুদিৎ সিং নামে এক শিখ সিঙাপুর ও মালয়ে বহুকাল বাস করিয়া ধন ও মান অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি কানাডা গবর্মেণ্টের এমিগ্রেশন সম্বন্ধে আইন পরীক্ষা করিবার জন্য 'কোমাগাটা মারু' নামে জাপানী জাহাজ ভাড়া করিয়া হংকঙে প্রত্যাবৃত্ত পঞ্জাবিদের লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে পঞ্জাব হইতে কয়েক শত লোক কানাডায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত। মোট ৩৭২ জন পঞ্জাবি কানাডা যাত্রার উদ্দেশ্যে 'কোমাগাটামারু'তে আরোহণ করিল; তাহাদের ভরসা জাহাজ যখন সরাসরি ভারত-বন্দর হইতে কানাডার বন্দরে পৌঁছিতেছে, তখন আইনগত কোনো বাধা থাকিতে পারে না। ১৯১৪ সালের ২১শে মে কানাডার ব্রিটিশ-কলম্বিয়া স্টেটের ভাংকুভার বন্দর-নগরে জাহাজ পৌঁছিলে উহাকে বন্দরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। কর্তৃপক্ষের হুকুম, ভারতীয়দের তীরে নামিতে দেওয়া হইবে না। এই সংবাদে জাহাজে আরোহীদের মধ্যে ভীষণ চঞ্চলতা দেখা গেল। উভয়পক্ষের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গেল— গবর্মেণ্ট অটল; তাঁহারা বলিলেন জাহাজের নোঙর না তুলিলে তোপ দাগিয়া জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া

হইবে। ব্রিটিশ-ভারতের নাগরিক ব্রিটিশ-কলম্বিয়ার তীরে আসিয়া এইভাবে লাঞ্ছিত হইল! অগত্যা জাহাজ ফিরিল— কানাডা সরকার জাহাজের খরচ ও ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হইলেন। কিন্তু তাহার দ্বারা জাতির ইজ্জত বাঁচিল না।

কোমাগাটামারু যখন ভারতে ফিরিতেছে তখন য়ুরোপীয় মহাসমর (জুন ১৯১৪) আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যাখ্যাত শিখ ও পঞ্জাবিদের মানসিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। পথিমধ্যে হংকং, সিঙাপুর, রেঙ্গুন— যেখানে জাহাজ থামিল— সেখানেই শিখরা তীরে নামিয়া ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে তাহাদের কাহিনী বলিয়া অসন্তোষের বহ্নি জ্বালাইবার চেষ্টা করিল। সত্যই তাহাদের ও অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীদের প্ররোচনায় সিঙাপুরে একদল পঞ্জাবি সৈন্য কিছুকাল পরে য়ুরোপীয় মহাসমরে যাইতে অস্বীকৃতই হয়। ইহা একপ্রকার 'মিউটিনী'। এই বিদ্রোহে উভয়দলের বহুলোক হতাহত হইয়াছিল;— অবশেষে ইংরেজের মিত্র জাপানীরা তাহাদের সৈন্য পাঠাইয়া বিদ্রোহীদের ধ্বংস করে। ত্রিশ বৎসর পরে এই জাপানীদের ভরসায় ভারত-উদ্ধারের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সুভাষচন্দ্র!

কোমাগাটামারু কলিকাতার নিকট বজবজে আসিয়া নোঙর করিল (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। পঞ্জাবি আরোহীদের মন ব্রিটিশদের প্রতি বিদ্বেষবহ্নিতে দারুণ উত্তেজিত। তীরে নামিয়াই তাহারা শুনিল ভারত সরকার তাহাদের জন্য বজবজের স্টেশনে ট্রেন তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছেন—বিনা ভাড়ায় তাহাদিগকে দেশে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। এক ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে তাহারা সদ্য যে ব্যবহার পাইয়া আসিতেছে, তাহাদেরই জ্ঞাতি ইংরেজ সরকারের এইরূপ সাধু প্রস্তাব তাহারা বিনা সন্দেহে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহারা গবর্মেণ্টের করুণার দান লইতে অস্বীকৃত হইয়া বলিল যে, তাহারা স্বাধীনভাবেই দেশে ফিরিয়া যাইবে। সরকার পক্ষ হইতে তাহাদের নগর প্রবেশে বাধা দেওয়া হইলে দাঙ্গা বাধিল; উভয়পক্ষের মধ্যে গুলি চলিল— ১৮ জন শিখ মারা পড়িল, পুলিশও কয়েকজন নিহত হইল। গুরুদিৎ সিং প্রমুখ ১৯ জন শিখ নিরুদ্দেশ হইলেন, অবশিষ্টদের ধরিয়া পুলিস দেশে চালান দিল।

এই ঘটনাটির আদ্যান্ত ব্যাপারই পঞ্জাবিদের মনকে বিষাইয়া তুলিল। আমেরিকার 'গদর' দল এই বিষয়টিকে লইয়া তথাকার 'হিন্দু'[১]দিগকে ভীষণভাবে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ভারতের বিপ্লবীরাও ঠিক করিয়া আছে 'কোমাগাটা মারু'র পঞ্জাবিরা দেশে ফিরিয়া আসিলেই তাহাদের বৈপ্লবিক দলে আকর্ষণ করিয়া লইবে।

আমেরিকাবাসী 'হিন্দু'রা এই সময়ে সেখানে বাসকালে কীভাবে ভারতের মধ্যে বিপ্লব সংঘটন হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিতেছেন। মার্কিণ-প্রবাসী ভারতীয়দের একটি কাজ হইল গদর (বিদ্রোহ) ভাবে শিক্ষিত করিয়া পঞ্জাবি ও শিখদিগকে ভারতে প্রেরণ করা। স্থির হইয়াছিল, আমেরিকা হইতে প্রত্যাগতেরা শিখ ও পঞ্জাবিদিগকে যুদ্ধে যোগদান করিতে নিষেধ করিবে ও বিপ্লবকর্মে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিবে। সেই উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে 'তোসামারু' জাহাজে ১৭০ জন শিখ ভারতে ফিরিয়া আসিল। সরকারী কর্মচারীরা এই-সব প্রত্যাগতদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পূর্বাহ্লেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কয়েক মাসের মধ্যে তাহাদের ১০০ জনকে অন্তরীণাবদ্ধ করা হইল। তৎসত্ত্বেও পঞ্জাবে বিপ্লববাদ দ্রুত প্রসারিত হয়;— কারণ যাহারা ফিরিয়াছে তাহারা 'মরিয়া' হইয়াই আসিয়াছে। শিখ ও পঞ্জাবিদের মধ্যে অধিকাংশ বিপ্লবীদের বয়স ত্রিশ বৎসরের উপর, বৃদ্ধ লোকও ছিলেন; কিন্তু ইহাদের নেতা কর্তার সিং বিশ বৎসরের যুবকমাত্র। সকলে একবাক্যে বলিত যে, এরূপ উৎসাহী বুদ্ধিমান কর্মঠ যুবক সচরাচর দেখা যায় না— যে কোনো দেশের বৃহৎ সংস্থার নেতা হইবার যোগ্যতা তাহার ছিল।

পঞ্জাব সরকার প্রত্যাগত শিখদের চাল-চলন ভাবগতিক দেখিয়া মোটেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; অথচ স্পষ্ট অপরাধের প্রমাণ অভাবে তাহাদের আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আইন না থাকায়, তাহারা কিছুকাল দেশমধ্যে বিপ্লবের বাণী প্রচার করিতে সমর্থ হইল। ১৯১৫ সালের প্রথমেই ভারতরক্ষা আইন পাশ হইলে পুলিসের হাতে আইনের নামে বে-আইনীভাবে লোক আটকের যন্ত্র হস্তগত হইলে তাহারা আইনের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল।

১ আমেরিকায় ভারতবাসীরা 'হিন্দু' নামে পরিচিত, ইন্ডিয়ান বলিলে তথাকার রেড ইন্ডিয়ান বুঝায়।

১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিষ্ণুগণেশ পিংলে নামে এক মহারাষ্ট্রীয় যুবক বহুকাল আমেরিকায় বাস করিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন; আমেরিকায় 'গদর' ও অন্যান্য বিপ্লব-প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এই যুবকের ভারতে প্রত্যা-গমনের উদ্দেশ্য বিপ্লব সংগঠন।

বোম্বাই প্রদেশে এখন বিপ্লবের সে অগ্নিদাহ নাই। পিংলে বাঙালি বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হইলেন ও রাসবিহারীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া দেশময় বিরাট বিদ্রোহাগ্নি জ্বালাইবার জন্য নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন। পঞ্জাবের বিপ্লবভাবাপন্ন লোকদের একত্র করিয়া কিরূপভাবে সরকারী খাজাঞ্চিখানা লুঠ করিতে হইবে, দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ প্রচার করিয়া তাহাদের ভাঙিতে হইবে, অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করিয়া, বোমা প্রস্তুত কবিয়া ডাকাতি করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন। নেতারা লুধিয়ানা অঞ্চলের সমস্ত রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ছোট ছোট কমিটি গঠন করিয়া এই-সমস্ত বিপ্লব কার্যের ব্যবস্থা করিলেন। অনেকগুলি ডাকাতিও অনুষ্ঠিত হইল। পুলিসের সঙ্গে আমেরিকা-প্রত্যাগত শিখ ও পঞ্জাবিদের কয়েকবার গুলি ছোঁড়াছুড়ি হইয়া গেল। ডাকাতি যে সর্বদা বৈদান্তিক নিস্পৃহতাবোধ হইতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না; কাহারও কাহারও ব্যক্তিগত ক্রোধ ও আক্রোশ মিটাইবার জন্য লুণ্ঠনাদি হইয়াছিল বলিয়াও শোনা যায়, এইরূপ একটি নৃশংস হত্যাকাহিনী ভাই পরমানন্দ তাঁহার আত্মকাহিনীতে লিখিয়াছেন।

দিল্লীতে বড়লাট হত্যার চেষ্টার (১৯১২) পর ষড়যন্ত্র-মামলা শুরু হইলে রাসবিহারী বসু ফেরার হন; তাঁহার ফোটো প্রধান প্রধান স্থানে লটকানো হইল এবং তাঁহাকে ধরিয়া দিতে পারিলে পুলিস বহু সহস্র টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগের চরদের চক্ষে ধূলি দিয়া বাংলা ও পঞ্জাবের মধ্যে বিপ্লবসূত্র গ্রথিত করিবার কার্য করিয়া চলিলেন। প্রত্যাগত শিখেরা আমেরিকা হইতে রাসবিহারীর দিল্লী-ষড়যন্ত্র-কাহিনী শুনিয়া আসিয়াছিল। তাহারা পঞ্জাবে তাঁহাকে আহ্বান করিল। পঞ্জাবের ক্ষেত্র কিরূপ জানিবার জন্য রাসবিহারী তাঁহার প্রধান সহায় শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে কাশী হইতে প্রেরণ করিলেন। কাশীতে শচীন্দ্রের ভালো সংস্থা ছিল। শচীন্দ্র পঞ্জাবের অবস্থা অনুকূল বোধ করায় রাসবিহারী

তথায় গমন করেন ও পঞ্জাবি বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হন। রাসবিহারীর সংগঠনের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ইতিমধ্যে পিংলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সৈনিকদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি ছিল ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য—তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র আছে, সাহস আছে, নিয়মানুবর্তিতা আছে। রাসবিহারী এলাহাবাদের সৈন্যদলের মধ্যে আসিয়া কাজ করিবার জন্য দামোদর স্বরূপকে আনিলেন; বেনারসের ছাউনিতে পাঠাইলেন বিভূতি হালদার ও প্রিয়নাথকে; রামনগরসিক্রোল-এর সৈন্যদলের ভার অর্পিত হইল বিশ্বনাথ পাঁড়ে, মঙ্গল পাঁড়ে প্রভৃতির উপর। জব্বলপুরে সৈন্যদলের মধ্যে কাজ করিতে থাকে নলিনী ও অন্যেরা। কর্তার সিং, পিংলে প্রভৃতি লাহোর, অম্বালা, ফিরোজপুর, রাওয়াল-পিণ্ডি, মীরাট প্রভৃতি সেনাবারিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্যদের বুঝাইল যে য়ুরোপীয় সমর চলিতেছে, বিদ্রোহের ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। স্থির হইল ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পঞ্জাবে বিদ্রোহ ঘোষিত হইবে এবং যুগপৎ সর্বত্র কার্য শুরু হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে কৃপাল সিং নামে একজন বিপ্লবী পুলিসের নিকট ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করিয়া দিল। সরকার তখনই গোরা পল্টন আনাইয়া বারুদঘরে, তোপখানায়, অস্ত্রাগারে পাহারার ব্যবস্থা করিয়া সতর্ক হইলেন। তখন বিপ্লবীরা স্থির করিল ১৮ই বিদ্রোহ জাগাইবে; কিন্তু সরকারের ভাবগতিক ও ব্যবস্থাদি দেখিয়া সিপাহীরা ভয় পাইয়া গেল, ঐ দিনের বিদ্রোহের কথাও পুলিস কৃপাল সিং-এর সহায়তায় জানিয়া ফেলিল।

চারিদিকে খানাতল্লাসি ধরপাকড় চলিল; রাসবিহারীর বাসায় অনেক রিভলভার, গুলি, বোমা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু সেবারও পুলিস রাসবিহারীকে ধরিতে পারিল না। মীরাটের এক কেল্লায় পিংলে কতকগুলি বোমা সমেত ধরা পড়িল; এই বোমাগুলি মারাত্মক উপাদানে প্রস্তুত—সরকারী মতে সেগুলি অনায়াসে অর্ধেক রেজিমেণ্ট উড়াইয়া দিতে পারিত। পিংলের ফাঁসি হইল। বিপ্লবীরা একজন যুবককে বিদেশ হইতে অস্ত্রাদি সংগ্রহের জন্য আফগানিস্তানের পথে প্রেরণ করিয়াছিল। সেও ধরা পড়িল। পুলিস লাহোরের এই বিপুল বিপ্লব প্রচেষ্টার আভাস পাইয়া অতি ব্যাপকভাবে খানাতল্লাসি খোঁজখবর করিয়া এক মামলা খাড়া করিল; ইহা লাহোর-ষড়যন্ত্র-মামলা নামে খ্যাত। ইহার একদলে ৬১ জন, অপর দলে ৭২ জন ও আরেকটি দলে ১২ জন আসামী। ২৮ জন বিপ্লবীর ফাঁসি হইল, ২৯ জন মুক্তি

লাভ করিল, অবশিষ্টদের বিভিন্ন মেয়াদের জেল হইল। বিশিষ্টদের মধ্যে ভাই পরমানন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। পরমানন্দ বলিয়াছেন যে তিনি কখনো বিপ্লববাদ বা হত্যাদি সমর্থন করিতেন না, পুলিসের চক্ষে তিনি অপরাধী হইয়াছেন।

লাহোর-ষড়যন্ত্র-মামলার সময়ে ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যাবলীর বিচিত্র ইতিহাস প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইহাদের সহিত আমেরিকার 'গদর' দলের ঘনিষ্ঠ যোগ, আমেরিকাস্থ জার্মান কন্সাল ও গুপ্তচরদের নিকট সাহায্য গ্রহণের আয়োজন, বাংলার বিপ্লবীদের সহিত যুক্ত হইয়া বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থ আমদানীর ব্যবস্থা প্রভৃতি সবই জানাজানি হইয়া গেল। ১৯১৫ সালের ভারতরক্ষা আইন বলে ১৬৮ জন পঞ্জাবিকে বিপ্লবী সন্দেহে অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়। ইনগ্রেস অর্ডিনান্স (Ingress Ordinance) নামে এক বিশেষ আইন অনুসারে ৩৩১ জন লোককে ১৯১৪ হইতে ১৯১৭ সালের মধ্যে আটক করা হয়; প্রত্যাগত শিখদের মধ্যে ২,৫৭৬ জনকে নিজ নিজ গ্রামে আটক রাখা হইল।

লাহোর-ষড়যন্ত্র সফল হইলে ভারতে দ্বিতীয় সিপাহী-বিদ্রোহ পর্যায়ভুক্ত হইত। এই ষড়যন্ত্রে বহু শিক্ষিত লোক ছিল, তাহারা সকলেই প্রাণ হারাইল অথবা জেলে বা অন্তরীণে আবদ্ধ হইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিল। মোট কথা এই আন্দোলন ব্যর্থ হইলে পঞ্জাবে বিপ্লবের আশাও চূর্ণ হইল। এই রাজনৈতিক বিপ্লবদমনে ইংরেজের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন শিখ সর্দারগণ, পঞ্জাবি জমিদার ও প্রধান ব্যক্তিরা; দেশীয়দের সহায়তা ব্যতীত এই বিরাট বিপ্লব ব্যর্থ হইত না।

১৯১৫ সালে লাহোর-ষড়যন্ত্র-মামলার পর বিপ্লবী নেতারা বুঝিলেন যে, ভারতের মধ্যে বিপ্লবপ্রচেষ্টা সফল করিতে হইলে বাহিরের সহায়তার প্রয়োজন। য়ুরোপে যুদ্ধ চলিতেছে, জারমানরা ইংরেজের শত্রু— তাহাদের সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে। বাহির হইতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী না করিতে পারিলে বিদ্রোহ করা অসম্ভব, বন্দুক রাইফেল চুরি করিয়া, জাহাজী খালাসী ও কর্মচারীদের নিকট হইতে চোরাকারবারী মারফৎ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ব্যাপক বিদ্রোহ সফল হইবে না।

বাহিরের সহিত যোগস্থাপন ও বিদেশী সাহায্য পাইবার আশায় রাসবিহারী

ছদ্মবেশে ছদ্মনামে কলিকাতা হইতে ১৯১৬ সালের ১২ এপ্রিল জাপান যাত্রা করেন ; তিনি P. Tagore নাম লন এবং প্রকাশ করেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়, কবিবরের জাপান-যাত্রার পূর্বে ব্যবস্থা করিতে তাঁহার অগ্রদূতরূপে তিনি সেখানে যাইতেছেন ; রবীন্দ্রনাথ জাপান যাত্রা করেন ৩ রা মে। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ জাভা যান বিপ্লব উদ্দেশ্য লইয়া।

বাহিরের সহিত রাজনৈতিক যোগস্থাপনের চেষ্টা ইতিপূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। মানিকতলার বোমার ব্যাপার ব্যর্থ হইয়া গেলে একদল ভারতের বাহিরে চলিয়া যান। ইঁহারা আমেরিকা ও জারমেনিতে আশ্রয় লন ; ইঁহারা হইতেছেন হরদয়াল, বীরেন চ্যাটার্জি (সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা), বরকতউল্লা, ভূপেন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্র কর, অবনী মুখার্জি প্রভৃতি। ইহাদের বিদেশযাত্রা হইতে ভারতীয় বিপ্লবপ্রচেষ্টা নূতন ডিপ্লোমেটিকরূপ গ্রহণ করে। য়ুরোপে বহুকাল হইতে একটি বিপ্লবীদল ছিল ; শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা ও তাঁহার সঙ্গীদের কথা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমতী কামা নামে এক পারসি তেজস্বিনী মহিলা ভারতীয় যুবকদের নানাভাবে সাহায্য করিতেন, তাঁহার কথাও বলিয়াছি। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লববাদকে বা ভারতের স্বাধীনতাকে বৃহৎ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেখিবার দিকে এখনো তাঁহাদের দৃষ্টি যায় নাই। ১৯১১ সালে অবনী মুখার্জী এই উদ্দেশ্য লইয়া বিদ্যার্থীরূপে জারমেনী গমন করেন। অবনী জারমান সরকারের নিকট ভারতীয় বিপ্লববাদীদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। কিন্তু ভারতবাসী ও বিশেষত বাঙালি যুবকরা যে এইরূপ কোনো বিপ্লব প্রচেষ্টা করিতে পারে তাহা অতিবিজ্ঞ জারমান রাজনীতিজ্ঞরা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না ; এবং অবনীকে বাধ্য হইয়া জারমেনী ত্যাগ করিতে হইল। বোঝা গেল ইমপিরিয়ালিজম—তাহা সে ব্রিটিশ বা জারমানই হউক—সবার রঙ একই।

এই সময়ে সুইটজারল্যাণ্ডেও একদল ভারতীয় যুবক আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা বিষয় অনেক জল্পনা-কল্পনা করিতেন। পিলাই নামক এক তামিল যুবক ছিলেন ইহার নেতা বা সভাপতি। ইহাদের দলে আসিয়া জোটেন বীরেন চ্যাটার্জি। জারমেনিতে ছিলেন অবনী, বরকতউল্লা ও ভূপেন্দ্র দত্ত ; আমেরিকা হইতে হরদয়াল আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন।

জারমেনির সহিত ব্রিটেনের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে (১৯১৪) ভারতীয় বিপ্লবীরা জারমানদের সহায়তালাভের চেষ্টা পুনরায় করিলেন।

জারমেনীস্থিত ভারতীয়রা একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, তাহার মর্ম এই যে, 'ভারতে এইসময় বিপ্লবচেষ্টায় সাহায্য করিলে জারমেনীর এই যুদ্ধে কি সুবিধা হইতে পারে।' যাহারা এই পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাহারা বাঙালি বিপ্লবী। এই পুস্তিকা জার্মান গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও তাহার ফলে বিপ্লবীরা জারমান গবর্মেণ্টের বৈদেশিক দপ্তরে আহূত হন। জারমান সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের কিছু কিছু সংবাদ রাখিতেন, কারণ কয়েক মাস পূর্বে অবনী মুখার্জির সহিত তাহাদের দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মার্নের যুদ্ধের পর (সেপ্টম্বর ১৯১৫) হইতে জারমান সরকার স্থির করিলেন যে ভারতীয় বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সমরে তাঁহারা সাহায্য করিবেন।

এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া ভারতীয় যুবক বিপ্লবীরা খুবই আশান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং এই কয়টি শর্তে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শর্তগুলি এই : (১) ভারতীয় বিপ্লবীপক্ষ হইতে জারমান সরকারের নিকট হইতে একটি জাতীয় ঋণ গৃহীত হইবে এবং ভারত স্বাধীন হইলে উক্ত ঋণ পরিশোধিত হইবে। (২) জারমানরা অস্ত্রশস্ত্রাদি সরবরাহ করিবে ও বিদেশে তাঁহাদের যে-সব প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রদূত আছেন তাঁহারা সকলে বিপ্লবীদের সাহায্য করিবেন। (৩) তুর্কী তখনো নিরপেক্ষ ছিল (অক্টোবর ১৯১৪), জারমানদের পক্ষ লইয়া মিত্রশক্তির বিপক্ষে তাহাকে যুদ্ধে নামিতে হইবে; এই 'জেহাদ' ঘোষণার ফলে ভারতীয় মুসলমানেরা ইংরেজদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবে ও তাহাদের ভারতের বিপ্লবচেষ্টার সুবিধা হইবে।[১]

১৯১৪ সালের শেষ দিকে জারমেনীতে ভারত স্বাধীনতা কমিটি (Indian independence committee) গঠিত হইয়াছিল; এই কমিটির সর্বপ্রথম কাজ হইল দেশ ও বিদেশস্থ বিপ্লবীদের সংবাদ ও কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য আমন্ত্রণ প্রেরণ করা। এই আহ্বানে দেশে বেশ সাড়া পড়িয়া গেল। এই কমিটির নির্দেশমত অনেক বিপ্লবী ছাত্র ভারতে ফিরিয়া আসিল, তাহাদের অনেককেই বার্লিন ঘুরিয়া যাইতে হয়। এই বৎসরের শেষে পিংলে দেশে ফিরিয়া গিয়াছিল এবং সেখানে কীভাবে কাজে নামিয়া প্রাণ দেয়, সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বার্লিন কমিটিতে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ,

১ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বঙ্গবাণী' ১৩৩১, আশ্বিন।

বরকতউল্লা, বীরেন চ্যাটার্জি, ডাঃ মনসুর ও হরদয়াল ছিলেন। চারদিক হইতে যুবকদের আনাইয়া অর্থ ও অস্ত্রাদি দিয়া ভারতের নানাস্থানে পাঠানো হইল— যেন তাঁহারা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের যথাযথ সংবাদ ও অর্থাদি প্রদান করেন। কমিটি স্থাপনার পর হইতে ভারতীয় সমস্ত বিপ্লবীদল একত্র হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হন। বাহিরের আমেরিকার 'গদর' দল বার্লিন কমিটির সহিত মিলিতভাবে কর্ম করিতে আরম্ভ করায় কমিটির লোকবল বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইল। মার্কিনী 'গদর' পার্টির ব্যবস্থায় বহু শত শিখ ভারতে ফিরিয়া আসে, তাহাদের কথাও বলা হইয়াছে।

যুদ্ধ ঘনাইয়া উঠিলে বিশেষতঃ মার্ন-এর (সেপ্টেম্বর ১৯১৫) যুদ্ধের পর বিপ্লবীদের কর্ম প্রচেষ্টায় ভারতীয়দিগকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা জারমানদের প্রবল হইয়া উঠিল। মহাযুদ্ধে যে-সব ভারতীয় সৈন্যরা জারমানদের হস্তে বন্দী হইয়াছিল, বরকতউল্লা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পিল্‌লে নামে তামিল যুবক বৈদেশিক খবর প্রেরণের গুপ্তসাংকেতিক কোড্ শিখিয়া তাঁহার এক বিশ্বস্ত চরকে তাহা শিখাইয়া সিয়াম রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন; সেখান হইতে যুদ্ধের সংবাদ মুদ্রিত করিয়া চারিদিকে প্রচার করিবার মতলব ছিল। হেরম্বলাল গুপ্ত আমেরিকায় জারমানদের এজেণ্ট হইয়া গেলেন; পরে ডাক্তার চন্দ্রকুমার ঐ কার্যভার প্রাপ্ত হন। বার্লিন হইতে পারস্যের পথে বসন্ত সিংহ, কেদারনাথ ও কারসম্প নামে এক পারসি যুবক ভারতে আসিতেছিল, পথে ইংরেজের হাতে পড়িয়া তাহাদের প্রাণ যায়। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ,[১] জারমান সেনাপতি Von der Golt ও বরকতউল্লা আফগানিস্তানের ষড়যন্ত্র করিবার জন্য উপস্থিত হন। এইরূপে য়ুরোপস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদের বিচিত্র কাজ চলিতেছে।

১ রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ— বৃন্দাবনে প্রেমমহাবিদ্যালয় নামে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন; ইহা টেকনিক্যাল স্কুল। এই ধনীপুত্র য়ুরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে আফগানিস্তানের পথে য়ুরোপ যান ও জারমেনীস্থ ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হন। ভারত স্বাধীন হইলে ইনি দেশে ফিরিয়া আসেন। এখন ইনি ভারতীয় লোকসভার সদস্য। বিপ্লব যুগে ইনি এশিয়ার বহুস্থান সফর করেন ও ভারতের বাহিরে বিপ্লবভাব প্রচারের জন্য বহুল পরিমানে দায়ী।

জারমানদের সহয়তা লাভের আশায় জারমেনীর মধ্যে যেমন একদল বিপ্লবী চেষ্টা করিতেছিলেন, আমেরিকায় মার্কিনী-জারমানদের ও মার্কিন সরকারের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টাও চলিতেছিল। তখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জারমেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া য়ুরোপীয় মহাসমরে অবতীর্ণ হয় নাই। বিপ্লবীদের মনে হয়তো এই কথা উঠিয়াছিল যে, স্বাধীনতাকামী আমেরিকানরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করিতে পারে— কারণ তাহাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ফরাসী সেনাপতি লাফায়েৎ না আসিলে তাহারা বোধ হয় স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনে কৃতকার্য হইত না। যাহাই হউক, উচ্চ আশা লইয়া বিপ্লবীরা কর্মে অবতীর্ণ হইলেন। এই উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্র কর কাজ করিতে লাগিলেন; এই ক্ষীণদেহ রুগ্‌ণ যুবকের অদম্য উৎসাহ ও অসমসাহস ছিল। শোনা যায়, কানাডার পুলিস তাহাকে তাড়া করিলে একবার তুষারহিম নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মার্কিন রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। সুরেন্দ্র কর হরদয়াল প্রতিষ্ঠিত ও রামচন্দ্র পরিচালিত 'গদর' দলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন ও মার্কিন জনসাধারণের নিকট ভারতের কথা প্রচার করেন। মহাযুদ্ধের শেষ অবস্থায় যখন প্রেসিডেণ্ট উইলসন চৌদ্দদফা শর্তের শান্তির কথা প্রস্তাব করেন, সেই সময়ে এই সুরেন্দ্র করই তাহার মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার দাবি উল্লেখ করিবার জন্য প্রেসিডেণ্টকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই ইতিপূর্বে 'গদর' দল ভারতে তিন লক্ষের অধিক টাকা এবং তোসামারুতে বহুলোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই-সব লোক যাহারা অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছিল এবং প্রাণ দিবার জন্য ভারতে আসিয়াছিল, তাহারা অধিকাংশই স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত শ্রমজীবী 'সাধারণ' লোক।

জারমানদের সহিত ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ছিল ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত, সিয়াম রাজ্যের ব্যাংকক নগর ও জাভাদ্বীপের বাটাবিয়া (বর্তমান জাকার্তা)। শেষোক্ত দুইটি স্থানে আমেরিকান জার্মান-দূতের অপিস ছিল; তাঁহার আদেশ ও ব্যবস্থাক্রমে সাংহাই ও বাটাবিয়ার জারমান-কন্সালরা কাজ করিতেন বলিয়া বোধ হয়। পশ্চিম প্রান্তস্থিত কেন্দ্রের কাজ ছিল প্রধানত মুসলমান উপজাতি ও রাজ্যসমূহের মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি; এই-সব বোধ হয় জারমেনীর বৈদেশিক দপ্তরের অধীন ছিল।

বার্লিন কমিটি সংস্থাপন ও জারমান সাহায্য লাভের সংবাদ বাংলাদেশে

যথাসময়ে আসিল ; লোকদ্বারা প্রেরিত অর্থ নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিল। এই সংবাদ আসিলে অনেক বাদানুবাদের পর বিভিন্নদল একত্র হইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। বার্লিন হইতে প্ল্যান ঠিক ছিল যে বালেশ্বরে অস্ত্রাদি গ্রহণ করিতে হইবে। সেইজন্য বাঙালি বিপ্লবীরা হ্যারি এণ্ড সন্স ছদ্মনামে বালেশ্বরে য়ুনিভার্সাল এম্পোরিয়াম খুলিল, সেইটি হইল বৈপ্লবিক কর্মের আবরণ মাত্র।

এদিকে সিয়ামের ব্যাংককস্থিত বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক যুবক প্রেরিত হইল। ১৯১৫ সালের গোড়ায় জিতেন্দ্র লাহিড়ি য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাংলার বিপ্লবীদের সংবাদ দিল যে, জারমানরা বাটাবিয়ায় বাঙালি প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য বলিয়াছেন। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য C. Martin নাম লইয়া বাটাবিয়া রওনা হইয়া গেল ; ঐ মাসে অবনী মুখার্জী জাপানে প্রেরিত হইল— সেখানে রাসবিহারীর সহিত মিলিত হইবার জন্য বোধ হয়।

মার্টিন ওরফে নরেন্দ্র বাটাবিয়ায় উপস্থিত হইয়া জারমান কন্সালের সহিত পরিচিত হইলেন এবং খবর পাইলেন যে, অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই জাহাজ আমেরিকা হইতে রওনা হইয়াছে। নরেন্দ্রের কথামতো ঐ জাহাজ সুন্দরবনের খাড়িতে ভিড়িবে ঠিক হইল। হ্যারি এণ্ড সন্স-এর ছদ্মনামধারি কোম্পানির নামে জারমান এজেন্টরা তারযোগে ৪৩ হাজার টাকা প্রেরণ করে ; পুলিস জানিবার পূর্বেই ৩০ হাজার টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হইল।

১৯১৫ সালের জুন মাসে নরেন্দ্র জাভা হইতে দেশে ফিরিল। এদিকে যতীন্দ্রনাথ, যদুগোপাল, ভোলানাথ, অতুল ঘোষ প্রভৃতি বিপ্লবীরা আমেরিকা হইতে আগত 'ম্যাভেরিক' জাহাজের বন্দুক গোলাগুলি কীভাবে রাখিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করিতেছে। স্থির হইল সুন্দরবনের হাতিয়াদ্বীপে, কলিকাতায় ও বালেশ্বরে সেগুলি ভাগ করিয়া রাখিতে হইবে। বাংলাদেশে সে সময়ে যে সৈন্য ছিল তাহার জন্য বিপ্লবীরা ভয় পায় নাই, কারণ অধিকাংশ সৈন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছে, যাহারা আছে তাহারা টেরিটোরিয়াল ও ভলান্টিয়ার। কিন্তু অপর প্রদেশ হইতে সৈন্য যাহাতে বাংলাদেশে আসিতে না পারে, তজ্জন্য প্রধান প্রধান রেলওয়ে ব্রিজগুলি ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা হইল ; যতীন্দ্রনাথ মন্দ্রাজ রেলপথের সেতু, ভোলানাথ বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের চক্রধরপুরে, সতীশ চক্রবর্তী ঈস্ট ইন্‌ডিয়া রেলপথের লুপ লাইনের অজয় সেতু উড়াইয়া দিবার জন্য

প্রেরিত হইল। এ ছাড়া আরও বহু কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারা বিপ্লবের রঙীন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

য়ুরোপে ফরাসী গুপ্তচর বিভাগ ভারতীয় বিপ্লবকারীদের ষড়যন্ত্রের কথা প্রথম জানিতে পারে। ১৯১৫ সালের অগস্ট মাসে ফরাসী পুলিস ইংরেজ সরকারকে এই সংবাদ দেয়। ৭ই অগস্ট ভারতীয় পুলিস বালেশ্বরে হ্যারি এণ্ড সন্স-এর দোকান খানাতল্লাসি করিয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিল। সেখানে সুন্দরবন-হাতিয়া-র একখানি ম্যাপ আবিষ্কৃত হইল ও ম্যাভেরিক জাহাজ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্যও পুলিস সংগ্রহ করিল। ইহার পর যে ঘটনা ঘটিল তাহা উপন্যাসের ন্যায় রোমাঞ্চকর; বাঙালি যুবকদের বীরত্বের ও আত্মত্যাগের কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে স্থান পাইবার উপযুক্ত। পুলিস বিপ্লবী-দের সাক্ষাৎ পাইল বালেশ্বর হইতে ২০ মাইল দূরে কাপ্তিপদ নামক পার্বত্য অঞ্চলে; বিপ্লবীরা মাত্র পাঁচ জন। পুলিসের সহিত খণ্ডযুদ্ধে চিত্তপ্রিয় নিহত হইল, যতীন্দ্রনাথ সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইয়া অল্পকাল পরে মারা গেলেন; নীরেন্দ্র, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ ধরা পড়িল—প্রথম দুইজনের ফাঁসি ও জ্যোতিষের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল। বাঙালির প্রথম যুদ্ধোদ্যম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইলেও এ কথা সেদিন স্পষ্ট হইল যে, দেশের জন্য বাঙালি যুদ্ধ করিয়া মরিতে পারে।

'ম্যাভেরিক' জাহাজের কোনো সংবাদ না পাইয়া বিপ্লবীরা অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া দুই জন কর্মীকে পোর্তুগীজ রাজ্য গোয়ায় প্রেরণ করিল। সেখান হইতে ভোলানাথ চ্যাটার্জী—B. Chatterton নামে বাটাবিয়ার 'মার্টিন'কে এক তার করে। ইতিপূর্বে নরেন্দ্র-মার্টিন বাটাবিয়ার জারমান দূতের সহিত কিংকর্তব্য স্থির করিবার জন্য জাভা চলিয়া গিয়াছিলেন। গোয়ার টেলিগ্রামের ব্যাপার পুলিস জানিয়া সেখানে খোঁজ করিয়া ভোলানাথ ও তাহার সঙ্গীকে ধরিয়া ফেলে; ভোলানাথ কয়েকদিন পরে পুণা জেলে আত্মহত্যা করিয়া মুক্তি লাভ করিল।

নরেন্দ্র-মার্টিন দেশের মধ্যে বিপ্লব প্রচেষ্টার সকল আশা নির্বাপিত দেখিয়া আমেরিকা পলায়ন করিলেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে রাসবিহারী পঞ্জাব-ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইলে জাপান পলায়ন করিয়াছিলেন; অবনী মুখুজ্জে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি আলোচনার জন্য জাপানে রাসবিহারীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন; উভয়ে এই অঞ্চলের ভারতীয় বিপ্লবীদের সংঘবদ্ধ করিয়া

চীনদেশস্থ জারমানদিগকে তাহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর সাংহাই-এর জারমান-কন্সালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতে বিপ্লবকর্ম সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। অবনী ভারতে ফিরিতেছিলেন, পথে সিঙাপুরে ব্রিটিশ পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। অবনীর নোটবুকে অনেক ঠিকানা ও ঘটনা টোকা ছিল; সেই খাতা হইতে পুলিস বহু তথ্য অবগত হইল। বিচারে অবনীর প্রাণদণ্ডাদেশ হয়; কিন্তু তিনি মৃত্যুকে এড়াইলেন, সিঙাপুরের কেল্লা হইতে পলায়ন করিয়া অসহ্য কষ্টভোগের পর অবশেষে জাভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেখানে একজন য়ুরোপীয়ের ভৃত্য হইয়া য়ুরোপে চলিয়া যান ও পরে সোবিয়েত রুশে আশ্রয় লন।

১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে সাংহাই মহানগরীতে একজন চীনার নিকট ১২৯টি পিস্তল ১,২০,৩৮০ টোটা পাওয়া গেল। সেগুলি কলিকাতায় অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট তাঁহাব পৌঁছাইয়া দেবার কথা। পুলিসের বুঝিতে বাকি থাকিল না যে এগুলি বিপ্লবীদের জন্য প্রেরিত হইতেছে— সাধারণ চোরা-কারবারী ব্যাপার নহে। সাংহাই-এর ব্যাপার হইতে বিপ্লবের আরও অনেক তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। এদিকে ব্রহ্মদেশেও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে বলিয়া শোনা গেল; রাজদ্রোহ অপরাধে মান্দালয় জেলে অমর সিংহ নামে এক পঞ্জাবির ফাঁসি হইল। সিঙাপুরের সৈন্যদলে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। মোটকথা পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বত্রই বিপ্লবের আবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল।

এইবার আমবা ম্যাভেরিক প্রভৃতি জাহাজের কী হইল এবং কেন সেগুলি যথা সময়ে ভারতে আসিয়া পৌঁছিতে পারিল না, সেই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ম্যাভেরিক ছিল স্ট্যাণ্ডার্ড অইল কোম্পানির তৈলবাহী জাহাজ। একটি জারমান কোম্পানি এই জাহাজটি ক্রয় করিয়া বিপ্লবীদের হাতে সমর্পন করে। ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে (যে মাসে রাসবিহারী ভারেত ত্যাগ করেন) কালিফোর্ণিয়ার স্টেটের San Pedro বন্দর হইতে 'ম্যাভেরিক' খালি অবস্থায় বন্দর ত্যাগ করে। 'গদর' দলেব নেতা রামচন্দ্র ও সানফ্রান্সিসকোর জারমান কন্সাল এই জাহাজের ব্যবস্থা করিয়া দেন; ২৫ জন নাবিক ইহাতে ছিল, সকলেই ভারতীয়, পাঁচজন পারসিক বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়।

কথা ছিল—Anne Larson নামে আর একখানি জাহাজে জারমানরা বন্দুক প্রভৃতি লইয়া পথে আসিয়া ম্যাভেরিককে ধরিবে। কিন্তু সেই জাহাজখানি পথিমধ্যে মার্কিন গবর্মেণ্টের রক্ষী জাহাজ ধরিয়া ফেলে। ওয়াশিংটনের জারমান কন্সাল জাহাজের মালগুলি তাঁহার নিজের বলিয়া দাবি করেন, কিন্তু মার্কিন সরকার তাহা গ্রাহ্য না করিয়া মালপত্র বাজেয়াপ্ত করেন। ম্যাভেরিক বহুকাল অপেক্ষা করিয়া জাভার দিকে খালি অবস্থায় রওনা হইল। বাটাবিয়ায় জাহাজখানি কয়েকদিন থাকিয়া আমেরিকায় ফিরিয়া গেল, সেই জাহাজেই নরেন্দ্র ভট্টাচার্য আমেরিকায় পলায়ন করিলেন। এই নরেন্দ্র পরে মানবেন্দ্র রায় নাম গ্রহণ করিয়া সোবিয়েত রুশে আশ্রয় লন।

'হেনরি এস্' নামে আর একখানি জাহাজ মারফৎ জারমানরা যুদ্ধের সরঞ্জাম কিছু পাঠাইয়াছিল; ফিলিপাইন দ্বীপ হইতে জাহাজটি সাংহাই বন্দরে পৌঁছিলে সেখানে উহার মালপত্র আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে; কস্টমস্ বা শুল্কবিভাগ সমস্ত মাল নামাইয়া লয়। অপর একখানি জাহাজেও গোলাবারুদ আসিতেছিল, সেখানি আন্দামানের কাছে ব্রিটিশ ক্রুজার ডুবাইয়া দেয়।

'হেনরি এস্' জাহাজে Wehde ও Bochm নামে দুইজন মার্কিন-জারমান আসিতেছিল, তাহারা ধরা পড়িয়া আমেরিকায় প্রেরিত হয়; শিকাগোতে তাহাদের সঙ্গে হেরম্বলাল গুপ্তের বিচার হয়, সকলেরই শাস্তি হয়। সানফ্রান্সিসকোতেও একদল ভারতীয় বিপ্লবীর বিচার হইয়াছিল; কিন্তু এত গুরু অপরাধেও তাহাদের কাহারও ১৮ মাসের অধিক কারাগার হয় নাই।

এইরূপে বাহিরের সাহায্য লইয়া ভারত স্বাধীন করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। শোনা যায়, জারমান সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিল; এই টাকার কিয়দংশ কয়েকজন স্বার্থপর. তথাকথিত বিপ্লবী আত্মসাৎ করে, কিন্তু বেশির ভাগ টাকাই পড়ে জারমানদের হাতে।

আন্তর্জাতিক সহায়তায় ভারতের মধ্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার অনেকগুলি কারণ ছিল; প্রথমত, এই শ্রেণীর বিপ্লব জাগরিত করিয়া দেশ স্বাধীন করা বর্তমান যুগে অসম্ভব; কারণ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার কঠোরতা, গুপ্তচর-ব্যবস্থা, সমরসজ্জা সমস্তই ইহার প্রতিকূল। দ্বিতীয়ত, বিপ্লববাদ দেশের মধ্যে প্রচারিত হইলেও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিতের মধ্যে সীমিত ছিল। জাতীয় জাগরণ আনিবার জন্য যে সাহিত্যের প্রয়োজন, তাহা সৃষ্ট হয় নাই,

অর্থাৎ বিপ্লববাদের পটভূমে কোনো দার্শনিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তৃতীয়ত, বহির্জগতের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া ভারতের রাজনীতিকে খণ্ডিতভাবে দেখিবার অভ্যাসবশত তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাকে অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়াছিলেন। দেশের মধ্যে ডাকাতি হত্যাদির ফলে বিপ্লবীরা দেশের লোকের নিকট হইতে অনুকূল সহায়তা ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয়। অথচ বাহিরের চক্ষে ভারতের প্রচেষ্টাকে বহুগুণিত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা ছিল। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্যে আন্তরিক নিষ্ঠারও অভাব ছিল। চতুর্থত, বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানে বাঙালি, মারাঠি, পঞ্জাবি প্রভৃতি জাতির লোক অসমসাহস কর্তব্যনিষ্ঠা দেখাইলেও ইহাদের মধ্যেই কদর্য স্বার্থপরতা, নীচতা, অর্থলোভ, বিশ্বাসঘাতকতা বাসা বাঁধিয়াছিল। ভূপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "পঞ্জাবি বৈপ্লবিকেরা বলেন যে, যুদ্ধের সময়ে বিপ্লবোদ্যমের চেষ্টায় পঞ্জাবিরা প্রাণ দিয়াছেন, আর বাঙালিদের মধ্যে কেহ কেহ টাকা চুরি করিয়াছে। কথাটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের দোষ ত্যাগ করিয়া সমষ্টির গুণ গ্রহণ করিলে গুণের দিকেই পাল্লা ভারী হয়।"[১]

রাজনীতিতে গান্ধীজির নেতৃত্ব গ্রহণ ও অসহযোগ তথা খিলাফত-আন্দোলনের সময় হইতে দেশের মধ্যে বিপ্লবকর্ম কিছুটা মন্দা পড়ে এবং বিপ্লবশক্তি বহুধা বিভক্ত হইতেও থাকে। অসহযোগ, যুব-আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন, কৃষক-আন্দোলন প্রভৃতি বিচিত্র কর্মের মধ্যে বিপ্লবীরা ছড়াইয়া পড়িল। খাস বিপ্লবীদের কর্মপন্থা লইয়াও যথেষ্ট মতভেদ দেখা গেল। ১৯২৩ সাল হইতেই বিপ্লবীদের আটক রাখা আরম্ভ হয়; ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে অর্ডিনান্স পাশ হইলে বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক কর্মী আবদ্ধ হন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা গেল কয়েকটি দল নানাভাবে নানাস্থানে বিপ্লবকর্ম —যাহা এখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদের সীমানার মধ্যে আসিয়া পড়ে— সেইরূপ বিপ্লবকর্মে নিযুক্ত রহিয়াছে।

১৯২৮ সালে লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা চলিতেছে; সেই সময়ে লাহোরের পুলিস সুপার মিঃ সনডার্স ১৭ই সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে নিহত হইলেন। বহু যুবক ধৃত হইল— ভগৎসিংহ, বসন্তদাস, শুকদেব, যতীন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি।

---

১ সুভাষচন্দ্র বসুর তিরোধানের পর আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অর্থ লইয়া গোলমালের কথা শোনা যায়।

হাজতে ও আদালতে বন্দীদের প্রতি অকথ্য দুর্ব্যবহার নিরাকরণের জন্য বহু চেষ্টা করিয়া কোনো ফল দেখা না গেলে যতীন দাস অনশন ধর্মঘট করেন; চৌষট্টি দিন অনশনের পর তাঁহার দেহান্ত হয়। এই সময়ে বর্মাদেশেও স্বাধীনতা-আন্দোলন মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে দেখা দেয়; সেখানেও বৌদ্ধ ভিক্ষু উত্‌তম বহু দিন অনশনের পর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই অনশন-নীতির প্রবর্তক গান্ধীজি।

লাহোর-মামলায় সাক্ষী-সাবুদ ভালোরূপ জোগাড় করিতে না পারায় পুলিস মামলা উঠাইয়া আসামীদের রাজবন্দী করিয়া রাখিল।

বরিশালের পুরাতন 'যুগান্তর' দল, চট্টগ্রামের সূর্য সেন বা মাস্টারদা'র দল ও নানাস্থানের 'অনুশীলন-দল' কোনো-না-কোনো প্রকারের সংগ্রাম অনতিবিলম্বে আরম্ভ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ আর কার্যকরী হইতেছে না দেখিয়া বিপ্লবীরা সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রতি জনগণের মনকে আকর্ষণ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। কিন্তু অস্ত্র কোথায়? বিদেশ হইতে অস্ত্র আমদানীর বাধা কি এবং তাহার পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাই স্থির হইল অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়া অস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। বিদ্রোহাত্মক গোপন ইস্তাহার বিতরিত হইতে লাগিল। কলিকাতায় মেছুয়াবাজারে বিপ্লবী-দের আড্ডায়— যেখানে এই-সব জল্পনা-কল্পনা হইতেছিল, পুলিস হানা দিয়া (ডিসেম্বর ১৯২৯) সকলকেই গ্রেপ্তার করিল। এখানকার সূত্র ধরিয়া বাংলা-দেশের নানাস্থান হইতে ৩২ জন যুবককে লইয়া বিরাট মেছুয়াবাজার বোমার ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করিল। বহু লোকের শাস্তি হইল। মেছুয়াবাজারের ধরপাকড়ের চারি মাস পরে চট্টগ্রামের প্রচণ্ডতম প্রয়াস— অস্ত্রাগার লুণ্ঠনরূপে দেখা দিল। বাঙালির এত বড় দুঃসাহসিকতা, এত বড় আত্মত্যাগ, এমন সংগঠন, এমন দৃঢ়তা ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। সূর্য সেন, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও লোকেন্দ্র বলের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইল। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা দেশ জয় করিয়া ইংরেজদের নিশ্চিহ্ন করা। চারিদিন চট্টগ্রাম শহর বিপ্লবীদের হস্তগত ছিল; কিন্তু চারদিক হইতে সৈন্য, পুলিস আসিয়া গেল; বিপ্লব কীভাবে শমিত হইল তাহার বিস্তারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিব না— এ সম্পর্কে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিপ্লবের শেষ চেষ্টা ১৯৩০ হইতে ১৯৩৪ পর্যন্ত চলিয়াছিল; বাংলাদেশের নানা স্থানে সন্ত্রাসবাদের রুদ্রহস্তে কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ কর্মচারী নিহত ও আহত হন। এই গুপ্তসমিতির কেন্দ্র ছিল ঢাকা; ইহারা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা সংক্ষেপে বি. ভি. নামে পরিচিত। ১৯২৮ সালে কলিকাতার কন্‌গ্রেসের সময় সুভাষচন্দ্র বসু সামরিক কায়দায় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নামে সঙ্ঘ গড়িয়াছিলেন। তাহাদেরই ধ্বংসাবশিষ্টেরা নূতনভাবে দলবদ্ধ হইয়া সক্রিয় বিপ্লব বা সন্ত্রাস কর্মে লিপ্ত হইল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারে লুণ্ঠনাদি ঘটনার পর ১৯৩০ সালের ২৯শে অগস্ট বঙ্গদেশের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিস মি. লোম্যান ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে নিহত হন ও মি. হাডসন মারাত্মকভাবে আহত হন। হিন্দুদের উপর ঢাকায় ইংরেজ পুলিস কর্মচারীদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন অসহ্য হইলে যুবকরা প্রতিশোধপরায়ণ হইয়া উঠিয়া সন্ত্রাসের পথাশ্রয়ী হইল। ঢাকার হত্যাকারী বিনয়কৃষ্ণ রায় দীনেশ গুপ্ত ও সুধীর গুপ্ত বা বাদলকে লইয়া কলিকাতায় পলায়ন করিয়া আসিল; সেখানে রাইটার্স বিল্ডিং বা সেক্রেটারিয়েটে প্রবেশ করিয়া সাহেবদের উপর গুলি চালান; কিন্তু চারিদিক হইতে পুলিসের গুলি বর্ষিত হইতে থাকিলে পরাভব সুনিশ্চিত বুঝিয়া বাদল পটাসিয়াম সাইনাইড খাইয়া মৃত্যুবরণ করিল। দীনেশ ও বিনয় রিভলভার দিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বিনয় সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হয় ও পাঁচদিন পরে মারা যায়; দীনেশকে সুস্থ করিয়া ফাঁসি দেওয়া হয়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের অনিবার্য পরিণাম দেখিয়াও যুবকরা সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না; ইহাদের অন্য সঙ্গীরা মেদিনীপুরে অনর্থ আরম্ভ করিল। যে-সব ইংরেজ কর্মচারী বাঙালি হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট প্যাডি ১৯৩১ সালে ৭ এপ্রিল, মিঃ ডগলাস ১৯৩২ সালের ৩০ এপ্রিল ও ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর মিঃ বার্জেস নিহত হইলেন। ডগলাসের আততায়ী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ও অন্যদের হত্যাকারীদের মধ্যে ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ ও নির্মলজীবনের ফাঁসি হইল। এইভাবে বি. ভি. দলের বিচ্ছিন্ন কর্মীদের সন্ত্রাস প্রচেষ্টার অবসান ঘটিল।

কন্‌গ্রেসের মধ্যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধের জন্য তরুণ দল চঞ্চল হইয়া উঠিল। পৃথিবীর ইতিহাসে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর দ্রুত পরিবর্তন

হইতেছে— প্রাচ্যে চীন-জাপান অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত, য়ুরোপে ফ্যাসিস্ত ইতালি, নাৎসী জার্মেনী ও কম্যুনিষ্ট রুশ নূতন সমস্যা সৃষ্টি করিতেছে; ব্রিটিশের সার্বভৌম শক্তির অবসান সুস্পষ্ট। ভারতের মধ্যে কন্‌গ্রেসের একটি দল আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সুযোগ লইবার জন্য প্রস্তুতির আহ্বান ঘোষণা করিলেন। দিনাজপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশ সরকারকে ছয় মাসের মধ্যে স্বাধীনতা দিবার জন্য চরমপত্র পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু কন্‌গ্রেসের প্রধানগণ জানিতেন যে, নিরস্ত্র দেশে এই ধরণের বিপ্লব অসম্ভব— তাহার পরীক্ষা কয়েকবারই হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরী কন্‌গ্রেসে সুভাষচন্দ্র সভাপতিরূপে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সমর্থন পাইলেন না। অবশেষে মতভেদ স্পষ্ট বিরোধে পরিণত হইল— সুভাষকে কন্‌গ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করিতে হইল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে কন্‌গ্রেস আপোষনীতির পথ ধরিয়া রহিলেন; গান্ধীজির মত, যুদ্ধে আক্রান্ত ও বিপন্ন ব্রিটিশকে এই সময় বিব্রত করা সত্যাগ্রহীর ধর্ম নহে। কন্‌গ্রেসের প্রবীণরা মনে করিতেন যে, আপোষের দ্বারা মীমাংসা হইবে— সুভাষ প্রমুখ তরুণদল মনে করিতেন, স্বাধীনতার দাবি ও স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামের অনুকূল সময় এখনই। কন্‌গ্রেস সভাপতিকালে ও কন্‌গ্রেস হইতে বিতাড়িত হইবার পর তিনি যে তিন বৎসর দেশে ছিলেন তার মধ্যে দেশে কন্‌গ্রেসের আপোষী মনোভাবের ও কর্মধারার বিরুদ্ধে একটি জনমত ও জনসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যুব-আন্দোলন, কৃষক-আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন প্রভৃতির মধ্য দিয়া তিনি বিপ্লববাদ প্রচার করিতে থাকেন। সুভাষচন্দ্র 'ডিসিপ্লিন' বা সঙ্ঘকর্মে কঠোর সংযম ও কঠিন শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। য়ুরোপের সর্বত্রই দেখা যাইতেছিল ডিক্‌টেটরদের সাফল্যলাভ হইতেছে 'পার্টির' আনুগত্যের উপর; ফ্যাসিস্টরা মুসোলিনীগত প্রাণ, নাৎসিদের চোখে হিটলার দেবতা, কম্যুনিষ্ট পার্টির লোকের কাছে স্ট্যালিন দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ— কারণ তাহারা দেবতা মানে না। সুভাষের মনে হইতেছে 'পার্টি' সেই আদর্শে গড়িতে হইবে। কিন্তু পৃথিবীর আন্তর্জাতিক অবস্থা যেভাবে দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া চলিতেছে, তাহাতে জেলে বসিয়া দিন যাপনের কোনোই অর্থ নাই; কন্‌গ্রেস-কর্মীরা জেলবরণ করিতেন এবং লীগকর্মীরা সেই সুযোগে তাঁহাদের দাবিদাওয়া

আদায় করিয়া লইতেছেন; সাম্প্রদায়িক ফাটোল বিস্তৃততর হইতেছে। এই পরিস্থিতিতে বিদেশে গিয়া ব্রিটিশদের শত্রুপক্ষীয়দের সহিত যুক্ত হইয়া কাজ করিবার সঙ্কল্প সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করিলেন। নিজগৃহে নজরবন্দী অবস্থা হইতে কীভাবে সুভাষ দেশত্যাগ করিলেন (২৬ জানুয়ারি ১৯৪১) তাহা আজ সুবিদিত। গভীর রাত্রে এলগিন স্ট্রীটের বাসভবন হইতে মৌলবীর পরিচ্ছদে মোটরকারযোগে তিনি পলায়ন করেন। কাবুল হইয়া অবশেষে জারমেনীতে উপস্থিত হইলেন, সেখান হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল রেডিও মারফত। তিনি বলিলেন, "অক্ষশক্তির (Axis) আক্রমণ হইতে আপনাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য যদি ব্রিটেন আজ আমেরিকার দ্বারস্থ হইতে লজ্জা না পায়, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অপর কোনো জাতির সাহায্যপ্রার্থী হওয়া আমার পক্ষে অন্যায় নয়, অপরাধও হইতে পারে না।" তাঁহার বক্তব্য, বিদেশীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া ভারত উদ্ধার করিতে হইবে। ঠিক এই ভাবনা হইতে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েও ভারতীয় যুবকরা জারমানদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। সেবারের মতো এবারও সুভাষচন্দ্র বার্লিনে গিয়া সেই পথই ধরিলেন। কিন্তু জারমেনি হইতে ভারতে সাহায্য কীভাবে পৌঁছাইবে? পথ জটিল ও বিপদসঙ্কুল; তাছাড়া জারমেনরা নিজেরাই বিব্রত। সুতরাং জারমেনির ডুবো জাহাজে করিয়া তিনি জাপানে আসিলেন; সেখানে রাসবিহারী বসু কিছুটা পটভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে জাপান অল্প সময়ের ভিতর পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ব্রিটিশদের বহু সহস্র ভারতীয় সৈন্য জাপানীদের হস্তে বন্দী। সুভাষচন্দ্র ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙাপুরে জাপানী সরকারের অনুমোদনে ও সহায়তায় আজাদহিন্দ সরকার স্থাপন করিলেন। য়ুরোপের পোল্যণ্ড, চেকেস্লোভাকিয়া প্রভৃতি জারমান-বিধ্বস্ত রাজ্যগুলির বিকল্প গবর্মেণ্ট স্থাপিত হইয়াছিল লন্ডনে— স্বাধীন ভারতের আপিস প্রতিষ্ঠিত হইল সিঙাপুরে (২১ অক্টোবর ১৯৪৩,)— জাপানীদের নূতন লব্ধ সাম্রাজ্যের আর এক নগরে। সুভাষচন্দ্র হইলেন এই আজাদ সরকারের প্রধান পুরুষ, প্রধান সচিব, সমর-সচিব, পররাষ্ট্র-সচিব, সৈন্যাধ্যক্ষ অর্থাৎ এককর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য হিটলার যেভাবে সমস্ত পোর্টফোলিওগুলি নিজের হাতে রাখিয়া সর্বনিয়ন্তার কাজ করিতেছিলেন, সুভাষও সেই নীতি অবলম্বন করিয়া 'নেতাজী' পদ গ্রহণ করিলেন।

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মধ্যে ভারতের সকল প্রদেশের লোকই ছিল; বে-সরকারী বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, এই ফৌজে ১৪০০ অফিসার ও ৫০ হাজার সৈন্য ছিল। আজাদ সরকারের ব্যয়ের জন্য বহু টাকা উঠিয়াছিল— শুধু বর্মা হইতেই চার কোটি টাকা পাওয়া যায়। সুভাষ 'নেতাজী'রূপে ভারত স্বাধীন করিবেন; তাহার জন্য লোক সর্বস্ব দান করিতে প্রস্তুত। শোনা যায় তাঁহার অভিনন্দনের একটি ফুলের মালা প্রকাশ্য সভায় নিলাম করিয়া তখন-তখনই বারো লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তখন জাপানীদের সাম্রাজ্যভুক্ত; সেই দেশেই সুভাষচন্দ্রের এই-সব আয়োজনের কেন্দ্র। জাপানী-সৈন্য বর্মা অধিকার করিয়া পার্বত্য পথে আসাম সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল; সুভাষের আজাদ ফৌজও সঙ্গে আসিল। আক্রমণকারীরা মনে করিয়াছিলেন যে, ভারত-সীমান্তে তাহাদের আগমন-বার্তা প্রচারিত হইবামাত্র দেশমধ্যে বিপ্লব হইবে। সেজন্য বাস্তববোধহীন রাজনীতির যাহা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তাহাই ঘটিল। অল্পকালের মধ্যে মার্কিন, ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মিলিত সৈন্যবাহিনী জাপানীদের বাধা দিল। এ দিকে বাংলাদেশ তো ১৯৪২ সালের অগস্ট আন্দোলনের ও ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পর এমন নির্বীর্য হইয়াছে, তাহাদের নিকট যে কিছুই আশা করা যায় না, এ ধারণা আক্রমণকারী জাপানী ও আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মনে একবারও উদিত হয় নাই। যে অনাহারক্লিষ্ট জনতা খাদ্য কাড়িয়া হাঙ্গামা (food riot) বাধাইতে পারে নাই— তাহারা বিদেশী সৈন্যের আগমনবার্তা শুনিয়া পুলকিত হইয়া বিপ্লব করিবে? দরিদ্ররা জীর্ণ শীর্ণ— মধ্যবিত্তেরা যুদ্ধের অসংখ্য প্রকার কর্মে নিয়োজিত— সৎ ও অসৎপথে ধনাগমের মুক্ত প্রাঙ্গণে তাহারা বিহার করিতেছে! ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, কনট্রাকটারগণ যুদ্ধের পর্বে লক্ষপতি, ক্রোড়পতি হইতেছে— কাহারো আজাদ-ফৌজের আগমনে উৎসাহ নাই।

ব্যর্থ হইল জাপানীদের অভিযান— ব্যর্থ হইল আজাদ-হিন্দ-ফৌজের প্রয়াস। ব্রিটিশ-মার্কিন যুক্ত ফৌজের অমানুষিক চেষ্টায় বর্মা পুনরধিকৃত হইল; দেখিতে দেখিতে জাপানের তিন বৎসরের সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। সুভাষচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি জাপানীদের সহায়তায় ভারত উদ্ধার করিবেন; জাপানী শাসন সরকার তাঁহাকে এই ভরসা দিয়াছিল যে, তাহারা ভারত উদ্ধারের জন্য সহায়তা করিবে -- ভারতের প্রতি তাহার কোনো লোভ নাই।

সুভাষচন্দ্র ইতিহাসের ছাত্র এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি-অভিজ্ঞ— তিনি কী করিয়া ভাবিতে পারিলেন যে, যে-জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া গত পাঁচ বৎসর চীনের উপর পাশবিক দৌরাত্ম্য করিতেছে, যে-জাপানী আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া অতর্কিতভাবে পার্ল-হার্বার ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে, যে-জাপানীরা ১৯১৬ সালে সিঙাপুরে ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহী হইলে ইংরেজের মিত্ররূপে সিপাহীদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধোদ্যমকে কঠোরভাবে দমন করিয়াছিল— সেই লুব্ধ পরস্বাপহারক জাপানীরা ব্রিটিশদের হাত হইতে ভারত উদ্ধার করিয়া সুভাষচন্দ্রের হাতে উহা সমর্পণ করিয়া দেশত্যাগ করিবে! তাহা হইলে মুগল-সর্দার বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া বহলুলকে মসনদে বসাইয়া কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিতেন। দক্ষিণ ভারতে এই কণ্টক দিয়া কণ্টক উৎপাটনের নীতি অবলম্বন করিতে গিয়া নবাবরা ইংরেজ ও ফরাসীদের আহ্বান করেন— তাহাদের কেহই দেশ ছাড়িয়া যায় নাই। সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিজ্ঞরা এমন বৈদান্তিক নহেন যে, যে-দেশ রক্ত দিয়া অর্থ দিয়া জয় করিবে— তাহা অপরকে ভোগের জন্য ছাড়িয়া দিয়া আসিবে!

ব্রিটিশ, মার্কিনী ও ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে বর্মা, মালয় সবই পুনর-অধিকৃত হইল। আজাদ-ফৌজ ব্রিটিশ সৈন্যদের হস্তে বন্দী হইয়া বিচারের জন্য ভারতে প্রেরিত হইল। সুভাষচন্দ্র সিঙাপুর হইতে জাপানে যাইবার সময় বিমান দুর্ঘটনার পর নিখোঁজ হইলেন। ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্য সশস্ত্র আক্রমণ প্রয়াস ব্যর্থ হইল। তখন ব্রিটিশরাজত্বের শেষ বৎসর— বিপ্লবীদের বিচার হইল। জবহরলাল নেহরু ব্যারিষ্টাররূপে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের রক্ষার জন্য আদালতে উপস্থিত হইলেন— ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া আসিবার ত্রিশ বৎসর পর এই তাঁহার প্রথম আদালতে ওকালতি ও এই শেষ ওকালতি। ফৌজের বন্দীরা মুক্তিলাভ করিল।

ভারতের মুক্তি কোনো বহিরাগত মিত্রশক্তির সহায়তায় নিষ্পন্ন হইল না; গান্ধীজির অহিংসক অসহযোগনীতি হয়তো আংশিকভাবে এই স্বাধীনতার জন্য দায়ী। অতি সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভারত স্বাধীন হইয়াছিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ঘাতপ্রতিঘাতের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায়।

১৯৪৬ সালে বোম্বাই বন্দরে ভারতীয় নৌসৈন্যদের বিদ্রোহ ব্রিটিশ

সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তখন ভারতের কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকার শাসন সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিলেও ব্রিটিশরাই ভারতের মালিক।

ভারতের পূর্বদিকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বিদ্রোহী, ভারতের নৌবাহিনী সেই পথাশ্রয়ী। এই দুইটি ঘটনায় ব্রিটিশ বুঝিল এতকাল ভারতীয় সৈন্যবিভাগের মধ্যে যে দাসসুলভ মনোভাব ছিল— তাহা ধ্বংস হইয়াছে। এই অবস্থায় ভারতকে শাসন করা অসম্ভব। সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সৈন্যরা তো এতকাল ব্রিটিশ সরকারেরই তাঁবেদারী করিয়াছে— এখন তাহারাও স্বাধীন ভারত চায়। এ অবস্থায় ভারতকে সাম্রাজ্যমধ্যে রক্ষা করার চেষ্টা সম্পূর্ণ অর্থশূন্য— কারণ স্থলসৈন্য ও নৌসৈন্য উভয়েই বিদ্রোহী হইয়া ইংরেজের প্রভুত্বকে অস্বীকার করিতেছে। এখন ভারত ত্যাগই বুদ্ধিমানের কর্ম, ইহাতে তাহার ধন মান দুইই বজায় থাকিবে এবং ভারতীয়রা বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ করিয়া ব্রিটিশদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। পৃথক পাকিস্তান রাজ্য গঠিত হইলে ব্রিটিশের কূটনীতির জয় হইল। ভারতীয়রা মনে করিল, অহিংসা মন্ত্রবলে ভারত স্বাধীন হইল।

ইসলাম ও পাকিস্তান

পটভূমি

বস্তুতন্ত্রহীন আদর্শবাদ ও আদর্শহীন বাস্তববাদের সংঘর্ষে পাকিস্তানের জন্ম। ১৯৩০ সালে যখন 'পাকিস্তান' শব্দমাত্র সৃষ্ট হয়, তখন সেদিকে কাহারও দৃষ্টি যায় নাই। ১৯৪০ সালে মিঃ জিন্না বলিলেন, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই ইহাকে বাধা দিতে পারে; ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। জাতীয় আন্দোলনের প্রারম্ভভাগে একথা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ সর্ববিষয়ে ভিন্ন এবং পৃথক রাষ্ট্রসৃষ্টি ব্যতীত তাহার সমাধানও হইতে পারে না। কিন্তু আদর্শবাদীদের স্বপ্ন বুদ্‌বুদের মতো ফাটিয়া গেল— দুইটি পৃথক রাষ্ট্র— ভারত ও পাকিস্তান— সৃষ্ট হইল— ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

এই ঘটনা কেন হইল তাহার বিচার প্রয়োজন। পৃথিবীর জনসংখ্যা ধরা হয় ২৫০ কোটি— তাহার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ন্যূনকল্পে ৩০ কোটি এবং ভারতে (পাকিস্তান সমেত) মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৯ কোটি, তন্মধ্যে বঙ্গ-আসামে ছিল প্রায় ৩ কোটি। সুতরাং এই বিপুল সংঘবদ্ধ জাতির ইচ্ছা ও দাবির পটভূমি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে এই দেশবিভেদের কারণও অজ্ঞাত থাকিবে; সেইজন্য আমরা ইসলামের মূলগত ইতিহাসধারা এখানে সর্বাগ্রে আলোচনা করিব।

ভগবান বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট ও হজরত মহম্মদ ঐতিহাসিকক্রমে এই তিন মহাপুরুষ পৃথিবীর তিনটি ধর্মের প্রবর্তক—বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম ও ইসলাম। হিন্দুধর্ম, পার্সিধর্ম ও ইহুদীধর্ম বিশেষ কোনো ব্যক্তিপ্রবর্তিত ধর্ম নহে বলিয়া উহাদিগকে 'সনাতন' বলা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক দিক হইতে একথা অনস্বীকার্য যে হজরত মহম্মদ পৃথিবীর শেষ ধর্মপ্রবর্তক— ইসলাম প্রচারের পর পৃথিবীতে আর কোনো উল্লেখযোগ্য নূতন ধর্মমত স্থাপিত হয় নাই। পরেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায় বিশ্বধর্ম প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই ইতিহাসে পূর্বোল্লিখিত ধর্মগুলির ন্যায় ব্যাপকতা লাভ করে নাই; সুতরাং তাহাদের

কথা বাদ দেওয়া যাইতে পারে। ইসলাম পৃথিবীতে শেষ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও নৈতিক বিপ্লব আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া মুসলমানরা হজরত মহম্মদকে শেষ নবী বা প্রফেট বলিয়া বিশ্বাস করেন।

আরবজাতির মধ্যে যে অফুরন্ত প্রাণশক্তি ছিল তাহা হজরত মহম্মদের স্পর্শে গতিশীল হইয়া উঠে; তাঁহার সরল একেশ্বরবাদ ও উদার সমাজনীতি সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে। আরবরা হজরতের সেই সহজ ধর্মমত প্রচারে ব্রতী হইয়াছিল। হজরতের মৃত্যুর আশি বৎসরের মধ্যে আরবরা অতলান্তিক মহাসাগরতীরস্থ আফ্রিকা ও স্পেন হইতে সিন্ধুনদতীরস্থ ভারত এবং মধ্য-এশিয়ার কিয়দংশ জয় করিয়া বিশাল ধর্মরাজ্য গড়িয়া তোলে— পৃথিবীতে এইরূপ ঘটনা ইতিপূর্বে কথনো ঘটে নাই।

ইসলাম সাফল্য মণ্ডিত হইবার বিশেষ কতকগুলি কারণ ছিল। মুসলমানরা একেশ্বরবাদী; ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরাণ ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট— তাহার মধ্যে কাহারও হস্তক্ষেপের অধিকার নাই; হজরত মহম্মদকে নবী বলিয়া স্বীকার আবশ্যিক। এই তিনটি ইসলাম ধর্মের প্রধান ভিত্তিস্তম্ভ। এ ছাড়া মক্কার কাবাক্ষেত্রে 'হজ' করা মুসলমান মাত্রেরই পক্ষে জীবনের চরম কাম্য; ইহাই হইল নিখিল মোসলেম জগতের মিলন কেন্দ্র।

ইসলামের সাফল্যের অন্যতম কারণ, ৭-৮ শতকে সমকালীন অন্যান্য ধর্মমত পার্সি, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ অত্যন্ত অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। বৈজয়ন্তীয়ম গ্রীক সাম্রাজ্যে, এশিয়া ও মিশরে যে খ্রীষ্টীয় ধর্মমত সেসময়ে প্রবল, তাহার মধ্যে ধর্ম হইতে ধর্মীয়তার আড়ম্বর ছিল অধিক, অসংখ্য সম্প্রদায়ে তাহারা বিভক্ত। ইরানের পার্সিধর্ম ও মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধধর্মও ছিল তদ্রূপ। ভারতের হিন্দুধর্ম জাতিভেদ ও আচার-বিচার ও বিচিত্র কুসংস্কারে জরাজীর্ণ। সুতরাং ইসলামের জয়যাত্রায় তাহাকে বাধাদান করিবার শক্তি কাহারও ছিল না,— সকলেই সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক আদর্শতায় দেউলিয়া।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈজয়ন্তীয়ম গ্রীকরা ও পারসিকরা ছিল প্রবল ও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী; উভয়ে এশিয়া-মাইনর (আনাতোলিয়া) সিরীয়া ও ইরাকের দোয়াব বা মেসোপটেমিয়া লইয়া নিরন্তর সংগ্রামে রত। এই রক্তমোক্ষণকারী সমরানলে উভয় পক্ষই দগ্ধ হইতেছিল। এ ছাড়া পারস্যের মধ্যে কে রাজা হইবে তাহা লইয়াও অশান্তি ও নরহত্যা কিছু কম হইত না।

ইহার ফলে রণক্লান্ত গ্রীক-সম্রাটের নিকট হইতে সিরীয়া জয় করা আরবদের পক্ষে যেমন সহজ হইল, বীরশূন্য পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করা তদপেক্ষা অধিক শ্রমসাধ্য হইল না। যে-সব জাতি বা দেশ আরবের অধীন হইল, তাহারা যে কেবল আরবের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব স্বীকার করিল তাহা নহে, তাহাদিগকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া ঐ ধর্মও গ্রহণ করিতে হইল। মধ্যযুগে ইসলামের সহজ সরল ধর্মমত তথা সামাজিক সাম্যবাদের আদর্শতা জগতের সকলদেশের ধর্মে-অর্থে-কামে-মোক্ষে -বঞ্চিত সর্বহারাদের বুভুক্ষু দেহমনকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল; আজ পৃথিবীতে কম্যুনিজমেরও জয়যাত্রা হইতেছে— তাহার সহজবোধ্য আবেদনেব জন্য।

সমসাময়িক গ্রীক ও পারসিকদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া বোধ হয় হজরত মহম্মদের মনে এই কথাই স্পষ্ট হইয়াছিল যে, ধর্ম ও বাষ্ট্র পৃথকীকরণেব ফলে আজ উহারা এমন দুর্বল ও শতচ্ছিন্ন। খ্রীষ্টান গ্রীক-সম্রাট ও রোমের পোপ— উভয়েব মধ্যে কর্মপদ্ধতির মিল নাই— কে প্রভুত্ব করিবে তাহা লইয়া মতান্তব ও মনান্তর লাগিয়াই আছে। পারস্যেও শাহানশাহ ও মগপুরোহিতদের শাসনধারা পৃথক; সর্বত্র রাষ্ট্র ও ধর্ম বিচ্ছিন্ন। এ অবস্থায় ইসলামের মধ্যে ধর্ম ও রাষ্ট্রের একীকরণ দ্বারা আরবদের মধ্যে সংহতি আনয়নই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। হজরত মহম্মদ প্রেরিত পুরুষ— ঈশ্বরের অভিপ্রায় তাঁহার মধ্য দিয়া ভাষা পাইতেছে;— সে বাণীব আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তাঁহার অবর্তমানে এই সমাজের ধর্ম ও রাষ্ট্রের ভার যিনি পাইবেন তিনি তাঁহারই উত্তরাধিকারী— তিনি খলিফা। এই খলিফা একাধারে ধর্মাধিপ ও রাষ্ট্রপাল— ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত ধর্মগুরু। আরব তথা ইসলাম ধর্মরাজ্যেব তিনিই সর্বময় কর্তা। হজরত মহম্মদ ধর্ম ও সমাজ বা আধ্যাত্মিক জীবন ও ব্যবহারিক জীবনধারাব মিলনকেই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সহায়ক মনে করিয়া ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকে এক-'খলিফা'র নিয়ন্ত্রনাধীনে আনিবার ব্যবস্থা দিয়া যান। ইসলাম-ধর্মে মানুষের সহিত মানুষের রক্তের বন্ধন হইবার প্রতিকূল কোনো নিয়ম-নিষেধ না থাকায় মুসলমান-সমাজের পক্ষে 'জাতীয়ত্ব'বোধ সহজ হইয়াছে। ইসলামের মধ্যে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কারণে তিনটি বিষয় অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত; প্রথমত, ইহা authoritarian, অর্থাৎ হজরত মহম্মদ ও কোরাণের authority বা শাসন মুসলমান মাত্রেরই পক্ষে অলঙ্ঘ্য। দ্বিতীয়ত,

ইহা equalitarian অর্থাৎ সকল মুসলমান এক-ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ—সামাজিক উচ্চনীচ ভেদ ধর্মে অস্বীকৃত ; তৃতীয়ত, ইহা tolalitarian অর্থাৎ ইহারা অন্যের সহিত আপোষ-রফা করিয়া কিছু স্বীকার করিতে পারে না, তাহাদের সাম্প্রদায়িক আধিপত্য স্বীকার অপরিহার্য।

আরবজাতির অভ্যুত্থান ও বিস্তৃতির ইতিহাস খ্রীষ্টীয় ৬০০ হইতে ১০০০ অব্দ পর্যন্ত ধরা যাইতে পারে। দশম শতকের শেষ পর্যন্ত আরব-গৌরব বিদ্যমান ছিল ; ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ইসলাম সভ্যতা সর্বতোভাবে য়ুরোপীয় খ্রীষ্টান সভ্যতা হইতে উন্নততর ছিল। তারপর— সাত শত বৎসরের মধ্যে ইসলামের কেন এমনভাবে পতন হইল ও বিংশ শতকের প্রারম্ভভাগে ইস্‌লামিক রাষ্ট্রসমূহেব এমন হীন অবস্থা কেন হইয়াছিল, তাহার কারণ অনুসন্ধান নিরর্থক হইবে না, কাবণ ভারতের নয় কোটি মুসলমান এই পতনের অংশীদার এবং পৃথিবীর আর কোনো একটি দেশে এতো মুসলমানের বাস নাই।

কিন্তু ইসলামের অন্তরের মধ্যে তাহার বিরোধেব বীজ বপন কবা হইল এই 'খলিফা'র পদসৃষ্টি হইতে। খ্রীষ্টীয় সমাজের পোপ ও রোমান সাম্রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ বা ইম্পিরেটরেব সমস্ত ক্ষমতা এক খলিফার হস্তে সমর্পিত ;—মুসলিম জগতের সকল বিশ্বাসী—যে যেখানে বাস করে তাহাদের সকলের ঐহিক ও পারত্রিক সর্ববিধ কার্য নিয়ন্ত্রণের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত। এতো শক্তি এক হস্তে অর্পিত হইলে তাহার প্রতিক্রিয়ায় প্রতিরোধক শক্তির উদ্‌ভব অবশ্যম্ভাবী। আসলে absolute power corrupts absolutely. হজরত মহম্মদেব পর হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত ওসমান পর পর খলিফা নির্বাচিত হন। ইহারা অত্যন্ত সাদাসিধা ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন ; ওমর বস্ত্র-ব্যবসায়ী, খলিফা হইয়াও রাস্তায় কাপড় বিক্রয় করিতেন। এই দীন সরলতা আরবদের রাজ্যবিস্তার ও ঐশ্বর্যলাভের পর লোপ পাইল। অচিরেই বিবাদ বাধিল প্রভুত্ব লইয়া। হজরত আবু বকরের খলিফত্বকালে একটি দল হজরত মহম্মদের জামাতা হজরত আলীকে 'খলিফা' বা উত্তরাধিকারী কবিবার জন্য দলবদ্ধ হয়। এই মতভেদ হইতে মুসলমানদের সঙ্ঘভেদের সূত্রপাত— এই অন্তর্বিপ্লবে আলী নিহত হইলেন। হজরত মহম্মদের তিরোধানের ত্রিশ বৎসরের মধ্যে (৬৬১ অব্দে) আলীর পুত্র হাসানকে সেই দলের লোকে 'খলিফা' পদে বরণ করিল। কিন্তু তৃতীয় খলিফা ওসমান-বংশীয় মোয়াবিয়ার দল প্রবল থাকায়

তিনিও 'খলিফা'-পদে নির্বাচিত হইলেন। হাসানকে খলিফাপদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইল। প্রথম চারিজন, কাহারও মতে হাসান সহ পাঁচজন খলিফাকে 'খোলাফায়ে রশেদীন' বা প্রকৃত খলিফা বলা হয়; ইহাদের সময় পর্যন্ত খিলাফত নির্বাচনমূলক ছিল। অতঃপর মোয়াবিয়া হইতে খলিফাপদ বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে পরিণত হয়, যেমনটি হইয়াছিল রোমান সম্রাটদের মধ্যে।

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর অর্ধশতাব্দীর মধ্যে মোয়াবিয়ার মৃত্যুর পর (৬৮০) তদীয় পুত্র য়েজীদ ও হাসানের ভ্রাতা হোসেনের মধ্যে পুনরায় খলিফত্ব লইয়া বিবাদ বাধিল এবং কারবালার মরুভূমিতে পুণ্যাত্মা হোসেন সদলবলে য়েজীদের হস্তে প্রাণ দিলেন; অর্থাৎ হজরত মহম্মদের একমাত্র বংশধর তাঁহার অতিপ্রিয় কন্যা ফতিমার পুত্র হোসেন কোরেশীয়দের গৃহযুদ্ধে নিহত হইলেন। এক ধর্মরাজ্যপাশে নিখিল জগতকে বাঁধিবার স্বপ্ন শক্তিমদমত্ততার নিকট পরাভব মানিল। এই ঘটনার পর হইতে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে মতভেদ সুস্পষ্ট হইল। শিয়ারা এখনো হোসেনের মৃত্যু স্মরণ করিয়া মহরমের দিন শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। ভারতের মধ্যে মুর্শিদাবাদ, লখ্নৌ শিয়াদের প্রধান কেন্দ্র।

মোয়াবিয়ার বংশধরগণ ইতিহাসে উম্মীয় বা ওমায়ীদ খলিফা নামে পরিচিত; এতকাল মদিনা ছিল খলিফাদের বাসস্থান। উম্মীয়গণের রাজ্য এখন বহুদূর বিস্তৃত; কিছুকাল পূর্বে রোমানদের নিকট হইতে অধিকৃত সিরীয়া দেশের প্রধান শহর দামাসকসে আরবীয় ইস্‌লামের রাজধানী স্থানান্তরিত হইল। খলিফাগণ বৈভবের প্রথম স্বাদ পাইলেন দামাসকস মহানগরীতে আসিয়া। অপর দিকে শিয়ারা অর্থাৎ হাসানের অনুবর্তীগণ উম্মীয় খলিফাদের ধর্মগুরু বা খলিফা বলিয়া স্বীকার করিল না। তাহারা বরাবর ইহাদের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করিয়া আসিতেছে— বিংশ শতকেও তাহা শমিত হয় নাই।

আরবদের মধ্যে আলী ও উম্মীয়দল ব্যতীত হজরত মহম্মদের খুল্লতাত আব্বাসের একটি দল ছিল। ইসলাম প্রচারিত হইবার পূর্ব হইতেই আব্বাসীও উম্মীয় পরিবারের মধ্যে বিবাদ ছিল— যাহা সম্পূর্ণ উপজাতীয় বৈরতা। আব্বাসীরা উম্মীয়গণের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য সুযোগ খুঁজিতেছে; এক্ষণে আলীর বংশধরগণের সহিত যোগদান করিয়া উম্মীয়দের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু সে কার্য সিদ্ধ হইলে তাহারা আলীর বংশধরদের 'খলিফা'-পদ না দিয়া আপনাদের আব্বাসী পরিবারের মধ্যে ঐ পদ কায়েম করিয়া লইলেন (৭৫০

অন্ধ)। দেখা গেল, জল হইতে রক্ত গাঢ়— ধর্মের বন্ধন হইতে উপজাতীয় দলীয়তা প্রবল। খলিফার সার্বভৌম পদের জন্য এই বিরোধ।

যাহা হউক উম্মীয় বংশীয় মোয়াবিয়া য়েজীদ, আবদুল মালিক, ওয়ালীদ, হিসাম প্রভৃতির খলিফত্বকালে আরব সাম্রাজ্য বহু দূর বিস্তৃত হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দীর আরম্ভভাগে বোখারা, সমরকন্দ, খিবা, ফেরগনা, তাসকন্দ, চীনপ্রান্ত, ইরাক, দোয়াব, পারস্য, কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি ভূভাগ আরব সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছে। খলিফার সৈন্যদল উৎসাহী সেনাপতিদের নেতৃত্বে মিশর, উত্তর-আফ্রিকা অধিকার করিয়া জবর-উল-তারিক বা জিবরলটার প্রণালী পার হইয়া স্পেনে উপনীত হইল। স্পেন অধিকার করিয়া তাহারা তৃপ্ত নহে, পিরীনিসের অরণ্যময় পর্বত অতিক্রম করিয়া ফ্রান্সের মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিল। শঙ্কিত সচকিত য়ুরোপকে রক্ষা করিলেন ফ্রান্সের সর্দার চার্লস মার্তেল বা 'গদাধর' চার্লস। তুর-এর যুদ্ধে আরবরা পরাভূত হইলে (৭৩২) স্রোত উজান বহিল— আরবরা পিরীনিস পার হইয়া স্পেনের মধ্যে আশ্রয় লইল— সেখানে তাহারা আটশত বৎসর রাজত্ব করে। ইতিপূর্বে আরবের পূর্বদিকে পারস্য বিজিত হইয়াছিল ; এবার তাহাদের একটি বাহিনী ভারতের প্রত্যন্তদেশ সিন্ধুরাজ্যে প্রবেশ করিল।

ইসলামের বিজয়যাত্রার অভিঘাতে পশ্চিম এশিয়ার খ্রীষ্টীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন হইল— সমস্ত দেশ প্রাচীন ধর্ম ত্যাগ করিল— লোকে প্রাচীন ভাষা ভুলিয়া গেল, প্রাচীন আচার-ব্যবহার সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আরব-সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করিল। আজ ইরাক হইতে আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ভূভাগে আরবী ভাষাই ধর্মের ও রাষ্ট্রের ভাষা। পূর্বদিকে আয পারসিকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু আরব-সভ্যতার প্রধান বাহন আরবী ভাষা রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিল না। তাহারা আরবী সংস্কৃতি ও ভাষার প্রচারক হইল না। আরবদের নবীন প্রাণের স্পর্শে পারসিকদের স্থবির জীবনের বহু পরিবর্তন হইল সত্য— কিন্তু তাহাদের সত্তা নষ্ট হইল না।

আরবদের জাতীয় শক্তির এত প্রসার ও প্রচার -সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও বিদ্বেষ কিছুমাত্র শান্ত হয় নাই। অবশেষে উম্মীয় বংশের শেষ খলিফা হিসামের পর কীভাবে আব্বাসী বংশীয়রাই খলিফার পদপ্রাপ্ত হইলেন তাহা

ধর্ম-ইতিহাস নহে। যে-খলিফত্ব ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী মুসলমানদের শুভ ইচ্ছা ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা এক্ষণে সৈন্যদলের সংখ্যা, সাহস ও সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। আব্বাসী খলিফারা দামাসকস হইতে রাজধানী পরিবর্তন করিয়া ইরাকের বোগদাদে লইয়া গেলেন, সেখানে ৭৫০ হইতে ১২৫৮ পর্যন্ত পাঁচশত বৎসর তাহারা রাজত্ব করে। এই শেষ বৎসরে অমুসলমান মুঘল সেনাপতি হুলাগু খানের হস্তে বোগদাদ ও খিলাফত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

বোগদাদ পাঁচশত বৎসর তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল। কিন্তু খলিফাগণ তাঁহাদের ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিকতা হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা এখন রোমের পোপদের ন্যায় বিলাসী ও ঐশ্বর্যলোভী, রোমান সম্রাটদের ন্যায় আড়ম্বরপ্রিয় ও নিষ্ঠুর। ধর্মের জন্য লোকে যে 'জাকাৎ' দিত, তাহা এখন খলিফাদের ভোগবিলাসের ইন্ধন জোগাইবার জন্য দুর্বহকর স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে— 'ঈশ্ববৃত্তি' ঈশ্বরের কাজে লাগে না। পারস্যের নৈকট্যহেতু বোগদাদে পারসিকদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। প্রাচীন পারসিকদের শাহানশাহ ও ওমরাহদের আদর্শে আজ খলিফাদের দরবার ও হারেম গঠিত হইয়াছে। প্রাচীন আরবের বীর্য লুপ্ত, সরলতাও নিশ্চিহ্ন।

চারিদিকে বিদ্রোহের ভাব দেখা দিতেছে; আশা ছিল এক নবী, এক কোরান, এক ভাষা সমস্ত জগতকে এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বাঁধিবে,— শয়তানের দুনিয়া বেহেস্তে পরিণত হইবে। দেখা গেল, ধর্মের বন্ধনের উপর মানুষের জাতীয়ত্বের বা ন্যাশনালিটির প্রভাব অধিকতর প্রবল। আরবদের দ্বারা বিজিত উপজাতি সমূহ ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াও আপনাদের বৈশিষ্ট্য বা জাতীয়ত্ব ত্যাগ করিতে পারিল না। আফ্রিকা, স্পেন, মধ্য এশিয়া, পারস্য ও ভারতে বিভিন্ন বর্ণ বা জাতির লোকের বাস— তাহাদের ইতিহাস, পুরাণ, ভাষা, লোকাচার, আরবীয় সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সেইজন্য কালে দেখা গেল আফ্রিকার মুসলমানদের মধ্যে পীরপূজা, পারস্যের মধ্যে মরমিয়া সুফীদের ভাবোচ্ছ্বাস, ভারতের মুসলমানের মধ্যে বৈদান্তিকতা ও বৈষ্ণবীভাব আরবী-ইসলামকে বহুল পরিমাণে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

খলিফার এক-কর্তৃত্বেরও বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল নানাদিকে; মধ্য এশিয়ার খোরাসানে বিদ্রোহীরা পৃথক খলিফা নির্বাচন করিয়া বোগদাদের আধিপত্য হইতে মুক্ত হইল। সুদূর স্পেনের রাজধানী কার্দোভাতে তথাকার

মুসলমানেরা নিজেদের খলিফা নির্বাচন করিল। মিশরের মুসলমানরা মহম্মদের কন্যা ফতিমার কোনো এক বংশধরকে খলিফা করিয়া তথাকথিত ফতেমীয় খলিফা বংশ স্থাপন করিল। তবে মিশরে রাজশাসন ও খলিফত্ব এক হয় নাই। সুতরাং রাজসম্পদ ও ঐশ্বর্য যে খলিফা পদের অপরিহার্য অঙ্গ— তাহা মিশরে খালিফার পদসৃষ্টির দ্বারা প্রমাণিত হইল না। এই পার্থিব গৌরবশূন্য খালিফা-দের নিকট হইতে ভারতীয় মুসলমান বাদশাহদের কেহ কেহ আশীর্বাদ আনাইয়া লইয়াছিলেন।

আরবরা মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনায় যে কৃতিত্ব ও উদারতা দেখাইয়াছিল, তাহা সে-যুগে তুলনাহীন। অপরের জ্ঞান আহরণ করিতে ও সে-সকল বিষয়ে গবেষণা করিতে তাহাদের কোনো গোঁড়ামি ছিল না। হজরত মহম্মদ বলিয়াছিলেন, জ্ঞানের জন্য চীনের প্রাচীর পর্যন্ত যাইবে। গ্রীক, লাতিন, সিরীয়াক, সংস্কৃত, পারসিক ভাষার গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া তাহারা আরবী সাহিত্য ও আরবচিত্তকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। মধ্যযুগে তাহারাই য়ুরোপের প্রাচীন জ্ঞানের বর্তিকা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল। চিত্ত যতদিন মুক্ত থাকে ততদিন নব নব মত ও চিন্তার বিকাশ হয়। এই চিত্তবিকাশের ফলে ইসলামের মধ্যে বহুবিধ মত ও বিশ্বাস দেখা দিল, যাহা সনাতনী ইসলামী হইতে বহুদূরে গিয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মত হইতেছে মুতাজিলীদের। মুতাজিলীরা যুক্তিকে সকলের উপর স্থান দিয়াছিল। আব্বাসী খলিফাদের কেহ কেহ প্রথম মুতাজিলীদিগকে বিশেষভাবে সমাদর করিতেন। কিন্তু ইহাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য গোঁড়ারা তীব্র আন্দোলন করিতে থাকিলে খলিফাদের মন বিরূপ হইয়া গেল।

আপন মত ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ও অপরের মতামতকে খণ্ডন করিতে করিতে ক্রমবর্ধনশীল সম্প্রদায়গুলির বিরাট ধর্মসাহিত্য লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কালে ধর্মতত্ত্ব লইয়া তর্ক ও পণ্ডিতম্মন্যতার আড়ম্বর মওলনাদের সমস্ত মনোযোগকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিল যে, ইসলামের প্রাগ্রসরের সরল পথ, জ্ঞান আহরণের সহজ আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই রুদ্ধ হইয়া আসিল। শাস্ত্রের তর্কানলে মুতাজিলীরা মুসলিম ধর্মমত ও দর্শনকে যুক্তি দিয়া বিচার করিয়া বলিলেন, প্রাচীনকালে খলিফা মক্কায় যেমন বিশ্বাসীগণের

দ্বারা নির্বাচিত হইতেন, বর্তমানেও তাহাই বাঞ্ছনীয়, খলিফাপদ বংশানুক্রমিক হওয়া সম্পূর্ণরূপে অন-ইসলামী। খজিরৎ নামে আর-একটি সম্প্রদায় আরও অগ্রসর হইয়া বলিল যে, খলিফত্বের প্রয়োজনই নাই, ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রেণীর মত প্রচারিত হইতে থাকিলে খলিফারা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, এই-সব মত ইসলামের পরিপন্থী, অতএব উহাদের উচ্ছেদ সাধন করা মুসলমানেরই কর্তব্য। ইসলামের যুক্তিবাদ ও স্বাধীনচিন্তার উপর সেইদিন যবনিকা পড়িয়া গেল— তাহাদের সহায় থাকিল অন্ধ শাস্ত্র ও নিষ্ঠুর শস্ত্র। শাস্ত্রভীতি প্রদর্শন করিয়া আতঙ্ক-সৃষ্টির মতো কঠিন অস্ত্র আর নাই। মুতাজিলী বা খজিরৎদের ধর্মমত প্রচার করিতে পরবর্তী যুগে কোনো মুসলমান অগ্রসর হইল না।

আব্বাসী খলিফাগণের অধঃপতন হইতে আরব ইসলাম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, আব্বাসীরা বোগদাদে রাজধানী স্থাপন করেন। পারসিকদের প্রভাবে বোগদাদের দরবার অদ্ভুতভাবে রূপান্তরিত হইল। পারসিকরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিজেদের জাতীয় বীরদের-কেন্দ্র-করিয়া-লিখিত 'শাহনামা' মহাকাব্য লইয়া গর্ব অনুভব করিতে তাহাদের ইসলামিত্বে বাধিল না। নিজেদের পারসিক নাম সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া তাহারা আরবী নাম গ্রহণ করে নাই; এক কথায় জাতীয় জীবনে, সাহিত্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে আপনাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও তাহারা মুসলমান হইল। বিপুল পারসিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিল ইসলামের প্রভাবে— তাহা আরবী লিপিতে ও 'পারসিক' ভাষাতে লিখিত। সিরীয়া মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যদেশের সংস্কৃতি ও শিক্ষা, ভাষা ও লিপির ঐতিহ্য নিশ্চিহ্ন করিয়া সেখানে আরবী সভ্যতারই পত্তন হয়। পারস্যে আরবী লিপি গৃহীত হয় এবং একদিন তাহাদের প্রভাবে তুর্কীদের মাধ্যমে ভারতেও সেই লিপি ও পারসি ভাষা চালু হইয়াছিল। সেই লিপি ভারতে উর্দু ভাষার বাহন; সিন্ধুদেশের আরবী লিপিই চালু। বর্তমানে পাকিস্তানে উর্দু ভাষা ও লিপি রাষ্ট্রের অন্যতম ভাষা ও হরফ।

আব্বাসী খলিফাদের রাজধানী বোগদাদ আরবদের দেশ হইতে বহুদূরে; কোথায় মদিনা, দামাসকস— আর কোথায় বোগদাদ— মধ্যস্থানে বহুদূর-

বিস্তারিত মরুভূমি। উমীয়দের সহিত শত্রুতা থাকার জন্য আব্বাসী খলিফারা আরব সৈন্য অপেক্ষা পারসিক ও তুর্কী সৈন্য নিয়োগ করেন অধিক সংখ্যায়। তাছাড়া অপরিসীম ধনাগমের ফলে আরবদের দুর্জয় রণশক্তি ম্লান হইয়া আসিতেছিল। তুর্কী নামে এক দুর্ধর্ষ জাতি এই সময়ে দলে দলে আসিয়া খলিফাদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে— ইহারা হইল খলিফাদের আপাত-সহায়; কালে তাহারাই হইল খলিফার কালস্বরূপ, ধ্বংসের বাহক; আবার ইহারাই পূর্বদিকে ভারতে ইসলামের বিজয়কেতনের বাহন।

ইসলাম-জগতে তুর্কীদের অভ্যুদয় ও বিস্তারের ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে বহু যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে— যেমন ঘটিয়াছিল রোমান সাম্রাজ্যের ও খ্রীষ্টীয় জগতে জারমেনিক জাতিদের অভ্যুদয়ে। তুর্কীরা বহু উপজাতিতে বিভক্ত, যেমন ছিল এককালে আরবরা। তুর্কীদের এক উপজাতি— সেলেজুক— মধ্য এশিয়া হইতে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে এক সময়ে আনাটোলিয়ায় (এশিয়া-মাইনর) উপনীত হইয়া সেখানে প্রভুত্ব স্থাপন করে। মামেলুক নামে আর-একটি উপজাতি মিশরে প্রবেশ করে। কিছুকাল পরে ওসমানী (Ottoman) তুর্কীরা সেলজুকদেব বিতাড়িত করিয়া আনাটোলিয়া ও পরে দক্ষিণ-পূর্ব য়ুরোপে প্রসার লাভ করে; ইহারাই বৈজয়ন্তীয়ম গ্রীক সাম্রাজ্য ধ্বংস, কনস্টান্টীনোপল জয় (১৪৫৩) করিয়া বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্য স্থাপন করে। পূর্বদিকে গজনী ও ঘোর প্রভৃতি স্থানে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুর্কী রাজ্য গড়িয়া উঠে। এই গজনী ও ঘোরীরা ভারতলুণ্ঠন ও ভারতে রাজ্য স্থাপন করে। এই তালিকা হইতে তুর্কীদের শক্তি ও অধিকারের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

তুর্কীরা মধ্য এশিয়ায় মরুচর যাযাবর। পারসিকরা তাহাদের নিকটতম প্রতিবেশী। এই পারসিকদের নিকট হইতে তাহারা ইসলাম ধর্ম, পারসিক ভাষা, পারসিক সভ্যতার প্রথম পাঠ গ্রহণ করিল। এই সমরপ্রিয় জাতি ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও যেমন দুর্ধর্ষস্বভাব ছিল, ধর্মান্তরের পরও উহাদের স্বভাবের অকস্মাৎ কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই।

এতদিন খলিফারা গ্রীকদের নিকট হইতে সিরিয়া ছাড়া অন্য কোনো দেশ অধিকার করিতে সক্ষম হয় নাই। আনাটোলিয়া তখনো গ্রীক সাম্রাজ্যান্তর্গত; এইবার তুর্কী মুসলমানরা সেই দেশ অধিকার করিল— প্রধান নগর

ইকোনিয়াম ইহাদের রাজধানী হইল। খ্রীষ্টানদের ধর্মস্থান জেরুসালেম আরবরা ৬৩৭ অব্দে দখল করিয়াছিল বটে, কিন্তু খ্রীষ্টানদের উপর যাহাতে কোনোরূপ অত্যাচার না হয় এবং ধর্মকর্মে খ্রীষ্টানরা যাহাতে কোনো বাধা না পায় সেদিকে খলিফা ও মরের সহৃদয় দৃষ্টি ছিল। দীর্ঘকাল এই রীতিই অনুসৃত হইয়া চলে। কিন্তু সেলজুক তুর্কীরা ফিলিস্তান বা ইসরেইল ও সিরিয়া অধিকার করিলে পুরাতন রীতির পরিবর্তন হইতে চলিল। এই নূতন-মুসলমান তুর্কীদের পরধর্ম বিষয়ে অসহিষ্ণুতার ফলে খ্রীষ্টানতীর্থযাত্রীদের উপর জুলুম আরম্ভ হয় এবং তাহারই প্রতিক্রিয়ায় য়ুরোপে ক্রুজেড ও পশ্চিম এশিয়ায় জেহাদ আন্দোলন দেখা দিল। খ্রীষ্টান ও মুসলিমদের মধ্যে স্থায়ী বিরোধের জন্য প্রত্যক্ষত দায়ী নব-মুসলমান তুর্কীরা এবং পরোক্ষভাবে বৈজয়ন্তীয়ম গ্রীক সম্রাটগণের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য উদ্বেগ।

আরব-ইসলাম ও খিলাফতের পতনের বিবিধ কারণের অন্যতম তুর্কীদের অভ্যুদয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি তুর্কীরা আরব সাম্রাজ্যের বহু অংশ অধিকার করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল; বোগদাদের পতনের বহু পূর্বে খলিফের রাজ্য বোগদাদ মধ্যে সীমিত হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও দূর প্রান্তের স্বাধীন তুর্কী রাজারা তাহাদের নিজ নিজ প্রভুত্বের হুকুমনামা গ্রহণ করিতেন খলিফার নিকট হইতেই। গজনীর সুলতান মামুদ, মিশরের সলহদ্দীন (Saladin), অরমোরাবিদ বংশের অধিপতি, য়েমেনের রসুলীদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতি অনেকেই খলিফার নিকট হইতে বড় বড় উপাধি আদায় করিয়া আনেন। ১২২৯ অব্দে ভারতে ইলতুতমিসও খিলাফতী ফরমান পাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ খলিফাদের না-ছিল সাম্রাজ্য না-ছিল আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য,— তাঁহারা হইয়াছিলেন নানা দল-উপদলের ক্রীড়নক মাত্র। কিন্তু তাহারও একদিন অবসান হইল। ১২৫৮ অব্দে মুঘল সর্দার হুলাকু খান বোগদাদ অধিকার, ধ্বংস ও শেষ খলিফাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিলেন। এই মুঘলরা কে?

ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে মধ্য এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে মংগোল নামে এক অর্ধ-যাযাবর, অর্ধসভ্য জাতির অভ্যুদয় হয়। চেংগীজ খান মংগোলদের বহু উপ-জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক বিপুল দুর্নিবার্য শক্তিতে পরিণত করেন; মংগোল

সৈন্যবাহিনী প্রশান্ত মহাসাগর হইতে মধ্যয়ুরোপ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। চেংগীজের মৃত্যুর পর মংগোল সাম্রাজ্য তাঁহার পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে বিভক্ত হয়। কুবলাই খান চীনদেশে য়ুয়ান বংশের প্রতিষ্ঠাতা হন; সাইবেরিয়াতে সিবির রাজ্য, মধ্য এশিয়াতে জগতাই রাজ্য, পারস্যে ইলখান রাজ্য ও য়ুরোপীয় রুশে কিপচক রাজ্য মংগোলদের দ্বারা স্থাপিত হয়। মধ্য এশিয়ার মংগোলদেরই একটা উপশাখা ভারতে মুঘল নামে খ্যাত— যাহারা মুসলমান হইয়াও ভারতের তুর্কী-পাঠান-আফগানদের 'মুসলমান' রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল।

শেষ খলিফা মুসতাসিমের মৃত্যুতে (১২৫৮) ইসলাম জগৎ খলিফাশূন্য হয়। কাহার নামে মুসলমানরা 'খুতবা' পাঠ করিবে জানে না। আব্বাসীদের কোনো দূর আত্মীয় পূর্বদিক হইতে পলায়ন করিয়া মিশরে মামেলুক তুর্কীদের নিকট আশ্রয় লন। তাঁহাকে মামেলুকরা নামে-খলিফা করিয়া রাখিয়া দিল— রাজকার্য ও শাসনাদি ব্যাপারে তাঁহার উপর কোনো ক্ষমতাই অর্পিত হইল না; অর্থাৎ ইসলামের মূল কথা যে, খলিফার হস্তে ঐহিক ও পারত্রিক সকল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে— তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইল— এখন হইতে খলিফা ইসলামের ধর্মবিষয়ে 'পোপে'র স্থান মাত্র অধিকার করিয়া রহিলেন। অতঃপর (১২৫৮—১৫১৭) প্রায় আড়াইশত বৎসর মিশরে মামেলুকদের তাঁবেদারী করার পর খলিফাপদের পৃথক অস্তিত্ব লোপ পাইল। খলিফার এই হীন অবস্থাকালেও ভারতের মহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-৫১) ও ফিরোজশাহ তুঘলক এবং এশিয়ার অন্যান্য সুলতানরা এই মামেলুকী খলিফাদের নিকট হইতে হুকুমনামা আনাইয়া ছিলেন।

এদিকে য়ুরোপে দক্ষিণ-পূর্বে বৈজয়ন্তীয়ম গ্রীক সাম্রাজ্যের ওসমানী তুর্কীরা সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে (১৪৫৩)। তুর্কী সুলতান সেলিম ১৫১৭ অব্দে মিশরের রাজধানী কাইরো প্রবেশ করিয়া আব্বাসী খলিফার পদ নাকোচ করিয়া দিলেন। অতঃপর সেলিম স্বয়ং খলিফার পদ গ্রহণ করিলেন।

মুসলমান শাস্ত্র বা হাদিস-মতে খলিফত্ব পদলাভের অধিকারী হইবেন কোরেইশী বংশের লোকেরা; এবং দ্বিতীয় শর্ত হইতেছে এই যে তিনি মোসলেম জগতের অবিসম্বাদী আনুগাত্য দাবি করিতে পারিবেন। খলিফত্ব অধিকারীর যোগ্যতা সম্বন্ধে ইসলামের শাস্ত্রে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে; বিখ্যাত উলেমা ও ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেন (১৩৭৫-৭৯) আরব-

গৌরবের অবসানে খলিফাপদ নামে মাত্র দাঁড়ায়। (with the disappearance of the Arab supremacy there was nothing left of the khalifa but the name.— Short Enc of Islam. p. 240)

খলিফত্বে অধিকার কাহার এ প্রশ্নের শেষ মীমাংসা হয় নাই। শিয়া সম্প্রদায় বলেন যে, হজরত মহম্মদ তাঁহার জামাতা আলীকে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং খলিফার পদ কোরেইশী বংশের মধ্যে সীমিত থাকিবে এ কথা উঠিতেই পারে না; তা ছাড়া এ পদ নির্বাচনসাপেক্ষও নয়— ইহা হজরত আলীর বংশপরম্পরা চলিবে। শিয়ারা বহু অলৌকিক কথা এই-সব বাদানুবাদের মধ্যে আনিয়াছিলেন।

খারিজী সম্প্রদায়ের মতে খলিফার পদ যে-কোনো উপযুক্ত লোকই পাইতে পারেন কোরেইশী বংশের মধ্যে থাকা তো দূরের কথা; তাঁহাদের মতে অন্-আরব মুসলমানও খলিফা হইবার পূর্ণ অধিকারী। এই নজিরে তুর্কীর সুলতান খলিফা হইলেন।

পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে য়ুরোপের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে ওসমানী তুর্কীরা সাম্রাজ্য বিস্তার আরম্ভ করে। পূর্বেই বলিয়াছি ১৪৫৩ অব্দে বৈজয়ন্তীয়ম গ্রীক খ্রীষ্টানদের এগার শত বৎসরের প্রাচীন রাজ্য ও রাজবংশ ধ্বংস হইল। সেই হইতে য়ুরোপীয় খ্রীষ্টানদের সহিত এশিয়ান মুসলমান তুর্কদের বিরোধ বাধিল। তুর্কীর 'য়েনিচারি' (Janissaris) সৈন্যবাহিনী ও তাহার কামান য়ুরোপের ভীতির কারণ হইয়া উঠে। শতাধিক বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে তুর্করা মধ্য য়ুরোপকে আতঙ্কিত করিয়া রাখে। অবশেষে য়ুরোপীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ দেখা দিল; ইহার সঙ্গে যুগপৎ বিজ্ঞানের চাবিকাঠি তাহারা পাইল— যাহার সাহায্যে অস্ত্রশস্ত্র নির্মানে তাহারা তুর্কীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইল এবং অল্পকালের মধ্যে তাহাদের পুরাতন শত্রুকে বহু দূরে পশ্চাতে ফেলিয়া আগাইয়া গেল। বর্তমান য়ুরোপ আরম্ভ হইল বিজ্ঞান ও প্রয়োগশিল্প হইতে।

য়ুরোপের দক্ষিণ-পূর্বাংশ তুর্কী মুসলমানের আয়ত্তে আসিল পঞ্চদশ শতকে — যুগপৎ য়ুরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে স্পেন হইতে আরবরা বিতাড়িত হইল। আইবেরিয়ান উপদ্বীপের স্পেনাংশ হইতে সাত শত বৎসরের আরব-মুর-

মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল (১৪৯২)। ইসলামের যাহাদের এক কূল ভাঙিল তাহারা আরব, যাহাদের এক কূল গড়িল তাহারা তুর্কী। যাহারা রাজ্য গড়িল— তাহাদের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। যাহাদের রাজ্য ভাঙিল তাহাদের নাম ইতিহাস হারাইয়াছে; কিন্তু স্পেনে যে খ্রীষ্টান শক্তির নব অভ্যুদয় হইল তাহারা পৃথিবীতে নূতন ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইল।

কনস্টান্টিনোপলের পতনের অভিঘাতে য়ুরোপে যে নব আন্দোলনের জন্ম হইল তাহা য়ুরোপের ইতিহাসে রেনাসাঁস নামে পরিচিত। গ্রীক পণ্ডিতগণ প্রাচীন পুঁথিপত্র লইয়া য়ুরোপময় আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল; য়ুরোপের বিদ্যার কেন্দ্রগুলিতে, রাজাদের সভায়, পোপদের প্রাসাদে এই-সকল পণ্ডিতদের আবির্ভাবে মানুষের রুদ্ধচিত্তদুয়ার যেন খুলিয়া গেল। প্রাচীন গ্রীকদের লুপ্তজ্ঞান তাহারা যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিল; মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় চার্চের নিরানন্দময় ধর্মতত্ত্ব ও অপরীক্ষিত মূঢ় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহী হইল।

এতকাল য়ুরোপীয়গণ ভারতের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য করে নাই; আরবরা ছিল পূর্বসাগরের ও ইতালী নগরী ভেনিস ছিল ভূমধ্যসাগরের বণিক। মধ্যযুগে পূর্বদেশীয় বা এশিয়ার শিল্পজাত সামগ্রী পাইতে য়ুরোপের তেমন কোনো অসুবিধা হইত না; কিন্তু তুর্কীরা পশ্চিম-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব য়ুরোপের অধীশ্বর হওয়াতে পূর্ব পশ্চিমে সহজ বাণিজ্যপথ সহসা রুদ্ধ হইয়া আসিল। ইতিমধ্যে রেনাসাঁসের প্রভাবে ও বিজ্ঞানের আলোচনার ফলে য়ুরোপের বহু মূঢ় সংস্কার দূর হইয়াছিল। পৃথিবী বর্তুলাকার এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতে ও পূর্বসাগরে উপনীত হইবার জন্য নাবিক ও সাহসিকদের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা দেখা গেল। এই সমুদ্রের অজানা পথে ভারতের সহিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য পোর্তুগীজ ও স্পেনীয়দের মধ্যে প্রবল প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল। এই প্রচেষ্টার ফলে ভারত আবিষ্কার করিল পোর্তুগীজরা (১৪৯৮)। আমেরিকার সন্ধান পাইয়াছিল স্পেনীয়রা (১৪৯২)। আমেরিকা ও ভারতের অকথিত ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হইয়া ইহাদের রাজ্যভাণ্ডার পূর্ণ হইল। আধুনিক য়ুরোপের ইতিহাসের

নবপর্যায়ের সূত্রপাত এইখানে। এতকাল এশিয়ার পারসিক, হুন, মংগোল, তুর্কীজাতিরা য়ুরোপকে পূর্বদিক হইতে আক্রমণ করিয়া আসিতেছিল স্থলপথে। তুর্কীদের অভ্যুদয়ে য়ুরোপীয়দের জীবিকা বিপর্যস্ত হইলে, তাহারা সমুদ্রপথে নূতন জগৎ পাইল। সমুদ্রপথে এশিয়াবাসীরা সম্পূর্ণ অপরিচিত ভিন্নধর্মী, ভিন্ন বেশধারী, ভিন্নভাষাভাষী জাতিকর্তৃক আক্রান্ত হইল। এই আক্রমণের জন্য এশিয়াবাসীরা প্রস্তুত ছিল না। ইতিপূর্বে ভূমধ্যসাগর হইতে আরবদের আধিপত্য লোপ পাইয়াছিল। এইবার আরব সাগরে পোর্তুগীজদের উপদ্রবে আরব বাণিজ্যের একচেটিয়াত্ব লোপ পাইল। আরব সাম্রাজ্য লুপ্ত হইয়াছিল, এতদিনে তাহাদের বাণিজ্যও লোপ পাইল। আফ্রিকা ও এশিয়ার উপকূলে পোর্তুগীজদের অসংখ্য ব্যবসায়-কেন্দ্র স্থাপিত ও রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। মুসলমানরা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, সমুদ্রপথে তাহাদের রাজ্য ও বাণিজ্য আক্রান্ত হইতে পারে। খ্রীষ্টান-য়ুরোপের নিকট মোসলেম-এশিয়ার পরাজয়ের পর্ব আরম্ভ হইল এই সমুদ্রপথের আবিষ্কার হইতে। ইসলামের পতন শুরু হইল সর্বত্র, ভারতেও মধ্যযুগের ইতিহাস অবসিত হইল য়ুরোপীয়দের আবির্ভাবে।

পোর্তুগীজের পথ ধরিয়া আসিল দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ। খ্রীষ্টান জাতিদের মধ্যে শতাধিক বৎসর যুদ্ধ ও বিরোধের পর ইংরেজ ভারতের অধীশ্বর হইল অষ্টাদশ শতকে। আরম্ভ হইল ইতিহাসের আধুনিক যুগ।

উনবিংশ শতক শেষ হইবার পূর্বে পৃথিবীর সকল মুসলিম রাষ্ট্র নয় স্বাধীনতা হারাইয়া সম্পূর্ণরূপে য়ুরোপীয়দের পদানত— নয় নামে-স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া য়ুরোপীয়দের অনুগ্রহে টিকিয়া আছে মাত্র। উনবিংশ শতকের পূর্বেই ভারত ইংরেজদের অধীন হইয়াছিল। উনবিংশ শতকে মিশর-সুদান ইংরেজের আশ্রিত দেশে পরিণত হয়। মোসলেম-আফ্রিকা ফরাসী-রিপাবলিকের দ্বারা অধ্যুষিত; মধ্য-এশিয়ার তুর্কী মুসলমানরা রুশিয়ার পদতলে পিষ্ট। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মুসলমান রাজ্যগুলি ওলন্দাজদের অধিকারভুক্ত। য়ুরোপের মধ্যে দুর্ধর্ষ তুর্কীরা এখন এমনই দুর্বল যে তাহার সাম্রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে তাহা শমিত করিবার শক্তি তাহার আর নাই। গ্রীস, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া মন্টিনিগ্রো, রুমেনিয়া প্রভৃতি দেশ তুর্কীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া

স্বাধীন রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। এই-সব সংগ্রামে মোসলেম-তুর্কী দেখিল যে, খ্রীষ্টীয় য়ুরোপ তাহার উপর অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে কমাল আতাতুর্কের আবির্ভাবের (১৯২৪) সময় পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল তুর্কী লাঞ্ছিত হইয়াছিল যুক্ত য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের নিকট। বিশেষ বিশেষ প্রবল রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য তুর্কীর সুলতানরা মাঝে মাঝে ক্রীড়নক হইতেন মাত্র—যথার্থ মর্যাদা কেহ দান করিত না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৯১২) বলকান-যুদ্ধের ফলে তুর্কী সাম্রাজ্য আরও সঙ্কুচিত হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে তুর্কী সাম্রাজ্য হ্রাস পাইয়া রাজধানী ইস্তাম্বুলের কযেক মাইলের মধ্যে সীমিত হয়; কিন্তু তখনো তুর্কী সাম্রাজ্য বলিতে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার আরবী ভাষাভাষী জাতিদের দেশ বুঝাইত।

পারস্য কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের অধীন না হইলেও রুশ ও ইংরেজের ভয়ে সদাই সঙ্কুচিত— তাহার উত্তরাংশ রুশিয়ার ও দক্ষিণাংশ ইংরেজের প্রভাব-কবলে পড়িয়া জীর্ণ; আফগানিস্তান স্বাধীনরাজ্য হইলেও ইংরেজের আজ্ঞাবহ মিত্র মাত্র। বিংশ শতকে ২৫ কোটি মুসলমানের ইহাই ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা।

বিংশ শতকের প্রারম্ভে মুসলিম জগতের অবস্থা কী অধঃপতিত তাহা আমরা দেখিলাম। প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের পর সর্বত্র তাহাদের মধ্যে নব-জীবন লাভের চেতনা কার্যকরীরূপ গ্রহণ করিল। প্রথম মহাযুদ্ধে য়ুরোপের শ্বেতাঙ্গ প্রভুরাষ্ট্রগুলি পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া কেবল যে রক্তশূন্য, ধনশূন্য হইয়া পড়ে তাহা নহে, ধূর্ত কূটনীতিক বুদ্ধিতে তাহারা যে দেউলিয়া সে প্রমাণ দিল ১৯১৯ সালে সম্পাদিত ভার্সাই-এর সন্ধিপত্রে।

ইসলামের নবজাগরণ

মুসলমান রাষ্ট্রের অধঃপতনের প্রধানতম কারণ, তাহাদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার অভাব। তাহাদের জ্ঞানালোচনা কেবলমাত্র ইসলামীয় ধর্মতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক প্রথা ও বিশ্বাস -বিষয়ে কূটতর্ক ও বিচারে পর্যবসিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান তাহাদের চিত্তকে ও বুদ্ধিকে স্বচ্ছ করিতে পারে নাই। মধ্যযুগীয় বর্বর বিলাস ও ততোধিক বর্বর দারিদ্র্য ইসলামীয় রাষ্ট্রগুলির সমাজ-জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া খ্রীষ্টান পাশ্চাত্য জাতির সহিত দ্বন্দ্ব করিবার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অকর্মণ্য করিয়া তুলিয়াছিল। ইসলামের সামাজিক জীবনের সাম্যবোধ আজ চূর্ণিত—'জাতিভেদ' না থাকিলেও শ্রেণীভেদ সর্বত্র কুৎসিতভাবে উদগ্র। প্রাচীন খলিফাদের সরল জীবনযাপনের কথা কেহ আর কল্পনাতেও আনিতে পারে না। ধর্মের আধ্যাত্মিক সাধনা হইতে ধার্মিকতার বাহ্য আড়ম্বরে জীবন অধিক ভারাক্রান্ত, আরবী না বুঝিয়া কোরাণের কিছুটা মুখস্থ করা, পীর ও মস্তদের কবর পূজা, দরগায় সিন্নী দেওয়া, হাতে তাগা-তাবিজ বাঁধা, কণ্ঠে মালা ধারণ, হাতে তসবী ফেরানো প্রভৃতি বিবিধ সংস্কার সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমানের ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধনী মুসলমানদের অনেকেই মদ্যপান ও অহিফেন সেবনাদি ইসলামের নিষিদ্ধ অনেক-কিছুই করিতেন। সমস্ত ইসলাম দেহ নানা বিষে জর্জরিত না হইয়া পড়িলে এমনভাবে তুর্কী ও মুঘল সাম্রাজ্য এত অল্পকালের মধ্যে ধ্বংস হইত না। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি ভারতে অউরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) বত্রিশ বৎসরের মধ্যে পারস্যের সাহসিক নাদিরশাহ দিল্লী মহানগরী লুণ্ঠন করিয়াছিল (১৭৩৯) ও আর আঠারো বৎসর পরে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের মুষ্টিমেয় সৈন্যের নিকট বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা পরাভূত হইয়া ভারত-বিজয়ের পথ উন্মোচন করিয়া দিয়াছিল। মুসলান-সমাজ কী অধঃপতিত হইয়াছিল তাহা বাংলাদেশের নবাবী আমলের ইতিহাস পাঠ করিলেই জানা যায়। ক্লাইভকে জালিয়াৎ, হেষ্টিংসকে দুর্বৃত্ত-আদি আখ্যা দিলে আমাদের গাত্রজালা মিটিতে পারে, কিন্তু তদ্দারা

সমসাময়িক মুসলমান নবাব, ওমরাহ, সেনাপতিদের সচ্চরিত্রতা, সাধুতা, বীরত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না।

তুর্কীর বন্ধন হইতে মুক্তি আন্দোলনের বহুপূর্বে ইসলামধর্মকে পরিশোধিত করিবার আন্দোলন শুরু হয় আরবদের মধ্যে। ইতিহাসে ইহা 'ওহাবী আন্দোলন' নামে খ্যাত। মহম্মদ আবদুল ওহাব ১৭০০ অব্দে নেজদে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি এই নব-আন্দোলনেব প্রচারক হইলেও পাঁচ শত বৎসব পূর্বে ইবনে তয়মিয়া (৮ম শতক) ইসলামের মধ্যে ইমামী, পৌরহিত্য প্রভৃতি যে-সব অমুসলমানী বিষয় প্রবেশ করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। শ্রেণী-স্বার্থের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের ফলে ইবনে তয়মিয়া কারারুদ্ধ হন। আবদুল ওহাব সেই চিন্তার অনুবর্তন করিয়া বলিলেন, মুসা, যীশু, মহম্মদ সকলেই মানুষ— সুতরাং মানুষের স্বাভাবিক ভুলভ্রান্তি তাঁহাদের মধ্যে বর্তাইত; তাঁহাদের কাছে প্রার্থনা করা ঈশ্বরনিন্দার সমতুল। তাঁহাদের কবরস্থানে পূজা প্রার্থনাদির অনুষ্ঠান পৌত্তলিকতার নামান্তর মাত্র। মদ্যপান, তামাকু সেবন, শ্মশ্রুচ্ছেদন প্রভৃতি জঘন্য পাপ। ওহাব ঘোষণা করিলেন, ইসলামকে রশেদীন খলিফাদের যুগের বিশুদ্ধ ধর্মের আদর্শে ফিরাইতে হইবে।

ওহাবীমতে আকৃষ্ট বিশুদ্ধবাদীদের সংখ্যা ও শক্তি বাড়িতে বাড়িতে তাহারা ভারতীয় শিখদের ন্যায় একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হইয়া রাজ্য স্থাপন করিল (১৮০৪)। ইহাদের শক্তি ও আন্তরিকতা দেখিয়া শ্রেণী-স্বার্থান্বেষী লোকে স্বভাবতই চঞ্চল হইয়া উঠিল— এই আন্দোলনে বিশেষভাবে তুর্কীর সুলতান ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি খলিফা— তাঁহার শাসন ও শোষণ নীতির পরিপন্থী এই ওহাবী আন্দোলন; তাঁহাকে এ আন্দোলন দমন করিতেই হইবে; কিন্তু তুর্কীর নিজের শক্তি কোথায়? সেইজন্য তিনি তাঁহার অধীনস্থ মিশরের পাশা বা প্রদেশপাল আলবানিয়ান সাহসিক মহম্মদ আলীকে (Mehamet Ali) ওহাবী ধ্বংসের জন্য আদেশ দিলেন। এই বিচক্ষণ সেনাপতির য়ুরোপীয় কায়দায়-সুশিক্ষিত সৈন্য ও গোলন্দাজদের সম্মুখে ওহাবীরা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইল না, তাহারা ধ্বংস হইল (১৮১৮)। কিন্তু ইহার পর মহম্মদ আলী তুর্কীর সুলতান তথা খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালনা করেন। যুদ্ধান্তে খলিফা-

সুলতান মিশরের পাশা মহম্মদ আলীকে বংশানুক্রমে রাজপদ (খেদিভ) দান করিলেন। খেদিভ সুলতানের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ বার্ষিক কর দিতে প্রস্তুত হইলেন। মিশরে এই বংশ শতাধিক বৎসর রাজত্ব করেন, শেষ রাজা ফারুখ (১৯৫২) বর্তমান মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসের-এর পূর্ববর্তী নাজেব কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

ওহাবীদের রাজ্যস্থাপনের আশা দূর হইলেও ইসলামকে পরিশুদ্ধ করিবার পরিকল্পনা ও বাসনা আরবদের মধ্য হইতে বিদূরিত হইল না; ইসলাম জগতের নানা স্থানে সংস্কার-আন্দোলন দেখা গেল।

ভারতের পঞ্জাব প্রদেশে ওহাবীরা এক রাজ্য স্থাপন করিল; কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতে তখন শিখরা প্রবল— তাহারা ১৮৩০ অব্দে ইহাদের ধ্বংস করিয়া দেয়। ইংরেজদের পঞ্জাব জয়ের পরেও (১৮৪৮) ওহাবীরা সেই অঞ্চলে প্রবল ছিল এবং ইহাদের উচ্ছেদ করিতে ব্রিটিশদের রীতিমত কষ্ট পাইতে হয়। ভারতে ওহাবী আন্দোলন আমরা অন্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব।

য়ুরোপের নিকট আঘাত পাইতে পাইতে ইসলামের আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার জন্য জাগরণের ভাব দেখা দিতেছে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ক্রিমিয়ান যুদ্ধের পর তুর্কীদের মধ্যে শাসন-সংস্কার ও উদারনীতিক নব্যতন্ত্রতার হাওয়া বহিল। তাহারা দেখিতেছে, খ্রীষ্টীয় য়ুরোপ শ্বেতাঙ্গ-স্বার্থের জন্য যত সহজে মোসলেম বা অখ্রীষ্টান জাতি বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একক বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ-অভিযান, বাণিজ্য-বিস্তার, ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারে—ইসলাম-জগৎ সেরূপ পারে না। ইহার ফলে জগতে কোথাও তাহাদের সম্মান নাই—য়ুরোপীয় রাজনীতিজ্ঞরা ব্যঙ্গ করিয়া তুর্কীদের বলিতেন 'পীড়িত ব্যক্তি' বা Sickman of Europe!

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, ইসলাম-জগতের অধিকাংশ রাজ্যই য়ুরোপীয় কোনো-না-কোনো শক্তির প্রত্যক্ষত অধীন, না-হয় তাহার প্রভাবান্বিত পরিমণ্ডলে নামে-মাত্র স্বাধীন রাজ্যরূপে টিকিয়া আছে। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে উনবিংশ শতকে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ হইয়াছে। অলজিরিয়াতে

আবদুল কাদের, ককাসান পার্বত্য অঞ্চলে সামুয়েল বিদ্রোহী হইলে মুসলমানরা মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন নাই। ক্রিমিয়ান যুদ্ধে তুর্কীদের পরাভবের পর হইতে মোসলেম জগতের বহুস্থানে 'মেহদী' বা ভবিষ্যৎ অবতারের আবির্ভাব হইতে লাগিল— তাঁহারা খ্রীষ্টান তথা য়ুরোপীয় সভ্যতার আক্রমণ হইতে 'বিশ্বাসী'দের রক্ষা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিতেন। মিশরে, সুদানে, উত্তর আফ্রিকায়, আফগানিস্তানে, ভারতে, মধ্য-এশিয়ায়, চীন-তুর্কিস্থানে, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে— সর্বত্র অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম লইয়া গোঁড়ামি উৎকটভাবে দেখা দিল, অথচ কী ভাবে পাশ্চাত্য অভিঘাতকে প্রতিহত করা যায়— সে বিষয়ে সুচিন্তিত ভাবনা দেখা গেল না। কোনো কোনো দেশে ক্ষীণ আভা দেখা গেল যেমন, মিশরের বিখ্যাত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অল্-অজহরের মধ্যে ইসলামের সংস্কারের আন্দোলন। আধুনিকতার মোহে তুর্কী এবং মিশরের মুষ্টিমেয় যুবকের মধ্যে ইসলামের স্বভাবরক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও দেখা গেল, ধর্মের প্রতি উদাসীনতা হইল তাহাদের নূতনধর্ম ; কিন্তু ইহারা সর্বত্র সংখ্যায় ও শক্তিতে নগণ্য।

ইসলামের এই বিশ্বব্যাপী দুরবস্থা ও মূঢ়তা দূর করিবার জন্য নানা দেশে নানা ভাবে লোকে চিন্তা করিতেছে ; কিন্তু নিখিল মোসলেম জগতের মধ্যে কোনো ঐক্যসূত্র বা রাজনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধতার পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিতেছিলেন না। মুসলমানে মুসলমানে মিলনের বাধা কমই ; মক্কায় হজের সময় নানা দেশের বহুলোক জমায়েত হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এই সঙ্ঘবদ্ধতার প্রশ্ন ও ইসলামীয় সমস্যা সমাধানের কথা তেমনভাবে আলোচিত হইয়া দানা বাঁধে নাই ; 'হজে' যাহারা যাইত তাহারা সাধারণ লোক— তীর্থযাত্রার পুণ্যফলের জন্য তাহাদের হজ।

ওহাবীদের মধ্যে নিখিল মোসলেম সমাজকে এক করিবার ভাবনা কীভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছিল সেই ইতিহাস আমরা পূর্বে বলিয়াছি। সানুসি (Sanusi) সেই উদ্দেশ্য লইয়া কার্য আরম্ভ করেন। ইসলামের পবিত্রতা রক্ষা তাঁহার আদর্শ ছিল। কিন্তু নব্য তুর্কদের ধর্মহীন আচরণ সানুসি-অনুবর্তীদের অসহ্য হইল। কিন্তু সানুসিদের কর্মকেন্দ্র উত্তর-আফ্রিকার মধ্যে সীমিত থাকায় উহা বিশ্বব্যাপী হয় নাই। নিখিল মুসলমানদের মধ্যে

রাজনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে প্রচার করেন জমালউদ্দীন অল্ আফগনী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে জমালউদ্দীনের জন্ম হয় পারস্যে। যৌবনে তিনি য়ুরোপ ও এশিয়ার বহু স্টেট ভ্রমণ করিয়া য়ুরোপের বৈভব ও শক্তি এবং ইসলামের করুণ অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি ইসলামের ধর্মতত্ত্বীয় জটিল তর্কজালের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া সাধারণভাবে রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক দিক হইতে মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধতার কথা লইয়া আলোচনা ও আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন; ইহাকে বলা হয় Pan-Islamic movement। জমালউদ্দীন ভারতে আসিয়া এই নিখিল মোসলেম-ভাবনা প্রচার করিতে থাকিলে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। অতঃপর ১৮৮০ অব্দে মিশর গিয়া সেখানে আরবীপাশার স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্তু ১৮৮২ অব্দে ইংরেজ মিশর জয় করিয়া লইলে জমালউদ্দীন সেখান হইতে বিতাড়িত হইলেন। সেই সময়ে তুর্কী স্থলতান আবদুল হামিদ নিখিল মোসলেমকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জল্পনায় নিরত। জমালকে পাইয়া তিনি তাঁহাকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করিলেন; সেই হইতে মৃত্যু পর্যন্ত (১৮৯৬) জমালউদ্দীন মুসলমানদিগকে 'এক ধর্মরাজ্য' পাশে বাঁধিবার জন্য চেষ্টান্বিত ছিলেন। স্থলতান আবদুল হামিদ য়ুরোপীয়, এশিয় ও আফ্রিকান মুসলমানগণকে খ্রীষ্টীয়-য়ুরোপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া এক সঙ্ঘ গড়িবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু ১৯০৮ সাল হইতে 'নব্যতুর্ক' (Young Turk) সমাজের অভ্যুদয়ের ফলে নিখিল মোসলেম মিলনের অবাস্তব আদর্শতা তুর্কীদের মধ্যে ম্লান হইয়া আসিল; যুবতুর্ক প্যান-ইসলামের পক্ষপাতী নহে—তাহারা তীব্রভাবে জাতীয়তাবাদী—সর্বাগ্রে তুরস্কের সম্মান, পরে ইসলাম। মিশরীয়রাও তখন জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত—তাহাদের কাছে স্টেটই সর্বাপেক্ষা প্রধান প্রশ্ন। তুর্কী ও মিশরের ন্যায় পারস্যেও (ইরান) য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মনোভাব কঠিন, এবং যুগপৎ য়ুরোপীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি পাইবার জন্য যুবমনের তীব্র ব্যাকুলতা দেখা গেল। নবীন দলের উৎসাহে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের আদর্শে তেহারনে পার্লামেণ্ট বা মজলিস স্থাপিত হইল; দেশের আভ্যন্তরীণ আয়-ব্যয় সুষ্ঠুরূপে নিয়ন্ত্রিত করিবার আশায় পারস্যিক মজলিস শুস্টার নামে এক মার্কিণ বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করেন। কিন্তু যে মুহূর্তে শুস্টার দেশের মধ্যে কিছুটা সুব্যবস্থা আনয়ন করিলেন—তখনই

যুগপৎ ব্রিটিশ ও রুশের কূটনীতিজ্ঞদের বক্রদৃষ্টি পড়িল এই পেট্রোলিয়াম সম্পদসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের উপর। পারস্যের উত্তর হইতে জার-শাসিত রুশের, ও দক্ষিণ হইতে ব্রিটিশ বণিকদের জুলুমবাজিতে পারস্যের সংস্কারচেষ্টা ব্যর্থ হইল— মজলিস ভাঙিয়া গেল; উত্তরে রুশ ও দক্ষিণে ব্রিটিশ প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল (১৯১০)। এই বিপর্যয়ে পারসিক সম্ভ্রান্ত শ্রেণীদের হাত ছিল যথেষ্ট। সংস্কারের আন্দোলন তাহাদের শ্রেণীস্বার্থের বিরোধী।

১৯১২ অব্দে ইতালি অকারণে তুর্কী সাম্রাজ্যান্তর্গত উত্তর আফ্রিকাস্থিত ত্রিপোলি দেশ আক্রমণ করিয়া দখল করিল। এক অনধিকারীর হস্ত হইতে আফ্রিকান মুসলমানরা অন্য-এক অনধিকারীর হস্তে পতিত হইল। পরস্বাপহারক বিজেতাদের একই ধর্ম— শোষণ ধর্ম; সেখানে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেই সমগোত্রীয়। এই ১৯১২ সালেই বলকান উপদ্বীপের খ্রীষ্টান রাষ্ট্রগুলি একত্র হইয়া তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল; যুদ্ধের ফলে তুর্কীদের য়ুরোপীয় রাজ্যাংশ বহুল পরিমাণে সংকুচিত হইল। তবে এখনো এশিয়ায় তাহাদের আরব সাম্রাজ্য কেহ স্পর্শ করে নাই। বিংশ শতকেব প্রারম্ভভাগে আফ্রিকার মরোক্কো দেশ গ্রাস করিল ফ্রান্স ও স্পেন; অলজেরিয়া ফরাসীরা ও মিশর-সুদান ব্রিটিশরা দখল করিয়া আছে। খলিফার ধর্ম-সাম্রাজ্য এইভাবে ক্রমশই সংকুচিত হইয়া চলিতেছে।

য়ুরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মুসলমানদের প্রতি এই হামলা ও গুণ্ডামি সমগ্র মোসলেম-জগৎকে বিক্ষুব্ধ করে এবং বলকান যুদ্ধের সময়ে তুর্কীদের সাহায্য দান করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে রেডক্রশ সোসাইটির অনুকরণে রেড্ ক্রেসেণ্ট সোসাইটি প্রেরিত হইয়াছিল—ভারতের বাহিরে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের এই প্রথম প্রয়াস। ইহা প্যান-ইসলামবাদের অন্যতম রূপ। ইতিমধ্যে ভারতে ১৯০৬ সালের শেষদিকে মোসলেম লীগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রুশ-জাপানের যুদ্ধে রুশের পরাজয়ে মোসলেম-জগৎ উল্লসিত —কারণ একটি খ্রীষ্টান পাশ্চাত্য শক্তি আজ এশিয়ান শক্তির নিকট পরাভূত। ভারতের ১৯০৪ সালের স্বদেশী আন্দোলন এবং তাহার অব্যবহিত ঘটনা-পরম্পরা নিপীড়িত মোসলেম-জগৎ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছিল। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে শিক্ষিত মুসলমানের একটি শ্রেণী সর্বান্তঃকরণে যোগদান করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই; চীনা সাধারণতন্ত্র স্থাপনের সময়

(১৯১২) চীনা মুসলমানেরা সান-য়াৎ-সানকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্যদান করিয়াছিল। মোটকথা প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে (১৯১৪) মোসলেম-জগতের সর্বত্রই আত্মোন্নতির চেষ্টা ও রাষ্ট্রশাসনবিষয়ে স্বায়ত্তাধিকার লাভের জন্য ঔৎসুক্য দেখা গিয়াছিল। তবে এই চেষ্টার মধ্যে ভারত ব্যতীত আর কোথাও ন্যাশনাল বা জাতীয় ভাবের অপেক্ষা 'প্যান-ইসলাম' আন্দোলনের প্রভাব অধিক দেখা দেয় নাই; ইহার ফলে ভারতের মুসলমানের মধ্যে 'জাতীয়তা' বোধ স্বধর্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতে থাকে এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইল দ্বিজাতিক মতবাদ ও পাকিস্তানের সৃষ্টি।

প্রথম য়ুরোপীয় মহাসমর (১৯১৪-১৮) শেষ হইয়াছে ৪০ বৎসর পূর্বে, মাঝে আর-একটা মহাসমর হইয়া গিয়াছে (১৯৩৯-৪৫) এবং আর-একটা যুদ্ধের সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত, কেবল এই যুদ্ধের শেষে যুদ্ধের ফসল ভোগ করিবার জন্য কোনো জীব অবশিষ্ট থাকিবে কি না— সেইরূপ সন্দেহ হওয়ায় — সকলেই শান্তিরক্ষার জন্য কূটনীতির আশ্রয় লইয়াছেন; কূটনীতি ব্যর্থ হইলে যুদ্ধ অনিবার্য। যাহা হউক ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তুর্কী যোগদান করিল জারমানদের পক্ষে।[১] অপর পক্ষে আছে ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি। জারমান সাম্রাজ্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ ছিল জারমানদের উদ্দেশ্য, তুর্কীর উদ্দেশ্য বলকানে তাহার হৃতরাজ্য উদ্ধার ও আরব এবং ইসলাম জগতে তাহার ক্ষীয়মাণ আধিপত্য কায়েম করা। প্যান-জারমেনিক, প্যান-স্লাভনিক ও প্যান-ইসলামিক এই তিনটি আন্দোলন চলিতেছিল যুগপৎ। প্যান-স্লাভনিক জাতীয়ত্বের মুরুব্বি রুশ-- ইহারা প্যান-জারমেনিক আন্দোলনের নেতা প্রুশিয়ানদের বিরোধী। রুশের প্রগতির অন্তরায় জারমানরা ও তুর্করা। বালটিক সাগর দিয়া বাহির হইতে হইলে জারমানরা, ব্ল্যাকসী দিয়া বাহির হইতে হইলে তুর্কীরা। তুর্কীরাই রুশ সাম্রাজ্য প্রসারের প্রধান অন্তরায়, তাই তুর্কীদের বসপরাস প্রণালীর মালিকানা হইতে অপসারিত করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছে ব্রিটিশ, ফরাসীদের ঈর্ষান্বিত

১ মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারত হইতে বিপ্লবীরা জারমেনীতে গিয়া ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সহায়তা চাহিলে, সমর বিভাগ হইতে সহায়তার যে-সব শর্ত দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে একটি ছিল, ভারতীয় মুসলমানরা তুর্কীকে জারমানদের সপক্ষে যুদ্ধে নামিবার জন্য যেন চাপ দেয়।

অপচেষ্টার ফলে তাহা বারে বারে ব্যর্থ হইয়াছে। তুর্কী এই মহাযুদ্ধে যোগদান করিল রুশকে জব্দ করিবার আশায়। অবশ্য জারমেনীর উস্‌কানি ও চাপ ছিল ভিতরে ভিতরে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই তুর্কী সাম্রাজ্য তাসের বাড়ির ন্যায় ছত্রাকার হইয়া পড়িল; মিশর তুর্কীর প্রদেশ ছিল— খেদিভ ছিলেন বংশপরম্পরায় প্রদেশ-পাল (১৮৪১)। ইংরেজের প্ররোচনায় ও প্রশ্রয়ে খেদিভ তুর্কীর নামমাত্র শাসন ছিন্ন করিয়া 'স্বাধীন' সুলতান হইলেন (১৯১৪)। আরাবিয়ায় মক্কার শরীফ তুর্কীশাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, ব্রিটিশের অনুকূলে তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; ইসলামের ধর্মগুরু খলিফার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ। মেসোপটেমিয়ার আরবরা বিরুদ্ধাচরণ করিল। ভারতীয় মুসলিম সৈন্যদল অন্যান্য হিন্দু ও শিখ সৈন্য বাহিনীর সহিত একযোগে তুর্কীর সুলতান তথা ইসলাম-জগতের খলিফর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল।[১] মোট কথা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মোসলেম-জগৎ যতদূর সম্ভব উল্টাপাল্টা রকমের পক্ষ-বিপক্ষ নির্বাচন করিয়া লইয়াছিল। স্পষ্টই দেখা গেল প্যান-ইসলামবাদ বা খলিফার ইসলামী সার্বভৌমত্ববাদ আদৌ কার্যকরী হইল না; ন্যাশনাল বা জাতীয়ভাব সর্বত্র জয়ী— সকলেই আপন-আপন দেশের স্বার্থ ও কল্যাণের দিকে তাকাইয়া পক্ষ-বিপক্ষ নির্বাচন করিতেছেন। ধর্মের দিকে তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নাই। রাজনৈতিক সুবিধার জন্য যদি ধর্মের দোহাই সার্থক হয়, তবেই তাহার জিগির দিয়াছে। সেটি সার্থক হয় ভারতে।

যুদ্ধে জারমান-অষ্ট্রিয়া-তুর্কীর পরাজয় ঘটে (১৯১৮)। তুর্কীর পরাজয়ে সুলতানের ঐহিক ক্ষমতা বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হওয়ায় তাহার খলিফাপদের আর গৌরব থাকিল না। যুদ্ধের সময় ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী মুসলমানজগতকে

১ নিখিল ইসলামিক মনোভাব হইতে মুসলমানরা গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধে (১৮৯৭) তুর্কীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছিল; তখন স্যার সৈয়দ আহম্মদ ইহাকে সমর্থন করেন নাই। "He contributed articles to the *Aligarh Institute Gazette* denying the *pretensions of Sultan* Abdul Hamid *to the Khilafate* and preaching loyalty to the British rulers of India, even if they were compelled to persue an unfriendly policy towards Turkey." (W. C. Smith, Modern Islam in India. P. 17)

এই বলিয়া ভরসা দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধান্তে সন্ধিপত্র রচনাকালে তুর্কী-স্থলতানের প্রতি অসম্মানকর শর্তাদি সংযোজিত হইবে না। কিন্তু যুদ্ধান্তে জানা গেল যে, শর্তাদি ব্রিটিশের মিত্রপক্ষীয়দের অনুমোদিত নয়; তাহা দেখিয়া সর্বাপেক্ষা বিস্মিত হইল ভারতীয় মুসলমানরা। আরবরা তুর্কীর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, মিশর উল্লসিত; পশ্চিম এশিয়া তুর্কীশাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নূতন স্বাধীন রাজ্য গড়িবার প্রতিশ্রুতি পাইয়া আনন্দিত; কেবল ভারতের মুসলমানরা তুর্কীর খলিফার গৌরবের ক্ষুণ্ণ হওয়ায় চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং খিলাফত-আন্দোলন আরম্ভ করিল, অর্থাৎ প্যান-ইসলাম বা রাষ্ট্রঅতিরিক্ত আনুগত্যের (extra territorial) মনোভাব ভারতের জাতীয়তাবাদের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে-ইতিহাস অন্যত্র আলোচিত হইবে।

ভারতে ওহাবী আন্দোলন

ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিলে মুসলমানদের বহু শতাব্দী অর্জিত সুবিধা-সুযোগ একে একে শাসন ও শৃঙ্খলার জন্য অপহৃত হইতে থাকে। মুসলিম যুগে সরকারের বড় বড় চাকুরিতে তাহাদের ছিল অগ্রাধিকার; হিন্দুরা ছিল নিম্ন কর্মচারী। মুসলিম সম্রান্তেরা সৈন্যবিভাগে একছত্র ছিলেন; এ ছাড়া রাজদরবারের অনুগ্রহে অসংখ্য উপায়ে তাহারা ধনার্জন করিত। ব্রিটিশযুগে ইংরেজ নিযুক্ত হইল সেই-সব অর্থকরী কার্যে। ব্রিটিশযুগে মুসলমান ছাড়া বহু লক্ষ হিন্দু সৈন্যবিভাগে ভর্তি হয়। মুসলমান-যুগে হিন্দুকে সৈন্যবিভাগে লওয়া হইত না— কারণ মুসলমানরা কাফেরের হস্তে নিহত হইলে বেহেস্তে যাইতে পারে না। সেইজন্য হিন্দুরা মুক্তি পাইত জিজিয়া কর দিয়া। সাধারণ হিন্দুরা যুদ্ধাদি কর্মের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া মন দিয়াছিল শিল্পে-বাণিজ্যে, শাসনকার্যে; ইহার ফলে হিন্দুশ্রেষ্ঠীর হস্তে ধন পুঞ্জীভূত হইল এবং এই ধনিক শ্রেষ্ঠীরাই রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিত। মুসলিম যুগে পার্সি ছিল রাষ্ট্রভাষা— মুসলমানমাত্রেই সে-ভাষা আয়ত্ত করিত ভাল করিয়া—ফলে সকল সরকারী কাজেই তাহারাই ছিল মুখ্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠ। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি চালু হইতে থাকিলে (১৮৩৫) মুসলিমদের পার্সী ভাষায় পাণ্ডিত্য সত্বেও জীবিকার্জনের পথ অতি সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। কোম্পানীর যুগে কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপিত হয়— সেখানে সেই মধ্যযুগীয় শিক্ষাই মুসলমানরা পাইতে থাকে— সে-শিক্ষা ব্যবহারিক জীবনে তাহাদের কাজে লাগিল না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক ঘটনা ভূমি-সংস্কার আইন। গ্রামে গ্রামে মুসলমানরা বহু নিষ্কর জমি ভোগ করিতেছিল; সরকারী ব্যবস্থায় এই-সব অধিকার প্রমাণ করিবার জন্য দলিল-দস্তাবেজ পেশ করিবার প্রয়োজন হইল। তখন দেখা গেল, অধিকাংশ মুসলমান রায়ত এই-সব প্রমাণ দেখাইতে অসমর্থ। এই-সব জমি ধীরে ধীরে বাজেয়াপ্ত হওয়ায় বহু লক্ষ মুসলমান ভারতের নানাস্থানে ভূমিহীন হইয়া পড়িল। এ ছাড়া বহু ওয়াকফ (মুসলমানী দেবত্র) স্টেট ছিল; সে-সব সম্পত্তির দলিল গবর্মেণ্টের

কাছে পেশ না করিতে পারায় বহু ওয়াকফ-স্টেট বাজেয়াপ্ত হইল, ইহার ফলে মুসলমানী শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হইল। মুসলমান যুগে কাজি'রা ছিলেন বিচারাদি ব্যাপারে সর্বেসর্বা; দেওয়ানী, ফৌজদারী, ধর্মীয় সকল বিষয়ে তাঁহাদের বিচার ছিল শেষ কথা। ব্রিটিশযুগের পূর্বে আপীল-আদালত প্রভৃতি প্রায় অজ্ঞাত ছিল। এই-সকল বিচিত্র কারণে ভারতে মুসলমান-সমাজ অতীব হীন-দশা প্রাপ্ত হয়।

ব্রিটিশ-শাসনের প্রথম যুগে মুসলমানদের এই হীনদশা হইতে মুক্তিদানের জন্য ভারতে ওহাবী আন্দোলন নূতনভাবে দেখা দিয়াছিল। সৈয়দ আহমদ নামে এক ব্যক্তি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ১৭৮৬ অব্দে উত্তর প্রদেশের রায়বরেলী জেলায় সৈয়দ আহমদের জন্ম; যৌবনে তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন। অবশেষে দিল্লীতে গিয়া একজন বিখ্যাত মওলনার নিকট ইসলাম ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তিনি ইসলাম পরিশোধনের জন্য প্রচারে বহির্গত হইলেন। পাটনা হইল তাঁহার প্রচারকেন্দ্র। সেখানে তিনি চারিজন লোককে 'খলিফা' বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৮২২ সালে মক্কা হইতে হজ করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর তিনি আরাবিয়ার ওহাবীদের ন্যায় ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য জেহাদ ঘোষণা করিলেন। পঞ্জাবে তখন শিখদের রাজ্য; সেখানে সৈয়দ আহমদ মুসলিম রাজ্য স্থাপনের জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ১৮৩০ সালে তিনি আপনাকে 'খলিফা' বলিয়া ঘোষণা ও মুদ্রাদি নিজ নামে মুদ্রিত করিলেন। কিন্তু ১৮৩১-এ তিনি শিখদের দ্বারা নিহত হন। ইহার পর তাঁহার শিষ্যেরা দীর্ঘকাল ভারতের নানাস্থানে উপদ্রবের চেষ্টা করে। এই আন্দোলন দমন করিতে ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারের বহু ধনক্ষয় হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় পাটনায় ওহাবীরা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। ওহাবীদের আক্রমণস্থল ছিল ইংরেজ—এই বিধর্মীদের হস্ত হইতে দেশ উদ্ধার ছিল তাহাদের কল্পনা; হিন্দু তখনো আক্রমণস্থল হয় নাই।

ভারতে মোসলেম জাগরণ ও পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে ছিলেন মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ তিনজন পুরুষ—স্যর সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলি ও স্যর মহম্মদ ইক্‌বাল। মুসলিম জাগরণের তিনটি স্তর এই তিনজনের রচনা ও কর্মধারার মধ্যে প্রকটিত হইয়াছে। প্রথম জন মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার, দ্বিতীয় জন মুসলিমদের অতীত গৌরব কাহিনী ও ইসলামের ভাবগত আদর্শবাদের ব্যাখ্যান ও তৃতীয় জন ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও তাহার ডিমক্রেসীর বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। ইহারা কেহই যথার্থভাবে রাজনৈতিক ছিলেন না, কিন্তু প্রত্যেকেই রাজনীতির আবর্তে আকর্ষিত হন এবং হিন্দুদের হইতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের দাবি পেশ করেন। কন্‌গ্রেসের সৃষ্টির সময় হইতেই এই পার্থক্যনীতির জন্ম।

স্যার সৈয়দ আহমদ যথার্থভাবে আধুনিক ভারতের মুসলমান-সমাজের প্রধান ও প্রথম সংস্কারক; ১৮৭৬ অব্দে তিনি সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও ১৮৭৮ হইতে ১৮৮৩ পর্যন্ত গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন; এই সময়ে লর্ড রীপনের স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক আইন লইয়া আলোচনা চলিতেছে। এই আইন প্রণয়নকালে স্যার সৈয়দ আহমদের চেষ্টায় মুসলমানদের জন্য পৃথক মনোনয়নের ব্যবস্থা হয়। তিনি সাধারণভাবে নির্বাচনেরই বিরোধী। এক সভায় তিনি বলিয়াছিলেন, "So long as differences of race and creed and the distinctions of caste form an important eliment in the socio-political life of India and influence her inhabitants in matters connected with the administration and welfare of tha country at large, the system of election pure and simple cannot be safely adopted. The larger community would totally override the interests of the smaller community, and the ignorant public would hold Government responsible for introducing

measures which might make the differences of race and creed more violent than ever." স্যার সৈয়দ যাহা বলিলেন তাহাই ভারতীয় মুসলমানগণ ১৮৮৩ হইতে ১৯৪৭ পর্যন্ত রূপদান করিবার জন্য চেষ্টা করেন; ১৮৮৭ সালে তিনি বলেন, "Now suppose that all the English···were to leave India. Then who would be rulers of India? Is it possible that under these circumstances *two nations*— the Mohammedan and the Hindu— could sit on the same throne and *remain equal in power?* Most certainly not. It is necessary that one of them should conquer the other and thrust it down. To hope that both could remain equal is to desire the impossible and the inconceivable."[১]

এই উদ্ধৃতির নির্গলিত অর্থ হইতেছে যে, ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি এবং ইহাদের মধ্যে কখনও বনিবনা বা সৌহার্দ্য হইতে পারে না; শরীকি রাজ্য অচল, একই সিংহাসনে দুই শরীকে বসিবে কি করিয়া? সেইজন্য স্যর সৈয়দ তাঁহার সধর্মীদের কন্‌গ্রেস আন্দোলনে যোগদান করিতে নিষেধ করিলেন। স্যর সৈয়দ মুসলমানদিগকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষিত হইয়া হিন্দুদের সমকক্ষ করিবার জন্য আলিগড়ে এংলো-ওরিয়েণ্টল কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন ১৮৭৫ অব্দে। ১৮৮৩ সাল হইতে সেখানে ইংরেজ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইল। এই কলেজের উদ্দেশ্য— মুসলমান ছাত্রগণকে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যভাবে দীক্ষিত করা এবং যুগপৎ তাহাদিগকে ইসলামের সকল দীনিয়াত বাধ্যতামূলকভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতে শিক্ষা দেওয়া। এক দিকে তাহারা য়ুরোপীয় আধুনিকতা ও অন্য দিকে ইসলামীয় মধ্যযুগীয়তা সমভাবে অনুসরণ করিবে— ইহাই হইয়াছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা। মিঃ বেক্, মিঃ থিওডোর মরিসন ও মিঃ আর্চিবোলড— এই তিন জন ইংরেজ অধ্যক্ষের শিক্ষায়, শাসনে ও পরামর্শে যে মুসলমান যুবকরা 'শিক্ষিত' হইয়া আলিগড় হইতে বাহির হইয়াছিলেন, তাহারাই পরযুগে নব-ইসলামীয়

১ The Making of Pakistan by Richard Symonds— Faber 1949, P. 31

আন্দোলনের নেতা হন। কিন্তু স্যর সৈয়দের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ও তাঁহার পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুসরণ ও অনুকরণ -রীতির বিরোধী গোঁড়া মুসলমানেরও অভাব ছিল না। হিন্দুসমাজে এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের পক্ষে বেদবেদান্তের অভ্রান্ততা ও অপৌরুষেয়তা অস্বীকার করিয়া,— এমন-কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া সম্পূর্ণভাবে 'আধুনিক' বিজ্ঞানবাদী হওয়া সম্ভব কিন্তু মুসলমান-সমাজের পক্ষে সে-শ্রেণীর লোকের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না; তাহাদের পক্ষে ধর্ম-নিরপেক্ষ স্টেটগঠন বা পরধর্মসহিষ্ণু জীবন-যাপন, বা কোরাণের authority লইয়া প্রশ্ন উত্থাপন প্রভৃতি সহজে সম্ভব হয় না।

স্যর সৈয়দ -প্রবর্তিত আন্দোলন ও তাঁহার রচিত প্রবন্ধাদির মধ্যে একটা apologetic বা কৈফিয়তী ভাব ছিল; তাঁহার রচনার উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য শ্রোতা ও পাঠককে ইসলামের গুরুত্ব বুঝানো। মুসলমানদের এই নব জাগরণে বহু লেখক ও কবি উর্দু ভাষার মাধ্যমে যে সহায়তা দান করিলেন, তাহার কথা সংক্ষেপে না বলিলে পরবর্তী যুগের ভারতীয় মুসলমানদের মতি ও গতির ধারা স্পষ্ট হইবে না।

এই নব আন্দোলনের হোতাদের মধ্যে প্রথমে নাম করিতে হয় আলতাফ্ হুসেন বা হালি-র (মৃ ১৯১৪); উর্দু কবিতায় তাঁহার স্থান অতুলনীয়; অতীত ইসলামের গৌরবময় যুগ ও বর্তমানে তাহার দুর্দশার কথা তাঁহার রচনায় ওজস্বিতার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

জাকা উল্লা (১৮৩২—১৯১০) নাজির অহমদ প্রভৃতি মনীষীগণের রচনা মুসলমানদের মনকে উদ্বুদ্ধ করিতে বিশেষ সহায়তা করে। নাজীর অহমদ সর্বপ্রথম উর্দু ভাষায় কোরাণের তর্জমা করিলেন; প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি বাঙালি মুসলমান বহুপূর্বে বাঙলা ভাষায় কোরাণ প্রভৃতি পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

আর-একজন লেখক হইতেছেন, মহম্মদ শিব্লি বা নুমানি (১৮৫৭-১৯১৪)। শিবলি ইসলামের ধর্মতত্ত্বকে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হন; সে-হিসাবে তাহাকে মুতাজিলীদের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। উর্দু-ইসলামি সাহিত্যে হালি, শিবলি, ইকবালের নাম অমর হইয়া রহিয়াছে।

এই-সব লেখকদের প্রভাবে ইসলাম সংস্কার ও ইসলামের গৌরবপ্রচার

প্রভৃতি প্রভূতভাবে অগ্রসর হইল; কিন্তু তাহা এখনো সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার অস্ত্ররূপে প্রযুক্ত হয় নাই।

আমরা অন্য এক পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, বঙ্গচ্ছেদ কেন্দ্র করিয়া যে স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গদেশে দেখা দিয়াছিল (১৯০৫), তাহা পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের শীর্ষ স্থানীয়রা আদৌ পছন্দ করেন নাই। তাঁহাদের ধারণা পূর্ববঙ্গ-আসামের নূতন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতাবলে তাহাদের প্রাধান্যলাভ হিন্দুদের পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। তাই হিন্দুরা পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের বিশেষ অধিকার, সুবিধা-সুযোগাদি হরিবার জন্য বঙ্গচ্ছেদ রদ করিবার পক্ষপাতী। সেইজন্যই বর্ণ হিন্দু জমিদারদের পক্ষ হইতে এই আন্দোলনকে প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য এত চেষ্টা। সরকারের উদ্দেশ্য 'মুসলমান শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়া পূর্ববঙ্গে বলশালী করিয়া তোলা, যাহার ফলে দ্রুতবর্ধনশীল হিন্দুসংহতি সম্ভবত অনেকটা সংযত হইবে।' ইহা সমকালীন ইংরেজের সম্পাদিত 'স্টেটসম্যান' কাগজের মন্তব্য।[১]

কন্‌গ্রেসকে দশ বৎসরের মধ্যে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে গঠিত হইতে দেখিয়া শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের ভাবনা উদয় হয়। বিশেষভাবে হিন্দুদের বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলন করিতে দেখিয়া মুসলমানদের মধ্যেও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার ভাবনা তীব্রভাবে দেখা গেল; হিন্দুদের আধিপত্য সঙ্কুচিত করাও অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই আন্দোলনের উদ্‌ভাবক ছিলেন আলিগড়ের ইংরেজ অধ্যক্ষ মিঃ আর্চিবোলড; যেমন কন্‌গ্রেসের ছিলেন মিঃ হিউম। আচিবোলড সাহেবের উপদেশ ও ব্যবস্থায় মুসলমানরা বড়লাট লর্ড মিনটোর নিকট দরবার করিতে যান, বড়লাটের নিকট যে দরখাস্ত মুসলিম নেতারা পেশ করেন— তাহার মুসাবিদা করিয়া দিয়াছিলেন মিঃ আর্চিবোলড এবং কীভাবে কী করিতে হইবে তাহার গোপন পরামর্শ তিনিই দেন। ১৯০৬ সালের পহেলা অক্টোবর মুসলমান-সমাজের ৭৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির ডেপুটেশন শ্রীল আগা খার (মৃ ১৯৫৭ জুলাই) নেতৃত্বে বড়লাট বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইল। এই

১ খণ্ডিত ভারত পৃ ১২৬।

সময়ে ভারতের নূতন শাসন-সংস্কারের আলোচনা চলিতেছে— দরবারকারীরা বড়লাটকে জানাইলেন যে, মুসলমান-সমাজ পৃথক নির্বাচনপ্রথা-প্রবর্তনের পক্ষপাতী— মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, আইন-পরিষদ বা প্রতিনিধিমূলক যে-কোনো প্রতিষ্ঠান আছে, সর্বত্র মুসলমানগণ সম্প্রদায়-হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করিতে চাহে, যৌথ নির্বাচন মুসলমানের স্বার্থপরিপন্থী।

ভারত-সরকার সম্প্রদায়গত নির্বাচন ও মনোনয়নবিধি ব্যবস্থা করিতে রাজি হইলে, সমসাময়িক কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে, ইংরেজরা এই ব্যবস্থায় অতীব প্রীত হইয়াছিল; তাহাদের মনে হইল, এই ব্যবস্থার দ্বারা বিদ্রোহী হিন্দুদের কবল হইতে ব্রিটিশ-ভারতের (তৎকালীন ছয় কোটি বিশ লক্ষ) মুসলমানকে উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের পক্ষভুক্ত করা সম্ভব। কারণ ১৯০৬ সালে বয়কট-আন্দোলন তীব্রভাবে দেশব্যাপী হইয়াছে;— ইহাকে ধ্বংস করিতে হইলে, দেশের মধ্যে প্রবল প্রতিপক্ষ গড়িয়া তুলিতে হইবে— ইহাই রাজনীতি।

বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎকারের এক মাস পরে ঢাকা শহরে 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেসী' নামে সম্মেলন আহূত হইল (ডিসেম্বর ১৯০৬)। ঠিক এই সময়ে কলিকাতার কন্‌গ্রেসে নৌরজী 'স্বরাজ' ব্যাখ্যা করিতেছেন। ঢাকার সম্মেলনে মুসলিম মনোভাব কিরূপ ছিল— তাহার দুইটি উদাহরণ মাত্র উল্লিখিত হইতেছে—একটি দ্বারা বঙ্গচ্ছেদ সমর্থিত ও অপরটি দ্বারা ব্রিটিশ পণ্য বর্জননীতি নিন্দিত হইল। অর্থাৎ কন্‌গ্রেস যে দুইটি বিষয় লইয়া সংগ্রামে নিরত — মুসলিম লীগ তাহাদের ঠিক বিপরীত কথা সমর্থন করিলেন। তৎকালীন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রথম শ্রমিক সদস্য মিঃ রামসে ম্যাকডোনালড তাঁহার **Awakening of India** গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন, "মুসলমান নেতৃবর্গ কতকগুলি ইংগ-ভারতীয় রাজকর্মচারীর নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এই কর্মচারীগণই লন্‌ডন ও সিমলা হইতে সংগোপনে পুতুলনাচের দড়ি টানিয়াছেন এবং মুসলমানদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়া হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অচিন্ত্যপূর্ব বিদ্বেষ ও বিভেদের বীজ বপন করিয়াছেন। অদৃষ্টের পরিহাস—এই ম্যাকডোনালডই কয়েক বৎসর পরে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ব্যবস্থা দান করিয়া পাকিস্তানের সূচনা করিয়া দেন।

লীগ-প্রতিষ্ঠার দেড়মাস পরে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে হিন্দুমুসলমান

দাঙ্গা হইল ; বাসন্তী প্রতিমা ভাঙিয়া হিন্দু স্ত্রীলোকদের উপর উপদ্রব করিয়া মুসলমানরা জানাইয়াছিল যে 'বয়কট'-আন্দোলনের সহিত তাহাদের সংস্রব নাই— উহা হিন্দুদের আন্দোলন মাত্র।

ঢাকার নবাব অলিমুল্লা সাহেব কুমিল্লায় আসিবার পর সেখানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধে। লোকদের মধ্যে এই কথা কীভাবে প্রচারিত হয় যে, গবর্নমেণ্ট মুসলমানদের পক্ষপাতী এবং হিন্দুদের সম্পত্তি লুঠতরাজ করিলে ও তাহাদের নারী বিশেষভাবে বিধবাদের হরণ করিলে সরকার শাস্তি দিবেন না। হইলও তাই।

মুসলিম লীগের শাখা ভারতের প্রধান প্রধান শহরে ও গ্রামে স্থাপিত হইল ; মুসলিম উলেমাগণ ধর্মে নিষ্ঠা ও সঙ্ঘে আস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া 'আঞ্জুমান' বা মুসলিম-সমাজের সভা স্থাপন করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রচারের ফলে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মবিষয়ে শৈথিল্য ও ঔদাসীন্য দূরিত হইল ; নমাজপড়া, রোজারাখা, জাকাৎ দেওয়া, মসজিদ যাওয়া, বকরঈদে গরু-কোরবানি করা প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি গেল। যুবক মুসলমানেরা তুর্কী 'ফেজ' মাথায় দিল—নানাভাবে জাগরণের সাড়া পড়িল। ধর্মের নামে গোহত্যা নিবারণের জন্য হিন্দুরা যে আন্দোলন করিয়া আসিতেছিল— তাহা মুসলমানরা তাহাদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপজ্ঞানে প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছিল।-- এখন হইতে উভয় পক্ষই গো-রক্ষা ও গো-হত্যার জন্য জান্ কবুল করিয়া পরস্পরকে আক্রমণে প্রবৃত্ত হইল। মুসলমান প্রমাণ করিতে চাহে এক মসনদে দুই শরীকের স্থান সংকুলন হয় না— 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' এ প্রবাদ বচন বর্ণে বর্ণে সত্য হইতে চলিল। আদর্শবাদীদের স্বপ্নালু দৃষ্টিতে যে অন্তর্নিগূঢ় ভেদচিহ্নগুলি অস্পষ্ট ছিল অথবা শিথিল চিন্তাহেতু যাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার মতো বাস্তবতাবোধ ও সাহসের অভাব ছিল, আজ তাহা সাম্প্রদায়িকতা বা নবধর্মীয়তার নূতন উত্তেজনার আলোকে সুস্পষ্ট হইতে চলিল।

মর্লি-মিনটো সংস্কারের সাম্প্রদায়িক নির্বাচন সমর্থিত হইলে মুসলমানরা বেশ বুঝিল— সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে অর্ধশতাব্দী (১৮৫৭-১৯০৭) তাহারা যে ইংরেজের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছিল তাহার অবসান হইল। কনগ্রেস স্থাপিত হইলে স্যর সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের কনগ্রেসে

যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলেও তৎকালীন মুসলিম নেতারা মুসলমান জনসাধারণকে বুঝাইলেন যে, এই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান তাহাদের স্বার্থের বিরোধী। কূটনীতিক ইংরেজের অদৃশ্য হস্তের স্পর্শে ও স্বার্থবুদ্ধি মুসলিম নেতাদের চেষ্টায় রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমানরা যোগদান তো করিলই না, উপরন্তু বাধা সৃষ্টি ও হাঙ্গামা বাধাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। তবে একথা সহস্রবার অনস্বীকার্য যে, বহু শিক্ষিত ও দরদী মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনে কেবল যোগদানই করেন নাই— নেতৃত্বও করিয়াছিলেন ; এখনো সে-শ্রেণীর মুসলমানের অভাব নাই যাঁহারা নিষ্ঠাবান মুসলমান হইয়াও ভারতকে তাঁহাদের স্বদেশ বলিয়াই জানে। ধর্মে তাঁহারা পৃথক হইলেও, জাতিতে (as a nation) তাঁহারা এক— এই মত পোষণ করেন।

লীগের পক্ষ হইতে দেশের সর্বত্র বড় বড় সভায় মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থ-বজায় রাখিবার জন্য জনসভা আহূত হইল। এই সভায় মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, তাহাদের ছাত্রদের জন্য বিশেষ হোস্টেল নির্মাণ, তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যার চাকুরিরক্ষা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে প্রস্তাব পাশ হইল। সর্বত্র মুসলমান স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথকীকরণের চেষ্টা তীব্র। স্বরাজ ও স্বধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য তাহারা করিতে পারিলেন না।

এই সময়ে বাংলাদেশে বিপ্লবীদের রক্তহস্ত দেখা দিলে আগা খাঁ সাহেব মুসলমান-সমাজকে হুঁশিয়ার করিয়া বলিলেন যে, উহাতে মুসলমানের যোগদান গোনা বা পাপ। সত্যই এই উপদেশ বা আদেশ বর্ণে বর্ণে পালিত হইয়াছিল ; খুব কম মুসলমানই বিপ্লব বা সন্ত্রাসকর্মে যোগদান করে। হিন্দু যুবকদের মধ্যে বিপ্লববাদী কে বা কাহারা তাহা তো কেহ জানে না ; তাই মুসলমান যুবকরা সাধারণভাবেই হিন্দু যুবকদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিত।

মুসলিমলীগের রাজনৈতিক আদর্শতা দশ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কন্‌গ্রেসেরই অনুরূপ— পার্থক্য শুধু এইখানে যে, কন্‌গ্রেস সমস্ত দেশের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বলোকের হিতার্থে যাহা-কিছু চাহিবার চাহিত, করিবার করিত ; মুসলিম লীগের আদর্শ হইল, কেবলমাত্র মুসলিম-সমাজের স্বার্থরক্ষা ; আর প্রধান কাজ হইল, ব্রিটিশ-রাজের প্রতি মুসলমানদের ভক্তির ভাব জাগ্রত করা ও সরকারের কোনো ব্যবস্থা সম্বন্ধে লোকের মনের মধ্যে ভুল ধারণা জন্মিলে

তাহা দূর করা ; ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার রক্ষা করা এবং সংযত ভাষায় সরকার বাহাদুরের নিকট স্বজাতির অভাব-অভিযোগ নিবেদন করা ; পূর্বোক্ত শর্তগুলি রক্ষা করিয়া যতদূর সম্ভব অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত মিত্রতা রক্ষা করা ; অর্থাৎ সহজ ভাষায়, আগে তাহারা মুসলমান, পরে তাহারা ভারতবাসী— এই মতবাদই রূপ লইতেছে।

ভারতীয় মুসলমানের মুসলমান-প্রীতি কেবল ভারতের মধ্যেই সীমিত থাকিল না ; যে প্যান-ইসলামিক ভাবনা ইহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে— তাহারই প্রেরণায় বিশ্বের মুসলমান সম্বন্ধেও তাহাদের দরদ নানাভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

আমরা ইতিপূর্বে বলকান যুদ্ধের কথা আলোচনা করিয়াছি। ভারত হইতে মহম্মদ আলী, ডাঃ আনসারী প্রভৃতি মুসলিম নেতারা তুর্কীতে একটি চিকিৎসা-মিশন (রেড ক্রেসেণ্ট সোসাইটি) প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সামান্য ঘটনা হইতে বুঝা যাইতেছে, ভারতীয় মুসলমানের মন ক্রমেই কীভাবে বহির্ভারতীয় নিখিল-মুসলিম-জগতের কল্যাণ-অকল্যাণ, সুখ-দুঃখের সহিত যুক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই অতিরাষ্ট্রীয় সহানুভূতি হইতে খিলাফত-আন্দোলনের জন্ম হইয়াছিল কয়েক বৎসর পরে।

১৯০৬ সালের নভেম্বরে মোসলেম লীগ গঠিত হইল—১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে সুরত কন্‌গ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীর বিরোধ দেখা দিল। দক্ষিণপন্থী বা মডারেটগণ সাংবিধানিক আন্দোলন পথাশ্রয়ী হইয়া অর্ধমৃতভাবে কাজ করিতে লাগিলেন। বামপন্থীদের মধ্যে যাহারা অতিউগ্র তাহারা সক্রিয় রাজনীতিতে নামিলেন এবং নেতাদের গোচরেই হউক বা অগোচরেই হউক বিপ্লবীদলের এক অংশ সন্ত্রাসবাদী হইয়া উঠিল। কন্‌গ্রেসের এই অর্ধমৃত অবস্থায় মুসলিম লীগ মুসলমান-স্বার্থরক্ষার কার্যে দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছিল এবং ১৯১৩ সাল হইতে ভারতের রাজনৈতিক ব্যাপারে লীগ আরো মনোযোগী হইল। এই সময়ে লীগের সংবিধান পরিবর্তিত হয়। তাহারাও স্বায়ত্তশাসন চাহিল এবং অনেকে কন্‌গ্রেসে যোগদান করিল। ১৯১৪ সালের অগস্ট মাসে য়ুরোপের মহাযুদ্ধ দেখিতে দেখিতে এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল ; তুর্কী কীভাবে এই যুদ্ধে জড়িত হইয়া

বিপর্যস্ত হয়, তাহার কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। গান্ধীজি সবেমাত্র দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ভারতে আসিয়াছেন (১৯১৫)—তিনি হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে ব্রিটিশদের দুর্দিনে সহায়তা করিতে বলিলেন ; উভয় সম্প্রদায় হইতেই সৈন্যসংগ্রহ কার্য চলিল। যুদ্ধের সময় উভয় সম্প্রদায়ের আশা, যুদ্ধশেষে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের শাসন-সংস্কার করিবেই।

ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভার ১৯ জন সদস্য তৎকালীন বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড-এর নিকট একটি সংবিধানের খসড়া পেশ করেন ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে। ইহার দুই মাস পরে লখ্‌নৌ নগরীতে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন এবং পাশাপাশি মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। এই লখ্‌নৌ-এ কন্‌গ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা বুঝাপড়া হইয়া ভাবী সংবিধানের একটি খসড়া সর্ববাদীভাবে গৃহীত হইল—ইহা 'লখ্‌নৌ প্যাক্ট' নামে পরিচিত।

কন্‌গ্রেস ও লীগের এই মিলনকে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে গোঁড়ারা সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না ; উভয় সম্প্রদায়ের অশিক্ষিত লোকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থগুলিই বৃহদাকারে দেখা দিল ; দেশের জাতীয় সর্বাঙ্গীন কল্যাণভাবনা তখনো দেশব্যাপী হয় নাই।

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে উত্তর প্রদেশের রামপুর স্টেটের বাসিন্দা মহম্মদ্‌ আলী ও তাঁহার ভ্রাতা সৌকৎ আলী অবতীর্ণ হইয়াছেন। মহম্মদ আলী ইংরেজিতে 'কমরেড' ও উর্দুতে 'হামদাম' নামে দুইখানি পত্রিকার সম্পাদক ; এই পত্রিকাদ্বয়ে মুসলমান ধর্ম ও সমাজের বৈশিষ্ট্য, ভারতে ও অন্যত্র তাহাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্গতি বিষয়ে আলোচনা থাকিত।

১৯১৪ সালে তুর্কী জারমানদের পক্ষ লইয়া ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানরা খুবই দোটানায় পড়িয়া যায় ; মুসলমানদের স্বাভাবিক সহানুভূতি তুর্কীদের প্রতি, যেহেতু তুর্কীর সুলতান মুসলমান জগতের খলিফা— তাহারা খুদবা পড়ে এই রুমের বাদশাহের নামে। মহম্মদ আলী এই বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন যাহা সরকারের মতে রাজানুগত্য-বিরোধী। ইহার প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার পত্রিকা বন্ধ ও ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হইল। কিন্তু আলী-ভ্রাতাদের দুর্দমনীয় দেশ ও ইসলাম-প্রীতি হ্রাস পাইল

না। তাঁহাদের উগ্রতার জন্য সরকার ভারত-রক্ষা-আইনবলে তাঁহাদিগকে অন্তরীণাবদ্ধ করিলেন (মে ১৯১৫); তখন মহাসমরের প্রথম বৎসরও শেষ হয় নাই।

তুর্কীর ভবিষ্যৎ, আলী-ভ্রাতাদের অন্তরীণ, ভারতের ভাবী সংবিধান প্রভৃতি নানা প্রশ্ন লইয়া দেশব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে। ইতিমধ্যে মদ্রাজে মিসেস আনি বেসাণ্ট ও তাঁহার দুই সহকর্মী 'হোমরুল' আন্দোলনের জন্য অন্তরীণাবদ্ধ হইলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা আলী-ভ্রাতাদের ও আনি বেসাণ্টের মুক্তির জন্য জোর আন্দোলন চালাইতে আরম্ভ করিলেন— ইহাতে হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর লোকেই যোগদান করিল।

১৯১৮ সালে য়ুরোপীয় মহাসমরে তুর্কীর ভাগ্যবিপর্যয় আরম্ভ হইল। তুর্কীর ভবিষ্যৎ লইয়া দেখা গেল পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের শিরঃপীড়া সর্বাপেক্ষা উৎকট। সাধারণ হিন্দুরা মুসলমানদের এই অতিরাষ্ট্রিক দুর্ভাবনার হেতুকে শ্রদ্ধার বা সহানুভূতির সঙ্গে দেখিতে পারিল না। যাঁহারা এই বহির্মুখিনতা সমর্থন করিতে পারিলেন না, তাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা হারাইলেন।

রাজনীতিতে যোগদান করে মুষ্টিমেয় লোক; অগণিত মূঢ় জনতা থাকে আপনার আপনার সংকীর্ণ সমাজ ও ধর্মবিশ্বাসের ক্ষুদ্রগণ্ডির মধ্যে; সেখানে বৃহত্তর 'নেশন' বা জাতীয়তাবোধ নাই, মাতৃভূমি বা দেশ নাই— আছে শুধু গ্রাম্য দলাদলি 'জাতে জাতে' বিরোধ ও ধর্মীয়তা লইয়া বিবাদ। অথবা বলা যাইতে পারে উপরিস্তরের শিক্ষিতেরা ভদ্রবেশে ধর্মের নামে যে বিষোদ্গার করিয়া ফেরেন, তাহারই তলানি সমাজের নিম্নস্তরে পৌঁছাইয়া গেলে সেখানে দেখা দেয় নারকীয় সাম্প্রদায়িকতা। ভদ্রবেশধারীরা সদর রাস্তার উপর নিজেরা যাহা করিতে লজ্জা পান, নিম্নস্তরের লোকে তাহাই উন্মত্তভাবে চালনা করে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইতেই হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুত্ব ও মুসলমানদের মধ্যে মুসলমানত্ব বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত হয়। অথবা বলা যাইতে পারে, নিরক্ষর ধর্মকর্মহীন নামেমাত্র মুসলমানরা আচারী মুসলমান হইয়া উঠিতে গিয়া স্বভাবতই সাম্প্রদায়িক হইয়া উঠিল। মূঢ়ভাবে অন-ইসলামিক প্রথা ও আচারকে মানার নাম উদারতা নহে— উহা জড়তা মাত্র। সেই মানসিক জড়তা ত্যাগ করিয়া তাহারা যখন ইসলামের আচার-ব্যবহার

নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন হিন্দুদের মনে হইল যে, মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক হইয়া উঠিতেছে। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ স্থাপিত হইবার পর গো-কোরবানি মুসলমান-সমাজের পক্ষে ধর্মের বিশেষ অঙ্গ হইয়া উঠিল। ইহারই ফলে গো-বধ লইয়া হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা শুরু হয়। ধর্মের নামে গো-রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুরাই সর্বপ্রথম আন্দোলন আরম্ভ করে উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে— মহারাষ্ট্রী হিন্দুরাই ছিল এই আন্দোলনের প্রবর্তক ও প্ররোচক। প্রায় বিশ বৎসর পরে এই গো-কোরবানী হইল মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় ধর্ম। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে বিহারের স্থানে স্থানে বকর ঈদের দিন সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর চড়াও করিয়া কোরবানী বন্ধ করিতে যায়। দাঙ্গা এমনি ভীষণাকার ধারণ করে যে অবশেষে মিলিটারি পুলিস আসিয়া উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তিস্থাপন বা শৃঙ্খলা আনয়ন করে। আরা জেলায় ত্রিশখানি গ্রামে লুটতরাজ হয়। পাঁচহাজার হিন্দু পাটনা জেলার কয়েকটি স্থান লুণ্ঠন করে। কোনো কোনো স্থানে ছয় দিন পর্যন্ত লুণ্ঠন চলিয়াছিল। এই ঘটনায় সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য বাড়িয়া গেল। মুসলমান নেতারা ১৯১৬ সালের 'লখ্‌নৌ প্যাকটের' উল্লেখ করিয়া বলিলেন, আইন সভায় ও শাসনবিষয়ে হিন্দুদের প্রতিপত্তি বাড়িলে তাহাদের কিরূপ দশা হইবে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল বিহারে। শিক্ষিত হিন্দুরা দাঙ্গাকারীদের নিন্দা করিলেন ও উপদ্রুত মুসলমানদের দুঃখ নিবারণের জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিলেন। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভেদের চিড়্ যাহা এতদিন স্পষ্টত লোকচক্ষুগোচর হয় নাই, তাহা এখন স্পষ্টভাবে ফাটলরূপেই দেখা দিতেছে। বিহারে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা যখন চলিতেছে সেই সময় ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ভারত সফরে আসিয়াছেন (১৯১৭); ভারতের নূতন সংবিধান রচনার পূর্বে লোকমত সংগ্রহ ও দেশের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য তাঁহার এই আকস্মিক আগমন। বিহারের দাঙ্গা শুরু হয় ঠিক সময় বুঝিয়াই মনে হয়। এই ঘটনার পর রবীন্দ্রনাথ 'ছোটো ও বড়ো' শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধে এই হিন্দু-মুসলমান ও তৎকালীন বহু রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। (দ্রঃ কালান্তর)। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন "বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা যায় এবং সেইটে জোর করিয়া যদি অন্য

ধর্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনোকালেই মিটিতে পারে না। নিজ ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না।"

আশ্চর্যের বিষয়, তিন শত চৌষট্টি দিন বাজারে মাংস সরবরাহের জন্য বহুশত গো-বধ হইতেছে— বিদেশী জাহাজে শুকনো মাংস যোগান দিবার জন্য গো-হত্যা, সৈন্য বিভাগের গোরাপল্টন ও মুসলমান সিপাহীর জন্য সহস্র সহস্র গো-বধ নিত্যকার ঘটনা; এ-সব কথা হিন্দুরা সবই জানে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, হিন্দুরাই গরু বিক্রয় করে মুসলমান কসাই-এর কাছে নাক-ঘুরাইয়া মুচিদের মারফৎ— আর হঠাৎ একদিন ধর্মের নামে তাহাদের রোখ চাপে গো-কোরবানী বন্ধ করিবার জন্য। আবার মুসলিম লীগের শাসনকালে মুসলমানের পক্ষেও সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে প্রকাশ্যে গরু জবাই করাটাও 'ধর্ম' বলিয়া বিবেচিত হইত অথচ মক্কায় হজের সময় কোরবানীর জন্য গরু পাওয়া যায় না; দুম্বা বা উট জবাহ্ হয়। মোট কথা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই ধর্মের বড়াই হইল ধার্মিকতার ও জাতীয়তার লক্ষণ বা দুর্লক্ষণ।

মুসলমানেরা এই-সব অজুহাত পাইয়া বলিল, কন্‌গ্রেস লীগের মিলন তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী। ১৯১৭ সালের মুসলিম লীগের বাৎসরিক সম্মেলনে তাহারা প্রস্তাব করিল যে, আগামী সংবিধানে তাহাদের প্রতিনিধি সংখ্যা পূর্বের দাবি হইতে আরও শতকরা পঞ্চাশ হারে বাড়াইতে হইবে। ১৯১৬ সালের 'লখ্‌নৌ প্যাকট' সম্পাদনের এক বৎসরের মধ্যেই প্যাকট খানচাল হইবার উপক্রম হইল; তবুও ভ্রাতৃত্বের কাঠামোটা বজায় থাকিল— কলিকাতার কন্‌গ্রেস মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইল; আনি বেসান্ট প্রেসিডেণ্ট —তাহার পাশেই বোরখা-আবৃত আলী-ভ্রাতাদের জননী বসিলেন। আলী-ভ্রাতারা কোনো প্রকার মুচলেকা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মুক্তি লাভ করেন নাই— তাঁহাদের বৃদ্ধা জননীই পুত্রদের প্রতিনিধিরূপে সেদিন কন্‌গ্রেসে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর য়ুরোপের মহাযুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হইল। জারমানদের পরাজয়ের সহিত তুর্কীরও পরাজয় হইল। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে

আলোচনা করিয়াছি— ভারতীয় মুসলমানরা বরাবর প্রার্থনা জানাইয়া আসিতেছিল যে, তাঁহাদের ধর্মগুরু খলিফাকে যেন অপদস্থ করা না হয়; সেইরূপ প্রতিশ্রুতিও তাহারা পায়— কিন্তু তুর্কীর সহিত নিষ্পন্ন সন্ধিপত্র প্রকাশিত হইতে দীর্ঘ সময় লাগিয়া গেল, এবং সেই সময়ে য়ুরোপীয় পত্রিকা-ওয়ালারা তুর্কীর ভবিষ্যত সম্বন্ধে মিত্রশক্তির কী করা উচিত বা না-উচিত সে-বিষয়ে বিচিত্র মত ব্যক্ত করিয়া ভারতীয় মুসলমানদিগকে আরও বিভ্রান্ত করিয়া রাখিল।

১৯২০-এর প্রথম দিকে কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডের সহিত তুর্কীর ভাগ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য দরবার করিলেন। বড়লাট বলিলেন যে, তুর্কীসমস্যা ব্রিটিশ সরকারের একার প্রশ্ন নহে, উহা মিত্রশক্তির রাজনীতিকদের বিচার্য বিষয়। অল্পকাল পরে মহম্মদ আলী প্রমুখ কয়েকজন খিলাফতী নেতা ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎভাবে আলোচনার জন্য তথায় উপস্থিত হইলে তিনিও সরাসরি বলিয়া দিলেন তুর্কীর সুলতানকে তুরস্ক রাজ্য ছাড়া আর কোথাও রাজ্য দেওয়া যাইতে পারে না, অর্থাৎ আরবজাতির উপর তাহাদের প্রভুত্ব থাকিবে না— তুর্কীসাম্রাজ্য থাকিবে না— তুর্কীসাম্রাজ্য লোপ পাইবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, সন্ধির শর্তানুসারে অন্যান্য পরাজিত জাতির প্রতি যে ব্যবহার করা হইবে, তুর্কীর প্রতিও অনুরূপ ব্যবহার হইবে। ডেপুটেশন ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ভারতে ফিরিয়া আসিলেন।

মৌলনা সৌকৎ আলী এক ফতোয়া প্রচার করিলেন যে, আগত সন্ধিশর্তে মুসলমানের দাবি— অর্থাৎ খিলাফতের সম্মানরক্ষা যদি করা না হয় তবে ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজের সহিত সহযোগিতা করা কঠিন হইবে। মুসলমান প্রচারকেরা ধর্মের নামে চারিদিকে খিলাফতের কথা প্রচার করিতে গিয়া অনেকখানি বিদ্বেষবিষও উদ্‌গীরণ করেন। খিলাফৎ ধর্মের কথা— সুতরাং সাধারণ মুসলমানের নিকট ইহার আবেদন সহজেই পৌঁছিল। 'ধর্ম-বিপন্ন' শ্লোগান বা আওয়াজ সকল দেশেরই মূঢ় জনতাকে উৎক্ষিপ্ত করে এবং চতুর রাজনীতিকরা যুগে যুগে ইহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। মধ্যযুগে ক্রুজেড তাহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

তুর্কীর সহিত সম্পাদিত সন্ধি (Treaty of Serves) ১৯২০ সালে ১৪ই মে প্রকাশিত হইলে ভারতীয় মুসলমানরা দেখিল, হৃতরাজ্য তুর্কসুলতান

মিত্রশক্তির নজরবন্দীরূপে কনস্টান্টিনোপলে থাকিলেন। চারিশত বৎসরের উপর যে আরবরা তুর্কীর অধীন ছিল, তাহাদের দেশগুলি আংশিকভাবে কিছুটা স্বাধীনতা লাভ করিল বটে তবে ইংরেজ ও ফরাসীদের প্রায় আশ্রিত রাজ্যরূপে তাহাদের রাজ্যগুলি গঠিত হইল। তুর্কীর থাকিল য়ুরোপের সামান্য একটু অংশ এবং এশিয়া মাইনর— তাহাদের আদি বাসস্থান। সন্ধি-শর্তানুসারে তুর্কীদের সৈন্যবল হ্রাস করিতে হইল। রাজ্যের সীমা সঙ্কীর্ণ হইল; বহির্জাতিসমূহের সহিত অবাধ-সম্বন্ধস্থাপন বিষয়ে স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হইল। এই শর্ত প্রকাশিত হইলে ভারতে মুসলমানরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করিল।

খিলাফতের প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া ধর্মোন্মত্ততা মুসলমানদের কীভাবে বিহ্বল করিয়াছিল, তাহার একটি উদাহরণ হইতেছে 'মুহাজরিন'। সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একদল ভক্ত মুসলমানদের মনে হইল ইংরেজ রাজ্যে বাস করা ভক্ত মুসলমানদের পক্ষে পাপ— ইহা 'দরউল হারব'; তাহারা স্থির করিল পার্শ্বস্থ মুসলমান রাজ্য—দরউল ইসলাম— আফগানিস্তানে গিয়া বাস করিবে। জমিজমা, ঘরবাড়ি, পশুপাল জলের দরে বিক্রয় করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া মূঢ় ভক্তের দল আফগানিস্তানে যাত্রা করিল। জনস্রোত দেখিয়া কাবুল সরকার ভীত হইয়া পড়িলেন— তাহাদের দেশে প্রচুর খাদ্য নাই, ভূমি নাই— এই ধর্মোন্মত্ত জনতাকে কোথায় তাহারা স্থান দিবে— কীভাবে তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিবে! কাবুল সরকার মুসলমান মুহাজরিনদের দেশে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। ভক্তদের স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল— মুসলমান হইলেই মুসলনানকে আশ্রয় দেয় না। অতঃপর কপর্দকহীন অবস্থায় তাহারা ভারতে ফিরিল; পেশাবার হইতে কাবুল পর্যন্ত সারা পথ এই সরল বিশ্বাসীদের শত শত কবর বহুকাল দেখা গিয়াছিল। ব্যর্থ হইল মুহাজরিন এবং যে শয়তানী সরকারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহারা দেশত্যাগী হইয়াছিল, সেই সরকার-ই তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

পাঠকের স্মরণ আছে, ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে রৌলট বিল পাশ হয়; তখন গান্ধীজি ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন— যাহার পরিণাম হয় জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ড। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় গান্ধীজি দেশব্যাপী

আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে খিলাফত-আন্দোলন দেখা দিলে তিনি মুসলমানদের এই দাবিকে ন্যায্য জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান দিবার আহ্বান জানাইলেন। তুর্কীর সহিত সন্ধিশর্ত প্রকাশিত হইবার পক্ষকাল মধ্যে বোম্বাই নগরীতে যে খিলাফত সম্মেলন আহূত হয় (২৮ মে ১৯২০) গান্ধীজি সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তিনি কন্‌গ্রেস ও লীগের যৌথ দাবি লইয়া আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন।[১] মহম্মদ আলী গান্ধীজির মধ্যে দেখিলেন, 'a visionary who is at the same time a thoroughly practical person'। ১৯২০ সালের কলিকাতায় কন্‌গ্রেস কমিটিতে অসহযোগনীতি গৃহীত হইল—নাগপুরের সাধারণ সভায় এই প্রস্তাব পুনরালোচিত হইয়া হিন্দুদের সমর্থন পাইয়া খিলাফত-আন্দোলন প্রচণ্ড শক্তিশালী হইয়া উঠিল। এতদিন গান্ধীজি কেবলমাত্র হিন্দুদের ভরসায় অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিতে বোধ হয় ভরসা পান নাই; মুসলমানদের সহায়তা লাভ করিয়া কন্‌গ্রেস অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করিল।

গান্ধীজির আধ্যাত্মিক, নিরুপদ্রব, অহিংসক অসহযোগনীতি ও মুসলমানদের উগ্র ধর্মচেতনা দেশের মধ্যে বিচিত্র আবেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিল। মুসলমানদের সকল শ্রেণী গান্ধীজির আধ্যাত্মিক নিরুপদ্রবতা ও অহিংসা মন্ত্রে শ্রদ্ধাবান ছিল না। তৎসত্ত্বেও খিলাফতের সুবিধার জন্য তাহারা

১ ডাঃ আম্বেদকর লিখিতেছেন,—

In taking up the cause of Khilafat Mr. Gandhi acheived a double purpose. He carried the Congress plan of working over the Muslims to its culmination. Secondly he made the Congress a power in the country, which it would not have been, if the Muslims had not joined it. The cause of the Khilafat to the Musalmans for more than political safeguards, with the results that the Musalmans who were outside it trooped in the Congress. The Hindus welcomed them. For, they saw in this a common front against the British, which was their main aim. The credit for this must of course go to Mr. Gandhi. For there can be no doubt that this was an act of daring."......Pakistan or the Partition of India. 1945. P. 142.

'হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই' ধ্বনিতে যোগ দিল। কিন্তু যেখানে হৃদয়-পরিবর্তনের কোনো আশা নাই, সেখানে রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে মিলন বা প্যাক্ট, তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তাহার প্রমাণ হিন্দু-মুসলমান উভয়েই দিল। মদ্রাজের খিলাফত কন্‌ফারেন্সে আলী-ভ্রাতারা যে এক বক্তৃতা দান করেন, তাহাতে হিন্দুসমাজ ক্ষুব্ধ ও ব্রিটিশ সরকার চঞ্চল হইয়া উঠিল। আলীরা স্পষ্টই ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহাদের সর্বপ্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হইতেছে, ইসলাম রক্ষা বা খিলাফতের স্বার্থ দেখা; এমন-কি আফগান আমীর যদি ভারত উদ্ধার করিতে আসেন, তবে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হইবে তাহাতে যোগদান করা। বলা বাহুল্য, মুসলমান নেতাদের এই ভাষণে হিন্দুরা আদৌ প্রীত হইতে পারিল না; কিন্তু গান্ধীজি ইহার মধ্যে আছেন বলিয়া তাহারা স্পষ্টত প্রতিবাদ করিল না— পাছে হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। লোকের সন্দেহ হইল, গান্ধীজি মুসলমানদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে দলভুক্ত রাখিবার জন্য তাহাদের সকল প্রকার জেদ ও চাহিদা পূরণ ও তাহাদের অদ্ভুত উক্তিরও প্রতিবাদ করিতেছেন না। মহারাষ্ট্রীয়রা গান্ধীজির এই আধ্যাত্মিক অসহযোগনীতি মোটেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিল না।

আলী-ভ্রাতাদের মদ্রাজ বক্তৃতায় গবর্মেণ্ট অত্যন্ত বিরক্ত হন; অনেকেরই সন্দেহ হইল, গবর্মেণ্ট তাঁহাদের কোনো প্রকার শাস্তিবিধান করিবেন। এই বিপদ কাটাইবার জন্য গান্ধীজিকে বাধ্য হইয়া বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইল। এই সাক্ষাতের ফলে আলী-ভ্রাতারা প্রকাশ্যে প্রচার করিলেন যে, তাঁহাদের উক্তির জন্য হিন্দুবন্ধুরা ব্যথিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা দুঃখিত। এই ঘটনায় হিন্দু অসহযোগীরা গান্ধীজি ও আলী-ভ্রাতাদের উপর আস্থা অনেকখানি হারাইল। ইহার প্রতিক্রিয়ায় অল্পকালের মধ্যে হিন্দুমহাসভার জন্ম হইল এবং তাহারা গান্ধীজি ও মুসলমানের উপর যুগপৎ বিরুদ্ধতা ও ক্রমে বিদ্বেষ প্রচার আরম্ভ করিল।

খিলাফত কমিটির সেবক বা ভলাণ্টিয়ারগণ কন্‌গ্রেস অনুমোদিত গ্রামের কাজ প্রভৃতি জনহিতকর কর্মে অবতীর্ণ না হইয়া কেবলমাত্র খিলাফত সংক্রান্ত কার্যে লিপ্ত থাকিল— দেশের সমগ্র কল্যাণের দিকে তাহাদের দৃষ্টি গেল

না। মুসলমান বালক ও যুবকদেরই লইয়া কুচকাওয়াজ ক্রীড়াদি করিতে তাহারা ব্যস্ত, যথার্থ জনসেবার ব্যাপারে তাহারা উদাসীন।

গান্ধীজির শান্ত কর্মপদ্ধতির উপর নির্ভর-অসহিষ্ণু আলী-ভ্রাতারা করাচীর খিলাফৎ কনফারেন্সে পুনরায় বলিলেন যে, আগত ১৯২১ সালের কন্‌গ্রেস অধিবেশনের পূর্বে কন্‌গ্রেস-লীগ যদি স্বরাজলাভের ব্যবস্থা করিতে না পারেন, তবে খিলাফত কমিটি 'ভারতীয় সাধারণতন্ত্র' ঘোষণা করিবেন। তাঁহারা আরও বলিলেন যে, ইসলামের শাস্ত্রানুসারে মুসলমানের পক্ষে মুসলমান হত্যা করা পাপ। সুতরাং কোনো ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে স্বধর্মীদের বধ করিবার জন্য সৈন্যবিভাগে যোগদান করাও পাপ। বক্তৃতাদানকালে আলী-ভ্রাতারা বোধ হয় ইসলামের অতীত ইতিহাস বিস্মৃত হইয়াছিলেন, নতুবা এইরূপ অনৈতিহাসিক উক্তি করিতেন না। ইহাদের এই বক্তৃতায় সরকারের ধৈর্য আর রহিল না; আলী-ভ্রাতাদের নামে মামলা রুজু হইল। করাচীর আদালতে মহম্মদ আলী বলিলেন, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা শাস্ত্রসম্মত আদেশ। বিচারে আলী-ভ্রাতাদের দুই বৎসর করিয়া কারাবাসের আদেশ হইল।

নিখিল মোসলেম লীগ আন্দোলন ও মৌলভীদের ধর্মপ্রচারের ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইতিপূর্বেই যথেষ্ট গোঁড়ামি ও হিন্দুদের হইতে পৃথক থাকার ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল; পৃথক নির্বাচনাদি ব্যাপারেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। সামান্য কারণে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা এখানে-সেখানে প্রায়ই দেখা দিতে লাগিল। কন্‌গ্রেস খিলাফতের প্রচারের ফলে লোকের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবার প্রবণতা সমাজদেহে ব্যাধির ন্যায় বাসা বাঁধিয়াছে। আইন-অমান্য করিবার ও taking law in one's own hands মনোভাব দেখা দিল এই আন্দোলনের সময়ে। ভারত স্বাধীনতালাভের পরেও সে এই ব্যাধিমুক্ত হয় নাই—ইহা সমাজদেহের সর্বস্তরে বিষবৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় মদ্রাজের মালাবার মুসলমানদের মধ্যে ধর্মোন্মত্ততা বীভৎসরূপে আত্মপ্রকাশ করিল।

মালাবারে (বর্তমান কেরলরাজ্য অন্তর্গত জেলা) মোপ্‌লা নামে একজাতি মুসলমান বাস করে; তাহারা স্বভাবদুর্ধর্ষ, ধর্মমূঢ় ও অত্যন্ত

অশিক্ষিত। ইংরেজ শাসনকালে তাহারা ৩৫ বার অশান্তি সৃষ্টি করে। উত্তরভারত হইতে খিলাফত ও কন্‌গ্রেস আন্দোলনের নানাপ্রকার বিকৃত ও অতিরঞ্জিত সংবাদ তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্র হইতে থাকে। 'অসহযোগ আন্দোলনের ফলে স্বরাজ আসিবে,' 'মুসলমানের ধর্ম বিপন্ন,' 'খিলাফতের সর্বনাশ' ইত্যাদি নানাকথা মোল্লাদের মুখ হইতে শুনিয়া এই উপজাতিটি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। উহারা গোপনে অস্ত্রশস্ত্র কীভাবে সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছিল। অতঃপর ১৯২০ সালের ২০ আগস্ট সেখানে প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিল। ইহারা ইংরেজের হাত হইতে স্বাধীন হইতে চায়। পথঘাট আটকাইয়া, রেলপথ উপড়াইয়া, টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া— তাহারা মালাবারকে বাহির হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। আলী মুসালী নামে একজন নেতাকে 'খিলাফত রাজা' করিয়া খিলাফতের পতাকা উড়াইয়া তাহারা 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠিত করিল। স্থানীয় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও সঙ্ঘবদ্ধ নহে, তাহারা নানা জাতি বা বর্ণে বিভক্ত। সকলেই আপন আপন চামড়া বাঁচাইবার ফিকির খুঁজিতেছে। তা ছাড়া তাহারা এই মুসলমানী অরাজকতায় যোগদান করিবার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইল না; 'খিলাফত রাজ' স্থাপিত হইলে হিন্দুদের কী লাভ বুঝিতে না পারিয়া তাহারা উদাসীন থাকিল এবং বিরুদ্ধাচরণও করিল। ইহার ফলে হিন্দুদের উপর গিয়া পড়িল ইহাদের কোপ; সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব শুরু হইল। হিন্দুদের জোর করিয়া মুসলমান করা, হিন্দু স্ত্রীলোকদের উপর পাশবিকতা, হিন্দুর গৃহাদি লুণ্ঠন প্রভৃতি হইল খিলাফতরাজের ধর্মপ্রতীক। দলে দলে হিন্দু দেশত্যাগী হইয়া অরাজকমণ্ডল ত্যাগ করিল। তাহাদের নিকট হইতে মোপ্‌লাদের বর্বর কাহিনী শুনিয়া লোকে স্তব্ধ— বিংশ শতকেও ধর্মের নামে ইহা সম্ভব! গভর্মেণ্টকে এই বিদ্রোহ দমন করিতে রীতিমতো কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলে বহু মোপ্‌লা শাস্তি পায়।

মোপ্‌লাদের পাশবিক ব্যবহারে হিন্দুসমাজ ত্রস্ত; কিন্তু মিলিতভাবে জাতি-বর্ণ-ভেদ ভাঙিয়া সংঘবদ্ধ হইতেও তাহারা অপারক। হিন্দুমহাসভা বৃথাই সে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সমাজ সংগঠন ও সুদৃঢ় না করিয়া 'শুদ্ধি' করিয়া দলভারী করিবার কথা ভাবিলেন। হিন্দুরা তো সংখ্যাগরিষ্ঠ,

সংখ্যার দৌর্বল্যে তাঁহারা হীন নহে। আসলে সমাজের মধ্যে 'হিন্দু' খুঁজিয়া পাওয়া যায় না— পাওয়া যায় কতকগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা 'জাত'; তাহাদের মধ্যে ঐক্য হইল না। হিন্দু বিপুল হইয়াও দুর্বল থাকিয়া গেল।

মুসলমান নেতারা মোপ্‌লাদের আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়া, তাহাদের 'ধর্মনিষ্ঠা'র প্রশংসা করিলেন। নির্বিচারে নরনারী হত্যা, গর্ভিনী নারীর গর্ভ ছেদন, প্রতিবেশীর গৃহে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি কার্য হইল 'ধর্মনিষ্ঠা'! এমন-কি গান্ধীজি বলিলেন, মোপ্‌লারা ঈশ্বরভক্ত!— "brave God-fearing Moplas who were fighting for what they consider as religion and in manner which they consider as religious." সর্ব অবস্থায় সর্ব ধর্ম সত্য এ কথা অত্যন্ত শিথিল মনোভাব প্রকাশক। সর্ব ধর্মের মাঝে সত্য আছে ইহা সত্য হইতে পারে— কিন্তু সকল ধর্মের মধ্যে অসত্যও কিছু কম নাই— ইহাও একটি বড়ো সত্য। শিথিল ভাবনার জন্য আমরা 'তালেগোলে' বলি 'সব সত্য'—সকল নদীই সমুদ্রে পৌছিবে। সকল তথ্য ও তত্ত্ব সত্য নহে, এবং সকল নদীই সমুদ্রে পৌছয় না।

এই ঘটনার পর হিন্দু ও মুসলমান নেতারা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গান্ধীজির ধর্মভাবপ্রণোদিত বাণী ও উপদেশ কোনো পক্ষেই বিশেষ ফলপ্রসূ হইল না। এই মহামানবের বাণী শুনিবার মতো পবিবেশ নষ্ট হইতে চলিয়াছে।

পঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায় খিলাফত-আন্দোলন সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"রাজনীতিক ভিত্তির উপর ভারতের খিলাফত-আন্দোলনটিকে দাঁড করানো হয় নাই, দাঁড় করানো হইয়াছিল ধর্মের ভিত্তির উপর। ইহা দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়াছে। রাজনীতির দিক হইতে ইহাকে সমর্থন করিবার যুক্তির অভাব ছিল না। যে-আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক, মহাত্মা গান্ধীর মতো ব্যক্তিও যে সেই আন্দোলনের ভিতর ধর্মকে টানিয়া আনিলেন ইহা আরো দুঃখের বিষয়। অসহযোগ কর্মতালিকায় আর আর কতকগুলি বিষয়কে ধর্মের ছাপ দিবার যে চেষ্টা, তাহাও ভয়ঙ্কর ভুল। ইহার প্রত্যক্ষ ফল হইয়াছে এই যে, ইহাতে ভারতের এক হইবার পথেই অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে, সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের

মিলনের উদ্দেশ্য লইয়া যে-অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার ফলে দেশব্যাপী অনৈক্যেরই আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়াছে।"[১] লালা লাজপত রায়ের উক্তি ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় হইল।

ভারতে যখন মুসলমান হিন্দুতে যৌথভাবে আন্দোলন করিয়া তুর্কীর সুলতানের গৌরব ও খলিফত্ব পদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যগ্র— সেই সময়েই তুর্কীতেই সুল্তান ও খলিফাবিরোধী মনোভাব প্রকট হইয়া উঠিল। সেভরেসের সন্ধিপত্র (১০ অগস্ট ১৯২০) সহি হইবার দুই বৎসরের মধ্যে তুর্কীর রূপান্তর হইল। গ্রীকদের সহিত যুদ্ধে সেনাপতি কামাল পাশা জয়ী হইলেন। ১৯২২ সালের নভেম্বরে সুলতানের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল, সুলতান ৬ষ্ঠ মহম্মদ কনস্টান্টিনোপল হইতে পলায়ন করিয়া ব্রিটিশ রণপোতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তাঁহার আত্মীয় আবদুল মজীদ 'খলিফা' ঘোষিত হইলেন। লোজানের সন্ধি-শর্তানুসারে (২৪ জুলাই ১৯২৩) গ্রীক ও তুর্কী জনতার স্থান বিনিময় হইল, গ্রীস পুরাপুরি গ্রীকরাজ্য ও তুর্কী পুরাপুরি তুর্কীরাজ্য হইল। মিত্রশক্তি কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ করিলে তুর্করা সেখানে পুনঃপ্রবেশ করিল, কিন্তু তাহারা রাজধানী স্থানান্তরিত করিল এশিয়া-মাইনরের আংকারায় (১৪ অক্টোবর ১৯২৩)। ইহার কয়েকদিন পরে তুর্কীরাজ্য রিপাবলিক ঘোষিত হইল (২৯শে) ও মুস্তাফ কামাল আতাতুক রিপাবলিকের প্রথম সভাপতি হইলেন। অতঃপর ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ খলিফার পদ উঠাইয়া দিয়া তুর্কী সেক্যুলার স্টেট হইয়া গেল।

তুর্কীর ইতিহাসে এই দ্রুত পটপরিবর্তনে ভারতের খিলাফত-আন্দোলনের অনেকখানি উৎসাহ হ্রাস পাইয়া আসিল; যে তুর্কী-খলিফত্বের জন্য তাহারা প্রাণপাত করিতেছিল, তাহারাই আজ খলিফাকে দেশ হইতে দূরিত ও তাহার পদ অপসারিত করিল। তুর্কী আজ মনেপ্রাণে 'ন্যাশনাল'—প্যান-ইসলাম বা নিখিল ইসলামিকতায় তাহার আকর্ষণ নাই— সে জানে সে 'তুর্ক'। ভারতীয় মুসলমানের ভাবনা ইহার বিপরীত। তাহারা প্রতিবেশীর সহিত সহজভাবে সরল অন্তঃকরণে বাস করিতে চাহে না, তাহাদের দৃষ্টি ভারতের বাহিরে নিবদ্ধ।

১ সমসাময়িক 'স্বরাজ' ১৩৩১, ১৫ অগ্রহায়ণ সংখ্যা।

এইবার মুসলিম আন্দোলন সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য, তবে একশ্রেণীর মুসলমান কেবলমাত্র মুসলমানদের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য উৎসুক— সর্বভারতীয় ভাবনা তাহাদের নহে। খিলাফত ও কন্‌গ্রেসের যৌথ প্রচেষ্টার অবসানে দেশমধ্যে দেখা দিল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। ১৯২৩ সালে কয়েকটি ভীষণ দাঙ্গা এখানে-সেখানে ঘটিয়া গেল; দিল্লীতে দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করে।— অগ্নিকাণ্ডে বহু সহস্র টাকার সম্পত্তি ও সম্পদ নষ্ট হয়, এমন কি নৃশংস হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হয়। তুর্কীতে খলিফাপদ রদের তিন মাসের মধ্যে ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোহাট শহরে হিন্দু-মুসলমানের যে দাঙ্গা হইল, তাহার তুলনা এখনো পর্যন্ত উত্তরভারতে পাওয়া যায় নাই। হিন্দুরা এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়— মালাবারের উলটা। কোহাটের হিন্দুরা ব্যবসায়ী, বহুযুগের স্থায়ী বাসিন্দা হইলেও তথাকার ধন-সম্পত্তির প্রধান মালিক হিন্দুরা— যেমন পূর্ববঙ্গে। দাঙ্গায় হিন্দুদের কত লক্ষ টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হইল বলা যায় না। কোহাটের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাচীরের কয়েকটি স্থান ভেদ করিয়া পার্বত্য মুসলমানরা বন্যার ন্যায় নগরে প্রবেশ করিয়া হিন্দুদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিল। কোহাটে ব্রিটিশ সৈন্য যথেষ্ট ছিল— অথচ উৎপীড়নকারীরা কোনো বাধা বা উৎপীড়িতরা কোনো সহায়তা পাইল না। এই ঘটনার পর সরকার হইতে তদন্ত কমিটি বসে; উহার প্রতিবেদন পাঠে হিন্দুরা আদৌ সুখী হইতে পারিল না, নিকটে সৈন্যবাহিনী থাকা সত্ত্বেও দাঙ্গা বন্ধ করিবার জন্য কোনো প্রকার চেষ্টা কেন করা হয় নাই, তাহার কোনো কারণ প্রতিবেদনে আলোচিত হয় নাই। (১৯৪৬ সালের কলিকাতার দাঙ্গার সময় ফোর্ট হইতে সৈন্য আসে নাই।)

গান্ধীজি এই ঘটনার পর ২১ দিন অনশনব্রত গ্রহণ করেন এবং দিল্লীতে মহম্মদ আলীর গৃহে বাস করিয়া উপবাস পর্ব পালন করেন। ইতিপূর্বে আমেথি, সম্ভল ও দক্ষিণে নিজাম রাজ্যে গুলবার্গায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। গান্ধীজি অনশন-প্রাক্কালে যে বিবৃতি দেন তাহাতে বলেন, “I am striving to become the best cement between the two communities.” গান্ধীজি ভাবিতেছেন তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতু স্বরূপ হইবেন; কিন্তু ১৯২৩ হইতে ১৯৪৭-এর ঘটনারাজির দ্বারা তাহা কি সমর্থিত হয়? কোথাও

কি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাকারীরা তাঁহার বিরাট হৃদয়ের স্পর্শে শান্ত হইয়াছিল ? এ প্রশ্নের ও সমস্যার উত্তর পাওয়া যায় না। যাহা হউক, গান্ধীজির উপবাসের সংবাদে চারিদিকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপনের জন্য কনফারেন্স বা সভা আহূত হইল। কিন্তু তাহা শ্মশান-নৈরাশ্যের ন্যায় কুহক সৃষ্টিমাত্র। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের যে ধর্মান্ধতাকে রাজনৈতিক সুবিধা-লাভের আশায় উত্তেজিত করা হইয়াছিল, আজ তাহাকে আর শাসনে রাখা যাইতেছে না। কারণ মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের নূতন সংবিধান অচিরে কার্যকরী হইবে ; এখন উভয় পক্ষই ভারতের রাজ্য-শাসন-বিষয়ে প্রভুত্ব পাইবার জন্য সকলেই বদ্ধপরিকর, সকলেই উত্তেজিত। কন্‌গ্রেস সকল সম্প্রদায়, সকল জাতির প্রতিনিধিরূপে কার্য করিতে চায়— কিন্তু মুসলমানরা মনে করে তাহাদের ভরসা মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠান। হিন্দুও এখন কন্‌গ্রেসের উপর আস্থা হারাইতেছে— কন্‌গ্রেসের মুসলিম-তোষননীতি তাহারা আর বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। লালা হরদয়াল যিনি এক কালে উৎকট বিপ্লবী ছিলেন, আজ তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরূপ, তিনি ১৯২৫ সালে ঘোষণা করিলেন হিন্দুস্থানের হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন হিন্দুসংগঠন ; মুসলমানদের 'শুদ্ধি'-দ্বারা হিন্দুকরণ ও আফগানিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ 'শুদ্ধি' করিয়া অধিকার করা। "If Hindus want to protect themselves they must conquer Afganistan and the frontiers and convert all the mountain-tribes." হরদয়ালের এই প্রলাপ উক্তি হিন্দুদেরই আশান্বিত করে নাই— কারণ হিন্দু জানে তাহারা এক-জাত বা নেশন নহে,— তাহারা দ্বিসহস্রাধিক জাতি, উপজাতি, বর্ণ ও উপবর্ণে বিভক্ত— তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন নাই, পরস্পরের মধ্যে আহার-পান নিষিদ্ধ, তাহারা অত্যন্ত শিথিলভাবে বিজড়িত অসংখ্য জাতের পুঞ্জমাত্র, নেশন নহে। অবশেষে দেখা গেল, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা মদনমোহন মালবীয় হিন্দু সংগঠনের নেতৃত্বভাব গ্রহণ করিলেন। আর্য-সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মালকানা রাজপুত মুসলমানদিগকে 'শুদ্ধি' দ্বারা আর্য করিয়া লইলেন, দিল্লীর উপকণ্ঠস্থিত 'মেচ' নামে ধর্মহীন উপজাতিকে আপনাদের সমাজভুক্ত করিলেন। বলা বাহুল্য ইহা সংগঠন নহে, সংখ্যাবর্ধন মাত্র— হিন্দুরা তো সংখ্যায় মুসলমানদের চারি গুণ ;

তাহাতে কি আসিয়া যায়? সংখ্যার দ্বারা শক্তির মাপ হয় না— শক্তির পরখ হয় সংহতিতে। হিন্দুর সেই সংহতি ছিল না, এবং আজও কি হইয়াছে? শুদ্ধির ব্যাপারে মুসলমান-সমাজ হিন্দুদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত, মুসলমানের পক্ষে হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিবার অধিকার যেন স্বয়ংসিদ্ধ ঘটনা; বহু সহস্র বৎসর বিনা বাধায়, বিনা প্রতিবাদে সে প্রচার কার্য করিয়া আসিয়াছে; হিন্দুকে ধর্মান্তরে গ্রহণ করিবার ব্যাপারে তাহারা সাত শত বৎসর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, আজ অন্য কোনো ভাগীদারের প্রবেশ তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। শিখদের প্রতি মুঘলদের যে এত আক্রোশ তাহার মূলে ছিল এই নূতন সম্প্রদায়ের প্রচারধর্মীয়তা। আজ হিন্দু যেমন খ্রীষ্টান, মুসলমান, অর্ধ-মুসলমানকে 'শুদ্ধি' দ্বারা স্বধর্মে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইল, তখন মুসলমানদের মনে হইল, তাহাদের চিরন্তন অধিকারে হিন্দুরা হস্তক্ষেপ করিতেছে। এ অবস্থায় হিন্দুদের সহিত মিতালি কেমন করিয়া রক্ষা করা যায়!

ভারতের মুক্তি আন্দোলনের নেতাদের সম্মুখে আজ সমস্যা কেবল ব্রিটিশ সরকারের সহিত সংগ্রাম-পরায়ণতা নহে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ভেদ ও অপ্রীতির মীমাংসাসাধন হইল গুরুতর সমস্যা। বাংলাদেশের স্বরাজ্য দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলার মুসলমানদের সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবার জন্য তাহাদের অনেক দাবি মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু প্যাক্টের দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না। তাহা পরবর্তী ইতিহাস স্পষ্টত দেখাইয়াছে। হিন্দুরা এই প্যাক্টে খুশি হইল না — তাহাদের অনেক-কিছু ছাড়িতে হইল বলিয়া। মুসলমানরাও খুশি হইল না, তাহারা আরও বেশি পাইল না বলিয়া। মুসলমানদের মন পাওয়া গেল না, তাহাদের চাহিদা বাড়িয়াই চলিল। অল্প কালের মধ্যে রাজনৈতিক মিতালি রক্ষার জন্য মুসলমানদের চাহিদা রাজনৈতিক জুলুমে পরিণত হইল। সাদা চেকে সহি দিবার প্রস্তাবেও তাহাদের ফিরানো যায় নাই। তাহারা শরীকি কারবারে হিন্দুদের সহিত মিলিতে চাহে না। অমুসলমানদের মধ্যে কন্‌গ্রেসী অপরিবর্তন-বাদী খদ্দরীদল, স্বরাজ্য দল, হিন্দুমহাসভার দল, বিপ্লবী দল, আর্যসমাজী দল এবং শিখদের মধ্যে অকালী ও মোহান্তদের দল; এ ছাড়া অনুন্নত সম্প্রদায় রাজনীতির মধ্যে নবতম সমস্যারূপে দেখা দিল—'হরিজন' নাম তখনো চালু

হয় নাই। এখানে সেখানে 'কম্যুনিষ্ট' নামে নূতন দলের ক্ষীণ শব্দও শোনা যাইতেছে। তবে সে প্রতিষ্ঠান নিছক হিন্দু দিয়া গড়া নয়, মুসলমান নামকরা লোকও ইহার মধ্যে ছিলেন।

নূতন শাসনতন্ত্রের উপর প্রভুত্ব কে করিবে তাহা লইয়া সকলেই কলরবে মত্ত। এই অবস্থায় বাংলার মধ্যে আবার বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা উগ্রভাবে প্রকাশ পাইলে ১৯২৪ সালের অর্ডিনান্সের সাহায্যে তথাকার বহু শত যুবককে গবর্মেণ্ট অকস্মাৎ আটক করিলেন। মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে দাবি-দাওয়া বিষয়ে ও আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট মিল ছিল; এতদ্‌ব্যতীত সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য করিয়া যাইবার শক্তিও তাহাদের যথেষ্ট। সর্বক্ষেত্রে তাহারা যে হিন্দু হইতে পৃথক একক (unit) সেই মতবাদ দৃঢভাবে প্রচার করিতে তাহারা দ্বিধাবোধ করিত না। হিন্দুই আপনাকে 'হিন্দু' বলিতে সঙ্কোচ বোধ করে, ধর্মবিষয়ে সে যে-উদারতার ভান করে, তাহা তাহার ধর্ম-সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের নামান্তর মাত্র; আবার যাহারা আপনাদিগকে ধার্মিক বলিয়া মনে করে তাহারা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ছাড়া কিছুই নহে। এই দুই চরম সীমান্তে হিন্দু দোলায়িত—সে হয় উদাসীন, না-হয় সাম্প্রদায়িক। উভয় ধর্মের অতি নিষ্ঠাবান, অতি উৎসাহী ব্যক্তিদের প্রচারের ফলে ভারতময় হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ তীব্র হইতে তীব্রতর, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘন ঘন ও নৃশংসতর হইয়া উঠিতেছে।

১৯২৬ সালের মার্চ মাসে কলিকাতায় দাঙ্গা বাধিল; ব্যাপারটা ঘটে আর্যসমাজের মিছিল ও মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজানো লইয়া। কিছুকাল হইতে সদর রাস্তার ধারে অবস্থিত মসজিদের সম্মুখে শোভাযাত্রাকালে কোনো-প্রকার গীতবাদ্য করা হিন্দুদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। নিষিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই হিন্দুদের পক্ষে সেটা বেশি করিয়া করারও প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই সময়ে আর্যসমাজীরা উত্তর ভারতে 'শুদ্ধি' আন্দোলন ও aggressive বা মারমুখী ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত। কলিকাতায় অবাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা এই মনোভাব হইতে উদ্ভূত হয়। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া প্রত্যক্ষ-দর্শী রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "ঈশ্বরদ্রোহী পাশবিকতাকে ধর্মের নামাবলী পরালে যে কী বীভৎস হয়ে ওঠে তা চোখ খুলে একটু দেখলেই বেশ দেখা যায়। আজ মিথ্যে ধর্মকে পুড়িয়ে ফেলে ভারত যদি খাঁটি ধর্ম খাঁটি নাস্তিকতা

পায়, তবে ভারত সত্যই নবজীবন লাভ করবে।" ইহা কবির স্বপ্ন। বাস্তববাদীরা নিজ নিজ ধর্মের পবিত্র ভাষায় ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পরস্পরকে নিধনে রত। এবারকার দাঙ্গার বৈশিষ্ট্য হইল মসজিদ ও মন্দির আক্রমণ ও কলুষকরণ— ধর্মীয়তার চরম রূপ!

এই বৎসরের শেষে (১৯২৬) গৌহাটিতে কন্‌গ্রেস, হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রশ্নতে আজ সমস্ত রাজনীতিক আন্দোলন আচ্ছন্ন। দেশকে সক্রিয় বিপ্লবকর্মে কেহ পথ দেখাইতেছে না—যাহারা সে চেষ্টা করিয়াছিল তাহারা অন্তরীণাবদ্ধ। গৌহাটিতে যখন কন্‌গ্রেস চলিতেছে, তখন দিল্লীতে আর্য-সমাজের নেতা, গুরুকুল আশ্রম স্থাপয়িতা, শুদ্ধি-আন্দোলন প্রবর্তক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এক মুসলমান যুবকের গুলিতে নিহত হইলেন। যে দিল্লীতে পাঁচ বৎসর পূর্বে (১৯২১) হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রহসন জুমা মসজিদের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যেখান হইতে স্বামীজি হিন্দু-মুসলমানকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়াইবার জন্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন,—আজ সেই দিল্লীতে এক তরুণ মুসলমানের গুলিতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। ইহা হইল ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি চর্চার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। এই ধর্মমোহাচ্ছন্ন রাজনীতি-আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় গান্ধীজিকেও প্রাণ দিতে হয়। ১৯২৬-২৭ সালে ভারতে ৪০টি স্থানে দাঙ্গা হইয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশে ১৯২৯ ফেব্রুয়ারি হইতে ১৯৩৮ এপ্রিলের মধ্যে নয় বৎসরে ২১০ দিন দাঙ্গা হয়, ৫৬০ জন লোক নিহত ও ৪,৫০০ লোক আহত হয়। বাংলাদেশে ১৯২২ হইতে ১৯২৭ সালের মধ্যে ৩৫,০০০ স্ত্রীলোক অপহৃত হয়, ইহার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক, আর যে-সব মুসলমান নারী অপহৃত হয়, তাহার অপহারক মুসলমানই। এই কয়েকটি তালিকার দ্বারা দেশের মনোবিকৃতির সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না।

১৯২১ সালের সংবিধানে যে দ্বৈরাজ্য শাসনপদ্ধতি প্রদেশে প্রবর্তিত হয়, তাহার বিরুদ্ধে ভারতীয়রা প্রথম হইতেই আপত্তি করিয়া আসিতেছে। এতদ্‌সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয় (১৯২৮)। ইহার সভাপতি স্যর জন সাইমনের নাম অনুসারে ইহা 'সাইমন কমিশন' নামে পরিচিত। এই কমিশন ভারতের জন্য নূতন সংবিধান রচনার পূর্বে দেশের

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া পার্লামেণ্টে প্রতিবেদন ও সুপারিশ পেশ করিলেন।

সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে মিঃ জিন্না মুসলিম লীগের নেতৃরূপে লখ্নৌ প্যাক্ট বা নেহরু-সংবিধান খসড়ানুযায়ী মুসলমানদের দাবি-দাওয়া নাকচ করিয়া ১৪ অথবা ১৫ দফা দাবি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের শর্তরূপে পেশ করিলেন (১৯২৯)। মিঃ জিন্না এক বক্তৃতায় বলিলেন, "আমি বরাবর কন্গ্রেসের একনিষ্ঠ সদস্য ছিলাম এবং কোনোদিন সাম্প্রদায়িক দাবি দাওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম না, কিন্তু দেখা যাইতেছে '[illegible]'এর অপবাদ যাহা মুসলমানদের উপর আরোপিত হইতেছে, তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে না। সংখ্যালঘুর নৈরাপত্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন।" জিন্না-সাহেব খিলাফত-আন্দোলনকালে অসহযোগের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তিনি ভালোভাবেই জানিতেন, ব্রিটিশের সহিত সহযোগিতার দ্বারাই মুসলমান-সমাজ লাভবান হইবে। স্যর সৈয়দ আহমদ ঠিক এই পথ অনুসরণ করিয়া মুসলমানকে কন্গ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কারণ ইংরেজের সহিত সম্প্রীতি রক্ষার দ্বারা যাহা-কিছু সম্ভাব্য আদায় করিতে হইবে। জিন্না-সাহেব সেই পথ ধরিলেন, তিনি আলী-ভ্রাতাদের কন্গ্রেস-মিতালি পছন্দ করেন নাই। ব্রিটিশের সহিত অসহযোগেরও তিনি বিরোধী ছিলেন।

জিন্না সাহেবের তথাকথিত চৌদ্দ দফা দাবি পাকিস্তানের প্রথম সোপান। —যদিও পাকিস্তান শব্দ তখনো সৃষ্টি হয় নাই। মুসলমানদের স্বার্থ হিন্দুর হস্তে নিরাপদ নহে— এই আশঙ্কায় তিনি এই শর্ত প্রস্তুত করেন। স্যর সৈয়দ আহমদের সময় হইতে জিন্না-সাহেবের সময় পর্যন্ত অধিকাংশ মুসলমানের মনে কেন এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সংখ্যাগুরু হিন্দুদের শাসনব্যবস্থায় মুসলমানের স্বার্থ নিরাপদ নহে। কন্গ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার অধিকাংশ সদস্যই হিন্দু এবং তাহারা যে সকলেই উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন এ কথা সত্য নহে। রুশের গায়ে আঁচড় দিলেই তাতারের রূপ বাহির হইয়া পড়ে। কি হিন্দু কি মুসলমান অধিকাংশেরই মন ধর্মবিষে জর্জরিত। শিশুকাল হইতে তাহারা মানুষ হইবার শিক্ষা পায় নাই; তাহারা নিজ নিজ বিশেষ ধর্ম, বিশেষ সম্প্রদায়ের শিক্ষা লাভ করিয়া বিশেষ ধর্মীয় নামে মানব-সমাজে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে।

জিন্না-সাহেবের এই স্বার্থরক্ষা-কবচ প্রচারিত হইলেও সকল শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে মতের ও পদ্ধতির ঐক্য আনিতে পারিল না। মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলন পৃথক নির্বাচনের এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমান যুক্তনির্বাচনের পক্ষপাতী। ১৯৩১ এপ্রিল মাসে জাতীয়তাবাদীদের সম্মেলনে স্যর আলী ইমাম বলেন যে, পৃথক নির্বাচন ভারতের মুসলমানের স্বার্থের পরিপন্থী। কিন্তু লীগ ঠিক উল্টা কথাই প্রচারে রত। প্রতিদিন কাগজপত্রে, সভাসমিতিতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ প্রশ্নগুলি ব্যাপক ও তীব্রভাবে প্রচারিত হইতে থাকিল ;— মিলনের সূত্র কেহই আর খুঁজিয়া পাইতেছে না। সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যে কেবল মুসলমানী সংবাদ পত্র ও পত্রিকাই প্রচার করিতেছিল, সে কথা সত্য নহে; ভারতে তথাকথিত 'জাতীয়' কাগজগুলি পাকিস্তান প্রচারকল্পে কম সহায়তা করে নাই।

১৯৩১ মার্চ মাস হইতে কন্‌গ্রেস আইন-অমান্য-আন্দোলন আরম্ভ করিলে কন্‌গ্রেসের সকল কর্মীই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তারপর এই আন্দোলন কিভাবে মুলতুবী হয় এবং বিলাতের গোলটেবিলে কন্‌গ্রেসের এক মাত্র প্রতিনিধিরূপে গান্ধীজি ইংলণ্ডে যান, কিভাবে ভারতীয় প্রতিনিধিগণের মতভেদে গোলটেবিল-বৈঠক বানচাল হইয়া গিয়াছিল, সে আলোচনা পূর্বে হইয়া গিয়াছে।

গোল-বৈঠকে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না দেখিয়া মিঃ জিন্না ভারতে না ফিরিয়া বিলাতেই আইন-ব্যবসায় করিতে লাগিলেন— দেশে ফিরিলেন ১৯৩৭ সালে। এইবার দেশে ফিরিয়া লীগ কিভাবে ১৯৩৫ এর সংবিধান কার্যকরী করিবে, সে বিষয়ে আলোচনায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। কন্‌গ্রেস পার্টি কিভাবে প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া দেশ শাসন করেন, সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কন্‌গ্রেসের নামাবলী গাত্রাবরণ করিলেই মনের পরিবর্তন হয় না— তাহা কন্‌গ্রেসী শাসকগণ বহুক্ষেত্রে নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভারতের দ্বিজাতিকতত্ত্ব মুসলমান নেতারাও যেমন দীর্ঘকাল হইতে প্রচার করিয়া আসিতেছেন হিন্দুরাও যে তাহা হইতে কম দিন এই মতবাদ প্রচার

করিতেছিলেন, তাহা নহে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় কোনো বন্ধন না থাকায় এই দ্বিজাতিকতত্ত্ব তো স্বতঃসিদ্ধই ছিল। লালা লাজপত রায় ১৯২৪ সালে এই হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতিকতত্ত্ব স্পষ্টভাবেই বলিলেও তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্যই জীবনের শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। তারপর ইহার প্রধান প্রচারক হইলেন মহারাষ্ট্রীয় বীর বিনায়ক সবরকার। সবরকার ভারতে বিপ্লবী যুগে যে-সকল অসাধারণ কার্য করিয়াছিলেন তজ্জন্য সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। আটাশ বৎসর আন্দামানে ও দেশে অন্তরীণাবদ্ধ থাকিবার পর ১৯৩৭ সালের ১০ মে তিনি মুক্তিলাভ করেন। দীর্ঘকাল নির্বাসনে ও কারাগারে থাকিবার পর বাহিরে আসিয়া তিনি 'সন্ন্যাসী' হইয়া হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন না, তিনি হিন্দুধর্ম পুনরুদ্ধারের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন অথবা রাজনীতির মধ্যে হিন্দুত্ব আনিলেন। গান্ধীজিও হিন্দু ছিলেন— তিনিও হিন্দুদের ধর্মবোধ জাগ্রত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার হিন্দুত্ব ও সবরকারের হিন্দুত্ব সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মী।

সবরকার বলিলেন, স্বরাজের অর্থ হিন্দুর স্বত্ব বা হিন্দুত্ব; কোনো অ-হিন্দুর আধিপত্য হিন্দু স্বীকার করিবে না। ভারতের মধ্যে বাস করিলে অ-হিন্দুরা ভারতীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। তাঁহার যুক্তি, ভারতের মধ্যে বাস করিলেই কেহ ভারতীয় হয় না; তাহা হইলে ভারতের এংলো ইণ্ডিয়ানরা (ইউরেশিয়ান) তো ভারতের উপর আধিপত্য দাবি করিতে পারে। অউরঙ্গজেব বা টিপু সুলতানের রাজত্বকে স্বরাজ্য বলিব? "No! Although they were territorially Indians they proved to be worst enemies of Hindudom and there ore, a Shivaji, a Govindsingh, a Pratap or the Peshwas had to fight against the Moslem domination and establish real Hindu Swarajya" সবরকারের মতে ভারতের নাম 'হিন্দুস্থান', ভারতের ভাষা সংস্কৃত, তাহার লিপি দেবনাগরী, রাষ্ট্রভাষা হিন্দী এবং সেই হিন্দী ভাষা হইবে সংস্কৃতনিষ্ঠ, উহা উর্দু বা হিন্দুস্থানী নহে। দেশের সংবিধান সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, মুসলমান বলিয়াই কোনো সুবিধা-সুযোগের অধিকারী তাহারা হইবে না; It would be simply

preposterous to endow the Moslem minority with the right of exercising a practical veto on the legitimate rights and privilages of the majority and call it a 'Swarajya'; তিনি বলিলেন, হিন্দুরা এক এডওয়ার্ডের পরিবর্তে অউরঙ্গজেবকে ভারতেশ্বর করিতে চাহে না, তাহারা চায় নিজ দেশের কর্তৃত্ব নিজেরাই গ্রহণ করিবে অর্থাৎ হিন্দুস্থানের আধিপত্য হিন্দুর হাতেই থাকিবে।

মুক্তিলাভের অল্পকাল পরে ১৯৩৭ সালে আহমদাবাদের হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে সবরকার বলিলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা আজিকার নহে, ইহা বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে— "you can not suppress them by merely refusing recognition of them .... India cannot be assumed to-day to *be an* unitarian and homogeneous nation, but on the contrary there *are two nations* in the main, *the Hindus* and *the Muslims* in India."

সবরকারের এই উক্তির সহিত স্যর সৈয়দ আহমদের ও মিঃ জিন্নার দ্বি-জাতিবাদ তুলনীয়, দুই-ই এক সুরে বাঁধা— মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার উপর উভয়েরই বিশ্বাস ও ধর্মমূঢ়তার উপর উভয়েরই নির্ভর। ১৯৩৭ সালে যখন নূতন সংবিধান-মতে ভারতে কন্‌গ্রেসের প্রতিপত্তি ছয়টি প্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠ, তখন ভারতের হিন্দুদের একটি বড় অংশের ভাবনা কোন্‌দিকে যাইতেছে তাহা সবরকারের রচনা হইতে সুস্পষ্ট হয়। ভারতে দুইটি জাতি— হিন্দু ও মুসলমান – এ কথা হিন্দুরাও স্বীকার করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতেছেন, সংখ্যালঘু বলিয়াই মুসলিমরা অতিরিক্ত কিছু দাবি করিতে পারিবে না। তাহারা অপর সকলের ন্যায়ই ভারতের বাসিন্দা— প্রত্যেকেই ভোটের অধিকারী। রাজস্ব যে যেমন দেয় তদনুপাতে তাহারা সরকারী ব্যয়ের অংশ অধিকারী ইত্যাদি। অপরদিকে মুসলমানরাও ঠিক এই কথাই বলিয়া আসিতেছে, হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর হাতে তাহাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ব্যক্তিসত্তা কিছুই নিরাপদ নহে, সেইজন্য মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলির উপর যেমন তাহাদের পূর্ণ আধিপত্য থাকিবে, হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতেও তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থার প্রয়োজন।

১৯৩০ সালে মহাকবি মহম্মদ ইকবাল সর্বপ্রথমে মুসলমানদের জন্য পৃথক

রাজ্য গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ডক্টর আম্বেদকর ভারতচ্ছেদের দুই বৎসর পূর্বে লিখিয়াছিলেন— "It is like a race in armaments between two hostile nations. If the Hindus have the Benaras University, the Musalmans must have the Aligarh University. If the Hindus start 'Shuddhi' movement, the Muslims must launch tablig movement. If the Hindus start Sangathan, the Muslims must meet it by Tanjim. If the Hindus have the Rashtriya-Swayam-Sevaka-Sangha (R. S. S), the Muslims must reply organizing the Khaksars. This race in social armament and equipment in run with the determination and apprehension charactaristic of nations which are on the warpath. The Muslims fear that the Hindus are subjugating them. The Hindus feel that the Muslims are engaged in reconquering them. Both appear to be preparing for war and each is watching the 'preparations' of the other." [১]

১৯৩০ হইতে ভারতের অব্যবস্থিত রাজনৈতিক অবস্থায় মুসলমানদের মনের অশান্তি নানাভাবে রূপগ্রহণ করিতেছে। ১৯৩২-এ উত্তরভারতে খাকসার আন্দোলনের জন্ম হয়। আলনামা মাশরেকী (১৮৮৮) নামে লাহোরের এক অসামান্য মেধাবী অধ্যাপক এই আন্দোলনের জনক। ইনি কেমব্রিজের র‍্যাংলার ও ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ। ইনি অতি নিষ্ঠাবান মুসলমান; তিনি যে আন্দোলন প্রবর্তিত করিলেন তাহার উদ্দেশ্য হজরত মহম্মদের সময়ের ইসলাম প্রচার ও পরবর্তীকালে উদভূত কুসংস্কারাদি দূরীভূত করিয়া বর্তমান ভারতীয় মুসলিম-সমাজকে একটি শক্তিশালী সুশৃঙ্খল সামরিক জাতিতে পরিণত করা। এ সম্বন্ধে আললামা স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি ঐতিহাসিক ইসলামকে পুনর্জীবিত করিতে চাই। আমাদের নিকট সাড়ে তেরো শত

১ Ambedkar, Pakistan. P 236.

বৎসর পূর্বের খোদা-প্রদত্ত ইসলামই স্বীকার্য, কোনও মৌলবী-মোল্লার দেওয়া ইসলাম নহে।"

তাঁহার প্রধান লক্ষ্য back to the Quran— কোরানের শিক্ষার দিকে প্রত্যাবর্তন। আল্লামার চেষ্টায় পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু ও উত্তরপ্রদেশে খাকসার দল গঠিত হইল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সদস্যদের লইয়া কুচকাওয়াজ, মাঝে মাঝে কৃত্রিম যুদ্ধক্রীড়া হইত। ইহারা সকলেই যুদ্ধসজ্জা বা ইউনিফর্ম পরিধান করিত এবং বেল্চা ছিল ইহাদের হাতিয়ার। প্রত্যেক খাকসার ব্যক্তিগত ভাবে নিজ নিজ ব্যয় বহন করিত ; তবে সাধারণ সদস্য ও ধনী মুসলমানরা ইহাদের তহবিলে অর্থ সাহায্য করিত। 'অল্ ইশ্লা' নামে উর্দু কাগজ এই আন্দোলনের মুখপত্র। খাকসারদের মধ্যে ১৬ হইতে ৬০ বৎসর বয়স্ক পুরুষদের সদস্য করা হইত। ইহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ; সাধারণ সদস্যদের বলিত মুজাহিদ ; দ্বিতীয় শ্রেণীকে পাক্‌বাজ— যাহারা সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া সদস্য হইয়াছে ; তৃতীয় শ্রেণী বা জান্‌বাজ— ইহারা নিজ রক্ত দিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত যে, নেতার আদেশে প্রাণ দিতে তাহারা প্রস্তুত ; চতুর্থ বা মুআবিন — ইহারা বার্ষিক চাঁদা দেয়, তিন মাসের কুচকাওয়াজ শিক্ষালাভ করিয়া রিজার্ভে থাকে।

দলের মিলিটারি শিক্ষার বাহিরে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে। আল্লামা বলিলেন, "Islam becomes...the most successful and universal principle of nation-building, and all religious and moral injunctions become means to an end. It becomes, so to speak, the infaillible and divine sociology."[১] এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া মুসলমানরা রাজনীতি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

এ দিকে ১৯৩৩ সালে কেমব্রিজের ছাত্র রহমৎআলি পাকস্তান (Pakstan) শব্দ সৃষ্টি করেন। এই বৎসর বিলাতে ভারতীয় সংবিধান গঠনকালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের যুক্ত কমিটি বসে। তাহার সম্মুখে ভারতীয় মুসলমান প্রতিনিধিরা পাকস্তান পরিকল্পনাকে 'Only a student's scheme......

১ Smith, Modern Islam in India P. 273

chimarical and impracticable' বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর ১৯৩৪-এ মিঃ জিন্না ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভারতে লীগের কর্তৃত্বভার লইলেন; মুসলমানদের মনোভাব তিন বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেল।

১৯৩৭ সালে কন্‌গ্রেস যে কয়টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য শাসনভার গ্রহণে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেখানে সর্বত্রই হিন্দুরা প্রবল। মুসলমানদের পক্ষে 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সঙ্গীত গান করা, কন্‌গ্রেসী ত্রিবর্ণ ও চক্রলাঞ্ছিত পতাকার তলে দণ্ডায়মান হওয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠান—মওলনাদের মতে অন্-ইসলামীয় বলিয়া বিবেচিত হইল। কিন্তু ব্রিটিশরাজের ইউনিয়ন জ্যাক ও আজগুবি জন্তু ইউনিকর্ণ ও সিংহলাঞ্ছিত পতাকার নীচে সমবেত হইতে ইহাদের কখনো বাধে নাই, ব্রিটিশ ন্যাশনাল আনথেম্ বা জাতীয় সংগীতের সময় বাজনা বাজাইতে ও সমবেত হইতে আপত্তি করে নাই। আজ ভারতের নিজস্ব পতাকা হইল অসহ্য! মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিতে অর্ধচন্দ্রশোভিত সবুজ নিশান উড়িল; হিন্দুদের পক্ষে সেখানে আদব করা বাধ্যতামূলক হইল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছে।

এমন সময় ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ব্রিটিশরা উহার মধ্যে জড়িত হইয়া পড়ে এবং ভারতকে এই বিশ্বযুদ্ধে জড়াইয়া ফেলে— কারণ ভারত ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত দেশ। কন্‌গ্রেসের সঙ্গে এই লইয়া ব্রিটিশ সরকারের মতভেদ হয় এবং সকল প্রদেশেই কন্‌গ্রেসের শাসনাবসান ঘটে— সে ইতিহাস পূর্বে কথিত হইয়াছে।

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে কন্‌গ্রেস সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলে, সেখানে সরকারী উপদেষ্টাদের লইয়া গবর্ণরের শাসন প্রবর্তিত হইল। পঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও বঙ্গদেশে মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিল। কিন্তু পঞ্জাবে ছিল ইউনিয়ন মন্ত্রিত্ব অর্থাৎ হিন্দু, শিখ ও মুসলমান মন্ত্রীরা যৌথভাবে শাসনকার্য চালাইতে-ছিলেন; বাংলাদেশে ফজলুল হক সাহেব লীগের বাহিরে থাকিয়া হিন্দু মন্ত্রীদের সহায়তায় কার্য করিতেছিলেন। হক্-সাহেব যৌবন হইতে কন্‌গ্রেসের সহিত যুক্ত— এখনো তিনি কন্‌গ্রেসের সহিত কোয়ালিশনে বাংলাদেশ শাসনের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু কন্‌গ্রেস মুখ্যরা ছয়টি প্রদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়া এমনই

নিশ্চিন্ত যে অন্য প্রদেশে কোয়ালিশনে রাজি হন নাই। ব্যর্থ হইল ফজলুল হকের প্রয়াস, তবুও তিনি হিন্দু মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে লীগ উদগ্র হইয়া উঠিতেছে।

লীগ সদস্যদের সংখ্যাবৃদ্ধিহেতু পঞ্জাবে ইউনিয়ন মন্ত্রিত্বের এবং বাংলার ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বর অবসান ঘটিল। লীগের মনোনীত মন্ত্রীসভা উভয়স্থানে প্রবল হইয়া উঠিল। স্যর নাজীমুদ্দিন বাংলার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। আসামের সহিত মুসলমানপ্রধান সিলেট যুক্ত থাকায় সেখানেও লীগপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। আসামে মুসলমান ভোটারের সংখ্যাবৃদ্ধির আর একটি কারণ—ময়মনসিংহের অসংখ্য মুসলমান ধীরে ধীরে ব্রহ্মপুত্র তীরে আসামের নানাস্থানে গিয়া বাস করিয়েছিল; তাহারা চাষী সুতরাং তাহাদের অনেকেই ভোটার। কিন্তু আসামের উপজাতিরা বা চা-বাগানের বহু লক্ষ কুলি—যাহাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক তাহারা ভোটার ছিল না। ইহার ফলে আসামে মুসলমান ভোটারের সংখ্যাধিক্য হয় ও সেখানে লীগ মন্ত্রিত্ব স্থাপিত হয়।

এদিকে কন্‌গ্রেস মন্ত্রিত্ব হইতে অপসারিত হইয়া পুনরায় দেশমধ্যে অসহযোগ-আন্দোলন প্রবর্তন করিয়াছেন—তাঁহারা এখনো মুসলমানদের পৃথক দাবি মানিতে প্রস্তুত নহেন;—১৯৪০ মার্চ মাসে লাহোরের লীগ এর বাৎসরিক সম্মেলনে জিন্না-সাহেব বলিলেন যে, মুসলিম জাতির জন্য পৃথক রাজ্য চাই। 'No power on earth can prevent Pakistan.' এই কথা শুনিয়া কন্‌গ্রেসীরা হয়তো সেদিন বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ভারতে আসিলেন; যুদ্ধোত্তর পর্বে ভারতের সংবিধান কীভাবে রচিত হইবে এবং অন্তবর্তী অবস্থায় কীভাবে শাসন-ব্যবস্থা চালিত হইতে পারে—সেই সম্বন্ধে প্রস্তাব লইয়া তিনি আসেন। কন্‌গ্রেস ও লীগের নেতাদের সহিত তাহার আলোচনা হইল—কন্‌গ্রেস এখনও Unitery বা অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা আঁকড়াইয়া আছেন—তাঁহারা সরাসরি ক্রীপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। মুসলমান নেতারা ক্রীপসের নিকট এই শর্তটি কবুল করাইয়া লইলেন যে, বিশেষ বিশেষ প্রদেশের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার থাকিবে, এমন-কি কয়েকটি প্রদেশ মিলিয়া পৃথক ফেডারেশনও করিতে পারিবে। কন্‌গ্রেস বলিলেন, 'a severe blow to the conception of Indian unity' কিন্তু ক্রীপস কর্তৃক

সরাসরি পাকিস্তান-পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে না হওয়ায়, লীগ ক্রীপসের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না। ক্রীপসের দৌত্য ব্যর্থ হইল।

কন্‌গ্রেস ক্রীপস-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না—Indian unity ধ্বংস হইতেছে বলিয়া; লীগ গ্রহণ করিলেন না 'পাকিস্তান' স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইল না বলিয়া। অথচ উভয়ের উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতালাভ! ধর্ম বড় বালাই। মানুষে মানুষে ভেদসৃষ্টির এমন যন্ত্র আর নাই।

১৯৪২ সালের মে মাসে নিখিল ভারত কন্‌গ্রেস কমিটির সভায় মদ্রাজের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ও কন্‌গ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক রাজাগোপালাচারী বলিলেন যে, পাকিস্তান প্রস্তাব মানিয়া লওয়া হউক; তিনি আরও বলেন, মদ্রাজে কনগ্রেস-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিত্ব গঠিত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। কন্‌গ্রেস মুখ্যেরা একবাক্যে উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়ায় রাজাগোপালাচারী কন্‌গ্রেস সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এই ঘটনার তিন মাস পরে ১৯৪২ সালের বিখ্যাত অগস্ট আন্দোলন আসিল। গান্ধী প্রমুখ সমস্ত নেতা পুনরায় কারারুদ্ধ হইলেন। ক্রীপস আসিবার মুখে তাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। আবার কয়েক মাস পরে তাহারা কারাগারে প্রেরিত হইলেন।

কন্‌গ্রেস নেতাদের বারে বারে এই কারাগার বরণের ফলে কন্‌গ্রেসের কাজ প্রতিহত হইতেছিল— সেই সুযোগে লীগ সর্বত্র আসন সুদৃঢ় করিয়া লয়। কারাবরণ বা অনশন দ্বারা ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত করিলেই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয় না।

১৯৪১ সালে গান্ধী মুক্তিলাভ করিলেন। মিঃ জিন্নার সহিত ভারতের ভাবী সংবিধানাদি লইয়া দীর্ঘ আলোচনা চলিল। গান্ধীজি কিছুতেই স্বীকার করিলেন না যে, মুসলমান পৃথক জাতি। তাঁহার মতে ভারত বিভক্ত হইতে পারে না। তাঁহার কাছে হিন্দু-মুসলমান তাঁহার দুই অক্ষিতারকা। কিন্তু সকলের দৃষ্টি সেরূপ স্বচ্ছ নহে। ১৯৪২ সালের আন্দোলনকালে কন্‌গ্রেসের মন্ত্র হইয়াছিল Quit India—ভারত ছাড়ো—কিন্তু তাহার সহিত মুসলমানরা আর একটি শর্ত যোগ করিয়া দিলেন—ভারত বিভক্ত করিয়া পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়া দেশ ছাড়ো। গান্ধীজির মত, ভারতের সর্বাগ্রে মুক্তি চাই, জিন্নার মত, সর্বাগ্রে পাকিস্তান চাই। ইংরেজ দুই দলকে খুশি করিয়া ভারত ত্যাগ করিল কয়েক বৎসর পরে।

ইহার পর ভারত-ইতিহাসের পট দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া চলিল। ১৯৪৫ সালে জারমেনী পরাভূত হইলে তৎকালীন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কন্‌গ্রেস কমিটির সদস্যগণকে মুক্তিদান করিলেন। কন্‌গ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া যে আইন বলবৎ ছিল, তাহা প্রত্যাহৃত হইল। বড়লাট সিমলায় কন্‌গ্রেস ও লীগের নেতাদের আহ্বান করিয়া অন্তবর্তী শাসন ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কীভাবে এই কনফারেন্স ব্যর্থ হয় তাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি। স্পষ্টই বোঝা গেল, তৃতীয় পক্ষের সুপারিশে চরম মীমাংসা হইবে—দুই পক্ষেরই সমান অনমনীয় মনোভাব—উভয়েই আপন আপন খোঁট ধরিয়া বসিয়া থাকিলেন।

ইহার অল্পকাল পরে জাপান পরাভূত ও ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার পতন ঘটিল; এবার মন্ত্রিত্বে আসিলেন শ্রমিক দল। তাহারা আসিয়াই ঘোষণা করিলেন, ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলিতে নির্বাচন হইবে। এখনো ১৯৩৫ সালের সংবিধান বলবৎ রহিয়াছে। এইবার নির্বাচনে লীগ-মুসলমানদের প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় মোট ৪৯৫টি মুসলমান-আসনের ৪৪৬টি দখল করিল; তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রদেশে কন্‌গ্রেস বিপুলভাবে জয়লাভ করিল। মুসলমান প্রধান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কন্‌গ্রেসই জয়ী হইল।

ইহার পর ব্রিটিশ ক্যাবিনেট-প্রেরিত মিশন ভারতে আসিল। তাঁহাদের দ্বারা সংবিধান রচনার যে পদ্ধতি নির্ধারিত হইল তাহা লীগ গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। লীগ চাহিয়াছিল, মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলি তাহাদের উপযোগী সংবিধান রচনা করিবে—কন্‌গ্রেসের সহিত একাসনে বসিয়া উহা তাহারা করিবে না। এই লইয়া মতভেদ ক্রমে মনান্তর ও অল্পকাল মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘাতে পরিণত হইল। ১৯৪৬ সালের অগস্ট হত্যাকাণ্ডের কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি।

১৯৪৭ সালের জুন মাসে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করিলেন, তাহারা ১৫ই অগস্ট এর মধ্যে পাকিস্তান ও ভারত পৃথক স্টেট গঠন করিয়া দেশত্যাগ করিবেন।

১৫ই অগস্ট ১৯৪৭-এ ভারত ও পূর্বদিন পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষিত হইল। যে দেশে হিন্দু-মুসলমান প্রায় সহস্র বৎসর পাশাপাশি বাস

করিয়া আসিতেছে, তাহা দ্বিখণ্ডিত হইল; হিন্দুর দ্বিজাতিক মতবাদ ও মুসলমানের দ্বিজাতিক তত্ত্ব সফল হইল এই দেশ-বিভাগের দ্বারা। কেবল কন্‌গ্রেস সর্বধর্মনিরপেক্ষ থাকিয়া ভারতে হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে দেখিবার চেষ্টা করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত থাকিল। ভারতের জাতীয়তার আদর্শ এই সর্বমানবের মিলনসাধন—গত বারো বৎসর কন্‌গ্রেস সেই সাধনা করিতেছে নিরপেক্ষভাবে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

লর্ড চেম্‌সফোর্ডকে লেখা

Your Excellency,

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilized governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organization for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers—possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers, which have in some cases gone to the brutal length of making fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgment from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the noble vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral

এবং যাহারা ইহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তাহারাই এই দুইটি দেশের বিপদে মিত্রপক্ষীয়দের অনুসৃতনীতির যুক্তিযুক্ততা যাচাই না করিয়া পারেনা। কারণ মিত্রপক্ষীয়দিগের কার্য বার বার নিদারুণ ব্যর্থতায়েই পর্যবসিত হইয়াছে। স্বাধীনতা অপেক্ষা পরাধীন দেশগুলির উপর আধিপত্য স্থাপনা এবং ধনতান্ত্রিকপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টার উপরই ঐ-সকল নীতির ভিত্তি স্থাপিত। সাম্রাজ্যশাসক জাতিকে শক্তিদান করে নাই, পরন্তু উহা ভার এবং অভিশাপ স্বরূপ হইয়াছে। ভারতবর্ষ সকল প্রশ্নের জটিল গ্রন্থিস্বরূপ, কারণ ভারতের স্বাধীনতার মাপদণ্ডেই ব্রিটেন এবং মিত্রজাতিসমূহকে পরিমাপ করিতে হইবে, ভারতের স্বাধীনতায়ই এশিয়া আফ্রিকার জনগণের মনে আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হইবে।

"এই দেশে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান এ কারণ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ইহারই উপর যুদ্ধের ভবিষ্যৎ এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে এই সাফল্য সুনিশ্চিত। কারণ সেই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ মুক্তিসংগ্রামে এবং নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদকল্পে তাহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিবে। ইহার দ্বারা যে কেবলমাত্র যুদ্ধের জয়-পরাজয় প্রভাবিত হইবে তাহা নহে, পরন্তু সমুদয় পরাধীন ও নিপীড়িত মানবসমাজকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে আকর্ষণ করা সম্ভব হইবে, এবং তাহার সহিত ভারতের বন্ধুরূপে এই জাতিপুঞ্জ তাহাদের নৈতিক ও আত্মিক নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিদর্শন হিসাবে রহিলে সাম্রাজ্যবাদের কলঙ্ক সমগ্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন করিবে।

"বর্তমান সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত ভারতের স্বাধীনতা এবং বৃটিশ শাসনের অবসান অবশ্য প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো প্রতিশ্রুতি অথবা অঙ্গীকার বর্তমান অবস্থা পরিবর্তিত করিতে অথবা বর্তমান সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে পারে

না। এই-সকল অঙ্গীকার জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেনা। কেবলমাত্র স্বাধীনতা-হোমানলই লক্ষ লক্ষ লোকের মনে সেই পরিমাণ শক্তি ও উৎসাহ উদ্দীপিত করিতে পারে যাহাতে যুদ্ধের প্রকৃতি অবিলম্বে পরিবর্তিত হইবে।

"সুতরাং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি পুনর্বার ভারত হইতে ব্রিটিশ-শক্তির অপসারণের দাবী দৃঢ়ভাবে জানাইতেছেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর একটি অস্থায়ী গবর্নমেণ্ট গঠিত এবং স্বাধীন ভারত মিত্রজাতিপুঞ্জের সহিত মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ হইবে। এই স্বাধীন ভারতবর্ষ মুক্তিসংগ্রামের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্টের অংশ গ্রহণ করিবে। এই অস্থায়ী গবর্নমেণ্ট একমাত্র এই দেশেরই প্রধান প্রধান দল বা গোষ্ঠীর সহযোগিতায় গঠিত হইতে পারে। সুতরাং ইহাই হইবে ভারতবর্ষের প্রধান দলগুলির প্রতিনিধিদিগের একটি সম্মিলিত গবর্নমেণ্ট এবং ইহার প্রাথমিক কর্তব্য হইবে ভারতকে রক্ষা করা ও ইহার অধীনস্থ সশস্ত্র এবং অহিংস শক্তির দ্বারা মিত্র জাতিদিগের সহযোগিতায় আক্রমণ প্রতিরোধ করা। শ্রমরত কর্মী জমিতে কারখানায় এবং অন্যত্র যাহারা কাজ করে, তাহাদের সর্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিতে হইবে, কারণ বাস্তবপক্ষে তাহাদেব কর্মপ্রচেষ্টার ওপরই দেশরক্ষা নির্ভর করিতেছে। এই অস্থায়ী গবর্নমেণ্ট একটি গণ-পরিষদের খসড়া প্রস্তুত করিবে। এই গণ-পরিষদ ভারতবর্ষের জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। শাসনতন্ত্র সকল শ্রেণীর লোকের গ্রাহ্য হওয়া চাই। কংগ্রেসের অভিমত এই যে, এই শাসনতন্ত্রের ফেডারাল বা সংযুক্ত গবর্নমেণ্ট রীত্যনুযায়ী হইবে এবং এই শাসন-তন্ত্রের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলের যতদূর সম্ভব স্বায়ত্তশাসনাধিকার থাকিবে এবং সংযুক্ত গবর্নমেণ্টের নির্দিষ্ট ক্ষমতা ব্যতীত ঐ-সব অঞ্চলের অন্যান্য সর্বপ্রকার ক্ষমতা থাকিবে। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য; তাহাতে সহযোগিতাকারী ভারতবর্ষ এবং মিত্রজাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক ঐ সকল জাতির প্রতিনিধিদিগের মধ্যে অলোচিত হইবে। স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে

ভারতবর্ষ জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও শক্তির সাহায্যে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে।

"ভারতের স্বাধীনতা অবশ্যই এশিয়ার অপরাপর পরাধীন জাতির মুক্তির প্রতীক। ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোচীন, ইষ্টইণ্ডিজ, ইরাণ এবং ইরাকও অবশ্যই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে। যে সকল দেশ বর্তমানে জাপানের পদানত তাহারা পরবর্তীকালে অন্য কোন সাম্রাজ্যবাদী জাতির শাসনাধীনে রহিবে না।

"বর্তমান সঙ্কটময় মুহূর্তে কমিটি ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষার আলোচনায় নিযুক্ত থাকিলেও, ইহাও তাহাদের অভিমত যে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তি সংরক্ষণ ও সুনিয়ন্ত্রিত উন্নতির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ লইয়া একটি সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হওয়া প্রয়োজন। অপর কোনও ভিত্তিতে আধুনিক বিশ্ব-সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। এইরূপ একটি বিশ্বরাষ্ট্র তাহার অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করিবে, এবং এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির আক্রমণ ও শোষণনীতি প্রতিরোধ করিবে, সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের স্বার্থ রক্ষা করিবে, অনুন্নত জাতি ও অঞ্চলসমূহে উন্নতির ব্যবস্থা করিবে এবং সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থে পৃথিবীর ঐশ্বর্য আহরণ করিবে। বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে সকল দেশেই নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব হইবে, জাতীয়সৈন্যবাহিনী, নৌ-বহর এবং বিমান বাহিনীর আর কোন প্রয়োজন রহিবে না এবং একটি বিশ্বরাষ্ট্ররক্ষীবাহিনী সৃষ্ট হইবে এবং এই বাহিনীর কার্য হইবে জগতের শান্তিরক্ষা এবং আক্রমণ প্রতিরোধ করা। স্বাধীন ভারত সানন্দে এই বিশ্বরাষ্ট্রে যোগদান করিবে এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে অন্যান্য জাতির সহিত সাম্যের ভিত্তিতে সহযোগিতা করিবে।

"কমিটি দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছেন যে, যুদ্ধের মর্মান্তিক ও চরম শিক্ষা এবং পৃথিবীর সঙ্কট সত্ত্বেও অতি স্বল্পসংখ্যক দেশই এই বিশ্বরাষ্ট্রে যোগ দিতে সম্মত। ভারতবর্ষের বর্তমান সঙ্কটময় অবস্থার অবসানের জন্য কমিটি স্বাধীনতার দাবি জানাইতেছেন, যাহাতে সে স্বাধীন হইয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় এবং

চীন ও রুশিয়াকে তাহাদের বর্তমান বিপদের সময় সাহায্য করিতে পারে। রুশিয়া কিংবা চীনের আত্মরক্ষায় অথবা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আত্মরক্ষার শক্তিতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয় সেই বিষয়ে কমিটি বিশেষ উদ্বিগ্ন। বিশেষ করিয়া চীন এবং রুশিয়ার স্বাধীনতা মূল্যবান, এবং এই দুইটিকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের এবং ঐ দুইটি জাতির সঙ্কট ক্রমশঃই ঘনীভূত হইতেছে। বর্তমান অবস্থায় বৈদেশিক শাসনের আনুগত্য স্বীকারে ভারত যে কেবলমাত্র অধঃপতিত হইতেছে তাহা নহে, পরন্তু তাহার আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতাও খর্ব হইতেছে। শুধুমাত্র তাহাই নহে এই ব্যবহার দ্বারা ব্রিটেন সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের ক্রমবর্ধমান বিপদের কিছুই প্রতিবিধান করিতে পারিতেছে না। বরং তাহাদের প্রতি কর্তব্য হইতেই বিচ্যুত হইতেছে। অদ্যাবধি ওয়াকিং কমিটি ব্রিটেন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট যে সকল অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাহার কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই, বরং তাহাদের বিভিন্ন উক্তিতে ভারত এবং বিশ্বের প্রয়োজন সম্বন্ধে অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইতেছে। উপরন্তু তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতাবিরোধী এইরূপ সকল ভাব ব্যক্ত করিতেছেন যাহাতে প্রভুত্বপ্রিয়তা এবং জাতীয় শ্রেষ্ঠতার হীন মনোবৃত্তিই প্রকট। যে জাতি স্বীয় শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ও গর্বিত সে কখনই এইরূপ মনোভাব সহ্য করিবে না।

"বিশ্বের মুক্তির জন্য কমিটি পুনরায় ব্রিটেন এবং মিত্রশক্তি-বর্গের নিকট তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন। কমিটি মনে করেন যে, যে সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রভুত্বপ্রিয় গবর্নমেণ্ট ভারতবর্ষকে পদানত করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহাকে স্বীয় স্বার্থ ও মানবতার আদর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে বাধা দিতেছে সেই গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে জাতি যদি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে কমিটি তাহা হইতে জাতিকে বিরত করা সমীচীন বোধ করেন না। সেই কারণে ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য দাবি প্রতিষ্ঠার এবং অহিংস উপায়ে যে পর্যন্ত সম্ভব ব্যাপকভাবে

জাতি যাহাতে সুদীর্ঘ বাইশ বৎসরের শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে অর্জিত অহিংস শক্তি নিয়োজিত করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কমিটি গণ-আন্দোলনের অনুমতি দানের সিদ্ধান্ত করিতেছেন। এইরূপ একটি সংগ্রামের নেতৃত্ব মহাত্মা গান্ধীর উপরই ন্যস্ত থাকিবে। কমিটি তাঁহাকে অনুরোধ জানাইতেছেন যে, তিনি যেন জাতিকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করেন।

"কমিটি জনসাধারণের নিকট এই আবেদন জানাইতেছেন, তাহারা যেন ধৈর্য ও সাহসের সহিত সকল বিপদ ও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয় এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে অনুগত সৈন্য রূপে তাঁহার আদেশ পালন করে। তাহারা যেন স্মরণ রাখে যে, অহিংসাই এই আন্দোলনের ভিত্তি। এমন সময় উপস্থিত হইবে যখন হয়ত বিভিন্ন আদেশ জনসাধারণের নিকট যাইয়া পৌঁছাইবে না। কোনও কংগ্রেস কমিটির অস্তিত্ব থাকিবে না। এইরূপ ঘটনা যখন ঘটিবে, তখন প্রত্যেক নর-নারী প্রচারিত আদেশের সীমা লঙ্ঘন না করিয়া নিজেরাই কার্য সম্পন্ন করিবেন। মুক্তিকামী প্রত্যেক ভারতবাসী যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হইবেন, তখন তাহারা স্বয়ং আপন পথপ্রদর্শক হইয়া আপনাদের সেই বন্ধুর পথে চালিত করিবেন যে পথে বিশ্রামের স্থান নাই, কিন্তু যে পথ শেষে স্বাধীনতা এবং ভারতের মুক্তিতে মিশিয়া গিয়াছে।"

নির্দেশিকা

গ্রন্থপঞ্জী

কন্‌গ্রেসের পূর্বযুগ

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনী ইঃ পাঃ হাউস ১৯১৬।

অনাথনাথ বসু—মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ। ১৩২৭। ৪৯৫ পৃঃ।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—হিন্দু সমাজের ইতিহাস। ২ খণ্ড। ১৩৪০। ৬১১পৃঃ।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস—অষ্টাদশ শতাব্দী; নবাবী আমল। ১৩১৫। ৫৭৬+২৪ পৃঃ।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলার উনবিংশ শতাব্দী। ১৩৩৪। ৪১৭ পৃঃ।

গৌরগোবিন্দ রায়—আচার্য্য কেশবচন্দ্র। শত বার্ষিকী সংস্করণ। ৩ খণ্ড। ১৩৪৫। (১—৭০৪)+(৭০৫—১৪৩৬)+(১৪৩৭+২৩০২ পৃঃ।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর ১৩০২। ৫৪২ পৃঃ।

চণ্ডীচরণ সেন—মহারাজ নন্দকুমার

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি; বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত। ১৩২৬। ২৯০ পৃঃ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—ঝাঁসীর রাণী। ১৩১০। ৭৩ পৃঃ।

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়—পলাশির যুদ্ধ। ১৩৬৩। ১৯৭ পৃঃ।

দীনবন্ধু মিত্র—নীলদর্পণ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ভূমিকাসহ। ১৩২৮। ১৮৮ পৃঃ। প্রথম প্রকাশ, ১৭৮২ শকাব্দ।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্রোহে বাঙ্গালী বা আমার জীবনচরিত। ১৩৬৪। ৪১৮ পৃঃ।

দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়—সিপাহী যুদ্ধ। ১৩৩৮।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আত্মজীবনী। ১৩৩৯। ৪৭৮ পৃঃ।

নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রাজা রামমোহন রায়। ১৩১৭। ৭৪২ পৃঃ।

প্যারীচাঁদ মিত্র—ডেভিড হেয়ার। ১২৮৫। ২৬ পৃঃ।

প্রমোদ সেনগুপ্ত—ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, ১৮৫৭। ১৩৬৪। ৩৬৩ পৃঃ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আনন্দমঠ। ১৩৫৮। ১৫৩ পৃঃ।

বিনয় ঘোষ—বাঙলার নব জাগৃতি ; ১ম খণ্ড। ১৩৫৫। ২০৮ পৃঃ।
বিপিনচন্দ্র পাল—আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ। ১৩২৯। ১৫ পৃঃ।
নবযুগের বাংলা। ১৩৬২। ৩০৩ পৃঃ।
বিবেকানন্দ (স্বামী)—বর্তমান ভারত। ১৩২৬। ৪৩ পৃঃ।
ভূদেব চরিত—৩ খণ্ড। ১৩২৪। ৪১৮+৩৮৬+৪৭৪ পৃঃ।
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সিপাহী বিদ্রোহ বা মিউটিনি। ১৩১২। ৫৩৪ পৃঃ।
মণি বাগচি—কেশবচন্দ্র। ১৩৬৬। ১৮৪ পৃঃ।
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস। ১৩৬৪। ৩৬৪ পৃঃ।
রামমোহন, জিজ্ঞাসা। ১৯৫৮।
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। ১৩৬১। ২৪৭ পৃঃ।
মন্মথনাথ ঘোষ—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ। ১৩২২। ১২৫ পৃঃ।
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য—ঝাঁসির রাণী। ১৩৬৩। ৩৩৮ পৃঃ।
মোহিতলাল মজুমদার—বাংলার নবযুগ। ১৩৫২। ২৮৫ পৃঃ।
যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী—তীর্থ ভ্রমণ। ১৩২২। ১০৩+৬৪৭ পৃঃ।
সিপাহী-বিদ্রোহ বিবরণ। পৃঃ ৪৬০-৪৭২।
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—সুলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্রবাণী।
যোগেশচন্দ্র বাগল—উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। ১৩৪৮। ২৩৯ পৃঃ।
মুক্তির সন্ধানে ভারত।
কেশবচন্দ্র সেন ১৮৩৮—১৮৮৪। ১৩৬৫। ১২৮ পৃঃ।
জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ। ১৩৫৩। ২২৪ পৃঃ।
রজনীকান্ত গুপ্ত—সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস। ৫ খণ্ড। ১৩১৭। ২৬৪+২৪৪+২৬৮+৩১২+৪৫৫ পৃঃ।
নবভারত (স্যর হেনরী কটন-এর নিউ ইন্‌ডিয়ার বা পরিবর্ত্তন যুগের অনুবাদ)—গুরুদা, ১২৯৩ ভারত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চারিত্রপূজা। ১৩১১। ১০৪ পৃঃ।
রাজনারায়ণ বসু—বৃদ্ধ হিন্দুর আশা।
রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত। ১৩৫৯ সং ২৩৬ পৃঃ।
সেকাল আর একাল। ১৩৫৮ সং। ৯৬ পৃঃ।
রামগোপাল সান্ন্যাল—হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী। ১২৯৪। ৫৬ পৃঃ।

এল, নটরাজন—ভারতের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৫০-১৯০০)। পীযূষ দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক অনূদিত। ১৩৬০। ৯২ পৃঃ।

শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। ১৩১১। ৩৫১ পৃঃ।

শ্রীপতিচরণ রায়—হোমরুল। ১৩০০। ৩৮ পৃঃ।

সখারাম গণেশ দেউস্কর—ঝাঁসীর রাজকুমার। ১৩১৫। ৫২ পৃঃ।

সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—বিদ্রোহী রাজা রামমোহন। ১৩৪১। ৯২ পৃঃ।

সুন্দরানন্দ, (স্বামী)—জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ। ১৩৫৯। ২০১ পৃঃ

সুশীলকুমার গুপ্ত—উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ। ১৩৬৬। ২৭২ পৃঃ।

হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও কালিদাস মুখোপাধ্যায়।—১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ বা ডাঃ মজুমদার, ডাঃ সেন ও বিরুদ্ধ পন্থীদের আলোচনার পর্যালোচনা। ১৩৬৪। ৩৮ পৃঃ।

হেনরী জে, এম, কটন—নবভারত বা পরিবর্ত্তন যুগের ভারতবর্ষ। (রজনী-কান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক নিউ ইণ্ডিয়া পুস্তকের অনুবাদ) ১২৯৩। ১৭১ পৃঃ।

কন্‌গ্রেস

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—মহাজাতি গঠন পথেঃ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি। ১৩৫১। ২৯১+৫৬ পৃঃ।

এ্যানি বেশান্ত—দ্বাত্রিংশত্তম জাতীয় মহাসমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী এ্যানি বেশান্তের কংগ্রেস অভিভাষণ। কলিকাতা, ১৩২৪। ৫৯ পৃঃ

কংগ্রেস স্মারক গ্রন্থ। ৫৯ তম অধিবেশন। ১৩৬১। ৯২ পৃঃ।

গোপালচন্দ্র রায়—কংগ্রেসের ইতিবৃত্ত (১৮৮৫—১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭)। ১৩৫৬। ১৫৩ পৃঃ।

গোপাল ভৌমিক—ভারতের মুক্তি সাধক। ১৩৫২। ১২৮ পৃঃ

চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—কংগ্রেস সংগঠনে বাংলা। ১৩৫১। ৮৬ পৃঃ।

জওহরলাল নেহরু—আত্মচরিত [সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক অনূদিত]। ১৩৫৫। ৬৭২ পৃঃ।

জওহরলাল নেহরু—পত্রগুচ্ছ; অধিকাংশ চিঠি জওহরলাল নেহরুকে লেখা এবং কিছু চিঠি নেহরু কর্তৃক লিখিত। ১৩৬৭। ৪৫৩+৩ পৃঃ।

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ। ১৩৬৫। ৯৪২ পৃঃ।

ভারত সন্ধানে [ক্ষিতীশ রায়-কর্তৃক অনূদিত]। ১৩৫৬। ৬৫৮ পৃঃ।

জীবনকুমার ঠাকুরতা—দাদা ভাই নৌরোজী, ১৩৩১। ১৩৪ পৃঃ।

জ্ঞানেন্দ্রকুমার—লাজপৎ রায়। ১৩২৮। ৪০ পৃঃ।

ধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার—ভারতের স্বরাজ-সাধক। [১৩৩০]। ১৮৯ পৃঃ।

লালা লাজপত রায়। ১৩২৮। ১৬২ পৃঃ।

নগেন্দ্রকুমার গুহরায়—ডাঃ বিধান রায়ের জীবন-চরিত। ১৩৬৭। ৩৬০ পৃঃ।

পূরণচন্দ্র যোশী—কংগ্রেস-লীগ মিলনের পথে স্বাধীন হও। ১৩৫২। ৭৮ পৃঃ।

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া। ১৩৩৯। ১১১ পৃঃ।

প্রমথনাথ পাল—দেশপ্রাণ শাসমল। ১৩৪৫। ২০০ পৃঃ।

বসন্তকুমার দাস—কংগ্রেস বাণী। ১৩৩৭। ১০ পৃঃ।

বিজয়রত্ন মজুমদার—সুন্দর ভারত। ১৩৫৫। ২৫৬ পৃঃ।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনতন্ত্র। ১৩৫৬। ১৬ পৃঃ।

মধুসূদন মজুমদার—দেশপ্রেমিক বিপিনচন্দ্র। ১৩৫৬। ৪৭ পৃঃ।

মোহাম্মদ শামসুর রহমান চৌধুরী—মহম্মদ আলী। ১৩৩৮। ১০০ পৃঃ।

যোগেশচন্দ্র বাগল—জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী। ১৩৬১। ৫৪ পৃঃ।

মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত। ১৩৪৭। ৪৮৭ পৃঃ।

রেজাউল করীম—মনীষী মওলানা আবুল কালাম আজাদ। ১৩৬৫। ১১৮ পৃঃ।

সতীশচন্দ্র গুহ—যাঁদের ডাকে জাগল ভারত। ১৩৫৫। ১৭৫ পৃঃ।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—কংগ্রেস। ১৩২৮। ৬৪ পৃঃ।

সুধীরকুমার সেন—মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। ১৩৫৪। ১০৪ পৃঃ।

সুরেন্দ্রচন্দ্র ধর—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। ১৩৪১। ৫৫৩ পৃঃ।

স্বপনকুমার—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৩৬০। ১৬ পৃঃ।

হুমায়ুন কবীর—মোসলেম রাজনীতি ; ২য় সংস্করণ। ১৩৫২। ৭৬ পৃঃ।
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। ৩ খণ্ড। ১৩৫৪। (২২৩+৪)+(২১০+৬)+২০২ পৃঃ।
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—কংগ্রেস ; ৩য় সংস্করণ। ১৩৩৫। ৫৭৫ পৃঃ।

অন্যান্য দল

কম্যুনিস্ট পার্টি—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও কম্যুনিস্ট পার্টির ঘোষণা। (১৩৪৬ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)
খেলাফৎ সম্বন্ধে দুটি কথা। ১৩২৭। ১২ পৃঃ।
পূরণচন্দ্র যোশী—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অভিযোগের উত্তরে কমিউনিস্টদের জবাব। [১৩৫৩] ৩২৮+৮৪+৭৬ পৃঃ।
বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসম্মেলন ; সভাপতির অভিভাষণ। তারকেশ্বর। ১৩৩৩। ১৬ পৃঃ।
বিনয় ঘোষ—ফ্যাসিজম্ ও জনযুদ্ধ। ১৩৪৯। ১১৪ পৃঃ।
ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার কর্মপদ্ধতি। ১৩২৭। ১৬ পৃঃ।
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী—কায়েদে আজাম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্। ১৩৫৫। ১০০ পৃঃ।
যতীন্দ্রনাথ মজুমদার সংকলিত—স্বরাজ্যদলের কীর্তি। ১৩৩০। ২৯ পৃঃ।
রাজেন্দ্রপ্রসাদ—মুসলীম লীগ কী চায়। ১৩৫৩। ২৫ পৃঃ।
শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী—ভারতীয় রাজনীতি ও ডায়ালেক্‌টিক। ১৩৫৫। ১৪২ পৃঃ।
সমর গুহ—প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির জন্ম ও ভূমিকা। ১৩৬১। ৬৩ পৃঃ।
হীরেন মুখোপাধ্যায়—ভারতবর্ষ ও মার্ক্সবাদ। ১৩৫০। ১০৩+৬৫ পৃঃ।

বিপ্লব যুগ

অজয় ঘোষ—ভগৎ সিং—তাঁর সহকর্মীরা। ১৩৫৩। ৫২ পৃঃ।
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য—ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা। ১৩৬৫। ১৬৮ পৃঃ।

অমিয়নাথ বসু—দিল্লী চলো।

অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ)—অরবিন্দের পত্র।

কারাকাহিনী। চন্দননগর। ১৩২৮। ৯৬ পৃঃ।

অরুণচন্দ্র গুহ—বিদ্রোহী প্রাচ্য। (১৩৪২ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

অসীমানন্দ সরস্বতী—বিপ্লবের শিখা। ১ম খণ্ড। ১৩৬২। ১৪২ পৃঃ।

আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত—চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী। ১৩৫৫। ২৪৮ পৃঃ।

মাষ্টারদা। ১৩৫৫। ১০৮ পৃঃ।

আবদুল্লা রসুল—সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী। ১৩৬১। ২৪ পৃঃ গ্রন্থপঞ্জী।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেন। ১৩৬৩। ২১৪ পৃঃ।

ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র—শহীদ ক্ষুদিরাম। ১৩৫৫। ২০১ পৃঃ।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নির্বাসিতের আত্মকথা ৩য় সং। ১৩৫৩। ১৩২ পৃঃ।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—ভারতপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ। ১৩৫৭। ১৯২ পৃঃ।

উল্লাসকর—কারাকাহিনী।

কমলা দাশগুপ্ত—রক্তের অক্ষরে। ১৩৬১। ১৯৮ পৃঃ।

কল্পনা দত্ত—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা। (১৩৫২ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

ক্ষুদিরাম ; জীবনী। ১৩৫৫। ২০১ পৃঃ।

গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য—স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ১৩৫৬। ২য় খণ্ড।

গোপালচন্দ্র রায়—শহীদ। ১৩৫৫। ১০১ পৃঃ।

চারুবিকাশ দত্ত—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। ১৩৫৫। ২৯১ পৃঃ।

চন্দ্রকান্ত দত্ত—বাংলার বিপ্লবী। ১৩৫৬। ১৪৮ পৃঃ।

শহীদ সূর্য সেন। ১৩৫৬। ২২ পৃঃ।

ছবি রায়—বাংলার নারী আন্দোলন। ১৩৬২। ১৭৭ পৃঃ।

জওহরলাল নেহরু—কারাজীবন ও কোন্ পথে ভারত ? ১৩৫৫। ৯২ পৃঃ।

জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী—পথের পরিচয়। ১৩৬৩। ১১৫ পৃঃ। [অগ্নিযুগের কথা]

বিপ্লবী বীর নলিনী বাগ্‌চী। (১৩৩৭ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

বিপ্লবের তপস্যা। ১৩৫৬। ১১৮ পৃঃ।

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী—বিপ্লবী বাংলা। (১৩৩৬ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)
তারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী—বিপ্লবী ভারত। ১৩৫৫। ১৩৩ পৃঃ।
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী—জেলে ত্রিশ বছর। ১৩৫৫। ১৭৯ পৃঃ।
দীনেন্দ্রকুমার রায়—অরবিন্দ প্রসঙ্গ। ১৩৩০। ৮৪ পৃঃ।
দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়—মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী। ১৩৫৭। ১৪২ পৃঃ।
দেবপ্রসাদ ঘোষ—সতের বৎসর পরে। ১৩৪৫। ১২৯ পৃঃ।
দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়—তখন আমি জেলে। ১৩৬৩। ৫১১ পৃঃ।
ধীরেন্দ্রলাল ধর—স্বাধীনতার সংগ্রাম। ১৩৫৫। ১৩৬ পৃঃ।
নগেন্দ্রকুমার গুহ—স্বাধীনতার কথা। ১৩৩২। ১৬৭ পৃঃ।
নগেন্দ্রকুমার রায়—শহীদ যুগল। ১৩৫৫। ২৫২ পৃঃ।
স্বরাজ সাধনায় বাঙ্গালী ১ম ভাগ ১৩৩০] ২০৮ পৃঃ।
নজরুল ইসলাম—চন্দ্রবিন্দু (১৩৩৭ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)
বিষের বাঁশী। [১৩৩১ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত]
নলিনীকিশোর গুহ—বাঙ্গলায় বিপ্লববাদ। [নূতন সং দ্র.] ১৩৩০। ১৭১ পৃঃ।
বিপ্লবের পথে। ১৩৩৩। ১০৩ পৃঃ।
নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। রক্তবিপ্লবের এক অধ্যায়। ১৩৬১। ১৫৪ পৃঃ।
স্বাধীনতা পূজারী শ্রীশ্রীশচন্দ্র মিত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামে কলিকাতায় পিস্তল লুঠ। ১৯১৪। ১৩৫৫। ১৬ পৃঃ।
নিরঞ্জন সেন—বীর ও বিপ্লবী সূর্য সেন। ১৩৫৩। ২৫ পৃঃ।
নীহাররঞ্জন গুপ্ত—বিদ্রোহী ভারত। ৩ খণ্ড।
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—অবিস্মরণীয় মুহূর্ত ; ২য় সং। ১৩৬২। ২১৫ পৃঃ।
উনিশ শ' পাঁচ। ১৩৫৬। ১৪৭ পৃঃ।
কানাইলাল। ১৩৫৬। ৪৭ পৃঃ।
বাঘা যতীন। ১৩৫৭। ৪৫ পৃঃ।
বারীন ঘোষ। ১৩৫৯। ৪২ পৃঃ।
বীর সাভারকর। ১৩৫৮। ৪৭ পৃঃ।
মাতঙ্গিনী হাজরা। ১৩৫৮। ৪৬ পৃঃ।
সত্যেন বসু। ১৩৫৭। ৪৫ পৃঃ।

পদ্মনাভ—বিপ্লবের সপ্তশিখা। ১৩৫৬। ১২৫ পৃঃ।

পুলকেশচন্দ্র দে সরকার—১। বিপ্লব পথে ভারত। [১৩৩৬ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত]

২। ফাঁসীর আশীর্বাদ ; ২য় সং। ১৩৫৬। ১০৬ পৃঃ।

পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত—বিপ্লবের পথে। ১৩৬৪। ২৫৫ পৃঃ।

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—বিপ্লবী যুগের কথা। ১৩৫৫। ১০৪ পৃঃ।

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—মুক্তিপথে। [১৩৩৭ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত]

প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী—বিপ্লবী জীবন। ১৩৬১। ২০১ পৃঃ।

প্রমোদকুমার—শ্রীঅরবিন্দ (জীবন ও যোগ)। ১৩৪৬। ২৩০ পৃঃ।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়—কাজী নজরুল। ১৩৬২। ১২০ পৃঃ।

প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়—বিপ্লব ও ছাত্রসমাজ। [১৩৩২ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত]

বঙ্গ বিভাগ। ১৩৫৪। ৭০ পৃঃ।

বাঘা যতীন (চন্দননগরের 'বিপ্রভাণ্ডার' হইতে প্রকাশিত)।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—দ্বীপান্তরের কথা। ১৩৩০। ১০৮ পৃঃ।

পথের ইঙ্গিত। ১৩৩১। ৬৭ পৃঃ।

মানুষ গড়া। ১৩৩৩। ৭৫ পৃঃ।

মায়ের কথা।

বাস্তুহারা—স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী। ১৩৫৯। ৫৩ পৃঃ।

বিজনবিহারী বসু—কর্মবীর রাসবিহারী। ১৩৬৩। ৩৪৪ পৃঃ।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—কালের ভেরী। (১৩৩৭ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

বিদ্রোহীর স্বপ্ন। ১৩৪৬। ৬২ পৃঃ।

স্বরাজ সাধন। (১৩২৯ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদক—স্বাধীনতার অঞ্জলি। ১৩৫৫। ১৬০ পৃঃ।

বিমলপ্রতিভা দেবী—নতুন দিনের আলো। (১৩৩৬ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

বীণা দাস—শৃঙ্খল ঝংকার। ১৩৫৫। ১৮৭ পৃঃ।

ব্রজবিহারী বর্মণ রায়—ক্ষুদিরাম। ৩য় সংস্করণ। ১৩৬০। ১০৩ পৃঃ।
(১৩৩১ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)
তরুণ বাংলা। (১৩৩৫ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)
ফাঁসীর সত্যেন। (১৩৩৭ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)
বিপ্লবী কানাইলাল। ১৩৫৪। ৭০ পৃঃ।
বীর বাঙ্গালী যতীন দাস। (১৩৪২ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়—বিপ্লবতীর্থে (বিনয়, বাদল, দীনেশ)। ১৩৫৩। ২১৯ পৃঃ।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস; নব সংস্করণ। ১৩৬০। ৩৫৩ পৃঃ।

ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত—যুগ সমস্যা। ১৩৩৩। ৮০ পৃঃ।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু—ঋষি অরবিন্দ। ১৩৪৭। ১১১ পৃঃ।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গলা মায়ের শহীদ ছেলে। ১৩৫৫। ১৫০ পৃঃ।

মণীন্দ্রনারায়ণ রায়—কাকোরী ষড়যন্ত্র। ১৩৫৫। ১২৬ পৃঃ। (১৩৩৬ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

মতিলাল রায়—আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী। ১৩৬৪। ১৬৫ পৃঃ।
কানাইলাল (সচিত্র)।
শতবর্ষের বাংলা। (১৩৩২ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত) প্রবর্তক, ১৩৩০ আশ্বিন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

মদনমোহন ভৌমিক—আন্দামানে দশ বৎসর। ১৩৩৭। ১২৪ পৃঃ।

মন্মথনাথ গুপ্ত—কাকোরী ষড়যন্ত্রের স্মৃতি। ১৩৬৬। ১৫৬ পৃঃ।

মৃত্যুঞ্জয় দে—শহীদ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। ১৩৫৫। ৩২ পৃঃ।

মোহিত মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক—বিপ্লবী বাংলা। ১৩৫৪। ৪৭ পৃঃ।

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি। ১৩৬৩। ৬৬৭ পৃঃ।

রবীন্দ্র কুমার বসু—মুক্তি সংগ্রাম। ১৩৫৬। ৩৬৭ পৃঃ।

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রদ্ধানন্দ। ১৩৩৪। ১৪৮ পৃঃ।

রাখাল ঘোষ—বিপ্লবী অবনী মুখার্জি।

রাজকমল নাগ—বিপ্লব যুগের যুগল বলি। ১৩৬২। ২৫৬ পৃঃ।

রাজেন্দ্রলাল আচার্য—বিপ্লবী বাংলা বা স্বাধীনতার ইতিহাস। ১৩৫৬। ৫৩৬ পৃঃ।

রাসবিহারী বসু—আত্মকাহিনী। [‘প্রবর্তক’ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত]।

ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়—বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ।

শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়—বাঘা যতীন। ১৩৬৫। ১৩৪ পৃঃ।

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল—বন্দী-জীবন। ২ খণ্ড।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—পথের দাবী। ১৩৬৩। ৪২৮ পৃঃ। (১৩৩৩ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

শহীদ স্মৃতি কথা—স্বদেশী যুগ হইতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যন্ত শহীদদের প্রতিকৃতি সহ জীবন কাহিনী ১৩১১-১২—১৩৫৩-৫৪ বঙ্গাব্দ। ১৩৬৩। ১৬০ পৃঃ।

শান্তি দাস—অরুণ-বহ্নি। ১৩৫৮। ১২৯ পৃঃ।

শৈলেশ বসু—ভারতীয় বিপ্লবের গোড়াপত্তন ও ক্রমবিকাশ। ১৩৫৭। ১৯৪ পৃঃ।

সঞ্জয় রায়—বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জী। ১৩৬০। ২৮ পৃঃ।

সতীশ পাকড়াশী—অগ্নিদিনের কথা। ১৩৫৪। ২১৩ পৃঃ।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু—বিপ্লবী রাসবিহারী। ১৩৫৫। ১২১ পৃঃ।

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার—বন্দী জীবন। ১৩৬৫। ১০৬ পৃঃ।

সান্ত্বনা গুহ—অগ্নিমন্ত্রে নারী। [এই গ্রন্থখানি শান্তিনিকেতনের শ্রীসুধাময়ী মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গীত হইয়াছিল] (১৩৩৯ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)।

সুধীরকুমার মিত্র—মহাবিপ্লবী রাসবিহারী। ১৩৫৫। ২০৭ পৃঃ।

মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই। ১৩৫৫। ১২৬ পৃঃ।

সুপ্রকাশ রায়—ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস। ১৩৬২। ৬৫২ পৃঃ।

সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী—মরণজয়ী যতীন্দ্র নাথ দাস। ১৩৩৬। ১৮৮ পৃঃ।

সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়—অগ্নিযুগের অগ্নিকথা। ১৩৫৬। ২৯১ পৃঃ।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বন্দী। (১৩৩২ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

মশাল। (১৩৪১ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

স্বদেশরঞ্জন দাস—সর্বহারার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি। (১৩৪৩ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিপ্লবী তারকদাস। ১৩৬৫। ৪০ পৃঃ।

হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রক্ত বিপ্লবের এক অধ্যায়। ১৩৬১। ১৫৪ পৃঃ।

হেমচন্দ্র কানুনগো—বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা।

হেমন্তকুমার সরকার—পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সম্মেলন, প্রথম অধিবেশন ৩১-১২-৪৬ ; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত হেমন্তকুমার সরকারের অভিভাষণ। ১৩৫৩। ১০ পৃঃ।

বন্দীর ডায়েরী ১৩২৯। ১৩৪ পৃঃ।

বিপ্লবের পঞ্চ ঋষি।

হেমন্ত চাকী—অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী। ১৩৫৯। ১৮৪ পৃঃ।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও ওঙ্কারনাথ গুপ্ত—বিপ্লবী ভারতের কথা। ১৩৫৬। ১৩০ পৃঃ।

ভারতের বিপ্লব কাহিনী। ৩ খণ্ড। ১ম খণ্ড, ১৩৫৪ ; (২য় ও ৩য় খণ্ড) ১৩৫৫। ২২৮+২৫৭ পৃঃ।

‘স্বদেশী’ যুগ

অনিলবরণ রায়—স্বরাজের পথে। ১৩২৮। ৫৪ পৃঃ।

অপর্ণা দেবী—মানুষ চিত্তরঞ্জন। ১৩৬২। ৩৪৭+৩ পৃঃ।

অভেদানন্দ—ভারতীয় সংস্কৃতি। ১৩৬৪। ৩০৩ পৃঃ।

অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ) ধর্ম ও জাতীয়তা। ১৩২৭। ১০৯ পৃঃ।

ভারতের নবজন্ম। ১৩৩২। ১০৮ পৃঃ।

অরুণচন্দ্র গুহ—দেশ পরিচয়। (১৩৩৬ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

উমাকান্ত হাজরা—বঙ্গ জাগরণ ও স্বদেশের নানা কথা। ১৩১৩। ১০৬ পৃঃ।

ঋষি দাস—লোকমান্য তিলক। ১৩৬৪। ৮৫ পৃঃ।

কালিদাস মুখোপাধ্যায়—মুক্তি আন্দোলনে অভেদানন্দ। ১৩৫৫। ৬৪ পৃঃ।

কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। ১৩৩৫। ২৪৪ পৃঃ।

গিরজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ। ১৩৬৩। ৮৩৬পৃঃ।

চারুচন্দ্র বসু মজুমদার—বর্তমান সমস্যা ও স্বদেশী আন্দোলন। ১৩১২। ৪৬ পৃঃ।

চিত্তরঞ্জন দাস দেশবন্ধুর ব্রজবাণী। ১৩৩২। ৭৪ পৃঃ।

দেশের কথা। ১৩২৯। ১৪৩ পৃঃ।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—দেশবন্ধু—দেশপ্রিয়। ১৩৪৭। ১৭৯ পৃঃ।

দেবজ্যোতি বর্মণ—বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধনা। ১৩৬৪। ১৫২ পৃঃ।

নলিনীকান্ত গুপ্ত—স্বরাজের পথে। ১৩৩০। ১১৫ পৃঃ।

নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারতের বাণী ও যুগবার্তা। ১৩২৯।

প্রফুল্লকুমার সরকার—জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ; ২য় সং। ১৩৫৪। ১১৬ পৃঃ।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়—আত্ম-চরিত। ১৩৪৪। ৫৫৭ পৃঃ।

জাতিগঠনে বাধা—ভিতরে ও বাহিরের। ১৩২৮। ১৬ পৃঃ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—১। ভারতে জাতীয় আন্দোলন বা জাতীয় অভিব্যক্তি। ১৩৩২। ২৯৯ পৃঃ।

ভারত পরিচয় ২য় সংস্করণ।

প্রিয়নাথ গুহ—যজ্ঞভঙ্গ বা বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির ইতিহাস। ১৩১৪। ১৪৩+১৭৩ পৃঃ।

বালগঙ্গাধর তিলক। ১৩২৭। ৯৬ পৃঃ।

বিজয়লাল চট্টোপাধায়—বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ। (১৩৩৯ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

মতিলাল রায়—স্বদেশী যুগের স্মৃতি। ১৩৩৮। ১৭২ পৃঃ।

মুকুন্দ দাস—পথের গান। (১৩৩৯ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

মুরারীমোহন ঘোষ—বন্দীর ব্যথা। (১৩২৯ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

রজনীপামে দত্ত—আজিকার ভারত; ২ খণ্ড।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আত্মশক্তি। ১৩১২। ১৭৪ পৃঃ।

কালান্তর। ১৩৫৬। ৩৯১ পৃঃ। প্রথম প্রকাশ ১৩৪৪।

দেশের কাজ। ১৩৩৯। ৫ পৃঃ।

বাউল (গান) ১৩১২।

ভারতবর্ষ। ১৩১২। ১৫৪ পৃঃ।

রাজা প্রজা। ১৩২৭। ১৬২ পৃঃ।

৭। সত্যের আহ্বান; শিক্ষার মিলন। ['প্রবাসী' পত্রিকা ১৩২৯ দ্রষ্টব্য]।
সমস্যা; সমস্যার সমাধান। [প্রবাসী' পত্রিকা ১৩২৯ দ্রষ্টব্য]।
সমাজ। ১৩১৫। ১৫৮ পৃঃ।
সমূহ। ১৩১৫। ১২১ পৃঃ।
স্বদেশ। (কবিতা) ১৩১২। ১৪৫ পৃঃ।

রাজকুমার চক্রবর্তী—লোকমান্য তিলক। ১৩৪৩। ৭৯ পৃঃ।

লোকমান্য তিলক। ১৯২০। ৮০ পৃঃ।

শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়—শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন। ১৩৬৫। ১২১ পৃঃ।

শরৎকুমার রায়—মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত।

শৈলেশনাথ বিশী—বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন। ১৩৬৩। ১৪৩ পৃঃ।

সখারাম গণেশ দেউস্কর—দেশের কথা। ১ম ভাগ। ১৩১৪ ৩৫৪+৩৭ পৃঃ।
তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী।

সরোজকুমার সেন—ভারতে মুক্তির পন্থা। ১৩২৮। ১৬ পৃঃ।

সরোজনাথ ঘোষ—গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতাবলী। ১৩২৮। ১০৭+৮৬ পৃঃ।

সুকুমার রঞ্জন দাস—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। ১ম সং ১৩২৮ পৃ. ১৩৪। ১৩৪৩। ২৪৩ পৃঃ।

সুধাকৃষ্ণ বাগচী, সম্পাদক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ধারাবাহিক জীবনী। ১৩৩৩। ২৫৫ পৃঃ।

সুধীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—অশ্বিনী কুমার। ১৩৩০। ৫ পৃঃ।

সুরেন্দ্রনাথ সেন—অশ্বিনী কুমার দত্ত। ১৩৩৮। ৭১ পৃঃ।

হেমন্তকুমার সরকার—স্বরাজ কোন্ পথে? ১৩২৯। ৫৬ পৃঃ।

হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত—দেশবন্ধু-স্মৃতি। ১৩৬৬। ৪৩০ পৃঃ।

অসহযোগ

অরুণচন্দ্র গুহ—সত্যাগ্রহ ও পাঞ্জাব কাহিনী। ১৩২৮।

ইন্দুভূষণ সেন—স্বরাজ। ১৩২৮। ৬৪ পৃঃ।

উপেন্দ্রনাথ কর—সত্যাগ্রহ ও পাঞ্জাব কাহিনী। ১৩২৮। ১৩০ পৃঃ।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বর্তমান সমস্যা। ১৩২৭।

ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ। n. d.। ১৪ পৃঃ।

জিবতরাম ভগবানদাস কৃপালনী—অহিংস বিপ্লব। [ধীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত]। ১৩৫৫। ৪৮ পৃঃ।

ডায়ার ও পাঞ্জাব কাহিনী। ১৩২৮। ৭৫ পৃঃ।

নিশিথনাথ কুণ্ডু—অহিংসা অসহযোগের কথা। ১৩৩৩। ৫৪ পৃঃ।

প্রকাশচন্দ্র মজুমদার—সহযোগিতা বর্জ্জন। ১৩২৭। ৩৮ পৃঃ।

বিমলা দাসগুপ্তা—ত্রয়ী (গান্ধী, মহম্মদ আলী, চিত্তরঞ্জন)। ১৩২৭। ৭৭ পৃঃ।

বীণাপাণি দাস, সম্পাদিকা, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বা স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অধ্যায়। [১৩৩৭]। ১১১ পৃঃ।

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত—চম্পারণে সত্যাগ্রহ। ১৩৩৮। ১১৩ পৃঃ।

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী—আগষ্ট বিপ্লব (১৯৪২); ১ম খণ্ড। ১৩৫৩।

পাকিস্তান-আন্দোলন

গঙ্গাধর অধিকারী—পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য। ১৩৫১। ১০০ পৃঃ।

মহম্মদ হবীবুল্লা—পাকিস্তান। ১৩৪৮। ১০৬ পৃঃ।

মুজীবুর রহমান খাঁ—পাকিস্তান। ১৩৪৯। ২৩৮ পৃঃ।

রেজাউল করিম—জাতীয়তার পথে। ১৩৪৬। ২২০ পৃঃ।

পাকিস্তানের বিচার। ১৩৪৯। ১৪২ পৃঃ।

গান্ধী-সাহিত্য

অতুল্য ঘোষ—অহিংসা ও গান্ধী। ১৩৬১। ১০৮ পৃঃ।

অনাথগোপাল সেন—জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজীর অর্থনীতি। ১৩৫২ ৯০ পৃঃ।

অনাথনাথ বসু—গান্ধীজী। ১৩৫৫। ৮৪ পৃঃ।

ঋষি দাস—গান্ধী-চরিত। ১৩৫৫। ৩৯৯ পৃঃ।

কানাই বসু নোয়াখালির পটভূমিকায় গান্ধীজী; ১ম পর্ব। ১৩৫৩। ২০৮ পৃঃ।

কিশোরলাল মশরুওয়ালা—গান্ধী ও মার্কস। ১৩৬৩। ১৩৪ পৃঃ।

কৃষ্ণদাস—মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাত মাস, ১ম খণ্ড। ১৩৩৫। ৫৩৮ পৃঃ।

গোপালচন্দ্র রায়—মহাত্মা গান্ধীর শান্তি-অভিযান। ১৩৫৪। ৮৮ পৃঃ।

দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য—অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনে মহাত্মাজী। ১৩৫৬। ৭৪ পৃঃ।

নির্মল কুমার বসু— গান্ধীচরিত। ১৩৫৬। ২৩০ পৃঃ।

গান্ধীজী কি চান। ১৩৬৫। ৮৬ পৃঃ।

স্বরাজ ও গান্ধীবাদ। ১৩৫৪। ২১৫ পৃঃ।

বিজয়ভূষণ দাসগুপ্ত—মহামানব মহাত্মা। ১৩৫০। ১৭০ পৃঃ।

বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়—মৃত্যুঞ্জয় গান্ধীজী। ১৩৫৪। ১৬৪ পৃঃ।

বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী—গান্ধী হত্যার কাহিনী। ১৩৫৫। ৩৯৯ পৃঃ।

মতিলাল রায়—অনশনে মহাত্মা। ১৩৩৯। ১৯৭ পৃঃ।

মনোজমোহন বসু—যুগাবতার গান্ধী। (১৩২৮ সালে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

মহম্মদ নাজমোদ্দিন—মহাত্মা গান্ধীর ভ্রম। ১৩৩৩। ২৪ পৃঃ।

মহাদেব দেশাই—সিংহলে গান্ধীজী [সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক অনূদিত]। ১৩৩৮। ২০৪ পৃঃ।

মহাত্মা গান্ধী—কথা ও জীবনী। ১৩৩৭। ২২ পৃঃ।

মহীতোষ রায়চৌধুরী সম্পাদিত—মহাত্মাজীর তিরোধানে। ১৩৫৪। ৩২+২৮+৭২+৫২ পৃঃ।

মোহন দাস করমর্চাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী)—আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ। [সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক অনূদিত]। ১৩৩৩। ৩২৪ পৃঃ।

আমাদের স্বরাজ (ইণ্ডিয়ান হোমরুল এর বঙ্গানুবাদ)। ১৩৩৪। ৮৮ পৃঃ।

গঠন-কর্ম্ম-পন্থা।

গান্ধী গভর্নমেণ্ট পত্রালাপ (১৯৪২ – ১৯৪৫) অনুবাদক নরেন্দ্র দে]। ১৩৫২। ৪০৬ পৃঃ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ। ১৩৩৮। ৪৬০ পৃঃ।

বিলাতে ভারতের দাবী [হেমেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক অনূদিত]। ১৩৩৯। ১৫৬ পৃঃ।

ভারত-ভাস্কর মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা ও উপদেশ। ১৩২৮। ২১ পৃঃ।

মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা ও উপদেশ। ১৩২৮। ৭৮ পৃঃ।

স্বরাজ। ১৩২৮। ১০ পৃঃ।

স্বরাজের পথে। ১৩২৭। ২২ পৃঃ।

হিন্দ্ স্বরাজ্য। ১৩৩৭। ১১৪ পৃঃ।

হিন্দু ধর্ম্ম ও অস্পৃশ্যতা। ১৩৩৯। ১০৭ পৃঃ।

এম্, এল, দান্তওয়ালা—গান্ধীবাদের পুনর্বিচার। ১৩৫৩। ৫৩ পৃঃ।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত – গান্ধীজীর জীবন যজ্ঞ। ১৩৫৮। ২০৮।

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সত্যাশ্রয়ী বাপুজী। ১৩৫৬। ১৬৯+৫ পৃঃ।

যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মহাত্মা গান্ধী। ১৩২৫। ১২৩ পৃঃ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মহাত্মা গান্ধী। প্রবন্ধ ও অভিভাষণ। প্রকাশিত ১৯৪৮।

লুই ফিশার—গান্ধী ও ষ্টালিন। ১৩৫৮। ২৮২ পৃঃ।

শিবদাস চক্রবর্ত্তী—হারিয়ে যারে জগত কাঁদে (মহাত্মা গান্ধীর সম্পূর্ণ জীবনালেখ্য)। ১৩৫৫। ১৮৯ পৃঃ।

শৈলেশ বসু—মহামানব। ১৩৫৫। ১৮৮ পৃঃ।

গান্ধীজীর জীবন চরিত।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—গান্ধী ও বিপিনচন্দ্র। ১৩২৮। ২৪ পৃঃ।

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। ১৩২৮। ৩৫ পৃঃ।

গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন। ১৩২৮। ৪৪ পৃঃ।

গান্ধী না অরবিন্দ? ১৩২৭। ১৪ পৃঃ।

রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধী। ১৩২৮। ২৩ পৃঃ।

সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—মহামানবের জীবন কথা। ১৩৫৫। ৭৩ পৃঃ।

গান্ধীজীর জীবন চরিত।

সুধীরকুমার মিত্র—আমাদের বাপুজী। ১৩৫৪। ১১২ পৃঃ।

সুবোধকুমার ঘোষ—অমৃত পথ যাত্রী। ১৩৫৯। ১৯০ পৃঃ।

"এই পুস্তকে বেশির ভাগ গান্ধী কথিত ব্যাখ্যার সাহায্যেই গান্ধীর জীবন ও নীতির তাৎপর্য বর্ণনার চেষ্টা করা হয়েছে।" —ভূমিকা, গ্রন্থকার।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—গান্ধীজীকে জানতে হলে। ১৩৫৪। ১৩৪ পৃঃ।

হেমেন্দ্রলাল রায় সঙ্কলিত—বিলাতে গান্ধীজী। ১৩৩৯। ৩০১ পৃঃ।

সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

অনিল রায়—নেতাজীর জীবন বাদ।

উমাপদ খাঁ—নেতাজীর পদক্ষেপ। ১৩৫৯। ৬৫ পৃঃ।

গোপাল ভৌমিক নেতাজী (নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনোপন্যাস)। ১৩৫৩। ১৬৪ পৃঃ।

জ্যোতিপ্রসাদ বসু—নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ। ১৩৫৩। ১৬৫ পৃঃ।

জ্যোতির্ময় ঘোষ—পলাশী হইতে কোহিমা। ১৩৫৬। ১২৮ পৃঃ।

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী—আজাদ হিন্দ ফৌজ। ২ খণ্ড। ১৩৫৫।

দিলীপকুমার রায় আমার বন্ধু সুভাষ। ১৩৫৫।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—সুভাষচন্দ্র। ১৩৫৯। ২৪২ পৃঃ।

প্রণবচন্দ্র মজুমদার—সুভাষ বাদের অ আ ক খ। ১৩৬১। ১২ পৃঃ।

বিদ্যারত্ন মজুমদার—আজাদ হিন্দের অঙ্কুর। ১৩৫২। ১৭১ পৃঃ।

বিশ্বেশ্বর দাস—রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র। ১৩৪৫। ১৮২ পৃঃ।

এম, জি, মুলকর—আজাদী সৈনিকের ডায়েরী। ১৩৫৪। ১৫১ পৃঃ।

মুকুন্দলাল ঘড়াই—নেতাজী। ১৩৫৬। ৭৪ পৃঃ।

যুগবানী—১৩৬৬ নেতাজী সংখ্যা।

শাহ্ নওয়াজ খান—আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও নেতাজী। ১৩৫৪। ৫৩০ পৃঃ।

সতীকুমার নাগ, সম্পাদক—আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। ১৩৫৩। ৯৬ পৃঃ।

সতীশচন্দ্র গুহ দেববর্মা—আমাদের নেতাজী। ১৩৫৬। ১০২ পৃঃ।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু—আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে। ১৩৫৫। ১৫৯ পৃঃ।

সমর গুহ—নেতাজীর মত ও পথ। ১৩৫৫। ১৮৪ পৃঃ।

সমীর ঘোষ—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কাহিনী। ১৩৫৩। ৬০ পৃঃ।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—জ্বলন্ত তলোয়ার। (১৩৫৮) ১১৮ পৃঃ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্র বসু—১। নূতনের সন্ধান। ১৩৩৭। ১৩২ পৃঃ।

বাংলার মা ও বোনেদের প্রতি। ১৩৫৩। ৫০ পৃঃ।

ভারত পথিক। ১৩৫৫। ১৯২ পৃঃ।

মুক্তি সংগ্রাম (১৯৩৫-৪২)। ১৩৬০। ১০৮ পৃঃ।

হেমন্তকুমার সরকার—সুভাষের সঙ্গে বারো বছর (১৯১২-২৪)। ১৩৫৬। ১৫২ পৃঃ।

স্বাধীনতার প্রাক্কাল ও ভারত বিভাগ

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন। ১৩৫৫। ২৫৯ পৃঃ।

কমলা দেবী ও অনিল সেন—স্বাধীনতার মূল্য। ১৩৫৫। ৯ পৃঃ।

গোপালচন্দ্র রায়—ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান। ১৩৫৪। ১২৮ পৃঃ

দুর্গাপদ তরফদার—জাগ্রত কাশ্মীর। ১৩৫৭। ২৩৬ পৃঃ।

দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়—মুক্তি-যুদ্ধে বাঙালী। ১৩৫৭। ১৫২ পৃঃ।

নরহরি কবিরাজ—স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা। ১৩৬১। ২৬২+১১ পৃঃ।

পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী—যুদ্ধের পট ভূমিকায় বাংলা। ১৩৫৩। ১১১ পৃঃ

পূরণচন্দ্র যোশী—রক্তক্ষয়ী পাঞ্জাব। ১৩৫৪। ৬০ পৃঃ।

প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ভারতের সামন্ত রাজ্য। ১৩৭৫। ৪১২ পৃঃ।

বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী—বিভক্ত ভারত। ১৩৫৬। ১০২ পৃঃ।

বিমলচন্দ্র সিংহ—দেশের কথা। ১৩৫৮। ১৭৪ পৃঃ।

বিভাস দে—ভারত কি করে স্বাধীন হ'ল। ১৩৭৫। ৬০ পৃঃ।

ভবানী সেন মুক্তির পথে বাংলা। ১৩৫৩। ৬৯ পৃঃ।

ভারতভঙ্গ আন্দোলন ১৩৫৪। ২৪ পৃঃ।

ভূতনাথ ভৌমিক—ডোমিনিয়ন ভারতের পথরেখা।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম।

ভূপেশচন্দ্র লাহিড়ী—বঙ্গে হিন্দু রাষ্ট্র চাই। ১৩৫৩। ১২৪ পৃঃ।

মণি বাগচি—কেমন করে স্বাধীন হলাম। ১৩৬৫। ১১৬ পৃঃ

মতিলাল সাহা—জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশ। ১৩৫৪। ১৬২+২ পৃঃ।

যোগেশচন্দ্র বাগল—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। ১ম খণ্ড। ১৩৫৫। ২৫১ পৃঃ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সভ্যতার সংকট। ১৩৪৮। ১১ পৃঃ।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—খণ্ডিত ভারত [অনুবাদ]। ১৩৫৪। ৪৯১ পৃঃ।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১। পঞ্চাশের মন্বন্তর। ১৩৫২। ১২২ পৃঃ।
২। রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়।

শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারত ও বর্তমান মহাযুদ্ধ। ১৩৫১। ১০৬ পৃঃ।

সুকুমার রায়—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস।

সুধাংশু সেন—ভারতীয় বাহিনীর নবজাগরণ। [নৌ-বিদ্রোহের ইতিহাস]
১৩৫৪। ১০৩ পৃঃ।

সুধীরকুমার মিত্র—নয়া বাঙ্গলা। ১৩৫৩। ১৯৮+৮ পৃঃ।

সুনীলকুমার গুহ—স্বাধীনতার আবোল তাবোল; (ইতিহাস)। ১৩৬৪।
১১+৩৭৪ পৃঃ।

হরিদাস মুখোপাধ্যায়—বিপ্লবের পথে বাঙ্গালী নারী। ১৩৫২। ১৪০+৪ পৃঃ।

হীরেন মুখার্জী—ভারতে জাতীয় আন্দোলন। ১১৫০। ১২০ পৃঃ।